ড. নির্মল দাশ

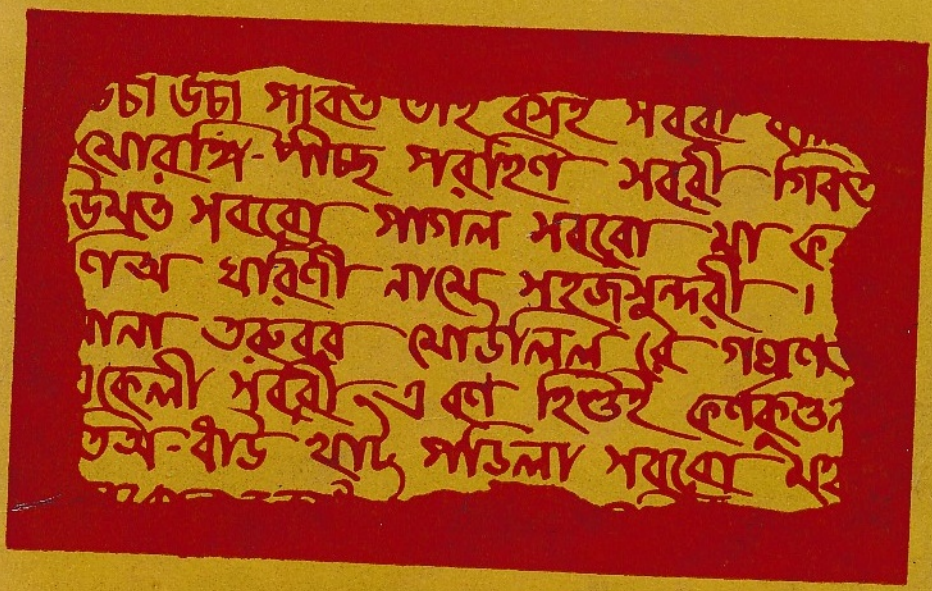

চর্যাগীতি পরিক্রমা

চর্যাগীতি পরিক্রমা

ড. নির্মল দাশ
প্রফেসর, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

দে' জ পা ব লি শি ং ॥ ক ল কা তা ৭০০ ০৭৩

CARYAGITI PARIKRAMA
A Textual criticism of the old Bengali Carya lyrics By Dr. Nirmal Das
Published by Sudhangshusekhar Dey
Dey's Publishing, 13 Bankim Chatterjee Street
Calcutta 700 073
Rs. 80.00

প্রথম দে'জ সংস্করণ : জুলাই ১৯৯৭, আষাঢ় ১৪০৪

প্রচ্ছদ : অজয় গুপ্ত

টা=১২০/-

দাম : ৮০ টাকা

ISBN : 81-7612-091-X

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

লেজার টাইপ সেটিং : পেজমেকার্স
২৩বি রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ৭০০ ০২৬

মুদ্রক : স্বপনকুমার দে, দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বাবা, মা ও জন্মভূমি বীরকুৎসা (রাজসাহী : বাংলাদেশ)
গ্রামের স্মৃতির উদ্দেশে

ভূমিকা

এর আগে 'চর্যাগীতি পরিক্রমা'র দুটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। দীর্ঘদিন অমুদ্রিত থাকার পর দে'জ পাবলিশিং থেকে বইটির নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হল। নতুন সংস্করণে পুরনো সংস্করণের কিছু ত্রুটি ও অসংগতি দূর করা হয়েছে। অন্যদিকে চর্যায় ভাষাব্যবহারের ব্যাপারটিকে সমাজভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটু নতুনভাবে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। ইচ্ছা ছিল এই উপলক্ষে চর্যার ভাষারূপে কতগুলো উপভাষার সমবায় ঘটেছে তা চিহ্নিত করা। কিন্তু সময়ের অভাবে তা করা হয়ে উঠল না। কেউ যদি এ ব্যাপারে উৎসুক হয়ে কাজে হাত দেন তবে পূর্বভারতীয় আর্যভাষা প্রসারের বিষয়ে নতুন আলোকপাত হবে বলে আমার মনে হয়।

নতুন সংস্করণ প্রকাশের সময় প্রয়াত অধ্যাপক সুকুমার সেনের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ছে। কারণ দ্বিতীয় সংস্করণ (১৯৮১) প্রকাশের আগে চর্যাপদের কয়েকটি গানের প্রচলিত পাঠান্তর নিয়ে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় পত্রিকায় আমি একটি ছোট প্রবন্ধ লিখি। এই প্রবন্ধে আমি দেখাবার চেষ্টা করি যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং সুকুমার সেন অনেক ক্ষেত্রেই পুথির পাঠ নাকচ করে দিয়ে সেই সব জায়গায় যে নতুন পাঠের প্রস্তাব দিয়েছেন সেগুলি অপ্রয়োজনীয়, বরং পুথির পাঠই বহুলাংশে সঠিক ও গ্রহণযোগ্য। এই প্রবন্ধ প্রকাশের পর অধ্যাপক সেন আমাকে ডেকে পাঠিয়ে জানতে চান যে এই প্রবন্ধের কথা তাঁকে আমি আগে কেন জানাই নি। আমি সভয়ে তাঁকে জানাই যে, তাঁর পাঠান্তরকে অপ্রয়োজনীয় বলার ধৃষ্টতাকে তিনি ভালভাবে নেবেন না ভেবেই আমি তাঁকে এই প্রবন্ধের কথা জানাই নি। আমার উত্তরে তিনি সস্নেহ তিরস্কার করে সেদিন বলেছিলেন, 'তুমি ভারি একটা কথা বললে! আমি লিখব আর সবাই তা মাথা পেতে মেনে নেবে, তা হলে আর লেখা কেন? তাহলে নতুন কথা আসবে কি ভাবে? তুমি বেশ করেছ আমার পাঠ না মেনে। আমি পড়েছি তোমার লেখা। তোমার সবটুকু আমি মানতে না পারলেও তোমার আদ্ধেকটা আমার মানতে আপত্তি নেই'। প্রবীণ শিক্ষকের এই ঔদার্যে আমি সেদিন একদিকে যেমন হতবাক হয়েছিলাম, অন্যদিকে তেমনি গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম চর্যার পাঠান্তরগুলি নিয়ে পূণাঙ্গ পুনর্বিবেচনার জন্য। নতুন সংস্করণ প্রকাশের মুহূর্তে তাই অনিবার্যভাবে তাঁর কথা বার বার মনে পড়ছে।

এই উপলক্ষে অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পের ক্বার্নের কথাও উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের পর তাঁর সঙ্গে আমার যে পত্রালাপ হয় তাতে আমি বিশেষভাবে উপকৃত হই।

বইটির নতুন সংস্করণ প্রকাশের ব্যাপারে দে'জ পাবলিশিং-এর কর্ণধার শ্রীসুধাংশুশেখর দে-কে কৃতজ্ঞতা জানাই, কারণ নতুন সংস্করণের প্রেসকপি তৈরি করার ব্যাপারে তিনি আমার আলস্যপ্রবণতা ও কেন্দ্রাতিগ অভিমুখিতাকে অতিক্রম করতে সাহায্য করে পরিণামে আমারই উপকার করেছেন। এ ব্যাপারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের নিরবচ্ছিন্ন প্রেরণা আমার জড়তা-ভঙ্গে অনেকখানি সাহায্য করেছে। অনুজপ্রতিম বিমল আমার বহুদিনের সুখদুঃখের সঙ্গী, সুতরাং তাকে ধন্যবাদ জানাবার আনুষ্ঠানিকতা নিষ্প্রয়োজন। চিরসুহৃদ অজয় এবারও মলাট এঁকে দিয়েছে, এই ভালবাসাও আমার পাথেয়।

বাংলা বিভাগ
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

নির্মল দাশ

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় : উপক্রম
আবিষ্কার ৯--১০ : পুথি-পরিচয় ১০-১২ ; পুথির নামকরণ ১২-১৫ ; রচনাকাল ১৬-২০ ; কবি-পরিচয় ২০-২৬

দ্বিতীয় অধ্যায় : ভাষাপ্রসঙ্গ
ভাষাবিচার ২৭-৩৩ ; চর্যাভাষার ব্যাকরণ (ক) ধ্বনিতত্ত্ব ৩৩-৩৪, (খ) রূপতত্ত্ব ৩৫-৪০ (গ), বাক্যরীতি ৪০-৪২ ; সন্ধ্যাভাষা ৪৩-৪৬

তৃতীয় অধ্যায় : তত্ত্বপ্রসঙ্গ
ধর্মতত্ত্ব ৪৭-৫১ ; সাধনতত্ত্ব ৫১-৫৭ ; দর্শনতত্ত্ব ৫৭-৬৫ ; পরিশিষ্ট : গুরুবাদ ৬৬-৬৮

চতুর্থ অধ্যায় : কবিত্ব-প্রসঙ্গ
জীবনরস ৬৯-৭৭ ; কাব্যরূপ ৭৭-৮৩ ; ছন্দ ৮৩-৮৮ ; অলঙ্কার ৮৮-৯৪

পঞ্চম অধ্যায় : উপসংহার
দেশ-কাল-সমাজ ৯৫-১০৩ ; অনুবর্তন ১০৩-১০৯

মূল পাঠ : পাঠবিচার, টীকা ও ব্যাখ্যা ১১৩-২২৬

পরিশিষ্ট : ২২৭-২২৯

আকরপঞ্জী : ২৩০-২৩১

পদপঞ্জী : ২৩২-২৪২

নির্ঘণ্ট : ২৪৩-২৪৪

সংক্ষেপসূচী

আ ভা অ = আঞ্চলিক ভাষার অভিধান।
ক. বি. = কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। চ. প. = চর্যাগীতি পদাবলী। তু. = তুলনীয়। দ্র. = দ্রষ্টব্য। HBL = History of Bengali Language. IL = Indian Linguistics. JDL = Journal of the Department of Letters. ODBL = The Origin and Development of the Bengali Language. SED = Sanskrit-English Dictionary

প্রথম অধ্যায়

উপক্রম

আবিষ্কার :

চর্যাগীতির আবিষ্কার বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সমগ্র উনিশ শতকে তো বটেই, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত এই অমূল্য ঐতিহাসিক উপাদানগুলি শিক্ষিত সমাজের আগোচর ছিল। ১৮৫৮ সালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকায় 'বঙ্গভাষার উৎপত্তি' নামে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন সেখানে বাংলাকে হিন্দীর পূর্বী শাখা থেকে উৎপন্ন বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন সেখানে বিদ্যাপতির রচনাবলী ; অন্যদিকে ১৯১১ সালে প্রকাশিত দীনেশচন্দ্র সেনের The History of Bengali Language and Literature-এ বাংলা সাহিত্যের আদিপর্বে বৌদ্ধ প্রভাবের কথা উল্লিখিত হলেও তাঁর আলোচনা প্রধানত গোপীচন্দ্রের গান, ডাক-খনার বচন ইত্যাদি কতকগুলি লৌকিক উপাদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই সব আলোচনায় অনুমানের স্থান যতটা প্রশস্ত ছিল তথ্যের প্রতিষ্ঠা ততটা প্রধান ছিল না। অবশ্য উপযুক্ত তথ্যও তখন সহজ-প্রাপ্য ছিল না। সেদিক থেকে চর্যাগীতিগুলির আবিষ্কারে ইতিহাসের অনেক শূন্যস্থান পূরণ ও পূর্বে অনুমিত সূত্রের পুনর্মূল্যায়ন সম্ভব হয়েছে।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এই অমূল্য ঐতিহাসিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয় বাংলার বাইরে রক্ষিত নেপালের রাজকীয় গ্রন্থভাণ্ডারে। প্রকৃতপক্ষে নেপাল ও তিব্বতে রক্ষিত বিভিন্ন বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থের পুথির দিকে সর্বপ্রথম বিদেশী গবেষকদেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। Brian Hodgson নামে জনৈক ইংরেজ নেপাল থেকে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের অনেকগুলি পুথি আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের পর তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস রচনা ও শাস্ত্রগ্রন্থ সম্পাদনার ব্যাপারে গবেষকদের মধ্যে বিশেষ তৎপরতা দেখা দেয়। বিস্তৃত ভাবে এ কাজ প্রথম শুরু করেন Eugene Burnouf (১৮৪৪)। এর পর আরও অনেক গবেষক নূতনতর পুথির সন্ধানে অনেকবার নেপালে গিয়েছেন। Daniel Wright ও Cecil Bendall-এর নাম এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাঙালি গবেষকরাও এ ব্যাপারে পশ্চাৎপদ ছিলেন না। রাজেন্দ্রলাল মিত্র নেপাল গিয়ে সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিভিন্ন বৌদ্ধপুথির সন্ধান করে ১৮৮২ সালে Sanskrit Buddhist Literature in Nepal নামে একটি পুথির তালিকা প্রকাশ করেন। রাজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর সরকার হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপর বাংলা-বিহার-আসাম-উড়িষ্যার পুথিসন্ধান ও সংগ্রহের দায়িত্ব ন্যস্ত করেন। রাজেন্দ্রলালের তালিকা ও আরো নবাবিষ্কৃত পুথির ভিত্তিতে হরপ্রসাদের

মনে হয় যে নেপালের নানা জায়গায় বৌদ্ধধর্ম-সংক্রান্ত নানা পুথি ছড়িয়ে রয়েছে এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এইসব উপকরণ একান্ত অপরিহার্য। এইসব উপকরণ সংগ্রহের জন্য তিনি ১৮৯৭-৯৮ সালে দুইবার নেপালে গিয়ে কতকগুলি সংস্কৃত পুথি সংগ্রহ করে আনেন এবং ১৯০৭ সালে তৃতীয়বার নেপাল গিয়ে আরও কিছু পুথি আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কৃত পুথিগুলির মধ্যে 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়', সরহপাদের দোহা ও অদ্বয়বজ্রের সংস্কৃতে রচিত 'সহজাম্নায়পঞ্জিকা' নামক টীকা এবং কৃষ্ণাচার্যের দোহা ও আচার্যপাদের সংস্কৃতে রচিত 'মেখলা' নামক টীকার পুথিগুলিকে প্রাচীন বাংলায় রচিত বলে তাঁর মনে হয়। এই তিনখানি পুথির সঙ্গে ডাকার্ণবের পুথিটি গ্রহণ করে তিনি বাংলা ১৩২৩ সনে (ইং ১৯১৬) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ প্রকাশের পর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ বিষয়ক পূর্বতন ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তগুলি বিচলিত হয়ে পড়ল। শুধু বাংলাই নয় হিন্দী, মৈথিলী, ওড়িয়া প্রভৃতি অন্যান্য নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহাসিকদের মধ্যেও বিশেষ তৎপরতা দেখা গেল। ফলে এক দিকে নেপালের পুথি সম্পর্কে ভারতীয় গবেষকদের আগ্রহ আরো প্রসারিত হলো, অন্য দিকে হরপ্রসাদ-আবিষ্কৃত রচনাবলীর নিবিড়তর বিশ্লেষণ শুরু হল। এই বিশ্লেষণের ফলে দেখা গেল, হরপ্রসাদের আবিষ্কার চমকপ্রদ হলেও তাঁর সিদ্ধান্তগুলি সমস্তই অভ্রান্ত নয়। প্রথমত দেখা গেল তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সব কয়টি পুথিই বাংলায় রচিত নয়, শুধু প্রথম পুথিটির ভাষাই বাংলা, অন্য তিনটি পশ্চিমা অপভ্রংশে রচিত। দ্বিতীয়ত হরপ্রসাদ মনে করেছিলেন যে তাঁর আবিষ্কৃত পুথিখানিই চর্যাগীতি সংগ্রহের মূল পুথি এবং সেই পুথিরই নাম 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'। সেই অনুসারে মুদ্রণের সময় পুথির নামকরণ করেছিলেন 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'। কিন্তু সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-আবিষ্কৃত তথ্যের সূত্র ধরে ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী চর্যাগীতির যে তিব্বতী অনুবাদ সংগ্রহ করেছিলেন তাতে দেখা যায় যে মূল গীতিসংগ্রহের নাম ছিল 'চর্যাগীতিকোষবৃত্তি'।

পুথি-পরিচয়

১. ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' প্রকাশের সময় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যার পুথিটিকে 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' নামে অভিহিত করেছেন, কিন্তু নেপালের দরবার-গ্রন্থাগারে (বর্তমানে 'রাষ্ট্রীয় অভিলেখাগার') রক্ষিত এই পুথিটির প্রথম পত্রের সম্মুখ পৃষ্ঠায় পুথির পরিচয় হিসাবে নাগরী হরফে 'চর্য্যাচর্য্যটীকা' কথাটি লেখা আছে। বস্তুত শাস্ত্রী 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'য় এই নাম উল্লেখ না করলেও 'বৌদ্ধগান ও দোহা' প্রকাশের আগে ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'A catalogue of Palmleaf and selected Paper MSS belonging to the Durbar Library, Nepal' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের (Vol. II) তালিকায় পুথিটির নাম হিসাবে তিনি দুই জায়গায় 'চর্য্যাচর্য্যটীকা' কথাটির উল্লেখ করেছেন (দ্রষ্টব্য : পৃ. xi এবং 94)। সুতরাং শাস্ত্রী যে পুথিতে লিখিত শিরোনামটি লক্ষ্য করেছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

২. পুথিটি তালপাতায় পুরনো বাংলা অক্ষরে (লিপিতাত্ত্বিকদের পরিভাষায় 'প্রত্ন বাংলা' অক্ষরে) লেখা। পুথির দীর্ঘতর পাতাগুলির আকার মোটামুটি $১২\frac{৮}{১০}'' \times ১\frac{৯}{১০}''$ পুথির নামপত্রে অবশ্য মাপ হিসাবে লেখা আছে "লে $১২\frac{৩}{৪}$ চৌ $১\frac{৭}{৮}$ এবং ক্যাটালগে শাস্ত্রীর উল্লিখিত মাপ "$12\frac{1}{2} \times 2$ inches")। পুথির শেষ পত্রসংখ্যা ৬৯ ; ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৬৬ সংখ্যক পত্রগুলি পুথিতে নেই। ৬৯ সংখ্যক পত্রের বিষয়গত অসম্পূর্ণতা ও তিব্বতী অনুবাদের সূত্র থেকে মনে হয় ৬৯ সংখ্যক পত্রের পর পুথিতে অন্তত আরও একটি পত্র ছিল, সেটিও নিরুদ্দেশ। পুথির প্রতিপত্রের দুই পৃষ্ঠাতেই লেখা, পশ্চাৎ পৃষ্ঠায় পত্রসংখ্যা উল্লিখিত। প্রতিপৃষ্ঠায় পাঁচটি পঙ্‌ক্তি (কেবল ৬৫-র পশ্চাৎ পৃষ্ঠায় তৃতীয় পঙ্‌ক্তির ছেড়ে যাওয়া অংশ ঐ পৃষ্ঠার প্রথম পঙ্‌ক্তির মাথায় লেখার ফলে ঐ পৃষ্ঠার পঙ্‌ক্তিসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬ ; বলা বাহুল্য এটি ব্যতিক্রমের মধ্যে গণ্য)। প্রতি পৃষ্ঠার প্রথম ও পঞ্চম পঙ্‌ক্তি একটানা লেখা ; দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পঙ্‌ক্তির প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় (বাঁ দিকে ঘেঁষে) বর্গাকৃতি ব্যবধান আছে, পুথির বন্ধনসূত্রের জন্য ছিদ্র রাখার উদ্দেশ্যেই এই ব্যবধান।

৩. পুথির প্রথম পত্রের সম্মুখ পৃষ্ঠায় বাঁ দিকের ঊর্ধ্বপ্রান্তে লাল কালিতে নাগরী হরফে একটি তারিখ লেখা আছে : 'সম্বত ৭৪১ ভাদ যমবাত' = ভাদ্র ৭৪১ সংবৎ। নেওয়ার সংবতের সূচনা ২০ অক্টোবর ৮৭৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে, বর্ষারম্ভ কার্তিক মাসের শুক্ল প্রতিপদ থেকে (দ্রষ্টব্য : Medieval Nepal, Part I, D.R. Regmi, p. 49-51)। সেই হিসাবে 'ভাদ্র' নেওয়ার সংবতের একাদশ মাস ; কাজেই ৭৪১ সংবৎ+৮৭৯ =১৬২০ খ্রীস্টাব্দ। হয়ত ঐ বৎসর ভাদ্র মাসে পুথিটি রাজ-গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হয়েছিল। তবে পুথির লিখিত হওয়া ও রাজ-গ্রন্থাগারে গৃহীত হওয়ার মধ্যে বেশ কিছু সময়ের ব্যবধান ছিল বলেই মনে হয়। মুনিদত্তের জীবৎকাল যদি ত্রয়োদশ শতাব্দী হয় (দ্রষ্টব্য : ভাষাবিচার) তবে মনে হয় পুথিটি ত্রয়োদশ শতকের শেষের দিকে বা চতুর্দশ শতকের গোড়ার দিকে লিখিত হয়েছিল।

৪. পুথিতে অনেক জায়গায় গানের পাঠের সঙ্গে টীকার পাঠের মিল নেই (দ্রষ্টব্য : ভাষাবিচার)। আবার পুথির দশম গানের টীকার শেষে মন্তব্য আছে "লাড়ীডোম্বীপাদানাং সূনেত্যাদি চর্যায়া ব্যাখ্যা নাস্তি"। এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায় দশম চর্যার মূল পাঠ ও টীকার পরে এবং একাদশ চর্যার আগে লাড়ীডোম্বীপাদের একটি চর্যা ছিল এবং সেটির সূচনা 'সূন' শব্দ দিয়ে। কিন্তু টীকার অভাবে গানটি লিপিকর বর্জন করেছেন। এই সব তথ্য থেকে মনে হয় শাস্ত্রীর পুথিটি আসলে গান ও টীকার একটি যুক্ত-সংকলনের পুথি (Collated text)। লিপিকরের সামনে সম্ভবত দুটি আদর্শ পুথি (exemplar text) ছিল—একটি শুধু গানের পুথি, তাতে টীকা ছিল না ; অন্যটি শুধু টীকার পুথি, তাতে গান ছিল না। এই শুধু গানের পুথিটি একশত গান-সম্বলিত চর্যাগীতিকোষের পুথিও হতে পারে, যা বুধগণ সংকলন করেছিলেন বলে 'চর্যাগীতিকোষবৃত্তি'রতিব্বতী অনুবাদে উল্লিখিত আছে। তবে গানের যে-পুথি লিপিকর ব্যবহার করেছিলেন, মুনিদত্ত সেই পুথি ব্যবহার করেন নি। তিনি ভিন্ন কোন পুথি

ব্যবহার করেছিলেন বলে তাঁর টীকার পাঠের সঙ্গে পুথির মূল গানের পাঠে অনেক জায়গায় ভিন্নতা দেখা যায়। মুনিদত্ত একশোটি গানের মধ্যে পঞ্চাশটি গান বেছে নিয়ে টীকা লিখেছিলেন, তাই কোন কোন চর্যার টীকা তাঁর টীকার বইতে বাদ পড়েছিল। ১০নং ও ১১নং চর্যার মধ্যবর্তী লাড়ীডোম্বীপাদের চর্যাটি সম্ভবত এই রকম একটি বাদ-পড়া চর্যা যা মুনিদত্ত টীকার জন্য বাছাই করেন নি। সুকুমার সেন অনুমান করেছেন মুনিদত্তের মূলপুথিতে শুধু টীকাই ছিল, গান ছিল না, "তাই একটি চর্যার টীকার পরেই অপর চর্যার টীকা আরম্ভ করিতে গিয়া টীকাকার প্রায়ই লিখিয়াছেন 'তমেবার্থং প্রতিপাদয়তি' ইত্যাদি বলিয়া। মধ্যে মূল চর্যার ব্যবধান থাকিলে এমন লিখিতেন না" (চর্যাগীতি পদাবলী, ভূমিকা, ১৮মে ১৯৬৬, পৃ ২-৩)। শাস্ত্রী-আবিষ্কৃত পুথির লিপিকর বা পুথির মূল প্রণেতা গানের আদর্শ পুথি থেকে গানগুলি এবং টীকার আদর্শ পুথি থেকে টীকাগুলি সংকলন করেছেন এবং সংকলনের সময় টীকার আগে সংশ্লিষ্ট গানগুলি বসিয়ে দিয়েছেন, তবে এই বসিয়ে দেবার কাজটি ঘটেছে কিছুটা যান্ত্রিকভাবে, তাই তিনি মিলিয়ে দেখেননি গানের পাঠের সঙ্গে টীকাকৃত পাঠের সর্বাঙ্গীণ মিল আছে কি না। সম্ভবত গোড়ার দিকে গানের পুথি ও টীকার পুথি আলাদা আলাদা প্রচলিত ছিল, পরে শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে ব্যবহারের সুবিধার জন্য একটি পুথির আধারে গান ও তাদের টীকার যুক্ত সংকলনের রীতি চালু হয়। শাস্ত্রীর পুথি এই ধরনেরই একটি সহজ-ব্যবহার্য যুক্ত সংকলনের পুথির প্রতিলিপি। অনুমান করা যায় এই ধরনের যুক্ত সংকলনের পুথি বৌদ্ধ পণ্ডিত ও বিদ্যার্থীদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় ছিল, তাই এই ধরনের পুথির অনেক প্রতিলিপি তৈরি করা হয় এবং অন্য ভাষাতেও এগুলির অনুবাদ হয়। Grags-pa rgyal-mchan কাশ্মীরি পণ্ডিত কীর্তিচন্দ্রের উপদেশ অনুসারে সম্ভবত চতুর্দশ শতকের প্রথমার্ধে নেপালে এই ধরনের পুথির তিব্বতী অনুবাদ করেন এবং ১৭৪১-৪৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে চীনে এই ধরনের পুথির মোঙ্গোলীয় অনুবাদ হয় (Kvaerne, p 3 footnote 25 at p. 269)। তবে এই যুক্ত সংকলনের পুথিগুলি হাতে লেখা বলেই বিভিন্ন পুথির মধ্যে আনুপূর্বিক অভিন্নতা ছিল না। যেমন, তিব্বতী অনুবাদের পুথিতে ৫০নং চর্যার 'তইলা বাড়ির...ফুলিআ'—এই চরণদুটির পাঠ ও টীকার অনুবাদ নেই। মনে হয় তিব্বতী অনুবাদক যুক্ত সংকলনের যে পুথি ব্যবহার করেছিলেন তাতে এই চরণদুটি ও তার টীকা ছিল না। সুতরাং শাস্ত্রী-আবিষ্কৃত পুথিটি সটীক চর্যাগীতির একমাত্র পুথি নয়, অন্যতম পুথি। তবে শুধু সেই অন্যতম পুথিটিই আমাদের হস্তগত হয়েছে।

পুথির নামকরণ ॥

চর্যার পুথিটি প্রকাশের সময় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তার পরিচয় দিতে গিয়ে 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা'-র মুখবন্ধে লিখেছিলেন "১৯০৭ সালে নেপালে গিয়া আমি কয়েকখানি পুথি দেখিতে পাইলাম। একখানির নাম 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়'।" শাস্ত্রী যেভাবে সোজাসুজি পুথিটির নামোল্লেখ করেছেন তাতে মনে

হতে পারে যে পুথির মধ্যেই 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' পদগুচ্ছ পুথির নাম হিসাবে উল্লিখিত আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পুথির কোনখানেই নাম হিসাবে তো দূরের কথা, এই পদগুচ্ছ সাধারণভাবেও উল্লিখিত হয় নি। সাধারণত পুথির পুষ্পিকাতে পুথির নাম পাওয়া যায়, কিন্তু পুষ্পিকার পাতাটি লুপ্ত হওয়ায় সেখান থেকে পুথিনাম উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। ফলে পুথির নামকরণ নিয়ে বিদ্বৎসমাজে নানা প্রশ্ন ওঠে।

বিধুশেখর শাস্ত্রী[১] মনে করেন যে প্রচলিত প্রথা অনুসারে পুথির মধ্যেই পুথির নাম দেওয়া আছে। পুথিশেষের পুষ্পিকা পাওয়া না গেলেও অনেক সময় পুথির গোড়ার দিকেও পুথির নাম প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত থাকে। সেদিক থেকে পুথির একেবারে গোড়ায় প্রারম্ভিক শ্লোকে যে 'শ্রীলূয়ীচরণাদিসিদ্ধরচিতেষ্ব প্যাশ্চর্য্যচর্য্যাচয়েসদর্দ্ধাবগমায় নির্মলগিরাং টীকাং বিধাস্যে স্ফুটং'[২] বাক্যাংশটি লিখিত আছে তার অন্তর্গত 'আশ্চর্য্যচর্য্যাচয়' পদগুচ্ছটিকেই বিধুশেখর পুথির নাম হিসাবে শনাক্ত করা যুক্তিযুক্ত মনে করেছেন। অন্যদিকে প্রবোধচন্দ্র বাগচী মনে করেন "The name chosen by Dr. Sastri was based on a wrong reading of the title Caryāścarya-viniścaya which however was not exactly quoted but suggested in the Sanskrit verse referred to". অর্থাৎ বাগচী পুথির যথার্থ নাম 'চর্য্যাশ্চর্য্যবিনিশ্চয়' বলে মনে করেন, কারণ তাতে চর্যার আশ্চর্যত্ব বা রহস্যময়তার ভাবটি ধরা পড়ে। কিন্তু বিধুশেখর বা প্রবোধচন্দ্রের সংশোধন প্রস্তাব সম্পর্কেও প্রশ্ন থেকে যায়। কারণ, বিধুশেখর যে 'আশ্চর্য্যচর্য্যাচয়' পদগুচ্ছকে পুথির নাম হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, সেটি পুথির অন্তর্গত হলেও সেটি পুথিনাম হিসাবে ঐ শ্লোকবাক্যে ব্যবহৃত হয় নি, ব্যবহৃত হয়েছে ঐ শ্লোক-বাক্যের একটি সাধারণ বাক্যাংশ হিসাবে অর্থাৎ আশ্চর্যচর্য্যাচয়=আশ্চর্য চর্যাসমূহ। কাজেই এটি পুথির অন্তর্গত উল্লেখ—এই যুক্তিতে একে পুথিনাম হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। অন্যদিকে, পুথিতে উল্লেখ নেই—এই যুক্তিতে যদি শাস্ত্রীর 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' নামটির প্রামাণিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হয়, তবে সেই একই যুক্তিতে প্রবোধচন্দ্রের প্রস্তাবিত নামটিও প্রশ্নাধীন হয়ে পড়ে, কারণ পুথির কোথাও 'চর্য্যাশ্চর্য্যবিনিশ্চয়' পদগুচ্ছটি নাম হিসাবে দূরে থাক সাধারণ বাক্যাংশ হিসাবেও ব্যবহৃত হয় নি। সুতরাং পুথির নাম হিসাবে 'চর্য্যাশ্চর্য্যবিনিশ্চয়' পদগুচ্ছটিও গ্রহণযোগ্য নয়।

এখানে একটা ব্যাপারে জটিলতা সৃষ্টি হয়। শাস্ত্রী তাঁর মুখবন্ধে পুথিটিকে সরাসরি 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' বলে উল্লেখ করলেও পুথির মধ্যে কোথাও এ নাম পাওয়া যাচ্ছে না। অন্যদিকে ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে বৌদ্ধ গান ও দোহা প্রকাশের আগের বছর ১৯১৫

---

১. V. Bhattacharya - Is it Caryāścaryaviniścaya or Āścaryacaryācaya : Indian Historical Quarterly, Vol. VI, 1930, pp. 169-71

২. অর্থ : শ্রীলুইপাদাদিসিদ্ধ রচিত আশ্চর্য্যচর্য্যাসমূহের মধ্যেও ভাল রাস্তায় (বা ভাল ভাবে) প্রবেশের জন্য পরিষ্কার ভাষায় পরিষ্কার টীকা লিখছি।

সালে তিনি যে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে A Catalogue of Palm leaf and selected Paper MSS belonging to the Durbar Library, Nepal' প্রকাশ করেন তার দ্বিতীয় খণ্ডের তালিকায় এই পুথির নাম হিসাবে দুই জায়গায় (p xi এবং 94) 'চর্য্যাচর্য্যটীকা' কথাটি উল্লেখ করেছেন। এই নাম তিনি পুথির মলাটেই লিখিত থাকতে দেখেছেন। এখানেই প্রশ্ন জাগে, পুথির মলাটে পুথির নামোল্লেখ থাকলেও এবং ঐ নাম একবছর আগেকার গ্রন্থতালিকায় পুথিনাম হিসাবে উল্লেখ করলেও পরের বছর বাংলা বইতে নামটি বাদ দিলেন কেন ? এ ব্যাপারে শাস্ত্রী কোন ব্যাখ্যা দেন নি, কাজেই আমাদের অনুমানের আশ্রয় নিতে হয়। অনুমান করা যায় যে, পুথির মলাটে উল্লিখিত নামটি কোন কারণে তাঁর কাছে প্রামাণিক বলে মনে হয়নি এবং সেই জন্য সব রকম বিতর্কের ঝুঁকি এড়াবার উদ্দেশ্যে কোন ব্যাখ্যার মধ্যে না গিয়ে সরাসরি বলেন 'একখানির নাম চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়'। বলা বাহুল্য, এই নাম শাস্ত্রীর স্বকপোলকল্পিত। তবে এই কল্পনা যথেচ্ছ নয়, এতে তান্ত্রিক বৌদ্ধদের গ্রন্থনামকরণের প্রচলিত রীতি অনুসৃত হয়েছে। তান্ত্রিক বৌদ্ধগ্রন্থাদির নামকরণে একটি প্রচলিত শব্দসজ্জারীতি ছিল : ইতিবাচক শব্দ + নেতিবাচক শব্দ + 'বিনিশ্চয়', যেমন, আচার্য জেতারি-র দার্শনিক গ্রন্থ 'ধর্মাধর্মবিনিশ্চয়' ; শব্দসজ্জার আর একটি রীতি ছিল : নামের মধ্যে 'বিনিশ্চয়' শব্দটি ব্যবহার করা, যেমন, অনঙ্গবজ্রের 'প্রজ্ঞোপায়বিনিশ্চয়সিদ্ধি' কিংবা বৌদ্ধ চিকিৎসাশাস্ত্রের বই 'রুজবিনিশ্চয়'। শাস্ত্রী বৌদ্ধ গ্রন্থাদির নামকরণের এই শাব্দিক ঐতিহ্য অনুসরণ করেই সম্ভবত নতুন নামকরণ করেন 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়'। এই নামের ব্যাখ্যা করে অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন 'যে গ্রন্থ আচরণীয় ও অনাচরণীয় তত্ত্বসমূহকে বিশেষরূপে নিশ্চয় করিয়া দেয়—তাহাই চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম খণ্ড, ১৯৬৩, পৃ. ১৬২)।

কিন্তু এখানেও প্রশ্নের নিরসন হয় না। প্রশ্ন থেকেই যায় যে, তিনি পুথির মলাটে লেখা নামটি কেন প্রামাণিক বলে মনে করেন নি ? এ ব্যাপারেও শাস্ত্রীর ব্যাখ্যাই সবচেয়ে অপেক্ষিত ছিল, কিন্তু তার অভাবে আমাদের পুনরায় যুক্তিনির্ভর অনুমানের আশ্রয় নিতে হয়। মনে হয়, মলাটে লেখা পুথিনামের নাগরী হরফই এই নামের প্রামাণিকতা সম্পর্কে তাঁকে সন্দিহান করে তুলেছিল। এই সন্দেহের কারণ, মলাটের পর গোটা পুথিটিই আগাগোড়া প্রত্ন-বাংলা হরফে লেখা, কিন্তু মলাটের উপর 'চর্য্যাচর্য্যটীকা' পদগুচ্ছটি নাগরী হরফে লেখা। এ থেকে মনে হয়, পুথির লেখক এবং পুথির মলাটে পুথিনামসহ আর যা কিছু লেখা আছে তার লেখক এক এবং অভিন্ন নয়, দুই ব্যক্তির জীবৎকালের মধ্যে সময়ের অনেক ব্যবধান ছিল। অর্থাৎ মূল পুথিটি অনেক আগে লেখা হয়েছে, পুথির মলাটের উপরের পুথিনামসহ সমস্ত লেখাই মূল পুথি লিখিত হবার অনেক পরে ভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা লিখিত অর্থাৎ মলাটের 'চর্য্যাচর্য্যটীকা' নামটি পরবর্তীকালের প্রক্ষেপ। এই অনুমানের কারণ, নেপালের বিভিন্ন রাজবংশে যতদিন বৌদ্ধ প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল ততদিন পূর্বভারতের অন্যান্য এলাকার মত নেপালেও ঐসব রাজবংশের আনুকূল্যে প্রত্ন-বাংলা হরফ রাজকীয় লিপি হিসাবে প্রচলিত ছিল। ঐ সময়

লেখার ভাষা যাই হোক লেখার হরফ ছিল প্রত্ন-বাংলা লিপি। পরে বৌদ্ধ রাজবংশের পতনের পর নেপালে যখন বহিরাগত হিন্দু রাজবংশের একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপিত হয় তখন থেকেই (মোটামুটি পঞ্চদশ শতকের দিকে) হিন্দু তথা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির স্মারক হিসাবে নেপালে প্রত্ন-বাংলা হরফের বদলে নাগরী হরফ রাজকীয় লিপি হিসাবে স্বীকৃতি পায় এবং সর্ববিধ রাজকীয় কাজকর্মে নাগরী লিপি ব্যবহৃত হতে থাকে। আসলে মনে হয়, পুথি লেখার সময় মলাটে কোনও নাম লেখা ছিল না, পরে রাজকীয় গ্রন্থাগারে পুথিটি গৃহীত হওয়ার সময় ব্যবহারের সুবিধার জন্য গ্রন্থাগারের ভারপ্রাপ্ত রাজকর্মচারী পুথিটির মলাটে একটি সাধারণ পরিচয়-সূচক নাম হিসাবে 'চর্য্যাচর্য্য টীকা' কথাটি লিখে রাখেন। তখন নেপালের শাসনতন্ত্রে বৌদ্ধযুগ শেষ হয়ে হিন্দু যুগ পুরোপুরি শুরু হয়ে গিয়েছে এবং সরকারি কাজকর্মে প্রত্ন-বাংলার বদলে নাগরী হরফের ব্যবহার চালু হয়ে গিয়েছে। এই প্রক্ষেপ সন্দেহেই শাস্ত্রী সম্ভবত এই নামটি গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি, এবং পুথির একটি গ্রহণযোগ্য নাম চালু করার জন্য তিনি বৌদ্ধ ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিজেই একটি নাম তৈরি করেন।

কিন্তু পুথিতে উল্লেখ নেই—এই যুক্তিতে যদি চর্য্যাচর্যবিনিশ্চয়ের নামটির গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে এবং প্রক্ষিপ্ত সন্দেহে যদি 'চর্য্যাচর্য্যটীকা' নামটিও বর্জনীয় মনে হয় তবে পুথির যথার্থ নাম সম্পর্কে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়? বলা বাহুল্য, সেই সিদ্ধান্তকে তথ্যনির্ভর ও যুক্তিসঙ্গত হতে হবে। সেজন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে তথ্যসন্ধানই একমাত্র উপায়। প্রকৃতপক্ষে পুথির অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে কোন দরকারি তথ্য পাওয়া না গেলেও অন্য একটি উৎস থেকে পুথির নাম সম্পর্কে জরুরি তথ্য পাওয়া গিয়েছে। এই উৎস হচ্ছে মুনিদত্তের পুথির তিব্বতী অনুবাদ। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে P. Cordier-এর তেঙ্গুর গ্রন্থতালিকা থেকে প্রবোধচন্দ্র বাগচী এই তিব্বতী অনুবাদের পুথির সন্ধান পান এবং পরে সেটি উদ্ধার করে তিনি ঐ পুথির সংস্কৃত অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই পুথির পুষ্পিকায় চর্যাপুথির নাম, টীকাকারের নাম, তিব্বতী অনুবাদকের নামসহ আরও কতকগুলি মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। এই তথ্য অনুসারে জানা যায় যে, 'বুধগণ' একশত চর্যার 'কোষ' সংকলন করেছিলেন। শিষ্যদের 'বোধপ্রতিপাদনে'র জন্য আচার্য মুনিদত্ত তার অর্ধসংখ্যক অর্থাৎ পঞ্চাশটি পদের টীকা রচনা করেন। এই টীকা গ্রন্থের নাম 'চর্যাগীতিকোষবৃত্তি'। শাস্ত্রী যে-পুথিটি আবিষ্কার করেন সেটি এই টীকারই পুথি, তবে টীকার সঙ্গে মূল গানের পাঠও আছে অর্থাৎ পুথিটি হচ্ছে একালের ভাষায় পাঠসংকলন-সহ বোধিনী পুস্তক বা Notes with Texts। লিপিকর হয়ত ভিন্ন ভিন্ন পুথি থেকে গান ও টীকা এক আধারে সন্নিবেশিত করেছিলেন, তাই কোন কোন ক্ষেত্রে গান ও টীকার পাঠে ছোটখাট গরমিল দেখা যায়। তবু পুথিটি মূলসমেত টীকারই পুথি। মূলসমেত টীকার পুথিই তিব্বতীতে অনূদিত হয়েছিল। সুতরাং তিব্বতী অনুবাদ-পুথির সূত্রে পুথির যে নাম জানা যায় সেই 'চর্যাগীতিকোষবৃত্তি' নামটিই পুথির প্রকৃত নাম হিসাবে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যায়।

রচনাকাল :

চর্যাগীতিগুলির সঠিক রচনাকাল নির্ণয়ে কিছু প্রাথমিক অসুবিধা আছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অবশ্য এগুলিকে 'হাজার বছরের পুরাণ' বলে চিহ্নিত করেছেন, কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্ত এগুলির প্রকৃত রচনাকাল নিরূপণের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী নয়। তাঁর ধারণা ছিল যে তাঁর আবিষ্কৃত পুথিটিই চর্যাগীতি-সংগ্রহের মূল পুথি, সুতরাং এই পুথির ভাষার কাল ও গানগুলির রচনাকাল অভিন্ন। কিন্তু পরবর্তী গবেষণায় দেখা গেছে যে তাঁর পুথি পুরাতন চর্যাগীতির সটীক সঙ্কলনের অনুলিপি মাত্র। এই সঙ্কলন যখন প্রথম গৃহীত হয় সেই সময় থেকে চর্যাগীতিগুলির প্রথম রচনার মধ্যে নিশ্চয়ই কালগত ব্যবধান ছিল। তাছাড়া গায়কের মুখে মুখে গানগুলির আদি ভাষা-প্রকৃতি কিছুটা পরিবর্তিত হওয়াই সম্ভব। এই পরিবর্তন যে ঘটেছিল তার প্রমাণ মূলগান ও টীকায় উদ্ধৃত গানের মধ্যে পাঠভেদ। আসলে পুথিতে চর্যাগানের ভাষা যে অবস্থায় পাওয়া যায় তা সর্বতোভাবে প্রথম রচনাকালের সমসাময়িক নয়, হয় টীকা রচনার সমসাময়িক অথবা পুথির লিপিকালের সমসাময়িক। সুতরাং পুথির ভাষা বিচার করে গানগুলির প্রকৃত রচনাকাল নিঃসংশয়ে নিরূপণ করা খুবই কঠিন ব্যাপার। এক্ষেত্রে গানগুলির রচনাকালকে একটি নির্দিষ্ট শতাব্দীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না করে একটি ব্যাপকতর আনুমানিক কালসীমার মধ্যে স্থাপন করাই সঙ্গত।

ভাষার সূত্র কিছুটা দুর্বল বিবেচনা করে বিশেষজ্ঞদের অনেকেই তাঁদের রচনাকাল সংক্রান্ত অনুমানের পরিপূরক হিসাবে কবিদের সম্ভাব্য আবির্ভাবকালের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করেছেন। চর্যা-কবিদের জীবৎকাল সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্যাদি তেমন পাওয়া যায় না, প্রধানত জনশ্রুতি ও কিংবদন্তি থেকেই তাঁদের আবির্ভাবকালের আভাস পাওয়া যায়। এই আভাস প্রধানত অনুমান-নির্ভর হওয়ায় চর্যার রচনাকাল সম্পর্কে পণ্ডিতদের অভিমতও বিবিধ। সাধারণভাবে লুইপাদকেই আদিসিদ্ধাচার্য বলে মনে করা হয়। কিন্তু আচার্য রাহুল সাংকৃত্যায়ন লুইপাদের পরিবর্তে সরহপাদকেই আদিসিদ্ধাচার্য বলার পক্ষপাতী, লুইপাদ তাঁর মতে অপেক্ষাকৃত কনিষ্ঠ সিদ্ধাচার্য। তাঁর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরহপাদ ৮ম শতাব্দীর ব্যক্তি এবং চর্যাগানগুলি ৮ম-১২শ শতাব্দীর রচনা। অন্যদিকে ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লাহ ভুসুকু ও কাহ্নপাদকে খ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এঁরও সিদ্ধান্ত, চর্যার আনুমানিক রচনাকাল ৮ম-১২শ শতাব্দী। অপরপক্ষে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতে চর্যাগানের রচনাকালের সীমা ১০ম-১২শ শতাব্দী। চর্যার আদিকবি লুইপাদ ছিলেন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের বর্ষীয়ান সমসাময়িক, লুই ও দীপঙ্কর উভয়ে মিলে 'অভিসময়বিভঙ্গ' নামে বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থ রচনা করেন। দীপঙ্কর ১০৩৮ খ্রীস্টাব্দে ৫৮ বৎসর বয়সে তিব্বত যাত্রা করেছিলেন। এই তথ্যের ভিত্তিতে সুনীতিকুমার সিদ্ধান্ত করেছেন: "The literary life of Lui when he composed these songs, can very well be placed in the second half of the 10th century...This period provisionally may be regarded as the upper limit for the Caryas" (ODBL., Pt I, p 120)। এ ছাড়া, কাহ্নপাদ ও

গোরক্ষনাথের আনুমানিক আবির্ভাবকালের সূত্র ধরে তিনি চর্যাগীতির রচনাকালের নিম্নসীমা নির্ণয় করতে চেষ্টা করেছেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পণ্ডিতাচার্য শ্রীকৃষ্ণপাদ রচিত 'হেবজ্রপঞ্জিকাযোগরত্নমালা' নামক একটি পুথি রক্ষিত আছে। পুথিটি মগধরাজ গোবিন্দপালের সময়ে ৩৯ রাজ্যাঙ্কে (আনুমানিক ১১৯৯ খ্রীস্টাব্দে) নকল করা হয়েছিল। এই পুথির লিপিকাল ১১৯৯ খ্রীস্টাব্দ হলে, টীকার মূল পুথি নিশ্চয়ই ঐ তারিখের আগে লেখা হয়েছিল। সেদিক থেকে টীকাকারের জীবৎকালের নিম্নতম সীমা ১২শ শতকের শেষার্ধ। তিব্বতী ঐতিহ্যে একাধিক কাহ্নপাদের কথা উল্লিখিত আছে, এবং চর্যাগীতির ভণিতায় উল্লিখিত কাহ্ননামধারী কবির সংখ্যাও অন্তত দুজন। বিশেষজ্ঞের অভিমত এই যে, এই একাধিক কাহ্ননামধারী চর্যাকবির মধ্যে একজন নিশ্চয়ই উক্ত 'হেবজ্রপঞ্জিকাযোগরত্নমালা'র প্রণেতা পণ্ডিতাচার্য কৃষ্ণপাদ। কেননা যোগরত্নমালার টীকাকার কৃষ্ণপাদ যেমন 'পণ্ডিতাচার্য' তেমনি ৩৬ সংখ্যক চর্যাগানেও পদকর্তা কাহ্ন নিজেকে 'পণ্ডিতাচার্য'রূপে উল্লেখ করেছেন এবং কাহ্ন-ভণিতাযুক্ত কোন কোন গানের টীকায় কাহ্নকে কৃষ্ণাচার্য বা পণ্ডিতাচার্য রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। এই অনুমান সত্য হলে চর্যাগীতির অন্তত একজন কাহ্নের আবির্ভাব-কাল খ্রীস্টীয় ১২শ শতক বলে নির্ণয় করা চলে। অন্যদিক থেকেও এই অনুমানের সত্য ভিত্তি সন্ধান করা যায়। ৩৬ সংখ্যক গানে পদকর্তা কাহ্ন জালন্ধরিপাদকে ধর্মসাক্ষী (গুরু) বলে স্বীকার করেছেন। নাথ-সাহিত্যেও দেখা যায় জালন্ধরিপাদ হচ্ছেন গোরক্ষনাথের শিষ্য এবং তাঁর শিষ্য কানু বা কাহ্নপাদ। নাথ-সাহিত্য থেকে অবশ্য কোন ঐতিহাসিক কালসংকেত পাওয়া যায় না, তবে মারাঠী গ্রন্থ জ্ঞানেশ্বরী (আনুমানিক ১২৯০ খ্রীস্টাব্দ)-তে যে গুরু-পরম্পরার আভাস পাওয়া যায় তাতে গোরক্ষনাথের উল্লেখ আছে। এই গোরক্ষনাথ গোয়নীনাথ বা গৈনীনাথকে দীক্ষা দেন। গৈনীনাথ আবার নিবৃত্তিনাথকে দীক্ষা দেন। নিবৃত্তিনাথের কাছ থেকে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্ঞানেশ্বর দীক্ষা গ্রহণ করেন। নিবৃত্তিনাথের জন্ম হয় ১২৭৩ খ্রীস্টাব্দে। গোরক্ষনাথের প্রশিষ্য নিবৃত্তিনাথের জন্মকালের ভিত্তিতে অনুমান করা চলে যে গোরক্ষনাথের অপর প্রশিষ্য কাহ্নপাদ দ্বাদশ শতকের শেষদিকে জীবিত ছিলেন এবং এই কাহ্নপাদ ও হেবজ্রপঞ্জিকার টীকাকার কৃষ্ণপাদ একই ব্যক্তি। সুনীতিকুমারের মতে 'We would get c. 1200 A. C. as the lower limit for one Kanha at least' (ODBL. Pt I, p. 122) এবং রচনারীতি, ভাষা ও সাধারণ বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে চর্যার অন্যান্য কবি কাহ্নের আবির্ভাবকালের সমসাময়িক "The other poets, from the style of their composition, from language, and from general spirit, belong to the same age' (ODBL, Pt, I. p. 123)। সুতরাং চর্যাগানের রচনাকালের নিম্নতম সীমা আনুমানিক দ্বাদশ শতাব্দী।

কবিদের আনুমানিক আবির্ভাবকাল ছাড়াও সুনীতিকুমার ভাষাতাত্ত্বিক বিচারের সাহায্যেও চর্যাগানের রচনাকাল নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। এই বিচার অনুযায়ী চর্যার ভাষাকে তিনি চতুর্দশ শতকের শেষ পাদে রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার চেয়ে অন্তত দেড়শবছরের পুরাতন বলে বিবেচনা করেছেন। এদিক থেকেও চর্যার রচনাকালের

নিম্নসীমা দাঁড়ায় মোটামুটি খ্রীস্টীয় ১২শ শতকের দিকে। কবিদের সম্ভাব্য আবির্ভাবকাল ও চর্যাগানের ভাষালক্ষণ বিশ্লেষণ করে চর্যার রচনাকাল সম্পর্কে তিনি শেষ সিদ্ধান্ত করেছেন : "The period 950-1200 A.C. would thus seem to be a reasonable date to give to these poems, and they are preserved in a post-14th century MS." (ODBL, Pt I, p. 123)।

আচার্য সুনীতিকুমারের মতো আচার্য সুকুমার সেনও চর্যাগানের কয়েকজন কবির আবির্ভাবকালের অনুমান-সূত্র অবলম্বনে চর্যাগানের সম্ভাব্য রচনাকাল নিরূপণের চেষ্টা করেছেন। অন্যতম চর্যাকার সরহ চর্যাগান ছাড়াও অবহট্‌ঠ ভাষায় অনেকগুলি দোহা রচনা করেছিলেন। এই দোহাগুলি একসময়ে তিনটি কোষগ্রন্থে সঙ্কলিত ছিল। এই দোহাকোষের প্রাচীনতম পুথির পুষ্পিকা থেকে জানা যায় যে সরহের অনেকগুলি দোহা 'বিনষ্ট প্রণষ্ট' হতে দেখে পণ্ডিত শ্রীদিবাকর চন্দ ২২১ নেপালসংবৎ (আনুমানিক ১১০১ খ্রীস্টাব্দ)-এর শ্রাবণ মাসে লুপ্ত-প্রায় দোহাগুলির 'যথালব্ধ' ('জহালদ্ধো') সঙ্কলন করেন। মূল দোহাগুলি বিনষ্ট হতে যদি আনুমানিক পঞ্চাশ বছর লাগে তবে দোহাগুলির রচনাকাল দাঁড়ায় একাদশ শতকের মাঝামাঝি এবং সেক্ষেত্রে সরহের জীবৎকালের নিম্নতম সীমা দাঁড়ায় একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ। এক্ষেত্রে অবশ্য লুই ও সরহ প্রায় সমসাময়িক হয়ে পড়েন, কিন্তু প্রচলিত ঐতিহ্য অনুযায়ী লুই সর্বজ্যেষ্ঠ সিদ্ধাচার্য এবং সরহ তাঁর কনিষ্ঠ। এই সমস্যামোচনের জন্য ডঃ সুকুমার সেন 'অভিসময়বিভঙ্গ'-রচনার ব্যাপারে লুই-দীপঙ্কর সহযোগিতার কিংবদন্তীটির পুনর্বিচার করে অনুমান করেছেন "বোধকরি তিব্বতী ঐতিহ্যে যাহা লুই ও দীপঙ্করশ্রীর সাক্ষাৎ সহযোগিতা বলা হইয়াছে আসলে তাহা তেমন ছিল না। হয় দীপঙ্করশ্রী পরবর্তীকালে লুইয়ের অসমাপ্ত অভিসময়বিভঙ্গ সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন, নয় লুই লিখিয়াছিলেন 'অভিসময়' আর অভিসময়ের পরিশিষ্ট ("বিভঙ্গ") রচনা করিয়াছিলেন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। এমন অনুমান করিলে লুইকে দীপঙ্করশ্রীর সমসাময়িক হইতে হয় না। তাহা হইলে লুইয়ের জীবৎকাল দশম শতাব্দী বলিলে ভুল হইবার সম্ভাবনা কম হয়" (সুকুমার সেন, চর্যাগীতি পদাবলী ১৯৬৬ সংস্করণ, পৃঃ ৯)। এই অনুমান সত্য হলে লুইয়ের জীবৎকাল দশম শতাব্দী, সরহ তাঁর কিছু পরবর্তী অর্থাৎ একাদশ শতকের প্রথমার্ধ। এই অনুমান ছাড়াও অবশ্য তিব্বতী কিংবদন্তী ও সরহের দোহাকোষের পুষ্পিকার ভিত্তিতে অনুমান করা চলে যে লুই সরহের বয়োজ্যেষ্ঠ এবং বর্ষীয়ান সমসাময়িক। লুই ও সরহ দুজনেই চর্যাগীতির প্রাচীনতর কবিবৃন্দের অন্তর্ভুক্ত। এঁদের জীবনকাল একাদশ শতকের প্রথমার্ধের পরে নয়। অনুরূপভাবে ভুসুকুর জীবৎকাল সম্পর্কেও কিছু অনুমান-সূত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের সাধনা ও দিনচর্যাবিষয়ে ভুসুকু 'চতুরাভরণ' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থ অনুলিপি করা হয় ৪১৫ নেপালসংবৎ অর্থাৎ ১২৯৫ খ্রীস্টাব্দে। সুতরাং ভুসুকুর জীবৎকালের নিম্নতম সম্ভাব্য সীমা ধরা চলে ১২১৫ খ্রীস্টাব্দ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধ। এইভাবে কবিদের জীবৎকালের আনুমানিক সূত্র অবলম্বনে ডঃ সুকুমার সেন চর্যাগীতির রচনাকাল "মোটামুটি দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী" বলেই অনুমান

করেছেন, তবে তাঁর মতে "এ অনুমান নিম্নতম সীমা সম্বন্ধে খাটে" (পৃঃ ৭)।

ভাষাবিচার ও কবিদের আবির্ভাবকাল ছাড়াও আরো দু-একটি পরোক্ষ প্রমাণের ভিত্তিতে চর্যাগীতির রচনাকাল অনুমান করা যায়। এক ☐ গানের বিষয়বস্তু ও ধর্মীয় ভিত্তি, ও দুই ☐ গানের গঠন-পদ্ধতি ও গায়নরীতি। চর্যাগানে মূলত যে ধর্ম-সাধনার পরিচয় আছে তা বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের। গানগুলিতে সাধকদের আচরণ-পদ্ধতি ও ধর্মসাধনার লক্ষ্য—উভয় বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উৎসবে ও অনুষ্ঠানে এই গানগুলি গাওয়া হত। সুতরাং যে সময়-সীমার মধ্যে এই বৌদ্ধ-সহজিয়া ধর্ম ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল তারই মধ্যে এগুলি রচিত হয়েছে। এই ধর্ম ঠিক কোন্ সময় থেকে কোন্ সময় পর্যন্ত স্পষ্ট বা ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ছিল তা একেবারে নির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব নয়, তবে মোটামুটি তুর্কী আক্রমণ বা তারও আগে সেন রাজত্বের পূর্বপর্যন্ত এই ধর্মাচার যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পাল রাজাদের বৌদ্ধ ধর্মানুরক্তির সুযোগেই বাংলাদেশে মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিচিত্র শাখাবিস্তার ঘটেছিল, তারপর ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী সেন-রাজাদের সময়ে রাজন্যবর্গের পরধর্ম-অসহিষ্ণুতার জন্য এই ধর্মাচার ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে তুর্কী আক্রমণের পর শেষ পর্যন্ত নাথ, শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত প্রভৃতি অন্য সম্প্রদায়ের সহজ সাধনার মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। সুতরাং খুব শিথিলভাবে ধরলে পাল রাজত্বের সময়সীমাকেই চর্যাগানের রচনা-কালের সময়সীমা বলা চলে। সেদিক থেকেও চর্যাগানের রচনাকালের ঊর্ধ্বতম সীমা অষ্টম শতাব্দী (প্রথম পাল রাজা গোপালদেব-আনুমানিক ৭৫০ খ্রীঃ) এবং নিম্নতম সীমা আনুমানিক দ্বাদশ শতাব্দী (শেষ পাল-নৃপতি মদনপাল—আনুমানিক ১১৪০ খ্রীষ্টাব্দ)।

চর্যাগানের সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্য থেকেও পরোক্ষভাবে গানগুলির রচনাকাল অনুমান করা চলে। গানগুলির কোন কোন ক্ষেত্রে কবিরা স্বয়ং একে 'চর্যা' নামে অভিহিত (অইসনি চর্যা কুক্কুরীপাএঁ গাইউ ২।৯) করেছেন, টীকাতেও গানগুলি চর্যা নামে অভিহিত। 'চর্যা' কথার সাধারণ অর্থ অবশ্য যোগীদের আচরণ-পদ্ধতি, কিন্তু কবি ও টীকাকারের উল্লেখে বোঝা যায় 'চর্যা' কথাটি একটি বিশেষ ধরনের গানের অভিধা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই অনুমান ভিত্তিহীন নয়। প্রথমত, প্রত্যেকটি পদের সঙ্গে উল্লিখিত রাগরাগিণীর নাম দেখে বোঝা যায় এগুলি সাঙ্গীতিক উদ্দেশ্যে রচিত। দ্বিতীয়ত, ১২১০-৪৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে রচিত শার্ঙ্গদেবের 'সঙ্গীতরত্নাকর' নামক সঙ্গীত শাস্ত্রীয় গ্রন্থের প্রবন্ধ অধ্যায়ে দেখা যায় বিশেষ ছন্দঃ পদ্ধতিতে রচিত একধরনের আধ্যাত্মিক সঙ্গীতকে 'চর্যা' বলা হয়। চর্যার পারিভাষিক লক্ষণ :

পদ্ধড়ীপ্রভৃতিচ্ছন্দাঃ পাদান্তপ্রাসশোভিতাঃ।
অধ্যাত্মগোচরা চর্যা স্যাদ্ দ্বিতীয়াদিতালতঃ॥ ইত্যাদি।

অর্থাৎ "প্রতিপদে অনুপ্রাসযুক্ত পদ্ধড়ী প্রভৃতি ছন্দে রচিত, আধ্যাত্মিক বিষয়ীকৃত, দ্বিতীয় প্রভৃতি তালযুক্ত যে গীতি তাকে চর্যা বলা হয়" (রাজ্যেশ্বর মিত্র, বাংলার সঙ্গীত, পৃঃ ৪৫)। চর্যার এই শাস্ত্রীয় লক্ষণের সঙ্গে আমাদের আলোচ্য চর্যাগানগুলির প্রকৃতিগত

সাদৃশ্য আছে। 'সঙ্গীতরত্নাকর' ছাড়াও ১১২৯ খ্রীস্টাব্দে সংকলিত 'মানসোল্লাস' নামক সংস্কৃত কোষগ্রন্থে চর্যার লক্ষণ নির্দেশ করা হয়েছে :

অর্থশ্চাধ্যাত্মিকঃ প্রাসঃ পাদদ্বিতয়শোভনঃ।
উত্তরার্ধে ভবেদেবং চর্যা সা তু নিগদ্যতে।

"অর্থ অধ্যাত্মবিষয়ক, মিল আছে, দুই তিন জোড়াছত্র। দ্বিতীয় অংশেও এমনি। তাহাকে বলে চর্যা" (সুকুমার সেন, চ-প, পৃঃ ১৫৫)। মানসোল্লাস বাংলাদেশে রচিত না হলেও এতে প্রাচীন বাংলাগানের নমুনা উদ্ধৃত হয়েছে। সুতরাং বাংলাদেশের গীতপদ্ধতির সঙ্গে সংকলকের বিশেষ পরিচয় ছিল। ১২শ ও ১৩শ শতকের দুখানি বইতে যখন চর্যাগানের বিস্তৃত আলোচনা আছে তখন বোঝা যায় যে এই শ্রেণীর গান ১২-১৩শ শতকের অনেক আগে থেকেই বাংলা তথা পূর্বভারতে বিশেষ প্রচলিত ছিল। ক্রমে এই শ্রেণীর গানের জনপ্রিয়তার জন্য এ-গুলির লক্ষণ সঙ্গীতশাস্ত্রে অবশ্য-বর্ণনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই অপ্রা্ক্ষ তথ্য থেকে অনুমান করা যায় গানগুলির রচনাকালের সম্ভাব্য নিম্নসীমা মোটামুটি দ্বাদশ শতাব্দী।

কবি-পরিচয় :

চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের যে খণ্ডিত পুথিটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রকাশ করেছিলেন তাতে ৪৬টি গোটা গান ও একটি গানের ভগ্নাংশ আছে।অধিকাংশ গানেই কবির নামাঙ্কিত ভণিতা আছে, কয়েকটিতে মাত্র নেই। তবে গানের টীকাকার বা পুথির লিপিকর প্রত্যেক কবির নাম উল্লেখ করেছেন। মূল গানে ও টীকায় পদকর্তার নাম যেভাবে উল্লিখিত হয়েছে তাতে মোট ২৩ জন কবির সন্ধান পাওয়া যায়। উক্ত কবিদের নাম, প্রত্যেক কবির রচিত পদের মোট সংখ্যা ও ক্রমিক সংখ্যা নিম্নরূপ (এই তালিকায় প্রথম বন্ধনীবদ্ধ নামগুলি মূল গানে নেই, টীকা থেকে উদ্ধৃত, এবং তৃতীয় বন্ধনীবদ্ধ সংখ্যাগুলি পুথির লুপ্তপাতায় লিখিত পদগুলির ক্রমসংখ্যা, এই ক্রমসংখ্যা মূলগানের তিব্বতী অনুবাদ থেকে অনুমিত) :

	কবিনাম	ক্রমিক সংখ্যা	মোট পদসংখ্যা
১।	লুই	১,২৯	২
২।	কুক্কুরীপা	২,২০,[৪৮]	৩
৩।	বিরুআ	৩	১
৪।	গুডরী	৪	১
৫।	চাটিল	৫	১
৬।	ভুসুকু	৬,২১,[২৩], ২৭, ৩০, ৪১, ৪৩, ৪৯	৮
৭।	কাহ্ন, কাহ্নু, কাহ্ণু, কাহ্ন, কাহ্নিলা কাহ্নিল	৭, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৮, ১৯, [২৪], ৩৬, ৪০, ৪২, ৪৫	১৩

	কবিনাম	ক্রমিক সংখ্যা	মোট পদসংখ্যা
৮।	কামলি	৮	১
৯।	(ডোম্বীপাদ)	১৪	১
১০।	শান্তি	১৫, ২৬	২
১১।	মহিণ্ডা	১৬	১
১২।	(বীণাপাদ)	১৭	১
১৩।	সরহ	২২, ৩২, ৩৮, ৩৯	৪
১৪।	(শবরপাদ)	২৮, ৫০	২
১৫।	আজদেব	৩১	১
১৬।	টেন্টনপা	৩৩	১
১৭।	দারিক	৩৪	১
১৮।	ভাদে	৩৫	১
১৯।	তাড়ক	৩৭	১
২০।	কঙ্কণ	৪৪	১
২১।	জঅনন্দি	৪৬	১
২২।	ধাম	৪৭	১
২৩।	(তন্ত্রীপাদ)	[২৫]	১

কিন্তু উল্লিখিত এই সব কবিনাম থেকে কবিদের সঠিক ব্যক্তিপরিচয় উদ্ধারের কিছু অসুবিধা আছে। কেন না, এই নামোল্লেখের ব্যাপারে টীকাকার মাঝে মাঝে ভুল করেছেন। যেমন ১৭ সংখ্যক গানের টীকায় পদকর্তা হিসাবে বীণাপাদের উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু মূল গানে বীণা শব্দটি যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে (বাজই আলো সহি হেরুঅবীণা) তাতে সেটিকে গীতিকারের নাম হিসাবে গ্রহণ করা কঠিন, কেন না টীকাকারের উক্তি ছাড়া আর কোথাও এ নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। ২৮ ও ৫০ সংখ্যক গানেও 'শবর' পদটি যেভাবে আছে তাতে সেটি ভণিতা বলে মনে হয় না, অথচ টীকায় পদটি কবিনাম হিসাবে উল্লিখিত। দ্বিতীয়ত, কোন কোন ক্ষেত্রে কবিনাম মূলগানে এক প্রকার, টীকায় ভিন্নপ্রকার। তৃতীয়ত, যেসব গানের ভণিতায় 'পা' পদাংশ (কুক্কুরীপা, টেন্টনপা ইত্যাদি) আছে সেগুলিকে কবির নিজের নাম বলে গ্রহণ করায় অসুবিধা আছে। কেননা 'পা' পদাংশ সম্ভ্রমবাচক 'পাদ' শব্দের বিকার, নামের সঙ্গে 'পা'-এর উল্লেখে বোঝা যায় যে এসব ক্ষেত্রে প্রকৃত পদকর্তা ভণিতায় নিজের নাম গোপন করে গুরুর নাম উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ কুক্কুরীপা, টেন্টণপা নামাঙ্কিত গানগুলি কুক্কুরী বা টেন্টনের নিজের রচনা নয়, সম্ভবত এঁদের কোন শিষ্য বা প্রশিষ্যের রচনা। চতুর্থত, ভণিতায় অনেক ক্ষেত্রে চর্যাকারের প্রকৃত নামের পরিবর্তে ছদ্মনাম উল্লিখিত হয়েছে। যেমন ৩৭, ৪৪ সংখ্যক চর্যাগানে যথাক্রমে যে তাড়ক ও কঙ্কণ ভণিতা দুটি

ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলি কবির প্রকৃত নাম নয়। সেকালে কবিরা অনেক ক্ষেত্রে উপঢৌকন-লব্ধ অলঙ্কারের নামে নিজের ছদ্মনাম গ্রহণ করতেন। তাড়ক ও কঙ্কণ সম্ভবত কবিদের উপহার-লব্ধ ভূষণের নাম, নিজের নাম নয়। আবার টেণ্টণপা নামটিকেও ছদ্মনাম বলেই মনে হয়। তাঁর গানে যে টেণ্টন (= ধূর্ত)-সুলভ চাতুর্যের পরিচয় আছে, সেটি তাঁর রীতিচরিত্রেরই পরিচায়ক, ব্যক্তিচরিত্রের নয়। ইনি হয়ত এই ধরনের অর্থচাতুর্যপূর্ণ গান লিখতেই অভ্যস্ত ছিলেন এবং সেইজন্য তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। পঞ্চমত, কবিরা অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিপরিচয়ের বদলে ভণিতায় নিজেদের জাতি (caste)-পরিচয় উল্লেখ করেছেন। ১৪ ও ২৫ সংখ্যক গানের ভণিতায় ডোম্বী ও তন্ত্রী সম্ভবত কবির ব্যক্তি-নাম নয়, জাতিবাচক নাম।

ভণিতায় ও টীকায় যে কবি-নামগুলি পাওয়া যায় তাতে মনে হয় গানগুলি সহজিয়া সাধকদের দ্বারা গুরুশিষ্য-পরম্পরায় রচিত, সম্ভবত দু-তিন পুরুষের রচনা। কিন্তু গানগুলির ভাষা ও রচনারীতিতে কালগত বৈষম্য ও বিবর্তনের চিহ্ন তেমন পাওয়া যায় না বলে কবিদের আবির্ভাবের পৌর্বাপর্য বা কালপারম্পর্য সন্ধান করা কঠিন। এ বিষয়ে একমাত্র বাহ্যপ্রমাণ কয়েকগুলি জনশ্রুতি ও বৌদ্ধ ঐতিহ্য। তিব্বতী বৌদ্ধ ঐতিহ্যে ও অন্যান্য সহজিয়া ঐতিহ্যে যে সব সিদ্ধাচার্যের নাম পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে কবিদের পরিচয় উদ্ধারের চেষ্টা করা যায়। কিন্তু এই ঐতিহ্য ও জনশ্রুতির ঐতিহাসিক ভিত্তি অত্যন্ত শিথিল হওয়ায় এবিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন। কবিদের পৌর্বাপর্য নির্ণয়ের ব্যাপারে ডঃ সুকুমার সেন দুটি অভ্যন্তরীণ নীতি নির্ধারণ করেছেন। প্রথমত যে সব কবির রচনায় যৌন তান্ত্রিকতার ইঙ্গিত অস্পষ্ট বা অনুপস্থিত সেই সব কবি অপেক্ষাকৃত প্রবীণ, দ্বিতীয়ত যে সব রচনায় পারিভাষিক ও আভিপ্রায়িক 'সন্ধ্যা' শব্দের প্রাচুর্য আছে সেগুলির কবি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন। প্রকৃতপক্ষে সহজিয়া সাধনায় যৌনতান্ত্রিকতার অনুপ্রবেশ অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের ঘটনা এবং তন্ত্রাচার কালক্রমে যত জটিল ও গুহ্য হয়ে উঠেছে চর্যাগানের ভাষাও তত আভিপ্রায়িক হয়ে উঠেছে। এই সূত্র দুটি অনেক পরিমাণে নির্ভরযোগ্য।

চর্যাগীতি-সংগ্রহের প্রথম কবি লুই। শুধু পদসংখ্যার ক্রমানুসারেই নয়, তিব্বতী ঐতিহ্যে যে ৮৪ জন সিদ্ধাচার্যের নাম পাওয়া যায় লুই তাঁদের মধ্যেও আদিতম। নাথ ধর্মের ঐতিহ্যেও এই সিদ্ধগণ স্বীকৃত। সেক্ষেত্রে অবশ্য আদিসিদ্ধ মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ। লুই শব্দটি সম্ভবত রোহিত শব্দ থেকে সৃষ্ট (রোহিত>রুই>লুই), এই ব্যুৎপত্তি থেকে মীননাথের সঙ্গে লুইয়ের অর্থগত সঙ্গতি পাওয়া যায়। সুমুপা-রচিত Pag samjon Zans (রচনাকাল ১৭৪৭ খ্রীঃ)-এ লুইকে শবরীপা-এর শিষ্য ও ধীবর সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মৎস্যের সঙ্গে নামের সংযোগের জন্যই বোধহয় এই সিদ্ধান্ত। তিব্বতী অনুবাদের মাধ্যমে লুইয়ের তিনখানা বইয়ের নাম পাওয়া যায় 'শ্রীভগবদভিসময়', 'অভিসময়বিভঙ্গ' ও 'তত্ত্বস্বভাবদোহাকোষগীতিকাদৃষ্টি নাম'। প্রথম দুটি বই বিশুদ্ধ বৌদ্ধদর্শনের, তৃতীয়টি দোহা ও গানের কোষগ্রন্থ। অন্যান্য চর্যাকারদের মধ্যে কেউ কেউ গান ছাড়াও অন্য বই লিখেছেন, কিন্তু সেগুলি বৌদ্ধ

তন্ত্রবিষয়ক, বিশুদ্ধ দর্শনের নয়। বাংলাদেশে যখন বৌদ্ধতন্ত্রধর্ম ব্যাপ্তি লাভ করেছিল তখন আচারের চেয়ে বিশুদ্ধ দর্শনচর্চা অনেকটা অপ্রচলিত হয়ে পড়েছিল। এদিক থেকেও বোঝা যায় যে লুই সহজিয়া বৌদ্ধধর্মের গোড়ার দিককার লোক। তাঁর দুটি গানের (১, ২৯) কোথাও যৌনতান্ত্রিকতার আভাস নেই। দুটি গানেই যোগ-সাধনার মাধ্যমে অনির্বচনীয় নির্বিকল্প মহাসুখতন্ময়তার অন্বেষণকে সাধ্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই সাধনায় জপতপ-শাস্ত্র অধ্যয়নের পরিবর্তে গুরু-নির্দিষ্ট যোগমার্গের শ্রেষ্ঠত্বই স্বীকৃত হয়েছে ["দিঢ় করিঅ মহাসুখ পরিমাণ।/লুই ভণই গুরুপুচ্ছিঅজান" (১) এবং "জাহের বাণচিহ্ন রুব ন জানী/ সো কইসে আগম বেএঁ বাখানী (২৯")]। দ্বিতীয়ত, লুই কোনো পারিভাষিক সাংকেতিক শব্দ ব্যবহার করেননি, তাঁর রূপক ব্যবহারও খুব স্পষ্ট : যেমন "কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল" (১) কিংবা তত্ত্বস্বরূপের পরিচয় 'উদক চান্দজিম সাচ ন মিচ্ছা' (২৯)—জলের উপর চাঁদের বিম্ব যেমন সত্যও নয় মিথ্যাও নয়। এছাড়া ভণিতা ব্যবহারেও লুইয়ের কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে। কয়েকটি গান বাদ দিলে চর্যার অধিকাংশ গানেই রচনার শেষাংশে একবার ভণিতা ব্যবহৃত হয়েছে, লুইয়ের গানে ভণিতার ব্যবহার দুইবার—দ্বিতীয় পদে ও শেষ পদে। ১২শ শতকের মানসোল্লাসে চার ছত্রের চর্যাগানের যে নমুনা উদ্ধৃত আছে তা থেকে মনে হয় আগে চর্যাগানের দুই তিন জোড়া ছত্র-সম্বলিত ক্ষুদ্র আকৃতিই প্রচলিত ছিল, পরে আকার-বৃদ্ধি ঘটে। লুই বা তাঁর শিষ্য দারিক (৩৪) এই প্রাচীন ঐতিহ্যই গ্রহণ করেছিলেন। লুইয়ের গান দুটির প্রত্যেকটি তাই দুটি করে চর্যার যুগ্মক বলে অনুমিত হয়।

কুক্কুরীপার নামাঙ্কিত পদ তিনটিতে নামের সম্ভ্রমসূচক অংশ 'পা' থেকে অনুমিত হয় যে এগুলি কক্কুরীপাদের কোন শিষ্য বা অনুশিষ্যের রচনা। কুক্কুরীপার নামে সংস্কৃত রচনা 'মহামায়াসাধন' পাওয়া গিয়েছে, এ থেকে মনে হয় ইনি মহামায়া উপাসক ছিলেন। তারানাথের মতে কুক্কুরী পা-এর সঙ্গে সব সময় একটি কুক্কুরী থাকত, তাই এই নামকরণ। সুকুমার সেন এই নামের অন্যবিধ ব্যুৎপত্তি কল্পনা করেছেন : কুক্কুটীপাদ>কুক্কুরীপা। পুথিতে কুক্কুরীপা-এর দুটি গান পাওয়া যায়, তৃতীয় গানটি (৪৮) পুথির লুপ্ত অংশের মধ্যে ছিল। তিব্বতী অনুবাদ থেকে এই লুপ্তচর্যার সম্ভাব্য রূপ জানা যায়। প্রাপ্ত দুটি গানের সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে, দুটি গানই নারীর উক্তি হিসাবে রচিত এবং দুটি গানেই নারীজীবনের (২য় গানে অসতী গৃহস্থবধূ, ২০ সংখ্যক গানে প্রসূতি নারী) বিভিন্ন আচরণ রূপক হিসাবে গৃহীত। সন্ধ্যা ভাষার আধিক্যের জন্য চর্যাকারকে অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন বলে মনে হয়।

বিরুআ ভণিতায় প্রাপ্ত চর্যাটি সম্ভবত বিরুআর নিজের রচনা নয়। ভণিতার ক্রিয়াপদে যে গৌরবসূচক বহুবচনের (ভণন্তি· বিরুআ) ব্যবহার আছে, তাতে মনে হয় গানটি বিরুআর কোন শিষ্য বা অনুশিষ্যের লেখা। বিরুআর মূল বোধহয় বিরূপ বা বিরূপক। তিব্বতী অনুবাদে বিরূপের নামে 'কর্মচণ্ডালিকানামগীতি', 'দোহাকোষ' ও'বিরূপ-পদচতুরশীতি' নামক রচনাগুলির সন্ধান পাওয়া যায়, অন্যদিকে তারানাথ বিরুআকে কাহ্নেরই নামান্তর বলেছেন। কাহ্ন নামাঙ্কিত একটি গানে কাহ্ন নিজেকে 'বিরুআ' (১৮)

নামেই অভিহিত করেছেন (কেহো কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই) এবং ঐ গানেই আবার কাহ্ন কর্তৃক 'কামচণ্ডালী' গাওয়ার ইঙ্গিত আছে। এই 'কামচণ্ডালী' ও 'কর্মচণ্ডালিকা-নামগীতি' এক ও অভিন্ন হতে পারে। এই অনুমান সত্য হলে বিরুআ নামাঙ্কিত গানটিকে কোন এক কাহ্নের শিষ্যরচিত বলে মনে করতে হয়।

৪ সংখ্যক গানের রচয়িতা গুণ্ডরী সম্ভবত ব্যক্তিনাম নয়, কবির জাতি অথবা বৃত্তিবাচক নাম (গুণ্ডরিক>গুণ্ডরী=মশলা ইত্যাদি গুঁড়া করা যায় বৃত্তি)। গানটিতে যৌনতান্ত্রিকতার স্পষ্ট ইঙ্গিত ও পারিভাষিক শব্দের আধিক্য থাকায় পদকর্তাকে অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন বলে মনে হয়।

চাটিল নামাঙ্কিত গানের শেষ পদে চাটিলকে সশ্রদ্ধভাবে 'অনুত্তরস্বামী' বলা হয়েছে, এজন্য মনে হয় গানটি চাটিলের কোন শিষ্যের রচনা। গানের মধ্যে একজায়গায় 'ধাম'-এর উল্লেখ আছে, ডঃ সুকুমার সেনের অনুমান "মনে হয় এখানে 'ধাম' ব্যক্তি বিশেষের নাম, যিনি চাটিলের শিষ্য, মুখ্যত যাঁহার উত্তরণের জন্যই চাটিল সাঁকো গড়িয়াছেন। সে সাঁকোয় আরও অনেকে স্বচ্ছন্দে ভবসাগর পার হইয়া যাইতে পারে" (পৃ ১৩)। অন্যদিকে ধামের নামে আর একটি চর্যা পাওয়া যায়। দুটি গান একই ব্যক্তির লেখা হতে পারে।

পদকর্তা কামলি (৮) ও সিদ্ধকম্বলাম্বরপাদ সম্ভবত একই ব্যক্তি। ৪৪ সংখ্যক গানের কৃষ্ণ কম্বলাচার্যের বংশধর। ১৪ সংখ্যক গানের ডোম্বীপাদ প্রথমে ত্রিপুরার রাজা ছিলেন, পরে কাহ্ন-বিরুআর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বীণাপাদ বিরুআর বংশধর। মহিণ্ডানামাঙ্কিত ১৬ সংখ্যক গানের ভণিতায় ক্রিয়াপদ বহুবচনের, এ থেকে মনে হয় গানটি মহিণ্ডার শিষ্যানুশিষ্যেরও রচনা হতে পারে। মহিণ্ডা বা মহীপাদ ছিলেন কাহ্নের বংশধর। মহিণ্ডার এই গানটির সঙ্গে কাহ্ন নামাঙ্কিত নবম চর্যাটির সুগভীর ভাবসাদৃশ্য আছে। ৩১ নং গানের আজদেবের নামে তিব্বতী ঐতিহ্যে তিনটি বইয়ের নাম পাওয়া যায় ; এগুলির মধ্যে 'চর্যামেলায়ন প্রদীপ' সম্ভবত চর্যাগীতির টীকা। ৩৩ নং গানের টেণ্টণের তিব্বতী রূপ ধেতন, এই ধেতন তিব্বতী ঐতিহ্যে কাহ্নের বংশধর। তিব্বতী ঐতিহ্যে ভাদে 'আচার্য', এঁর নামান্তর সম্ভবত ভাণ্ডারিন্, ভদ্রচন্দ্র, ভদ্রদত্ত বা ভদ্রোক। এঁর গানে তান্ত্রিকতার ছাপ স্পষ্ট নয়, পারিভাষিক শব্দের সংখ্যাও কম। ৪৬ সংখ্যক গানের জয়নন্দীর পরিচয় কিছু জানা যায় না। এঁর রচনায় তান্ত্রিকতার ইঙ্গিত নেই, সহজিয়া সাধকদের বৌদ্ধদার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীই বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে।

সংগৃহীত গীতের পরিমাণ বিচার করলে চর্যাগীতি-সংগ্রহের প্রধান কবি তিনজন সরহ (৪টি), ভুসুকু (৮টি) ও কাহ্নপাদ (১৩টি)। সরহের আবির্ভাব-কাল আনুমানিক একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ (রচনাকাল দ্রষ্টব্য)। সরহের নামে দোহাকোষ ছাড়াও সংস্কৃত রচনার সন্ধান পাওয়া যায়। এতেও তাঁর প্রবীণতার পরিচয় স্পষ্ট। সরহের গানে সহজ সাধনার কথা থাকলেও যৌনতান্ত্রিকতার পরিচয় নেই, যোগসাধনা ও পারমার্থিক ধ্যানধারণাই তাঁর গানগুলির প্রতিপাদ্য বিষয়। ২২ সংখ্যক গানে অচিন্ত্য যোগীর জন্মমরণ-বন্ধন-ছেদের কথা, ৩২ সংখ্যক গানে বাহ্য উপকরণ ও জপতপের পরিবর্তে

সাধকের সহজপন্থী আত্মজ্ঞানলাভের কথা, ৩৮ ও ৩৯ সংখ্যক গানে সাধকের পক্ষে গুরুর উপর নির্ভরশীলতা ও সহজ পথ অবলম্বনের নির্দেশ আছে। তাছাড়া গানে পারিভাষিক শব্দের সংখ্যাও অত্যন্ত কম। এতেও পদকর্তার প্রাচীনতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ভুসুকুর জীবৎকালের সম্ভাব্য নিম্নসীমা ১২৯৫ খ্রীষ্টাব্দ (রচনাকাল দ্রষ্টব্য)। তিব্বতী ঐতিহ্যে ভুসুকু শান্তিদেবের নামান্তর, কিন্তু এই পরিচয় ঠিক নয়। শান্তিদেব ছিলেন মঞ্জুশ্রীর উপাসক, আর ভুসুক ছিলেন সহজপন্থী সাধক। তাছাড়া এই শান্তিদেব ভুসুকুর চেয়ে অনেক প্রাচীন। ভুসুকুর দুটি গানে (৪১, ৪৩) কবি নিজেকে 'রাউত'-বলেছেন। 'রাউতের' মূল 'রাজপুত্র' (রাজপুত্র>রাঅউত্ত>রাউত) অর্থাৎ অশ্বারোহী যুদ্ধব্যবসায়ী বংশের সন্তান। ৬ ও ২৩ সংখ্যক গান দুটিতে হরিণ শিকার ও ৪৯ সংখ্যক চর্যায় দলদস্যু-কর্তৃক লুণ্ঠনের যে রূপক গৃহীত হয়েছে তাতে তাঁর 'রাউত' বৃত্তির সমর্থন পাওয়া যায়। ভুসুকুর গানের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, এই সাঙ্কেতিক রূপকচিত্রের বাহুল্য। এই রূপক চিত্রগুলিতে জীবনের যে প্রত্যক্ষ রূপ ফুটে উঠেছে চর্যাগীতির ধর্মনিরপেক্ষ জীবনরসিক পাঠকের কাছে তার মূল্য কম নয়। এই সাঙ্কেতিক চিত্রের বাহুল্য ও পারিভাষিক সন্ধ্যা শব্দের মাত্রাহীন প্রাচুর্য থেকে পদকর্তা হিসাবে ভুসুকুর আপেক্ষিক অর্বাচীনতাই প্রতিপন্ন হয়।

সবচেয়ে বেশীসংখ্যক গান পাওয়া গেছে কাহ্ন ভণিতায়। তবে কাহ্ন-নামাঙ্কিত সব গানই যে এক ব্যক্তির রচনা নয় এ কথা অনুমানের সঙ্গত কারণ আছে। চর্যাগীতিগুলি বিশ্লেষণ করে ডঃ সুকুমার সেন অন্তত দুজন কাহ্নের অস্তিত্ব অনুমান করেছেন। মোট তেরটি চর্যার মধ্যে—১০, ১১, ১৮, ১৯, ৩৬, ৪২ সংখ্যক চর্যা ছয়টিতে চর্যাকার কাহ্নের পরিচয় একরকম, আর বাকী ৭, ৯, ১২, ১৩, ২৪, ৪০, ৪৫ সংখ্যক চর্যা সাতটিতে কাহ্নের পরিচয় অন্য রকম। প্রথম ছয়টি গানের কাহ্ন জালন্ধরিপা-এর শিষ্য এবং তাঁর অপর নাম বিরুআ ['কেহো কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই'(১৮) এবং 'শাখি করিব জালন্ধরি পাএ'(৩৬)]। ইনি কাপালিক (১০, ১১, ১৮) লাঙ্গা (৩৬) বা নগ্ন সন্ন্যাসী এবং যোগী (৪২); ডোম্বীর সঙ্গে বিবাহে ও অহর্নিশ মিলনে উৎসুক (১৯)। কিন্তু অপর সাতটি গানের কাহ্নের সঙ্গে প্রথমোক্ত কাহ্নের পরিচয়গত পার্থক্য স্পষ্ট। শেষোক্ত সাতটি গানের কাহ্নও মহাসুখলাভের প্রয়াসী বটে, কিন্তু ডোম্বী-বিবাহ বা তজ্জাতীয় কোন যৌনতান্ত্রিক সাধনার ইঙ্গিত তাঁর রচনায় নেই। এঁর রচনায় সহজ স্বরূপের অনির্বচনীয়তা সম্পর্কে এক ধরনের গম্ভীর উপদেশ-প্রবণতা (১৩, ৪০, ৪৫) লক্ষ্য করা যায়, যা প্রথমোক্ত কাহ্নের রচনায় অনুপস্থিত। তাছাড়া পারিভাষিক শব্দের ব্যবহারেও উভয়ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য আছে। প্রথমোক্ত কাহ্ন বৌদ্ধতান্ত্রিক পরিভাষা ব্যবহার করলেও ব্যবহারিক জীবনের শব্দকেও রূপক হিসাবে গ্রহণ করেছেন, যথা, ডোম্বী, পদ্ম, খাট, রবিশশী, সসহর, যৌতুক, দুন্দুভি, পড়হ-মাদলা, কাহ্ন ইত্যাদি; পক্ষান্তরে দ্বিতীয়োক্ত কাহ্নের রচনায় রূপকার্থে ব্যবহারিক শব্দের ব্যবহার খুব কম, তুলনায় ধর্মীয় পারিভাষিক শব্দই প্রচুর, যথা, জিনউর, এবংকার, সহজ, তথতা,

তিশরণ, করুণা, শূন, তথাগত, মহাসুহ, দশবলরত্ন, জিনরত্ন, ইত্যাদি। এই শেষোক্ত পারিভাষিক শব্দগুলির মধ্যে এবংকার, দশবলরত্ন, ত্রিশরণ, তথাগত এবং জিনরত্ন— এই পাঁচটি শব্দ প্রথমোক্ত কাহ্ন কেন, দ্বিতীয়োক্ত কাহ্ন ছাড়া অন্য চর্যাকারের রচনাতেও নেই। তাছাড়া দ্বিতীয়োক্ত কাহ্নের রচনায় শাস্ত্র ও আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনির্বাচ্য সহজস্বরূপকে লাভের প্রচেষ্টা যে ব্যর্থ একথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে (৪০), ঠিক এই ভাবই দোহাকোষের কোথাও কোথাও আছে। এই বিশ্লেষণ সত্য হলে মনে হয়, শেষোক্ত কাহ্ন ও দোহাকোষের কাহ্ন একই ব্যক্তি। পূর্বের আলোচনায় (রচনাকাল দ্রষ্টব্য) দেখা গিয়েছে যে, কাহ্ন জালন্ধরিপাদের শিষ্য এবং তাঁর আবির্ভাবকাল মোটামুটি দ্বাদশ শতাব্দী। দ্বিতীয়োক্ত কাহ্নের জীবৎকাল সম্ভবত প্রথমোক্তের কিছু পূর্ববর্তী, দ্বিতীয়োক্তের রচনায় যৌনতন্ত্রাচারের অনুপস্থিতি ও সরাসরি উপদেশ-দানের প্রবণতা থেকেই এই অনুমান করা চলে। তবে এ সমস্তই নিছক অনুমান মাত্র, উপযুক্ত তথ্যাদির অভাবে এ বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কঠিন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভাষাপ্রসঙ্গ

ভাষাবিচার :

১৯১৬ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যখন চর্যাচর্যবিনিশ্চয়, সরহের দোহা, কৃষ্ণাচার্যের দোহা ও ডাকার্ণবের[১] পুথিগুলি একত্রে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন তখন তাঁর ধারণা ছিল "যদিও অনেকের ভাষায় একটু একটু ব্যাকরণের প্রভেদ আছে, তথাপি সমস্তই বাঙ্গালা বলিয়া বোধ হয়" (মুখবন্ধ, বৌদ্ধগান ও দোঁহা, পৃ-৬)। কিন্তু হরপ্রসাদের সিদ্ধান্ত ভাষাতাত্ত্বিকেরা একবাক্যে অনুমোদন করেন নি। ভাষাতাত্ত্বিক বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রথমে তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় ও পরে তাঁর The History of theBengali Language (১৯২০) নামক বক্তৃতামালায় এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে ডাকার্ণবকে "composed in corrupt Sanskrit.–interpersed with some Prākṛta sloka" এবং চর্যা ও দোহাকোষদ্বয়কে হিন্দীভাষায় রচিত বলে ঘোষণা করেন। ১৯২৬ সালে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'The Origin and Development of theBengali Language' নামক গ্রন্থে ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও ছন্দের ভিত্তিতে বিচার করে প্রতিপন্ন করেন যে, ডাকার্ণব ও দোহাগুলির ভাষা বা পশ্চিমা শৌরসেনী অপভ্রংশ এবং চর্যার ভাষা প্রাচীন বাংলা। তবে এই বাংলায় শৌরসেনী অপভ্রংশের প্রভাব খুব বেশী : "the influence of the Sauraseni Apabhransa was very great on it : and occasionally of Sanskrit and the literary Parkrits of the second MIA period" (ODBL, Pt. I.p. 112)। চর্যায় ব্যবহৃত নিষ্ঠান্ত-ইউ-উ যুক্ত কিউ, বিআপিউ, বিকসউ, থাকিউ, বাহিউ পদগুলি শৌরসেনী অপভ্রংশের প্রভাব বহন করে। অপভ্রংশের অপর প্রভাব—জো, সো,কো, জসু, তসু, প্রভৃতি সর্বনাম পদ, জিম, তিম প্রভৃতি সর্বনামজাত ক্রিয়াবিশেষণ এবং জইসন, তইসন, ইত্যাদি সর্বনামজাত বিশেষণ। উল্লিখিত সমস্ত পদই মূলত অপভ্রংশের অন্তর্গত, কিন্তু চর্যায় এগুলি অবাধে ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া, শূন্য বিভক্তির প্রয়োগ, করণের স্ত্রীলিঙ্গ বিভক্তি-ইঅ (সমাহিঅ<সমাধ্যা)-র ক্বচিৎ ব্যবহার, এবং কোথাও কোথাও যুগ্ম ব্যঞ্জনের প্রয়োগে চর্যার ভাষায় প্রাচীন সাহিত্যিক প্রাকৃতের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া চর্যাগানের পুথি নেপালে অনুলিখিত হয়েছিল, নেপালে মৈথিলী ভাষা বহু প্রচলিত, সেজন্য "through contamination, it is not strange to find in the Carya MS. two Maithili froms, [bhanathi] and [bolathi](=old and Early Middle Bengali [bhananti, bolanti]) and one or two cases of use of [-a-] instead of [-i-] as the link vowel in the [-b-] forms of the verb" (p. 117)

এছাড়া অনেকক্ষেত্রে ভাষাবৈষম্যের ব্যাপারে লিপিকরের দায়িত্বও কম নয়। যে লিপিকর অন্য পুথি থেকে প্রাপ্ত পুথির রচনা নকল করেছিলেন তাঁর কাছে বাংলার চেয়ে সম্ভবত শৌরসেনী অপভ্রংশের সর্বজনীন আদর্শই অধিক পরিচিত ছিল, তাই মূল পুথির যে অংশের বাংলা পাঠ তাঁর কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়েছে, সম্ভবত সেই অংশে বাংলার বদলে তার অপভ্রংশরূপটিই তিনি গ্রহণ করেছেন। ফলে প্রাপ্ত পুথির ভাষায় অপভ্রংশের অনুপাত বেড়ে গিয়েছে। গানের পাঠে ও টীকার পাঠে অনেক জায়গায় যে পদ-প্রয়োগের বৈষম্য দেখা যায় তা থেকেই পূর্বোক্ত অনুমান দৃঢ়তর হয়। গান ও টীকার পাঠভেদের উদাহরণ :

গানের পাঠ	টীকার পাঠ	চর্যাসংখ্যা/চরণসংখ্যা
চ্ছুপই	খণ্ডই	৬/৫
ভরিতী	ভরিলী	৮/১
কাহেঁরি	কাহেরে	৬/১
হাউँ	হউँ	১০/১১
ফেটলিউ	[illegible]টলেসু	২০/৩
জাণ জৌবণ	নবযৌবন	২০/৭
উইস্তা	উইএ	৩০/৩
চান্দরে	চান্দেরি	৩১/৫
ছাড়িঅ	ছাড়িল	৩১/৭
ভাইলা	গড়িল	৫০/১১ ইত্যাদি।

প্রকৃতপক্ষে চর্যাগানে শৌরসেনী অপভ্রংশ, মৈথিলী, ওড়িয়া ও অসমিয়া শব্দের বাহ্য ও আংশিক ব্যবহার লক্ষ্য করেই কেউ কেউ চর্যাভাষার বাংলা-ত্বে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। বিজয়চন্দ্র মজুমদারের মতে চর্যাগানে 'words and forms of many dialects' অবাধে গৃহীত হলেও এর মূল ভাষাগত কাঠামো হিন্দী। চর্যাভাষায় অন্য ভাষার অনুপ্রবেশ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত : "I must, however, say that in some songs, Bengali elements predominate. Our very late forms occur in one and the same piece along with many archaic Bengali forms as well as Oriya and Maithili forms" (HBL, Lecture xiii, p. 343)। অর্থাৎ চর্যার ভাষায় বাংলা শব্দের অস্তিত্ব ওড়িয়া বা মৈথিলী শব্দের অস্তিত্বের মতই আংশিক ও আকস্মিক। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেছেন, ৩৩ সংখ্যক গানের 'হাড়িত ভাত নাহি' বিশুদ্ধ বাংলা, কিন্তু ঐ গানের অপর পদাংশ 'দুহিল দুধু' হয় হিন্দী নয় ওড়িয়া, এবং 'ষামায়' নিঃসন্দেহে ওড়িয়া পদ। এছাড়া চর্যাভাষায় তিনি আর যে সব ওড়িয়া-লক্ষণ পেয়েছেন তা এই রকম : জঁহি, তঁহি, এৎথু, এঠু, অধিকরণ পদ—চান্দরে, বিষয়রে ; ক্রিয়াপদ—অছ, কএলা, ফিটিলি ; অন্যান্য বিশিষ্ট ওড়িয়া পদ ঘড়িএ (ক্রিয়া বিশেষণ), চিখিল, ডুলি, বেণি। অন্যদিকে রাহুল সাংকৃত্যায়ন, কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল প্রমুখ হিন্দী-প্রেমিক

পণ্ডিতেরা মনে করেন যে চর্যার ভাষা প্রাচীন হিন্দী। হিন্দী ভাষার সপক্ষে এঁদের যুক্তি এই যে, (১) চর্যার শব্দরূপ হিন্দী শব্দরূপের অনেক কাছাকাছি, (২) চর্যা হিন্দীর চির-অভ্যস্ত দোহাছন্দে রচিত, (৩) চর্যার কবিরা হিন্দীভাষী বিহারের অধিবাসী। এই যুক্তির বিরুদ্ধে বলা যেতে পারে : (১) চর্যায় পশ্চিমা অপভ্রংশ পদের প্রাচুর্য থাকায় চর্যার ভাষাকে হিন্দীর কাছাকাছি মনে হতে পারে, কারণ পশ্চিমা অপভ্রংশ থেকেই হিন্দীর বিকাশ। কিন্তু চর্যায় পশ্চিমা অপভ্রংশ শব্দের প্রাচুর্য থাকলেও তাতে তার ভাষাগত মূল কাঠামোটির কোন পরিবর্তন হয় নি। এই কাঠামোটি হিন্দীর অনুরূপ নয়, বরং বাংলারই কাছাকাছি ; (২) চর্যায় দোহা ছন্দের প্রয়োগ থাকলেও তা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ; (৩) চর্যার সমস্ত কবিই বিহারের অধিবাসী নন এবং যাঁরা বিহারের অধিবাসী বলে অনুমিত হন তাঁরা এক বৃহৎ প্রত্নবঙ্গভাষী এলাকার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অন্যদিকে ডঃ জয়কান্ত মিশ্রের 'A History of Maithili Literature' vol I গ্রন্থে চর্যাগুলি মৈথিলী সাহিত্যের আদি নিদর্শনরূপে চিহ্নিত এবং দিবাকর-সম্পাদিত 'Bihar through the Ages' গ্রন্থে চর্যাভাষা 'a sample of old Maithili' রূপে অভিহিত।

মৈথিলী ভাষার সপক্ষে যুক্তি :[১] (১) চর্যার অধিকাংশ কবি মৈথিলীভাষী। (২) চর্যার ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্ব বহুলাংশে মৈথিলীর সদৃশ—(ক) চর্যায় নাসিক্য ধ্বনির উপস্থিতি এবং দন্ত্য শিস্‌ধ্বনির (dental sibilant) প্রাচুর্য এর মৈথিলী সাযুজ্যের সমর্থক ; (খ) করণে এঁ, তেঁ এবং সম্বন্ধে ক বিভক্তির প্রয়োগ, (গ) বিভিন্ন সর্বনামীয় শব্দরূপ, যথা—হাঁউ, মো, মোএ, তো, তোএ, তোহোর, তোরা, সে, কাহি প্রভৃতি মৈথিলীর অনুরূপ ; (ঘ) প্রথম পুরুষ একবচনে-তি, থি, কর্মবাচ্যে ইঅ—এগুলি মৈথিলী ভাষার অনুরূপ : (৩) চর্যায় ব্যবহৃত শব্দাবলী মৈথিলী ভাষায় ব্যবহৃত, যেমন—আজি, সাঙ্কম, তেন্তলি, টাঙ্গী, সাসু, চঙ্গেড়া, কোঠা, ভাত, বাড়ী ইত্যাদি) ;(৪) চর্যায় ব্যবহৃত অনেক ইডিয়ম ও প্রবচন এখন মৈথিলীতে ব্যবহৃত হয়। এই যুক্তির বিরুদ্ধে বলা যায় (১) চর্যার যে সব কবিকে বিহারবাসী বলে অনুমান করা হয় তারা তখন এক বৃহৎ প্রত্ন-বঙ্গভাষী এলাকার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, (২) ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্বের যেসব বৈশিষ্ট্যের জন্য চর্যাভাষাকে প্রাচীন মৈথিলী বলে দাবী করা হয়, সেগুলি ঐতিহ্যসূত্রে বাংলা ভাষারও প্রাচীন বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য হতে পারে ; (৩) চর্যায় যেসব শব্দ মৈথিলী বলে দাবি করা হয় সেগুলি বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারেরও অন্তর্গত (৪) মৈথিলী বলে অনুমিত চর্যার ইডিয়ম ও প্রবচনগুলিকে প্রাচীন বাংলার ইডিয়ম ও প্রবচন বলে গ্রহণ করতেও ভাষাতাত্ত্বিক অসুবিধা নেই। আসলে এই সব দাবি যতটা প্রাদেশিক আত্মশ্লাঘা-প্রসূত ততটা ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ-নির্ভর নয়। কেননা, চর্যায় কিছু কিছু ভিন্ন শ্রেণীর নব্য ভারতীয় আর্যভাষার শব্দ, পদ ও বাক্যাংশ ব্যবহৃত হলেও ঐ সব ভিন্নজাতীয় উপাদানের পাশাপাশি প্রাচীন বাংলার যে সব নিজস্বপদ ও ইডিয়ম ব্যবহৃত হয়েছে তার অনুপাত ভিন্নজাতীয় উপাদানের চেয়ে অনেক বেশী। এ থেকেই বোঝা যায় যে, ভিন্নজাতীয়

১. দ্র. A History of Maithili Literature. Vol. I. p. 99-110.

উপাদানগুলি আগন্তুক মাত্র, চর্যাভাষায় নিজস্ব সম্পদ নয়। চর্যাভাষায় এই ধরনের খাঁটি বাংলা উপকরণের নমুনা : শব্দরূপে— ৩য়ায়-তেঁ(তে) -সুখদুখেতেঁ নিচিত মরিঅই (১), ৪র্থীতে-রে (রে)—সো করউ রসরসানেরে কংখা (২২), ৬ষ্ঠীতে-এর (র) পাটের আস (১) হরিণা হরিণির নিলঅ ণ জানী (৬), সপ্তমীতে-ত, -তে(তেঁ), -এ —হাড়ীত ভাত নাহি (৩৩), বেণ্টে যামাঅ (৩৩)। এছাড়া কতকগুলি বিশিষ্ট বাংলা অনুসর্গ দিআঁ— দিআঁ চণ্ডালী (৫০) সঙ্গে, সাঙ্গে—দুজ্জন সাঙ্গে অবসরি জাই (৩২), ডোম্বী এর সঙ্গে জো জোই রত্তো (১৯), নিমিত্তার্থক— অন্তরে (>তরে) —তোহার অন্তরে (১০), অধিকরণ—মাঝেঁ (মাঝে)— কোড়ি মাঝেঁ একু(২), কমল কুলিশ মাঝেঁ ভইঅ মিঅলী (৪৭)। বিশিষ্ট ক্রিয়াবিভক্তি —ইব (ভবিষ্যতে)—কাহ্ন কহিঁ গই করিব নিবাস (৭) ; ইল, ইলা (অতীতে)— সসুরা নিদ গেল (২), জে জে আইলা তে তে গেলা (৭) ; ইলে— সাঙ্কমত চড়িলে (১১)। অস্ত্যর্থক ধাতু হিসাবে আছ ও থাক—জই তো মুঢ়া অচ্ছসি ভান্তী (৪১), থাকিব তই ঘুণ্ড কইসে (৩৯)। বিশিষ্ট বাংলা ইডিয়ম ও প্রবচন— গুনিআঁ লেহুঁ, দিল ভণিআ, লেহুরে জানী, সড়ি পড়িআঁ, আখি বুজিঅ, ধরণ ণ জাই, কহন ণ জাই, আহার কএলা, অপণা মাংসে হরিণা বৈরী, হাথেরে কাঙ্কাণ মা লোউ দাপণ, বর সুণ গোহালী কিমে' ন্টঠ বলন্দে, হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী ইত্যাদি।

চর্যাগানের ভাষাপরিচয়-গত সমস্যার মীমাংসা করতে হলে দেখা দরকার সমস্যার মূল জটটি কোথায় ? সমস্যার মূল জট হচ্ছে ভাষাগত উত্তরাধিকার নিয়ে অর্থাৎ চর্যার ভাষায় ভারতীয় আর্যভাষার কোন্ উত্তরাধিকার প্রতিফলিত হয়েছে ? বলা বাহুল্য এ উত্তরাধিকার নব্য ভারতীয় আর্যভাষার উত্তরাধিকার। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে নব্য ভারতীয় আর্যভাষার কোন্ শাখা যাতে গানগুলি রচিত হয়েছিল ? সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে প্রথমেই নব্য ভারতীয় আর্যভাষার দাবিদার শাখাগুলির পারস্পরিক অবস্থানটি বুঝে নেওয়া যাক। দাবিদার ভাষা হচ্ছে পাঁচটি : হিন্দী, ওড়িয়া, মৈথিলী, অসমিয়া এবং বাংলা। এদের মধ্যে উত্তরাধিকারিত্বের দিক থেকে হিন্দীর অবস্থান অপর চারটি শাখা থেকে পৃথক, কারণ হিন্দীর সাক্ষাৎ পূর্বসূরি শৌরসেনী অপভ্রংশ, অপর চারটির সাক্ষাৎ পূর্বসূরি মাগধী অপভ্রংশ। সুতরাং দাবিদার হিসাবে হিন্দীর বংশানুক্রমিক অবস্থান একক। আবার একক দাবিদার হিসাবে আগেই দেখা গিয়েছে হিন্দীর দাবিগুলির ভিত্তি খুবই দুর্বল। চর্যার ভাষায় হিন্দীর প্রত্ন-উপাদান হিসাবে শৌরসেনী অপভ্রংশ পদসমূহের যে প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায় তা উত্তরাধিকার সূত্রে ব্যবহৃত নয়, ঋণগ্রহণসূত্রে আহৃত। তাছাড়া, চর্যাভাষার রূপতত্ত্বে হিন্দী ভাষার রূপতত্ত্বের কোন ধারাবাহিক কোন অনুবর্তন নেই। কাজেই, এই গানের সঙ্গে হিন্দীর ভাষাগত উত্তরাধিকারিত্বের যোগসূত্র থাকার দাবি ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে অসিদ্ধ ও অসমর্থনযোগ্য।

হিন্দীর দাবি খারিজ হয়ে গেলে বাকি থাকে আর চারটি নব্য ভারতীয় আর্যভাষা। এদের নিয়ে সমস্যার গ্রন্থি আরও জটিল। কারণ চারটি ভাষারই দাবি মোটামুটি প্রায় একই ধরনের ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক, শাব্দিক উপাদানের সমতার ভিত্তির উপর

প্রতিষ্ঠিত এবং ঐ সব দাবি বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক তথ্যের দিক থেকেও সমর্থিত। উত্তরাধিকারত্বের এই সমস্যার জট ছাড়াবার জন্য দেখা দরকার চারটি দাবিদার ভাষার বংশানুক্রমিক সম্পর্ক কী এবং স্বাধীন ভাষা হিসাবে তাদের আত্মপ্রকাশের ঐতিহাসিক পটভূমিকাই বা কেমন? বংশানুক্রমিকভাবে চারটি ভাষাই মাগধী অপভ্রংশ থেকে বিকশিত, সুতরাং এদের মধ্যে একটা অন্তর্লীন প্রত্ন-ঔপভাষিক সম্পর্ক বিদ্যমান। যে-কোন প্রাচীন ও বিকাশশীল ভাষার ইতিহাস বিচার করলে দেখা যায় যে, বিবর্তনের পথে প্রত্ন-ঔপভাষিক সম্পর্কে আবদ্ধ বিভিন্ন ভাষা অতীতে একটি প্রত্ন-ভাষারূপের (proto-language) আধারে বীজ-রূপে বিধৃত থাকে। কালক্রমে নানা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য ঐতিহাসিক ঘটনার অবকাশে প্রত্ন-উপভাষাগুলি পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন ভাষা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। এই স্বাধীন ভাষা-সত্তায় আত্মপ্রকাশের আগে পর্যন্ত এই বীজ-ভাষাগুলির অবস্থান ঐতিহাসিকভাবে উপভাষার অনুরূপ এবং সেজন্য তাদের মধ্যে মিল ও গরমিল দুই-ই প্রচুর। চর্যার ভাষার ক্ষেত্রেও নব্যভারতীয় আর্যভাষার এই বিবর্তনসূত্রটি অনুসৃত হয়েছে। শাস্ত্রী-আবিষ্কৃত চর্যাগানগুলি যখন লেখা হচ্ছিল ওড়িয়া, মৈথিলী, অসমিয়া এবং বাংলা ঐতিহাসিকভাবে তখনও স্বাধীন ভাষা-সত্তা অর্জন করে নি। তখন পূর্বভারতে মাগধী অপভ্রংশ থেকে নব্যভারতীয় আর্যভাষার একটি পূর্বী শাখার বিকাশ ঘটেছে, যার কোন গোত্রনাম স্থিরীকৃত হয় নি, যা শুধু কথ্য ভাষা হিসাবে পূর্বভারতের বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রচলিত ছিল। ভাষাতত্ত্বের পরিভাষায় এর নাম দেওয়া যেতে পারে প্রত্ন-মগধীয় নব্যভারতীয় আর্যভাষা (Proto Magadhan New Indo-Aryan)। এই প্রত্ন-ভাষা পূর্বভারতের বিস্তীর্ণ এলাকায় ব্যবহৃত হত বলে এদের নানা আঞ্চলিক রূপভেদ বা উপভাষাও ছিল, এই উপভাষাগুলি কালক্রমে অনুকূল পরিস্থিতির অবকাশে উড়িষ্যা এলাকায় ওড়িয়া, উত্তর-পূর্ববিহারে মৈথিলী, উত্তরপূর্ববঙ্গে অসমিয়া এবং বঙ্গদেশে বাংলা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। কিন্তু শাস্ত্রী-আবিষ্কৃত চর্যাগুলি লেখা হয়েছিল এইসব ভাষার স্বাধীন সত্তা অর্জনের আগে অর্থাৎ এই সব ভাষা যখন বীজ-ভাষা রূপে প্রত্ন-মগধীয় নব্য ভারতীয় আর্যভাষার আঞ্চলিক উপভাষা হিসাবে প্রচলিত ছিল। আচার্য মুনিদত্ত[১] তাঁর টীকার গোড়ার দিকে লিখেছেন যে সিদ্ধাচার্য লুই "প্রাকৃত" ভাষায় চর্যা লিখেছেন : 'দীনজনসমুদ্ধরণকামো নহি সিদ্ধাচার্য্যঃ শ্রীলূইপাদঃ ....প্রাকৃতভাষয়া রচয়িতুমাহ'। প্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতি বা জনগণের ব্যবহৃত কথ্য ভাষা, লেখ্য ভাষা নয়।[২] মুনিদত্তের সাক্ষ্য থেকেই বোঝা

---

১. মুনিদত্তের জীবৎকাল সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। তবে তাঁর টীকাগ্রন্থটি চতুর্দশ শতকের প্রথমার্ধে তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল বলে পণ্ডিতেরা (Kvaerne, p.2) মনে করেন। তিব্বতী অনুবাদ ও তার মূলের মধ্যে কমবেশি একশো বছরের ব্যবধান ধরে নিলে মুনিদত্তের জীবৎকাল মোটামুটি খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে দাঁড়ায়।

২. মুনিদত্ত শুধু লুই প্রসঙ্গে একথা বললেও একথা শুধু যে লুই সম্পর্কেই প্রযোজ্য এটা বলা তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। সমস্ত চর্যাকারই তাঁর উদ্দিষ্ট ছিল।

যায় গানগুলি তখন কথ্য ভাষাতে রচিত বলেই সমাজে পরিচিত ছিল। এই কথ্য ভাষার সঙ্গে ওড়িয়া, মৈথিলী, অসমিয়া বা বাংলা— এই জাতীয় গোত্রসূচক অভিধা বা বিশেষণ যুক্ত হবার অবকাশ ঘটে নি। প্রশ্ন উঠতে পারে চর্যার কবিরা প্রচলিত লেখ্য ভাষা ছেড়ে লেখার জন্য নিতান্ত কথ্যভাষাকেই বেছে নিয়েছিলেন কেন? এর উত্তর হচ্ছে, চর্যার কবিরা ছিলেন লক্ষ্য-সচেতন (target-conscious) ধর্মীয় সংগঠক এবং লক্ষ্য-দল (target group) অনুসারে তাঁরা লেখার ভাষামাধ্যম বেছে নিয়েছেন। যেখানে তাঁদের রচনার লক্ষ্য দার্শনিক বা পণ্ডিতসমাজ, সেখানে তাঁরা শাস্ত্রীয় ভাষা হিসাবে মান্য লেখ্য ভাষা সংস্কৃত ভাষাকে বেছে নিয়েছেন, যেখানে লক্ষ্য-দল সাধারণ লেখাপড়া জানা মানুষ সেখানে তাদের জন্য লিখতে গিয়ে সর্বজনীন লেখ্য ভাষা অবহট্‌ঠ ব্যবহৃত; আর যেখানে লক্ষ্য-দল জনসংখ্যার গরিষ্ঠ অংশ তৃণমূলের নিরক্ষর মানুষ, যাদের কাছে লেখাপড়ার ভাষা সংস্কৃত বা অবহট্‌ঠ দুরধিগম্য, সেখানে তাদের কাছে ধর্মীয় বার্তা পৌঁছে দেওয়ার একমাত্র পথ ছিল তারা যে ভাষায় কথা বলে সেই ভাষায় লেখা। এক্ষেত্রে আরও মনে রাখতে হবে, যে-কোন সংগঠনের শক্তি যেহেতু জনসংখ্যার আনুগত্যের অনুপাতের উপর নির্ভরশীল সেজন্য অভিজ্ঞ সংগঠক হিসাবে সিদ্ধাচার্যেরা সমাজের গরিষ্ঠ অংশকে নিজেদের ধর্মীয় সংগঠনের আওতায় আনার জন্য গণসংযোগের সবচেয়ে ফলপ্রসূ মাধ্যমে হিসাবে কথ্যভাষা তথা উপভাষাকেই বেছে নিয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ কাহ্নপাদের কথা বলা যেতে পারে। কাহ্নপাদ যখন পণ্ডিতদের জন্য হেবজ্রপঞ্জিকাযোগরত্নমালা নামে ধর্মদর্শনের টীকাগ্রন্থ লিখেছেন তখন লক্ষ্য-দলের প্রয়োজনে তার ভাষা সংস্কৃত, যখন উত্তরভারতের বিরাট এলাকার লেখাপড়াজানা সাধারণ লোকের জন্য দোহা লিখেছেন তখন তার ভাষা আন্তঃপ্রাদেশিক অবহট্‌ঠ, আবার যখন নিজের এলাকার নিরক্ষর কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে ধর্মীয় বার্তা পৌঁছে দিয়ে ধর্মীয় সংগঠনের শক্তিবৃদ্ধি করতে চেয়েছেন তখন ব্যবহার করেছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার কথ্য ভাষা। চর্যাগানে যে অন্ত্যজ সমাজের উপমান ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তারও কারণ কবিদের লক্ষ্য দল ছিল সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্ণীয় নিরক্ষর জনগোষ্ঠী, গানের অবয়বে যাদের জীবনের ছায়া বিম্বিত হলে যারা গান সম্পর্কে প্রাথমিক ভাবেই আগ্রহ বোধ করবে। চর্যার কবিরা কে কোথাকার বাসিন্দা ছিলেন সে সম্পর্কে কোন সুনিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায় না, তবে বিভিন্ন গানের ভাষায় যে সব অঞ্চলভিত্তিক ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক লক্ষণবৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় তার সূত্র ধরে এগোলে এ সম্পর্কে কিছু সত্যের ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে চর্যার ভাষায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে একই কারকে বিভিন্ন শব্দবিভক্তি এবং একই ক্রিয়াকালে বিভিন্ন ক্রিয়াবিভক্তি ব্যবহৃত হয়েছে—এ থেকে বোঝা যায়, মান্যীকরণের (Standardisation) মাধ্যমে ভাষার মধ্যে যে একটি একরূপতার (uniformity) লক্ষণ ফুটে ওঠে চর্যার ভাষা সেই প্রক্রিয়ার স্তরে পৌঁছেতে পারে নি, এই ভাষা বহু উপভাষাবিশিষ্ট একটি মান্যেতর (Non-standard) কথ্য ভাষা, যাকে ইতিপূর্বেই প্রত্ন-মগধীয় নব্যভারতীয় আর্যভাষা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সুতরাং সঠিকভাবে বলতে গেলে, চর্যাগানগুলি লেখা হয়েছিল

একটি মগধীয় প্রত্ন-ভাষায়, যার মধ্যে নিহিত ছিল পরবর্তীকালের বাংলা, ওড়িয়া, মৈথিলী ও অসমিয়া ভাষার অনুদ্‌গত বীজ।

তবে এই প্রত্ন-ভাষার বিভিন্ন উপাদান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এতে এমন কিছু আঞ্চলিক উপাদানের আনুপাতিক আধিক্য আছে যা পরবর্তীকালে বাংলা ভাষার অঙ্গ হিসাবে মান্যীকৃত হয়েছে। অর্থাৎ চর্যার প্রত্ন-ভাষায় বঙ্গীয় প্রত্ন-উপাদানের মাত্রা বেশি। উপভাষা-বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে তখনকার সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমিকার সঙ্গে প্রত্ন-মগধীয় নব্যভারতীয় আর্যভাষার বিকাশের সম্পর্কটি মিলিয়ে দেখলে চর্যাভাষার এই বৈশিষ্ট্যের ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায়। উপভাষা-বিজ্ঞানের সূত্র অনুসারে দেখা যায় একই ভাষাগোষ্ঠীতে অনেকগুলি আঞ্চলিক উপভাষা থাকলেও ভাষাগোষ্ঠীর যে অংশের মানুষের সামাজিক রাজনৈতিক গুরুত্ব আপেক্ষিকভাবে বেশি সেই অংশের উপভাষা নিজে আঞ্চলিক হয়েও সমগ্র ভাষা-অঞ্চল তথা ভাষাগোষ্ঠীর উপর প্রভাব বিস্তার করে। ফলে সমগ্র ভাষাগোষ্ঠীতে এই উপভাষা একটি কেন্দ্রীয় (focal) গুরুত্ব পায়। যে সময় চর্যাগানগুলি রচিত হচ্ছিল তখন পূর্বভারতে পালরাজবংশের প্রবল আধিপত্য। পালরাজারা ছিলেন বঙ্গদেশীয়, সেজন্য তাঁদের রাজধানীর সন্নিহিত উপভাষা হিসাবে বঙ্গীয় উপভাষা তখন সমগ্র মগধীয় নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছিল। বিশেষত তখনকার সেই সামন্তযুগের অখণ্ড রাজানুগত্যের কালে এটাই স্বাভাবিক ছিল। এই কারণে চর্যার ভাষায় বঙ্গীয় উপভাষার উপাদান এত বেশি। যাঁদের চর্যায় এই সব উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে, তাঁরা সকলেই যে বঙ্গদেশীয় ছিলেন এমন নাও হতে পারে ; বঙ্গীয় উপভাষার সামাজিক গুরুত্বের জন্য অন্য এলাকার বাসিন্দা হয়েও তাঁরা বঙ্গীয় উপভাষার উপাদান ব্যবহার করেছেন বা করতে বাধ্য হয়েছেন। তাই চর্যার প্রত্ন-ভাষায় বঙ্গীয় উপাদানের আনুপাতিক আধিক্য থাকায় আলোচ্য মগধীয় প্রত্ন-ভাষাকে প্রত্ন-বঙ্গীয় বলে অভিহিত করা যেতে পারে। এই অভিধা মেনে নিলে বলতে হয় চর্যাগানগুলির ভাষা হচ্ছে প্রত্ন-বঙ্গীয় (Proto Bengali) ভাষা।

চর্যাভাষার ব্যাকরণ :

(ক) ধ্বনিতত্ত্ব

চর্যাভাষার ধ্বনিতত্ত্ব আলোচনার প্রধান উপকরণ গানে ব্যবহৃত শব্দের বানান। কিন্তু লিপিকারের ত্রুটির ফলে এই বানানের ব্যাপারে সর্বত্র একই রীতি বা আদর্শ অনুসৃত হয় নি। হ্রস্ব দীর্ঘস্বর, তিন স-কার ও দুই ন-কারের ব্যবহারে নানাবিধ যুক্তিহীন বৈষম্য আছে। অ-কার, ই-কার ও এ-কারের ব্যবহারও অনেক পরিমাণে বিপর্যস্ত। পদান্ত ই-কারের স্থলে ক্ষেত্রবিশেষে য়-কার বা অ-কার লিখিত আছে, যথা, জাই, জায়, জাঅ— এই তিন প্রকার বানানই পুথিতে লভ্য। আনুনাসিক ধ্বনি কোথাও লুপ্ত, কোথাও-বা স্থানচ্যুত। তবে এই সব লিপি-বৈষম্য সত্ত্বেও চর্যাভাষায় কতকগুলি সাধারণ ধ্বনিবৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায় :

১। প্রাকৃতের স্তরে সমীভূত যুক্ত ব্যঞ্জনের সরলীকরণ এবং পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বরের ক্ষতিপূরণমূলক দীর্ঘতা : জন্ম > জম্ম > জাম, কর্ম > কম্ম > কাম—জামে কাম কি কামে জাম (২২)। তবে বানানে কোথাও কোথাও এই দীর্ঘীকরণের চিহ্ন অনুপস্থিত— মধ্যেন > মজ্ঝেন > মাঝেঁ-র বদলে মঝেঁ— সরঅ নারী মঝেঁ উভিল চীরা (৪)। এ সব ক্ষেত্রে অবশ্য লিপিকর-প্রমাদও ঘটে থাকতে পারে।

২। অর্ধতৎসম শব্দে যুক্ত ও যুগ্ম ব্যঞ্জনের সংরক্ষণ : দুর্লক্ষ্য > দুলক্খ— দুলক্খ বিণানা (২৯), মিথ্যা > মিচ্ছা— উদক-চান্দ জিম সাচ ন মিচ্ছা (৩৯), মৌক্তিক > মুত্তি— লবএ মুত্তিহার (১১)।

৩। পদান্তের স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয়। যেমন, ভণতি > ভণই—ভণই লুই (১), বসই সবরী বালী (২৮)। তবে কোথাও কোথাও পদান্তের ইঅ (-ইআ) ই (ঈ)-তে রূপান্তরিত হয়েছে, যথা, উত্থিত > উট্ঠিঅ > উঠিঅ > উঠি— গঅণে উঠি চরঅ অমণ ধান (২১), পৃষ্ট > পুচ্ছিঅ > পুচ্ছী -বাহতু কামলি সদ্‌গুরু পুচ্ছী (৮)।

৪। পদের মধ্যস্থিত একাধিক সন্নিকৃষ্ট স্বরধ্বনির মধ্যে কোথাও কোথাও য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতির আগম : নিকটে > নিয়ড্ডী— নিয়ড্ডী বোহী দূর মা জাহী (৫), সমায়াতি > যামায়— বেণ্টে যামায় (৩৩), অমৃত > অমিঅ > অমিয় (।)— অমিয়া আচ্ছন্তেঁ বিস গিলেসি (৩৯), আয়াতি > আবই (= আঅই)— ভব জাই ণ আবই (৪২), চেতয়তি > চেঅঅই > চেবই (= চেঅই)— ঘুমই ণ চেবই সপরবিভাগা (৩৩), ছেদয়তি > ছেঅঅই > ছেবই (= ছেঅই) —ছেবই বিদুজন গুরু পরিমাণী (৪৫)। কখনো কখনো সন্নিকৃষ্ট দুই পদের প্রথমটির অন্ত্যস্বর ও দ্বিতীয়টির আদিস্বরের মিলনে স্বরসন্ধির লক্ষণ উদাহৃত হয়েছে। তবে স্বরসন্ধির বৈচিত্র্য এখানে নেই, সন্ধি এখানে (১) অ + অ = আ এবং (২) অ + আ = আ এই দুই প্রকার স্বরমিলনের দৃষ্টান্তেই সীমাবদ্ধ। আসলে এখানে আলাদাভাবে সন্ধির নিয়ম প্রযুক্ত হয় নি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সন্ধিবদ্ধ পদগুলি সন্ধিবদ্ধ অবস্থাতেই সংস্কৃত থেকে তৎসম (বা অর্ধতৎসম) রূপে গৃহীত, যথা, (অ + অ) ভাব + অভাব = ভাবাভাব (৩০), স্বপর + অপর = স্বপরাপর (৩৪), বাক্‌পথ + অতীত = বাক্‌পথাতীত (৩৭), অজর + অমর = অজরামর (২২), (অ + আ) বিম্ব + আকারে = বিম্বাকারে (৩৯)। শুধু দুটি ক্ষেত্রে যেখানে পূর্বপদ তদ্ভব ও উত্তরপদ তৎসম এবং সেই কারণে সন্ধিবদ্ধ পদটি তৎসমরূপে সংস্কৃত থেকে ঋণ-গ্রহণ সূত্রে গৃহীত নয়, সেখানে উক্ত পূর্বপদের অন্ত্যস্বর ও উত্তরপদের আদ্যস্বরের রূপধ্বনিতাত্ত্বিক (morpho-phonemic) রূপান্তরে সংস্কৃত ব্যাকরণের স্বরসন্ধির নিয়ম অনুসৃত হয়েছে ধাম (<ধর্ম) + অর্থে = ধামার্থে (৫), সঅল (< সকল) + অনুত্তর = সঅলানুত্তর (৩৪), এখানে স্বরধ্বনি-পরিবর্তনের অন্য নিয়ম (যথা, স্বরলোপ অর্থাৎ 'ধামর্থে', 'সঅলনুত্তর') একেবারে অপ্রযোজ্য ছিল না।

৫। পদের আদিতে শ্বাসাঘাতের ফলে কোথাও কোথাও আদ্য অ-কারের দীর্ঘীভবন: কক্ষিকা > কচ্ছিআ > কাচ্ছি— মেলিলি কাচ্ছী (৮), চন্দ্র > চন্দ > চান্দ— চান্দরে চান্দ-কান্তি (৩১), জালন্ধরি (৩৬) (পশ্চিমা হিন্দীতে 'জলন্ধরি'), পাণ্ডিআচাএ (< পণ্ডিতাচার্য) (৩৬), অহকং > হকং > হউঁ > হাউঁ (১০, ১৮, ২০)।

(খ) রূপতত্ত্ব :

১। **লিঙ্গ :** চর্যার ভাষায় লিঙ্গ দুটি— পুলিংঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ। বাক্যে স্ত্রীলিঙ্গের প্রভাব অত্যন্ত সক্রিয়। কর্তা স্ত্রীলিঙ্গ হলে নিষ্ঠান্ত অতীতকালের ক্রিয়ারূপে স্ত্রী-প্রত্যয় ব্যবহৃত হত। যেমন, সোনে ভরিলী করুণা নাবী, কিংবা সসি লাগেলী তান্তী, কিন্তু পুংলিঙ্গে— দুহিল দুধু, চলিল কাহ্ন, ইত্যাদি। এছাড়া, সম্বন্ধপদের ব্যবহার বিশেষণের অনুরূপ হওয়ায় সম্বদ্ধ পদের লিঙ্গ অনুযায়ী সম্বন্ধপদের লিঙ্গ নির্ণীত হত, যথা, ভাগেলি তোহোর বিণাণা (৩৯) —এখানে সম্বদ্ধ পদ 'বিণাণা' পুংলিঙ্গ, কাহেরী শঙ্কা, হাড়েরি মালী— এক্ষেত্রে সম্বন্ধপদ 'শঙ্কা' ও 'মালী' স্ত্রীলিঙ্গ। এছাড়া স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের সাধারণ বিশেষণও স্ত্রীলিঙ্গ হত— **অইসনি** চর্যা, নিশি **অন্ধারী,** ইত্যাদি।

২। **বচন :** শব্দরূপে একবচন ও বহুবচনের কোন তফাৎ নেই। বহুত্ব বোঝাবার জন্য কতকগুলি সমষ্টিবাচক শব্দ, যথা— লোঅ (< লোক), সকল, জাল ইত্যাদি ব্যবহৃত আহত— পারগামি লোঅ, তুম্হে লোঅ, সঅল সমাহিঅ, তান্তিধ্বনিসএল, জোইণিজালে রএণি পোহাঅ— ১৯), জাসু মুণন্তে টুট্টই ইন্দিআল (৩০)।

এছাড়া বিশেষ্য-বিশেষণ-সর্বনাম-অসমাপিকাপদের পুনরাবৃত্তির দ্বারা নির্ধারক (selective) বহুবচনের অর্থ বোঝানো হত : **উঁচা উঁচা** পাবত, **জে জে** আইলা **তে তে** গেলা, **কেহো কেহো** তোহোরে বিরুআ বোলই, **মিলি মিলি** মাঙ্গা, **ছোই ছোই** জাহ সো বান্ধ নাড়িআ।

৩। **বিভক্তি :** একই বিভক্তির দ্বারা একাধিক কারকের অর্থজ্ঞাপন : -এ-এঁ-তেঁ, এতেঁ করণ ও অধিকরণ উভয় কারকেই প্রযুক্ত হত। করণ : সুখদুখেতেঁ, অপণে, সাণে, বেগেঁ, আলিএঁ কালিএঁ ; অধিকরণ : ঘরে. তৈলোএ, চীএ, তিঅধাএ, ঘরেঁ, হিএঁ। করণ ও অধিকরণের বিভক্তি অপাদানেও ব্যবহৃত, যথা : **জামে** কাম কি **কামে** জাম ; দশ দিসেঁ ; কুলেঁ কুল, ডোম্বিত আগলী। গৌণ কর্ম ও সম্প্রদানের বিভক্তি একই, রে, -রেঁ, -ক—রসরসানেরে, করিণিরে, পথক, নাশক।

৪। **অনুসর্গ** : ক্ষেত্র বিশেষে বিভক্তির স্থলে অনুসর্গের ব্যবহার : করণের অনুসর্গ— সাঙ্গে, দিআঁ, বিনু, লই, সম, বিহুনে— দুজ্জন সাঙ্গে, দিআঁ চণ্ডালী, তঁই বিনু, ষষহর লই, যিহেঁ সম, নিন্দ বিহুণে। নিমিত্তার্থক অনুসর্গ : অন্তরে, অর্থে, লাগি— তোহোর অন্তরে, (১০), ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই (৫) গঅণ টাকলি লাগি (১৬)। অধিকরণের অনুসর্গ : মাঝ, মঝেঁ, মঝ।

৫। **শব্দরূপ :**

(ক) বিশেষ্য :

কর্তা : কর্তৃবাচ্যের কর্তায় বিভক্তি প্রত্যক্ষ নয়— **লুই** ভণই, **সসুরা** নিদ গেল, **বহুড়ী** জাগঅ, **ভবণই** গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী, **পারগামি লোঅ** নিভর তরই। কর্মভাববাচ্যের অনুক্ত বিভক্তি-এ, -এঁ, যথা, **কুম্ভীরে** খাঅ, কুক্কুরীপাএঁ, মতিএঁ।

কর্ম : মুখ্যকর্মের বিভক্তিও প্রত্যক্ষ নয়। যথা, রুখের **তেন্তুলি** কুম্ভীরে খাঅ, **গুরু**

পুচ্ছিঅ জান, **রূপা** থোই নাহিক ঠাবী, **কমলরস** পিবমি। গৌণকর্ম ও সম্প্রদানের বিশিষ্ট বিভক্তি ঃ -রেঁ, ক, কুঁ —**রসরসানেরে** কংখা, জিম জিম করিণা **করিণিরে রিসঅ** (৯), **নাশক** থাতী, বিদ্যাকরি **দমকুঁ** অকিলেসেঁ।

করণ : তে,-তেঁ,-এ, এঁ, সঁ— **তরঙ্গতে** হরিণার খুর ন দীসঅ। **সুখদুখেতে নিচিত** মরিআই। ভণই লুই আমহে **ঝাণে** দিঠা। **আলিএঁ কালিএঁ** বাট রুন্ধেলা। বেঙ্গাসঁ সাপ বড়্ছিহল জাঅ(৩৩)। শূন্য বিভক্তি— বাঢ়ই সো তরু সুভাসুভ **পানী,** খেলহুঁ **নঅবল**।

প্রাচীন প্রাকৃতের বিভক্তি-ইঅ (-অ) ক্বচিৎ ব্যবহৃত— সঅল **সমাহিঅ** কাহি করিঅই, চীঅন **বাকলঅ** বারুণি বান্ধঅ। অনুসর্গ : সাঙ্গে, দিআঁ, বিনু, লই, সম, **বিহুনে**।

সম্প্রদান : নিজস্ব কোন বিভক্তি নেই, গৌণ কর্মের সঙ্গে অভিন্ন। বিশিষ্ট অনুসর্গ— অন্তরে, লাগি।

অপাদান : করণ ও অধিকরণের -এ, এঁ, -ত বিভক্তি অপাদানে ব্যবহৃত। **জামে** কাম কি **কামে** জাম, **কুলেঁ** কুল, **ডোম্বীত** আগলী। দুটি ক্ষেত্রে অবহট্ঠের পঞ্চমী বিভক্তি 'হু' ব্যবহৃত হয়েছে : খেপহু, রঅণহু ; অনুসর্গ : লই— মোহভঙ্গার **লই** সঅলা অহারী (৩৬), কূল **লই** খর সোন্তে উজাঅ (৩৮)।

সম্বন্ধ : সম্বন্ধের বিশিষ্ট বিভক্তি '-এর' এবং '-র'। -'এর' সাধারণত অ-কারান্ত পদেই বসে, কদাচিৎ আকারান্ত ও ই (ঈ) -কারান্ত পদেও বসে। রুখের, পাটের, ডোম্বীএর, মূষাএর, হরিণার, জোইর। সম্বন্ধ পদ স্ত্রীলিঙ্গ হলে বিভক্তিরও লিঙ্গান্তর হয় : (এ) 'রি' (রী)—**হাড়েরি** মালী, **মহামুদেরী** কংখা। এছাড়া, অবহট্ঠের হ বিভক্তি পাওয়া যায় দুটি ক্ষেত্রে : খণহ, গঅণহ। -আ <* + -অস্য < অস্স > আস < আহ < আ) পাওয়া যায় কয়েকটি পদে—**অপণা** মাংসেঁ, **মাআ মোহসমুদা,** পইঠেল **গরাহকা** নাহি নিসারা, **মুঢ়া** হিঅহি ন পইসই। কৃত-জাত 'ক' ও 'করি' (স্ত্রীলিঙ্গ) -র প্রয়োগও আছে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে : **ছান্দক, করণক, আপণকরি** সখী।

অধিকরণ : করণের বিভক্তির সঙ্গে অভিন্ন। করণের বিভক্তির অতিরিক্ত আরও দুটি বিভক্তি আছে : -ত, -ই (হি) —**হাড়ীত** ভাত নাহি, **সাঙ্কমত** চড়িলে, মূঢ়া **হিঅহি** ন পইসই, **দিবসই** বহুড়ী কাউই ডরে ভাঅ(২)। বিশিষ্ট অনুসর্গ : মাঝেঁ মঝেঁ মঝ, গঙ্গাজউনা **মাঝে** রে, কোড়ি **মঝেঁ** একু, **মঝ** বেণী। এছাড়া বিভক্তিহীন অধিকরণের দৃষ্টান্তও দুর্লভ নয় : কানেট চৌরি নিল **অধরাতী** (২), **দেহ-নঅরী** বিহরএ একারেঁ (১১)।

সম্বোধন : সম্বোধনে প্রাতিপদিক বা মূল শব্দের কোন পরিবর্তন হয় না। কর্তৃপদের রূপটিই সম্বোধনে গৃহীত হয়। তবে সম্বোধিত ব্যক্তির পরিচয় অনুযায়ী কর্তৃপদের রূপের সঙ্গে বিভিন্ন সম্বোধনসূচক অব্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন, সম্বোধিত ব্যক্তি যেখানে নারী সেখানে মূল পদের সঙ্গে 'লো' (১০, ১৪, ১৮), 'অলো' (১০, ১৭), 'হালো' (১০, ১৮), 'গো' (২০)— এই অব্যয়গুলি ব্যবহৃত হয়েছে, তেঁই লো ডোম্বী সঅল বিটলিউ, বাজই **অলো** সহি হেরুঅ বীণা, **হালো** ডোম্বী তো পুছমি সদভাবে, ফেটলিউ **গো** মা এ অন্তউড়ি চাহি। আবার সম্বোধিত ব্যক্তি যেখানে শিষ্য সেখানে 'বট' (২৯), 'বপা' (৩২) পদের ব্যবহার পাওয়া যায়— লুই ভণই **বট** দুলক্খ বিণানা, সরহ ভণই **বপা**

উজুবাট ভইলা। এছাড়া দু-একটি তৎসম সম্বোধনসূচক অব্যয়েরও ব্যবহার পাওয়া যায় : রে (১, ১২, ১৪, ১৫), হে (৫), —সুন্নুপাখ ভিড়ি লাহ্‌রে পাস, জই তুম্‌হেলোঅ **হে** হোইব পারগামী।

(খ) সর্বনাম :

দু-একটি ক্ষেত্র ছাড়া বহুবচনবোধক পৃথক সর্বনাম পদ নেই। বহুক্ষেত্রেই প্রথম পুরুষের সর্বনাম পদ ও নির্দেশক সর্বনাম পদ রূপের দিক থেকে অভিন্ন। কতকগুলি সর্বনামজাত পদ বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণ রূপে ব্যবহৃত। সর্বনামের সম্বন্ধ পদ লিঙ্গান্তর-সাপেক্ষ।

কর্তা :

কর্তৃবাচ্যে—

উত্তমপুরুষ : আম্‌হে, অম্‌ভে, অম্‌হে, মো, ম, হাঁউ।

মধ্যমপুরুষ : তুম্‌হে, তু, তো, তুম্‌হে, লোঅ (বহুবচন)।

প্রথমপুরুষ : জ, স, জো, সো, জে (বহুবচন), তে (বহুবচন) সেব (২০) কেহো, কোবী, কিম্পি, কিষ, কীস, কাহি, কিমো, এহু, এ। প্রথমপুরুষের কতকগুলি পদ বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত : অইসনি, কইসণ, কইসণি, কইসা, জইসা। ক্রিয়াবিশেষণরূপে ব্যবহার— আইস, জইসোঁ, তইসোঁ, জেতই, তেত।

কর্মবাচ্যে— আম্‌হে, মই, মো, ম, মোএ। তঁই।

কর্ম : মধ্যমপুরুষ— কা, কীস, কিম্‌পি, কি, জা, জাসু, তা, তো।

করণ : আম্‌হে, মই, তঁই, তোএ। ক্রিয়াবিশেষণরূপে ব্যবহৃত করণের পদ— জেঁ, জেন, কইসেঁ, জবেঁ, তবেঁ।

গৌণকর্ম-সম্প্রদান : মকুঁ। তোরেঁ, তোহোরে। কাহেরে। তোহোর অন্তরে।

অপাদান : জথা।

সম্বন্ধ : উত্তমপুরুষ— পুংলিঙ্গ : মোহোর, মোর, মো ;
স্ত্রীলিঙ্গ : মোরি, মেরি।
মধ্যমপুরুষ— পুংলিঙ্গ : তো, তোরা, তোহোর ;
স্ত্রীলিঙ্গ : তোহোরি।
প্রথমপুরুষ— পুংলিঙ্গ : জা, জাহের, তাহের, জাসু, জসু, তাসু, তসু ;
স্ত্রীলিঙ্গ : কাহরি।

অধিকরণ : এথু, কা, কহিঁ, তহিঁ।

৬। ক্রিয়া ও ধাতুরূপ :

(ক) সমাপিকা ক্রিয়া— বর্তমানকাল এবং খুব সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ কাল ছাড়া ক্রিয়াপদে কর্তৃবাচ্যের প্রয়োগ নেই। ক্রিয়াপদের রূপে বচন ও পুরুষভেদ ছিল, তবে প্রয়োগে এই ভেদ সর্বত্র রক্ষিত হত না। কর্মবাচ্যে কর্তৃপদ স্ত্রীলিঙ্গ হলে-ইল অন্ত-

অতীতের পদ এবং ইব-অন্ত ভবিষ্যতের পদে স্ত্রী-প্রত্যয় যুক্ত হত, যথা, **লাগেলি** তান্তী, **দিবি** পিরিচ্ছা।

নির্দেশক ভাব (indicative mood)

বর্তমান কাল :

উত্তমপুরুষ	একবচন	বহুবচন
	-মি (< অস্মি)	-হুঁ (< সং-ধ্বম্)
	পেখমি, জাণমি	আছহুঁ, করহুঁ; খেলহুঁ
	পুছমি, লেমি	জাণহুঁ, বিহরহুঁ, লেহুঁ।
মধ্যমপুরুষ	-সি (< অসি)	-হ (< সং-থস্)
	পুছসি, বাসসি, জাসি	জাণহ, পরিমাণহ, ছেবহ
	গিলেসি, বুঝসি, আইসসি	বিন্ধহ, ভুলহ
প্রথমপুরুষ	(১) -ই (< সং-তি)	(১) -ন্তি (< সং-অন্তি)
	অচ্ছই, পেখই, ভণই, পইসই	ভণন্তি, চাহন্তি, কহন্তি,
	(২) -অই (< কর্মভাববাচ্যের	বিলসন্তি, গান্তি, নাচন্তি,
	য-বিকরণ + তি) ঃ	হোন্তি।
	করিঅই, মরিঅই, পতিআই	(২) -থি
	(৩) লুপ্ত বিভক্তি ঃ অচ্ছ,	ভণথি, বোলথি।
	তুট, উহ, বান্ধ, দে	

ভবিষ্যৎকাল (প্রাচীন মৌলিক রূপ) :

মৌলিক অর্থাৎ সংস্কৃত ভবিষ্যৎ কালের পদ (যথা, করিষ্যতি) থেকে জাত প্রাচীন ভবিষ্যতের ক্রিয়াপদ চর্যাগীতিতে অল্পপরিমাণেই ছিল। যে রূপগুলি পাওয়া যায় তা সবই মধ্যম ও প্রথমপুরুষের এবং পদের অর্থও পুরোপুরি ভবিষ্যতের নয়, অনুজ্ঞা ভাবের।

মধ্যমপুরুষ— সি (< সং-স্যসি) হোহিসি, মারিহসি।

প্রথমপুরুষ— হ (< সং-স্যতি) কহিহ, করিহ।

ভবিষ্যৎকাল (কৃদন্তরূপ) :

পূর্বোক্ত কয়েকটি মৌলিকরূপ ছাড়া চর্যাগীতির অধিকাংশ ভবিষ্যতের পদই ছিল কৃদন্ত : সংস্কৃত 'তব্য' প্রত্যয়জাত-ইব (-তব্য > ইঅব্ব > ইব্ব > ইব) যোগে এই ভবিষ্যতের পদ গঠিত হত। -তব্য প্রত্যয় মূলে কর্মভাববাচ্যে প্রযুক্ত হয়ে কর্মের বিশেষণের কাজ করত। এই রীতি চর্যার ভাষাতেও রক্ষিত হয়েছে। তাই ইব-অন্ত ভবিষ্যতের পদ সাধারণত কর্মভাববাচ্যে (Passive voice) প্রযুক্ত হয়েছে এবং প্রাচীন বিশেষণের রীতি অনুযায়ী লিঙ্গান্তরের অধীন হয়ে পড়েছে। যথা, **করিব** নিবাস (নিবাস

ঃ কর্ত্তব্যঃ) ; মই **ভাইব** কীষ, জই তুমহে লোঅ **হোইব** পারগামী। স্ত্রীলিঙ্গে মই দিবি পিরিচ্ছা (= **ময়া** দাতব্যা পৃচ্ছা)। প্রয়োগ কর্মভাববাচ্যে হওয়ায় কৃদন্ত ভবিষ্যৎ পদের পুরুষগত রূপভেদ নেই। একটি ক্ষেত্রে অবশ্য কৃদন্ত ভবিষ্যতের পদ কর্তৃবাচ্যে ব্যবহৃত হয়েছে, তবে সেই পদে এঁ বিভক্তি যুক্ত হয়েছে : জই তুহ্মে ভুসুকু অহেরি **জাইবেঁ** (মধ্যম পুরুষ—২৩)।

অতীতকাল :

মৌলিক অর্থাৎ সংস্কৃত অতীতের পদ (যথা, অগচ্ছৎ) থেকে জাত অতীতের পদ চর্যার ভাষায় একেবারে লুপ্ত। শুধু সংস্কৃত নাসীৎ (ন আসীৎ) -জাত 'নাহি' পদটি আছে ক্রিয়ারূপে নয়, অব্যয়রূপে। তাই চর্যাভাষায় সমস্ত অতীত কালের পদই কৃদন্ত। গঠনের দিক থেকে এই অতীতের পদ দুইটি শ্রেণীতে পড়ে (১) ল-প্রত্যয়হীন ও (২) ল-প্রত্যয়যুক্ত। ল-প্রত্যয়হীন অতীতের সৃষ্টি সংস্কৃত-ক্ত প্রত্যয় থেকে। এই জাতীয় পদ প্রায় সর্বদাই কর্মভাববাচ্যে প্রযুক্ত এবং লিঙ্গ-পুরুষ ও বচনগত বিভেদবর্জিত। এই জাতীয় অতীতের একাধিক রূপ পাওয়া যায়, কোথাও ক্ত প্রত্যয়যুক্ত মুল কৃদন্ত পদের সমীকৃত রূপ, যথা, পইঠা, পইঠো (< প্রবিষ্ট), নঠা (< নষ্ট), দিঠা (< দৃষ্ট)। কোথাও আবার-ক্ত প্রত্যয় থেকে জাত-ইঅ, -ইআ, -ঈ, ইউ প্রত্যয়-বিশিষ্ট, যথা : জউতুকে **কিঅ** আনুতু ধাম, কাহ্ন ডোম্বী বিবাহে **চলিআ,** জাহের বাণ চিহ্ন রূব ন **জানী,** কমল **বিকসিউ**। ল-প্রত্যয়যুক্ত অতীতের পদে কর্মবাচ্যে কোন বিভক্তি যুক্ত হয় না, তবে কর্তা **কর্ম** স্ত্রীলিঙ্গ হলে স্ত্রী-প্রত্যয় যুক্ত হয়, মই **দেখিল** (ময়া দৃষ্টম্), **মেলিলি** কাচ্ছী (মুক্তা কক্ষিকা)। কর্তৃবাচ্যে ল-প্রত্যয়যুক্ত পদে কতকগুলি পুরুষসূচক প্রত্যয় যুক্ত হয়— উত্তমপুরুষ : ই, এসু— **সুতেলি,** ভইলি, ফিটলেসু, প্রথম পুরুষ : -অ, -আ, -ই (-ঈ-স্ত্রীলিঙ্গ) —নিল, জিতেল, মিলিল, চলিল, কএলা, সুতেলা, পড়িলা, আইলা, ভরিলী, লাগেলী, ঘলিলি, পোহাইলী।

অনুজ্ঞাভাব (Imperative mood) :

আধুনিক বাংলায় বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয় কালেই অনুজ্ঞা ভাবের ক্রিয়াপদ প্রচলিত আছে, কিন্তু চর্যার ভাষায় শুধু বর্তমানেরই অনুজ্ঞারূপ পাওয়া যায়। ভবিষ্যতের অনুজ্ঞার অর্থ নির্দেশক ভবিষ্যতের রূপ দিয়েই প্রকাশ করা হত। চর্যার ভাষায় মধ্যম পুরুষে বচনভেদে দুরকম অনুজ্ঞারূপ পাওয়া যায়। একবচন— পুচ্ছ, অচ্ছ, জাণ, বাহ, দে, কর, জাহী, হোহী। বহুবচন— অচ্ছহু, সিঞ্চহু, হোহু, লেহু, জাহু। নিষেধার্থক অনুজ্ঞাভাবে ক্রিয়াপদের সঙ্গে 'মা' ও 'ন' পদের ব্যবহার ছিল, মা হোহি, ন ভুলহ। প্রথম পুরুষ (কর্মভাববাচ্যে) —জাইউ, করউ।

(খ) অসমাপিকা ক্রিয়া :

চর্যাভাষায় অসমাপিকার রূপ ত্রিবিধ : (১) অসমাপিকা ক্রিয়া যেখানে ল্যবর্থক (Conjunctive অর্থাৎ আধুনিক বাংলায়— 'ইয়া') সেখানে অতীতের ল-প্রত্যয়হীন পদগুলি ব্যবহৃত হত, যথা, দুলি **দুহি** পিটা ধরন ন জাই, গুরু **পুচ্ছিঅ** জান, ডোম্বী

বিবাহিআ অহারিউ জাম, (২) অসমাপিকা ক্রিয়া যেখানে ভাবার্থক (conditional) সেখানে ভাবে সপ্তমী বা ভাবে তৃতীয়া -জাত -ইলে প্রত্যয় যুক্ত হত : সাঙ্কমত **চড়িলে** দাহিন **বাম** মা হোহী, রাতি **ভইলে** কামরু জাঅ ; (৩) অসমাপিকা ক্রিয়া যেখানে তুমর্থক ও শত্রর্থক (infinitive and gerundial অর্থাৎ আধুনিক ইতে) সেখানে সংস্কৃত শতৃ প্রত্যয় জাত 'অন্তে' (অন্ত্ + এ) প্রত্যয় যুক্ত হত— আন **চাহন্তে** আন বিণঠা, অমিঅ **আচ্ছন্তে** বিস গিলেসি, মই এথু **বুড়ন্তে** কিম্পি ন দিঠা।

৭। ক্রিয়াবিশেষণ :

চর্যাভাষায় ক্রিয়াবিশেষণের সাধারণত তিনটি রূপ পাওয়া যায় : (১) তৃতীয়া সপ্তমী— এঁ -এ বিভক্তিযুক্ত পদ—ভবণই গহন গম্ভীর **বেগেঁ** বাহী, **নিতে নিতে** ষিআলা যিহেঁ সহ জুঝঅ। (২) বিশেষ্য-বিশেষণ পদের সঙ্গে -ই, -ইঅ অন্ত অসমাপিকা ক্রিয়াপদ **-দিঢ় করিঅ** মহাসুহ পরিমাণ, **থির করি**। (৩) সর্বনামজাত —**আইস**, জইসোঁ, তইসো, জেতই, জথা, তথা, জিম, তিম, জবেঁ, তবেঁ।

৮। অব্যয় :

চর্যাভাষার কতকগুলি বিশিষ্ট অব্যয় :

(ক) নঞর্থক— **মা**, ন, নাহী

(খ) সংযোগসূচক বা নির্দেশক -ই (ঈ), বি (বী)

পেখমি দহদিহ সব্বই শূন।
বেণি পাখে সোই বিণা।
কাআ তরুবর পঞ্চ **বি** ডাল।
কোবী ন দেখি।
জিণরঅণ **বি** কইসা।

(গ) নিশ্চয়াত্মক— হ, হো

সুইণা **হ** অবিদারঅ রে। জহি মণ ইন্দিঅবণ **হো** ণঠা।

(ঘ) সম্বোধনসূচক— হে, রে, আল, লো, হালো (বিশেষ্যের শব্দরূপ দ্রষ্টব্য)।

(ঙ) পাদপূরণমূলক— সে ঃ হেরি **সে** কাহ্নি ণিঅড়ী জিনউর বট্টই।
হের **সে** সবরো নিরেবণ ভঈলা।
এক **সে** শুঙিণী দুই ঘরে সান্ধঅ।

(গ) বাক্যরীতি :

চর্যাগীতির ভাষা প্রাচীন বাংলার প্রতিনিধি। কিন্তু এই প্রতিভূভাষা থেকে সেকালের বাংলাভাষার বাক্যরীতি সম্পর্কে সাধারণ ধারণা গঠন করা একেবারে সহজসাধ্য নয়। এর কারণ প্রধানত দুটি— ১. চর্যাগীতির বাক্যগুলি ছন্দোবিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেজন্য বাক্যরীতির ছন্দনিরপেক্ষ স্বাধীন রূপটি সেখানে পুরোপুরি রক্ষিত হয় নি। ছন্দের

অনুরোধে পদবিন্যাসের একটু এদিক-ওদিক হওয়াও অসম্ভব নয়। ২. চর্যাগীতির রচনা-রীতি ও ভাবপ্রকাশপদ্ধতি স্থানবিশেষে এত সংক্ষিপ্ত, জটিল ও অসংলগ্ন যে সেই সব ক্ষেত্রে বাক্যের অন্তর্নিহিত যুক্তিধারা অনুসরণ করা কঠিন এবং সেই কারণে তার অন্বয়ের প্রকৃতি নির্ধারণও কঠিন। কিন্তু এই প্রাথমিক অসুবিধা সত্ত্বেও চর্যাগীতির একটি পদ বা চরণ-যুগ্মকের কাঠামো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে পদগুলি এক বা একাধিক সরল (একটি মাত্র উদ্দেশ্য + একটি বিধেয়) বা মিশ্র (একটি প্রধান বাক্যের সঙ্গে অপর একটি অপ্রধান বাক্যাংশের সমন্বয়ে গঠিত) বাক্যের দ্বারা নির্মিত। যেমন, সরল বাক্যে— হরিণা হরিণীর নিলঅ ণ জানী (৬), হাঁউ নিরাসী খমণ ভতারি (২০), কাআ তরুবর পঞ্চবি ডাল (১) ; মিশ্রবাক্য—জাহের বাণচিহ্ন রূপ ন জানী। সো কইসে আগম বেএঁ বখানী ॥ (২৯-এক্ষেত্রে দ্বিতীয় চরণটি প্রধান বাক্য, প্রথম চরণ তার বিশেষণধর্মী বাক্যাংশ) ; জো বুঝই তা গলেঁ গলপাস (৩৭), লুই ভণই গুরু পুচ্ছি অ জান (১), জে জে আইলা তে তে গেলা (৭), ইত্যাদি।

এছাড়া, চর্যার বাক্যগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ছন্দের প্রয়োজনে বাক্যবিন্যাসের কিছু বিপর্যয় ঘটেছে বটে তবে এই বিপর্যাস যতটা বহিরঙ্গের ততটা অন্তরঙ্গের নয় অর্থাৎ যে সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যাংশের পারস্পরিক অন্বয়ে গোটা বাক্যটি তৈরী হয়েছে সেই সব অন্তর্লীন ক্ষুদ্র বাক্যাংশের নিজস্ব কাঠামোতে পদবিন্যাসের কোন বিপর্যয় ঘটে নি, বিপর্যয় যা ঘটেছে তা বাক্যের সামগ্রিক রূপটিতে। এর কারণ, মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার স্তর থেকেই যখন আর্য ভাষার প্রাচীন বিভক্তি ও প্রত্যয়গুলি লুপ্ত হয়ে আসছিল তখন থেকেই উপযুক্ত বিভক্তি ও প্রত্যয়যোগে বাক্যকে সংহত করার প্রাচীনতর রীতি অনেকাংশে শিথিল হয়ে আসে এবং বাক্যগঠন সংহত না হয়ে বহুভাষিত (periphrastic) হয়ে পড়ে। এই বহুভাষিত বাক্যরীতিতে বাক্যাংশ তথা বিভিন্ন পদের নির্দিষ্ট ধরনের ক্রমসংস্থানের গুরুত্ব সর্বাধিক। গদ্যে সাধারণত কর্তা কর্ম ইত্যাদি পদকে যে ভাবে সাজানো হয়, পদ্যে ছন্দের প্রয়োজনে তার অল্পবিস্তর বিপর্যয় ঘটানো চলে, কিন্তু যে নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে এক একটি বাক্যাংশ গঠিত হয় সেই ক্রমটি সকল অবস্থাতেই রক্ষা করতে হয়। এই ক্রমকে ক্ষুণ্ণ করলে বাক্যাংশের বিশেষ অন্বয়গত অধিকার ও ক্ষমতা বিনষ্ট হয়। এই কারণে চর্যাগীতিতে দেখা গিয়েছে যে, ছন্দের অনুরোধে বাক্যের বাহ্য পদবিন্যাসের বিপর্যয় ঘটলেও অভ্যন্তরীণ বাক্যাংশের নিজস্ব অন্বয় অক্ষুণ্ণ রয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার করা যেতে পারে ঃ

১। যৌগিক ক্রিয়াপদ : বাক্যের যে অংশে যৌগিক ক্রিয়াপদ অবস্থিত সেই অংশের অন্বয় অপরিবর্তিত, যথা, গই পইঠা (১৬), টুটি গেলি (৩৭), গুণিআ লেহুঁ (১২), টলিআ পইঠা (৩৫), পুচ্ছিঅ জাণ (১) অবসরি জাই (৩২) ধরণ ণ জাই (২) বাহবা ন জাই (১৪), কহন ন জাই (২০), লক্খণ ন জাই (১৫), পার ন জাই (৩৮), বোলবা জাঅ (৪০) ইত্যাদি। এইসব বাক্যাংশের অন্বয় অপরিবর্তনীয়রূপে নির্দিষ্ট।

২। কৃদন্ত বিশেষণ + বিশেষ্য। উল্লিখিত পদক্রমও অপরিবর্তনীয়রূপে বিদ্যমান ; যথা পইঠেল গরাহকা (৩), দুহিল দুধু (৩৩), বেঢ়িল হাক (৬) মাতেল চিঅগঅন্দা (১৬),

গেলী জাম (৮), বুড়িলী মাতঙ্গী (১৪), জলিঅ চণ্ডালী (৪৯), চালিঅ যষহর (২৭) ইত্যাদি।

৩। -র, -এর (-এরি) বিভক্তিযুক্ত বিশেষ্যপদ + বিভক্তিহীন বিশেষ্য : উল্লিখিত পদক্রম অপরিবর্তনীয়। যথা, বিশেষ্যীয় সম্বন্ধপদ + বিশেষ্য —রুখের তেন্তুলি (১), পাটের আস (১১), টেন্টণপাএর গীত (৩৩), হরিণির ণিলঅ (৬), মুসার চার (২১), হাড়েরি মালী (১০) ইত্যাদি। চর্যাগীতির কোথাও এই পদক্রমের ব্যত্যয় দেখা যায় না, কিন্তু সম্বন্ধ পদ যদি সর্বনামীয় হয় অর্থাৎ সর্বনামের সঙ্গে-র,-এর প্রভৃতি সম্বন্ধবিভক্তির যোগে সম্বন্ধপদ গঠিত হয় তবে শব্দক্রম বিচলিত হতে পারে যথা, [১] মেরি তইলা বাড়ী (৫০), [২] বাসনা তোরা (৪১)—এখানে প্রথম ক্ষেত্রে পদক্রম সম্বন্ধপদ + বিশেষ্য, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিশেষ্য + সম্বন্ধপদ।

৪। বিশেষ্য/সর্বনাম + অনুসর্গ : চর্যাভাষার সর্বত্রই অনুসর্গ তার স্বভাবধর্ম অনুযায়ী বিশেষ্য ও সর্বনামের অব্যবহিত পরে বসেছে, যথা, ষিহে সম (৩৩), তোহোর অন্তরে (১০), তোএ সম (১০), নিন্দ বিহুণে (১৩), তঁই বিনু (৪), ডোম্বীএর সঙ্গে (১৯) ইত্যাদি।

৫। বিভক্তিহীন বিশেষ্য (কর্ম বা অধিকরণ) + কৃজাত অসমাপিকা : উল্লিখিত বাক্যাংশের শব্দক্রমও সর্বত্র অপরিবর্তিত : যথা, গুরু পুচ্ছিঅ (১১) দুলি দুহি (২) মুহ চুম্বী (৪) বন ছাড়ী (৬) খুণ্টি উপাড়ী (৮) আখি বুজিঅ (১৫) ইত্যাদি।

৬। নঞর্থক বাক্যাংশ : (ক) এই বাক্যাংশ যেখানে নঞর্থক অব্যয় ও ক্রিয়াপদ যোগে গঠিত সেখানে শব্দক্রম : নঞর্থক অব্যয় + ক্রিয়াপদ— ন পুচ্ছসি (১৫), [ধরণ] ন জাই (২), ন ভুলহ (১৫), [কিম্‌পি] ন দিঠা (১৬), [ভেউ] ণ জাঅ (৪৩), নউ দাঢ়ই নউ তিমই ন চ্ছিজই (৪৩), [অণ] ণ হোই (৪৬), [কণ্ঠ] ন মেলই (১৮), জানমি (৩১) মা জাহী (৫), মা দেসি (১২), মা কর (২৮, ৪১), মা জাহু (৩২), মা ভোল (৩৭), মা হোহী (৫, ৪২)। (খ) নঞর্থক বাক্যাংশ যেখানে বিশেষ্যপদ ও নঞর্থক অব্যয় যোগে গঠিত সেখানে শব্দক্রম অনির্দিষ্ট ও পরিবর্তনসাপেক্ষ : [১] বিশেষ্য + নঞর্থক অব্যয় : ভাত নাহী (৩৩), কাহ্ন নাহি (৪২), সো এথু নাহী (২০), কেডুআল নাহী (৮), জাম মরণ ভব নাহী (৪৩), [২] নঞর্থক অব্যয় + বিশেষ্য : নাহি বিশেষ (৪৯), নাহি ছিণালী (১৮), নাহি পড়বেষী (৩৩), নাহিক ঠাবী (৮), নাহি নিসারা (৩) মাঝে ন থাহী (৫)। (গ) যেখানে অর্থের দিক থেকে একাধিক নঞর্থক বাক্যাংশের ভাব প্রকাশ পেয়েছে সেখানে দুটি বিশেষ্য বা ক্রিয়াপদের মাঝখানে একটি মাত্র নঞর্থক অব্যয় ব্যবহার করা চর্যাভাষার নঞর্থক বাক্যাংশ গঠনের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ, যেমন, কাজ ণ কারণ (২৬) = কার্যও নাই, কারণও নাই, সাচ ন মিচ্ছা (২৯), পাপ ন পুণ্ণ (৩৫), চেঅণ ণ বেঅণ (৩৬), জাই ণ আবই (৪২), নাব ন ভেলা (১৫), ঘাট ণ গুমা, নাদ ন বিন্দু ন রবি ন সসিমণ্ডল (৩২)।

এ ছাড়া চর্যাভাষার বাক্যরীতির অপর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য : ইডিয়ম ও প্রবচনের দ্বারা বাক্যের সৌষ্ঠববৃদ্ধি ॥[১]

---

১. চর্যার বাক্যের গঠনশৈলীর বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে বিশদ অবগতির জন্য অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রনাথ বসুর Functional Analysis of Old Bengali Structures দ্রষ্টব্য।

সন্ধ্যাভাষা :

চর্যাগীতির মূল বিষয় বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের অধ্যাত্মতত্ত্ব। ধর্মতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব বিষয়ে বিবিধ নির্দেশদান উপলক্ষেই গানগুলি রচিত। কিন্তু এই তত্ত্ব-উপদেশ ঠিক সরাসরি সর্বজনবোধ্য ভাষায় দেওয়া হয়নি, আসল বক্তব্যকে কতকগুলি ভিন্ন অর্থবহ শব্দ ও উপমা-উৎপ্রেক্ষার সাহায্যে আচ্ছন্ন করা হয়েছে। ফলে চর্যার ভাষার প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই দুটি করে অর্থ বর্তমান, একটি অর্থ বাহ্য বা লৌকিক, অপর অর্থ গূঢ় এবং পারিভাষিক, যা একমাত্র দীক্ষিত সাধকদেরই অবগত ; যেমন :

মূলশব্দ	লৌকিক অর্থ	গূঢ় অর্থ
(চর্যার ব্যবহৃত)		
হরিণা (৬)	হরিণ	চিত্ত
হরিণী (৬)	হরিণী	জ্ঞানমুদ্রা
ডোম্বী (১০)	ডোমরমণী	পরিশুদ্ধাবধূতিকা
গঙ্গা জউনা (১৪)	গঙ্গাযমুনানদী	চন্দ্রাভাস ও সূর্যাভাস
দুলি (২)	কচ্ছপ	মহাসুখকমল
শবর (৫০)	শবর জাতীয় পুরুষ	বজ্রধর, হেরুক
শবরী (৫০)	শবর জাতীয়া নারী	দেবী নৈরাত্মা
বারুণী (৩)	মদ্য	সংবৃত্তি বোধিচিত্ত
পুলিন্দ (১৫)	মাস্তুল	নপুংসক

চর্যাগানের টীকারচনা করতে গিয়ে মুনিদত্ত চর্যায় ব্যবহৃত শব্দগুলির ভিতরে গূঢ় অর্থই প্রকাশ করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তাঁর টীকার বিভিন্নস্থানে এই দ্ব্যর্থ শব্দ ও প্রকাশরীতিকে 'সন্ধ্যাভাষা' 'সন্ধ্যাবচন' 'সন্ধ্যাসংকেত' অথবা 'সন্ধ্যা' নামে অভিহিত করা হয়েছে। মুনিদত্তের টীকা অনুসরণ করে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রচার করেছিলেন যে চর্যাগীতি 'সন্ধ্যাভাষায় লেখা'। কিন্তু এই 'সন্ধ্যা ভাষা'র বানান, ব্যুৎপত্তি ও অর্থ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন মত পোষণ করেন। পুথির আবিষ্কারক হরপ্রসাদ 'সন্ধ্যাভাষার' অর্থ ব্যাখ্যায় বলেছেন 'সন্ধ্যাভাষার মানে আলো আঁধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না।" (মুখবন্ধ, বৌদ্ধগান ও দোঁহা, পৃ ৮)। অর্থাৎ হরপ্রসাদ 'সন্ধ্যা' অর্থে এই ভাষার সঙ্গে 'সন্ধ্যার' নৈসর্গিক অস্ফুটতার সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু পরবর্তী গবেষকদের কাছে হরপ্রসাদের এই ব্যাখ্যা মনঃপূত হয়নি। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধে এই ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করে বলেন "আমরা শাস্ত্রী মহাশয়ের এই বিবৃতি ষোলআনা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। ভাগলপুর জেলার দক্ষিণ-পূর্বাংশ, সাঁওতাল পরগণা এবং বীরভূমের পশ্চিমাংশ, এই ভূভাগকে সন্ধ্যা দেশ কহে, অর্থাৎ ইহা আর্য্যাবর্ত এবং বঙ্গদেশের সন্ধিস্থলে অবস্থিত ; এই প্রদেশের ভাষাকেও সন্ধ্যাভাষা কহে। ....সিদ্ধাচার্য্যগণের অবলম্বিত দোহা পদ-সকলের ভাষা এই দেশেরই সন্ধ্যাভাষা বা বিভাষা" (পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী, প্রথমখণ্ড

পৃ. ৯৮)। অর্থাৎ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে চর্যার ভাষা ভাষাবিশেষের গূঢ়রূপ নয়, আঞ্চলিক উপভাষা বিশেষ। অন্যদিকে বিধুশেখর শাস্ত্রী 'সন্ধ্যা' শব্দটির বানান ও ব্যুৎপত্তি সম্পর্কেই আপত্তি প্রকাশ করলেন (Sandhā bhāṣā, Indian Historical Quarterly, Vol IV, No 1, 1928. p. 287-96)। তাঁর মতে 'সন্ধ্যা' বানানটি লিপিকর-প্রমাদ, প্রকৃত বানান 'সন্ধা', সম্ -ধা ধাতু থেকে এই শব্দের ব্যুৎপত্তি। এই ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী সন্ধাভাষা বা বচনের অর্থ যে ভাষায় বা শব্দে অর্থ সম্যকরূপে নিহিত আছে, অর্থাৎ আভিপ্রায়িক ভাষা বা সাংকেতিক ভাষা। চর্যাগীতির অপর বিশেষজ্ঞ ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী বিধুশেখর শাস্ত্রীর এই ব্যুৎপত্তি ও ব্যাখ্যা সমর্থন করেছেন (Sandhābhāṣā and Sandhāvacana, Studies in the Tantras, Part I, 1939, p. 27-33)। যুক্তির দিক থেকে বিধুশেখর ও প্রবোধচন্দ্রের 'সন্ধা' বানানটি গ্রহণযোগ্য, কিন্তু পুথিতে প্রাপ্ত 'সন্ধ্যা' বানানটিও একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। কেন না, এই পুথি ছাড়াও সরহের দোহাকোষের অদ্বয়বজ্ররচিত 'সহজান্নায়পঞ্জিকা' নামক টীকায়, 'হেবজ্রতন্ত্রে' এবং অন্য অনেক বৌদ্ধতান্ত্রিক পুথিতেই 'সন্ধ্যা' বানানটি পাওয়া যায়। সুতরাং এই বানানকে ঠিক লিপিকর-প্রমাদ বলা চলে না। 'সন্ধ্যা' বানানটি লিপিকরপ্রমাদ হলে অন্যান্য পুথিতেও 'সন্ধ্যা' বানান থাকত না। সেক্ষেত্রে 'সন্ধ্যা' বানানটিই সঙ্গত বলে মনে হয় এবং 'সন্ধ্যা' শব্দের অর্থ প্রাকৃতিক সন্ধ্যার সঙ্গে মিলিয়ে না দেখে অন্য ভাবে সন্ধান করা দরকার। প্রকৃতপক্ষে, 'যে ভাষার অভীষ্ট অর্থ সম্যক ধ্যান (সম্—ধ্যৈ) যোগে বুঝতে হয়' এরকম ব্যুৎপত্তি করলে 'সন্ধ্যা' বানানটি অক্ষুণ্ণ থাকে। এই ভাষার অর্থবোধের সঙ্গে যে 'ধ্যানের' সম্পর্ক ছিল টীকাকার মুনিদত্ত ১২ সংখ্যক চর্যার টীকার গোড়াতেই তার ইঙ্গিত দিয়েছেন, 'পুনরপি তমেবার্থং দ্যূতক্রীড়াধ্যানেন প্রকথয়ন্তি কৃষ্ণাচার্যপাদাঃ।"

প্রকৃতপক্ষে 'সন্ধ্যা'র বানান ও ব্যুৎপত্তি যাইহোক না কেন, সন্ধ্যাভাষা যে কোন আঞ্চলিক উপভাষা নয়, আসলে গূঢ়ার্থ-প্রতিপাদক এক ধরনের বচন-সংকেত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যেখানে অভীষ্ট বক্তব্যকে সাধারণের অগোচরে রেখে প্রকাশ করার দরকার হয় সেখানে এই ভাষার ব্যবহার প্রশস্ত। প্রাচীনকালের ধর্মচর্যায় যখনই গোপনীয়তার দরকার হত, তখনই ধর্মগুরুগণ এই ধরনের সাংকেতিক বচনের মাধ্যমে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের শিষ্যদের সঙ্গে তত্ত্বালাপ করতেন। ঋগ্বেদে (১. ১৬৪, ১. ১৫২. ৩, ১০. ৫৫.৫) ও অথর্ববেদে (৭. ১, ১১.৮.১০) এই ধরনের সাংকেতিক ভাষারূপের সন্ধান পাওয়া যায়। চর্যাগানের রচয়িতা বৌদ্ধ যোগীদের সাধন-পদ্ধতি ছিল তন্ত্রনির্ভর, তাই তন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী সাধনার গুহ্যত্ব-রক্ষার জন্য তাঁদের আরও বিশেষভাবে সতর্ক হতে হত। এ ব্যাপারে বৌদ্ধযোগী ও যোগিনীরা কায়িক ও বাচনিক উভয়প্রকার গুহ্যতা পালন করতেন। হেবজ্রতন্ত্রে যোগী ও যোগিনীব্যবহৃত এইসব কায়িক ও বাচনিক সংকেত সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে। কায়িক সংকেতের নাম 'ছোম্বা' এবং বাচনিক সংকেতের নাম 'সন্ধ্যাভাষা।' হেবজ্রতন্ত্রে অবশ্য সন্ধ্যাভাষার কোন সংজ্ঞা দেওয়া নেই, তবে সন্ধ্যাভাষার যে তালিকা ও অর্থ দেওয়া আছে তাতে এই ভাষার আভিপ্রায়িক

দ্ব্যর্থ লক্ষণ খুবই স্পষ্ট। সমস্ত তান্ত্রিক গ্রন্থেই এই ধরনের সন্ধ্যাভাষার অস্তিত্ব আছে, এই তান্ত্রিক সন্ধ্যাভাষার প্রকৃত পরিচয় হল, "a secret, obscure language with a double meaning, wherein a particular state of consciousness is expressed in erotical terminology, the mythological and cosmological vocabulary of which is charged both with hatha-yogic and with sexual significance" (Mercia Eliade)।

চর্যাকারদের শিষ্যপ্রশিষ্যদের মধ্যে তান্ত্রিকতার ক্রমপ্রসার ঘটেছিল। তাই প্রাচীনতর কবির চেয়ে অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কবির রচনায় সন্ধ্যাভাষার প্রয়োগ বেশী। যেমন, দশম শতকে আবির্ভূত বলে অনুমিত আদিতম চর্যাকবি লুইয়ের গানে সন্ধ্যাভাষার আভাস নেই, রূপকগুলিও খুবই স্পষ্ট, অন্যদিকে দ্বাদশ শতকের কবি বলে অনুমিত ভুসুকুর চর্যাগুলি সন্ধ্যাবচনে নিবিড়ভাবে আচ্ছন্ন। কোন কোন চর্যাকার অল্পস্বল্প সন্ধ্যাভাষার ব্যবহার করেছেন, কেউ কেউ আবার সমগ্র গীতিটিকে সন্ধ্যাভাষার আতিশয্যে প্রহেলিকাময় করে তুলেছেন। যেমন, কুক্কুরীপাদ রচিত ২-সংখ্যক গানটির একটি পদে :

দিবসই বহুড়ী কাউই ডরে ভাঅ।
রাতি ভইলেঁ কামরু জাঅ ॥

বাহ্য অর্থ : দিনের বেলায় বধূ কাকের ডাকে ভয় পায়, রাত্রি হলে (কামরূপ বা) কামসেবার্থে যায়।

সন্ধ্যা অর্থ : বহুড়ী = অবধূতিকা, দিবস = প্রবৃত্তি, রাতি = নিবৃত্তি, কামরু = কামরূপ বা মহাসুখ চক্র। চিত্তের প্রবৃত্তিময় অবস্থায় অবধূতিকা ভীত হয়, কিন্তু প্রকৃতি-দোষমুক্ত নিবৃত্ত অবস্থায় মহাসুখচক্রে প্রবেশ করে।

টেন্টণপাদ-রচিত ৩৩ সংখ্যক গানটিও পুরোপুরি সন্ধ্যা-প্রহেলিকায় আচ্ছন্ন। বিভিন্ন স্বভাববিরুদ্ধ ঘটনার সমন্বয়ে গানটি রচিত :

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী ॥
বেঙ্গসঁ সাপ বড়হিল জাঅ।
দুহিল দুধু কি বেণ্টে ষামাঅ ॥
বলদ বিআএল গবিআ বাঝেঁ।
পিটা দুহিএ এ তিনা সাঁঝে ॥
জো সো বুধী সৌ নিবুধী।
জো ষো চৌর সৌ দুষাধী ॥
নিতে নিতে ষিআলা ষিহে সম জুঝঅ।
টেন্টণ পাএর গীত বিরলেঁ বুঝঅ ॥

বাচ্যার্থ : টোলায় বা লোকালয়ে আমার ঘর, প্রতিবেশী নেই। হাঁড়িতে ভাত নেই,

নিত্য (অতিথির) আগমন। ব্যাং সাপকে কাটে। দোয়া দুধ বাঁটে প্রবেশ করে। বলদ প্রসব করল, গাভী রইল বন্ধ্যা। ত্রিসন্ধ্যা পাত্র দোহন করা হয়। যে বুদ্ধিমান সেই নির্বোধ, যে চোর সেই কোটাল। শৃগাল নিত্য সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করে— টেণ্টনপাদের এই গান কম লোকে বোঝে।

সন্ধ্যাঅর্থ: টাল = মহাসুখচক্র। প্রতিবেশী = চন্দ্রসূর্যরূপ দ্বৈতাভাস। হাঁড়ী = দেহভাণ্ড। ভাত = সংবৃত্তি বোধিচিত্ত। বেঙ্গ = বিগতাঙ্গ প্রভাস্বরবিজ্ঞান। দুহিল দুধ = বোধিচিত্ত। বাঁট = মহাসুখচক্রপথ। বলদ = প্রকৃতিদোষাশ্রিত অবিদ্যাচিত্ত। গাভী = নৈরাত্মা। পীঠ = প্রকৃতিদোষ। দোহন = নিঃস্বভাবীকরণ। বুধী = মননেন্দ্রিয়প্রধান বালযোগী। চোর = প্রকৃতিদোষ হরণকারী। শৃগাল = অপরিশুদ্ধচিত্ত। সিংহ = প্রভাস্বর বিশুদ্ধ চিত্ত।

চর্যা-পরবর্তী নাথ সাহিত্যে, বাউল গানে, বৈষ্ণব সহজিয়াদের রাগাত্মিক পদে এবং হিন্দী সাহিত্যের কবীর ও সুন্দরদাসের রচনায় এই ধরনের যোগাশ্রিত উল্টাধারার গান প্রচুর পাওয়া যায়। এ থেকে মনে হয় মধ্যযুগের ভারতীয় ধর্মসাহিত্যে এই ধরনের সন্ধ্যাপ্রহেলিকাগুলি বিশেষ আভিপ্রায়িক রূপ (motif) লাভ করেছিল। চর্যাগানের সন্ধ্যা-প্রহেলিকাগুলি তারই বিশিষ্ট পূর্বরূপ।

তৃতীয় অধ্যায়

তত্ত্বপ্রসঙ্গ

ধর্মতত্ত্ব :

বৌদ্ধ গান ও দোঁহার মুখবন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছিলেন, "এই সকল উঁচু অঙ্গের ধর্মকথার ভিতরে একটা অন্যভাবের কথাও আছে। সেটা খুলিয়া ব্যাখ্যা করিবার নয়। যাঁহারা সাধনভজন করেন, তাঁহারাই সে কথা বুঝিবেন, আমাদের বুঝিয়া কাজ নাই। আমরা সাহিত্যের কথা কহিতে আসিয়াছি, সাহিত্যের কথাই কহিব।" কিন্তু চর্যাগান সম্পর্কে 'সাহিত্যের কথা' বলতে গেলে 'অন্যভাবের' 'ধর্মকথা' একেবারে বাদ দিলে চলে না, কেন না এই গানগুলির নিছক সাহিত্য-মূল্য খুবই কম, ধর্মমূল্যই প্রধান। তাই চর্যাগানের সাহিত্যমূল্য বিচারের সঙ্গে এর ধর্মতত্ত্বের পর্যালোচনা ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

চর্যাগীতিতে বর্ণিত ধর্মীয় ইঙ্গিত, সাধন-প্রণালীর বিবরণ ও বিভিন্ন পারিভাষিক শব্দের উল্লেখে স্পষ্টই বোঝা যায়, এই গানগুলির মূল পটভূমিকা হচ্ছে বৌদ্ধধর্ম, তবে বৌদ্ধধর্মের আদিরূপ নয়, কোন একটি পরিবর্তিত তান্ত্রিকরূপ। বুদ্ধদেবের তিরোধানের পর তাঁর বাণী ও নির্দেশের সঠিক তাৎপর্য নির্ণয় প্রসঙ্গে তাঁর শিষ্যানুশিষ্যদের মধ্যে যে মতবিরোধ দেখা দেয় সেখান থেকেই বৌদ্ধধর্মের রূপ-পরিবর্তনের সূত্রপাত। এই মতপার্থক্য দূর করার জন্য কয়েকবার ধর্ম মহাসংঘ আহ্বান করা হয়, কিন্তু মতভেদ দূর হয় না। শেষপর্যন্ত এই মতভেদের সূত্র ধরে বৌদ্ধধর্ম হীনযান ও মহাযান এই দুইটি শাখায় ভাগ হয়ে যায়। দুটি শাখার মধ্যে প্রধান পার্থক্য ছিল ধর্মের চূড়ান্ত লক্ষ্য নিয়ে। বৌদ্ধদের মধ্যে একদল ছিলেন অত্যন্ত রক্ষণশীল, এঁদের ধর্মীয় লক্ষ্যও ছিল সংকীর্ণ। এঁরা মনে করতেন ধ্যান ও কঠোর আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংসারচক্রের আবর্ত থেকে ব্যক্তিগত মুক্তি তথা অর্হত্ত্ব লাভই ধর্মাচরণের আসল লক্ষ্য। ধর্মাদর্শের এই আপেক্ষিক হীনতা বা সংকীর্ণতার জন্য এঁরা হীনযানী। অন্যদিকে আর একদল ছিলেন ধর্ম-সাধনার দিক থেকে অপেক্ষাকৃত উদার। এঁরা হলেন মহাযানী। মহাযানীদের ধর্মাচরণের উদ্দেশ্য শুধু নিজের মুক্তিলাভ নয়, সমগ্র জীবের মুক্তিলাভ এবং এঁদের চূড়ান্ত লক্ষ্যও অর্হত্ত্বলাভ নয়, বোধিসত্ত্বাবস্থালাভ।[১] বৌদ্ধশাস্ত্র মতে শাক্যমুনি গৌতম

---

১. 'The great difference between the Arhat and the Bodhisattva is that the former is intent upon his own enlightenment and liberation, while the Bodhisattva wishes to help all creatures and bring them to full enlightenment. In order to do this, although qualified for Nivana, he voluntarily renounces it in order to remain in the world to help all creatures, men and animals'. —Mahayana Buddhism : B. L. Suzuki, p. 52

বুদ্ধত্ব লাভের অনেক আগেই জন্মজন্মান্তর ধরে পরোপকারের জন্য আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। বুদ্ধত্ব লাভের পূর্ববর্তী স্তরগুলিই হচ্ছে বোধিসত্ত্বাবস্থা। মহাযানীরা মনে করতেন যে প্রত্যেক জীবের মধ্যেই বুদ্ধত্বলাভের সম্ভাবনা নিহিত আছে, তবে বুদ্ধত্ব লাভের আগে শাক্যমুনি যে ভাবে বোধিসত্ত্বাবস্থায় আরূঢ় হয়ে পরার্থে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন, বুদ্ধত্বকামী ভিক্ষুকেও সেইভাবে কুশলকর্মের মাধ্যমে পরোপকারে আত্মোৎসর্গ করতে হবে। তাই বোধিসত্ত্ব অবস্থালাভই হলো মহাযানী সাধকের পরমকাম্য। এই অবস্থাকে স্থায়ী করার বিভিন্ন উপায় ('নয়') মহাযানী আচার্যেরা নির্দেশ করেছেন। প্রথম যুগের আচার্যেরা মনে করতেন যে সাধক ছয়টি 'পারমিতা' বা দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য, ধ্যান ও প্রজ্ঞা নামক ছয়টি পরমগুণের অনুশীলন করলেই বোধিসত্ত্বাবস্থাকে স্থায়ী করতে পারেন। পরবর্তীকালে এই ছয়টি পারমিতার সঙ্গে আরও চারটি পারমিতা যুক্ত হয়েছিল, এই চারটি হচ্ছে উপায়, প্রণিধান, বল ও জ্ঞান। কিন্তু এইসব পারমিতার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সাধারণ মানুষের পক্ষে ছিল দুরধিগম্য এবং এসবের অনুশীলনও ছিল অত্যন্ত আয়াসসাপেক্ষ, অথচ মহাযান ধর্মে সর্বসাধারণের অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল, তাই পরবর্তী আচার্যেরা সাধারণ মানুষের কথা মনে রেখে বিধান দিলেন যে মন্ত্রশক্তির প্রয়োগেও এই বোধিসত্ত্বাবস্থাকে স্থায়ী করা যায়। এই ভাবে মহাযান বৌদ্ধধর্ম কালক্রমে স্থূলত দুটি ভাগে ভাগ হয়ে গেল— পারমিতানয় ও মন্ত্রনয়।

প্রকৃতপক্ষে এই মন্ত্রনয় বা মন্ত্রযানের পথ ধরেই বৌদ্ধধর্মে নানাবিধ গুহ্য আচার অনুষ্ঠানের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, তন্ত্রাচার এর মধ্যে প্রধান। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্ম-সাধনার মধ্যে তন্ত্রধর্মই সর্বাপেক্ষা আচারনিষ্ঠ, বুদ্ধিগ্রাহ্য তত্ত্বালোচনার চেয়ে কার্যকরী আচরণপদ্ধতিই এখানে প্রধান। এই আচরণপদ্ধতির মধ্যে মন্ত্র, মণ্ডল ও মুদ্রার বিশিষ্ট স্থান ছিল। 'মন্ত্র' বা শব্দবীজের আবৃত্তি করে তান্ত্রিক সাধক শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করেন। উদ্বুদ্ধ শক্তি দেবদেবী রূপে আত্মপ্রকাশ করে নিজ নিজ গুণানুযায়ী নির্দিষ্ট স্থান (মণ্ডল) গ্রহণ করেন, তখন সাধক মন্ত্রোচ্চারণের বদলে নির্বাক করন্যাসে ('মুদ্রা')র মাধ্যমে আরাধ্যের আবাহন (অভিষেক) করেন। এর সঙ্গে দেবতার প্রতীক-স্বরূপ বর্ণরেখাত্মক যন্ত্র ও মৈথুনাদি অন্যান্য ম-কারের ব্যবহার, আভিচারিক ষট্‌কর্মের আশ্রয় গ্রহণ ও বিবিধ যোগানুষ্ঠানের আয়োজনও জড়িত ছিল। মন্ত্রযানের গোড়ার দিকে সম্ভবত তন্ত্রের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে মন্ত্র, মুদ্রা ও মণ্ডলই বিশেষভাবে গৃহীত হয়েছিল, পরে অন্যান্য উপাদানও গৃহীত হয়েছিল। এই অন্যান্য উপাদানের মধ্যে তান্ত্রিক যৌনাচার ও যৌগিক কায়সাধনা পরবর্তীকালে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছিল। এই তান্ত্রিক আচার-স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রযান বৌদ্ধধর্মে আধ্যাত্মিক দৃষ্টির যে বিভিন্নতা সূচিত হয়েছিল সামগ্রিকভাবে তা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম বা 'বজ্রযান' নামে পরিচিত।

বজ্রযানের অন্যতম রূপান্তর সহজযান। সহজযানী সাধকেরা যেহেতু তন্ত্রনির্ভর ছিলেন, সে জন্য তাঁদের ধর্মতত্ত্বে মহাযানী বৌদ্ধধর্মের প্রাথমিক ধারণাগুলি অনেক পরিমাণে তান্ত্রিক ধারণার দ্বারা প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হয়ে পড়েছিল। মহাযানী ধর্মমতে বোধিসত্ত্বাবস্থা বা বোধিচিত্ত লাভই সাধকের পরম কাম্য। ধর্মতত্ত্বের দিক থেকে বোধিচিত্ত

• •

শূন্যতা ও করুণার মিলিত অবস্থা ('শূন্যতাকরুণাভিন্নং বোধিচিত্তমিতি স্মৃতম্' শ্রীগুহ্যসমাজতন্ত্র)। সাধক যখন পরম জ্ঞান বা প্রজ্ঞার বশে জগৎ-প্রপঞ্চকে শূন্য-স্বভাব বলে অনুভব করেন তখন তাঁর স্বার্থ-সীমাবদ্ধ সংকীর্ণ সত্তার বিলোপ ঘটে, সমুদ্রে বিলীন লবণখণ্ডের মতো তিনি তখন নিজের ক্ষুদ্র সত্তা হারিয়ে ফেলেন এবং সেই অবস্থায় জগতের সমস্ত জীবের জন্য করুণাবোধে আপ্লুত হন। বোধিচিত্ত তাই শূন্যতা ও করুণার অদ্বয় মিলন। তন্ত্রের প্রভাবে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে এই শূন্যতা ও করুণা যথাক্রমে নারী ও পুরুষ বা প্রজ্ঞা ও উপায় রূপে রূপান্তরিত হল এবং এই প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলিত অবস্থা বোধিচিত্তও তন্ত্রকথিত শিবশক্তির মিলিত অবস্থা যুগনদ্ধের অনুরূপ অদ্বয় রূপে পরিকল্পিত হল। এই বোধিচিত্ত বজ্রযানে বজ্রসত্ত্ব এবং সহজযানে সহজ, সহজানন্দ, মহাসুখ ইত্যাদি। এই মহাসুখ লাভই সহজিয়া সাধকদের পরম লক্ষ্য। কিন্তু এই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য প্রব্রজ্যা, শাস্ত্রপাঠ, জপ-তপ প্রভৃতি সমস্ত বাহ্যানুষ্ঠানকেই বর্জন করে ধর্মাচার্যেরা একমাত্র দেহকেই অবলম্বন করবার নির্দেশ দিয়েছেন। এক্ষেত্রেও তন্ত্রের প্রভাব লক্ষণীয়। তন্ত্রমতে দেহের বামগা ও দক্ষিণগা ইড়া-পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্যদিয়ে প্রবাহিত প্রাণ ও অপান বায়ুকে মধ্যগা সুষুম্না নাড়ী-পথে চালিত করে সাধনসম্মতভাবে মস্তিষ্কের সহস্রার পদ্মে আনয়ন করলেই সাধক সিদ্ধি লাভ করেন। সহজিয়া সাধকেরাও মহাসুখ লাভের ঠিক একই প্রক্রিয়া বর্ণনা করেছেন। বামগা নাড়ী তাঁদের মতে প্রজ্ঞারূপিণী, দক্ষিণগা নাড়ী উপায়-রূপিণী এবং মধ্যগা নাড়ী অদ্বয়রূপিণী অবধূতিকা। সহজযানে নাড়ীগুলির বিবিধ পারিভাষিক প্রতিশব্দ আছে। বামগা দক্ষিণগা নাড়ীর স্বাভাবিক নিম্নগা গতি রুদ্ধ করে অবধূতিকা মার্গে ঊর্ধ্বগামী করলেই তাঁদের মতে মহাসুখ বা সহজানন্দ লাভ হয়।

চর্যাগীতিতে যে ধর্মসাধনার ইঙ্গিত আছে তা প্রধানত এই সহজযান বৌদ্ধধর্মের। এই ধর্মসাধনাকে 'সহজ' নামে অভিহিত করার দ্বিবিধ সার্থকতা আছে, প্রথমত এই ধর্মসাধনার সাধ্যও সহজ, দ্বিতীয়ত সাধনপদ্ধতিও সহজ। একদিকে সাধনার মাধ্যমে তাঁরা যা পেতে চান তাও সহজানন্দ, অন্যদিকে তাঁদের সাধনপদ্ধতিও বক্র নয়, সহ-জ (জন্মের সহিত জাত) দেহ। সাধারণভাবে অন্যান্য সাধকেরা যখন দেহের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি রোধ করে ধ্যান, সমাধি, জপতপ-শাস্ত্রপাঠের মাধ্যমে মুক্তির সন্ধান করেন তখন তাঁর সহজ দেহের সহজ প্রবৃত্তিগুলি উপেক্ষা করে বক্রপথে বিচরণ করেন। চর্যাগীতিতে অন্যান্য ধর্মের এই বক্রগামিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রবলভাবে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। চর্যাগীতির প্রথম গানেই লুই ধ্যান-সমাধির ব্যর্থতা ঘোষণা করে বলেছেন

সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই।
সুখদুখেতেঁ নিচিতি মরিঅই॥

৩৪ সংখ্যক গানে দারিকপাদ বলেছেন :

কিন্তো মন্তে কিন্তো তন্তে কিন্তোরে ঝাণবখানে।
অপইঠান মহাসুহলীলে দুলখ পরম নিবাণেঁ॥

মন্ত্রে তন্ত্রে ধ্যানে শাস্ত্র-ব্যাখ্যায় কোন লাভ নেই, মহাসুখ-লীলায় প্রতিষ্ঠিত না হলে দুর্লক্ষ্য পরমনির্বাণ লাভ হয় না।

শুধু ধ্যানসমাধিই নয় আগমবেদ পুথিপাঠেও যে এই সহজকে পাওয়া যায় না, ২৯ সংখ্যক গানে লুইপাদ সেকথা বলেছেন :

জাহের বানচিহ্ন রূব ন জানী।
সো কইসে আগমবেএঁ বখানী॥

যে সহজের বর্ণ চিহ্নরূপ কিছুই জানা যায় না, তার কথা আগমবেদে কি করে ব্যাখ্যাত হয়? ৪০ সংখ্যক গানে কাহ্নপাদও প্রায় সমস্বরে বলেছেন :

জো মণ গোএর আলাজালা।
আগম পোথা টণ্টা মালা॥
ভণ কইসেঁ সহজ বোলবা জাঅ।
কাঅ বাক চিঅ জসু ণ সমাঅ॥

আগম পুথি ইত্যাদি মিথ্যামালা, কারণ যা কিছু মন তথা ইন্দ্রিয়গোচর তাই নিস্ফল, অন্য দিকে সহজানন্দ ইন্দ্রিয়গোচর নয়। কায়-বাক্‌চিত্ত যার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না, সেই সহজ-স্বরূপকে ব্যাখ্যা করা যায় কি ভাবে? এ ব্যাপারে 'জেতই বোলী তেতবি টাল' —যে যত ব্যাখ্যা করবে সে তত ব্যর্থ হবে। এইজন্য চর্যাকারের নির্দেশ :

উজুরে উজু ছাড়ি মা লেহুরে বঙ্ক।
নিয়ড়হি বোহি মা জাহুরে লাঙ্ক॥ ৩২॥

সাধনার পথ হলো ঋজু, ঋজুকে ছেড়ে বাঁকা পথে যেও না, বোধি নিকটেই আছে, লঙ্কায় (দূরে) যেও না, এবং 'জে জে উজুবাটে গেলা অনাবাটা ভইলা সোঙ্গ' (১৫) যাঁরা ঋজু পথে গিয়েছেন তাঁরা কেউ ফেরেন নি অর্থাৎ সহজানন্দ লাভ করেছেন।

চর্যাগীতিতে উল্লিখিত 'সহজ' ও সহজলাভের ঋজুপথ— উভয়ই সাধারণ মানুষের অজ্ঞাত। দুইয়েরই পরিচয় একমাত্র গুরুর কাছে পাওয়া যায় :

নান্যেন কথ্যতে সহজং ন কস্মিন্নভিলপ্যতে।
আত্মনা জ্ঞায়তে পুণ্যাদ্ গুরুপাদোপসেবয়া॥ হেবজ্রতন্ত্র,
পুথি পৃ ২২ (খ)।

কবিও চর্যায় বলেছেন 'গুরু পুচ্ছিঅ জাণ'। গুরুপ্রসাদে কবিরা সহজস্বরূপের যে

পরিচয় পেয়েছেন তা অনেকটা ঔপনিষদিক ব্রহ্মের অনুরূপ। ব্রহ্মের মতই সহজও অনির্বাচ্য, স্ব-স্বরূপ ও স্বসংবেদ্য। সহজানন্দও ব্রহ্মানন্দেরই মত বাহ্যজ্ঞানবর্জিত ও গ্রাহ্য-গ্রাহক-রহিত :

পেখমি দহদিহ সব্বই শূণ।
চিঅ বিহুনে পাপ ণ পুণ্ণ ॥

সহজমগ্ন অবস্থায় সাধকের উপলব্ধি : দশদিক সর্বশূন্য দেখছি, প্রকৃতিদোষে দুষ্ট চিত্ত না থাকায় পাপপুণ্যের কোন ভেদ-বোধ নেই। এ ব্যাপারে ভুসুকুপাদের উপলব্ধি:

দহিঅ পঞ্চ পাটণ ইন্দি বিসআ ণঠা।
ণ জাণমি চিঅ মোর কহিঁ গই পইঠা ॥
সোণ রুঅ মোর কিম্পি ণ থাকিউ ॥
নিঅ পরিবারে মহা নেহে থাকিউ ॥
চউকোড়ি ভণ্ডার মোর লইআ সেস।
জীবন্তে মইলেঁ নাহি বিশেষ ॥(৪৯)

রূপ-বেদনাদি পঞ্চস্কন্ধ ও ইন্দ্রিয়-বিষয়াদি বিনষ্ট হওয়ায় চিত্ত অচিন্তায় লীন হল। সোনা-রূপা অর্থাৎ নির্বাণ-ভবরূপ বিকল্পজ্ঞান-বর্জিত হয়ে মহাসুখে মগ্ন আছি। এই চতুষ্কোটি-বিনির্মুক্ত অবস্থায় জীবনমরণের কোন ভেদ নেই। এই উপলব্ধির সঙ্গে ঔপনিষদিক ব্রহ্মোপলব্ধির কোন মৌলিক প্রভেদ নেই। এই সাধর্ম্য থেকে মনে হয় চর্যাগীতির ধর্মতত্ত্বে তার সাম্প্রদায়িক নিজস্বতা সত্ত্বেও ভারতীয় ধর্মসাধনার বহুযুগাশ্রিত সনাতন ধ্যানধারণাই নতুন রূপ লাভ করেছে ॥

সাধনতত্ত্ব :

চর্যাগীতিতে ধর্মতত্ত্বের চেয়ে ধর্মীয় সাধনপ্রণালীই সমধিক প্রাধান্য লাভ করেছে। এর কারণ, চর্যাকারদের ধর্মচিন্তা বহুলাংশে তন্ত্রপ্রভাবিত। তন্ত্রে ধর্ম সম্পর্কে কোন নতুন তত্ত্ব প্রতিপাদন অপেক্ষা সত্যলাভের কার্যকরী সাধনপদ্ধতির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে তন্ত্রসাধনার অনেক বহিরঙ্গ দিক আছে, চর্যাগীতির সহজ সাধকেরা তন্ত্রের এই বহিরঙ্গ দিকগুলি বাদ দিয়ে মূল সাধনার উপরই গুরুত্ব দিয়েছেন। তন্ত্রের মূল সাধনা কায়সাধনা অর্থাৎ দেহের মধ্যেই পরমসত্যের অবস্থান এবং সাধনায় দেহকে অবলম্বন করলেই এই সত্যের উপলব্ধি ঘটে। সহজিয়া সাধকেরাও তাঁদের ধর্মের মূলতত্ত্বগুলি এই দেহের ভিত্তিতেই প্রতিপাদন করেছেন। তাঁদের ধর্মমতে বোধিচিত্ত বা মহাসুখই হচ্ছে পরম সত্য এবং সাধকের পরম কামনার বিষয়। প্রজ্ঞারূপিণী শূন্যতা ও উপায়রূপিণী করুণাকে সাধনার দ্বারা মিলিত করলেই এই মহাসুখ লাভ হয়। এই মহাসুখ, শূন্যতা ও করুণার তত্ত্বকে সহজিয়া সাধকেরা দেহের বিবিধ ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার

উপর স্থাপন করেছেন এবং এজন্য দেহের মধ্যে তাঁরা চারটি চক্র বা পদ্মের অস্তিত্ব কল্পনা করেছেন। প্রথম চক্র নাভিতে অবস্থিত— নাম 'নির্মাণচক্র', দ্বিতীয় চক্র হৃদয়ে— নাম 'ধর্মচক্র', তৃতীয় চক্র কণ্ঠে— নাম 'সম্ভোগচক্র' এবং চতুর্থ চক্র মস্তকে অবস্থিত— নাম 'সহজচক্র' বা 'মহাসুখচক্র'। এই সহজচক্রই বোধিচিত্তের স্বস্থান। দেহের চক্রাবস্থান ছাড়াও সহজিয়া সাধকেরা দেহের তিনটি প্রধান নাড়ীকে সাধনার সহায় রূপে গ্রহণ করেছেন। যে প্রজ্ঞা ও করুণার মিলনে অদ্বয় সহজানন্দের অনুভব, দেহের নাড়ীতেই তাঁরা সেই প্রজ্ঞা ও করুণার সারূপ্য খুঁজে পেয়েছেন। বাম নাসারন্ধ্র থেকে প্রবাহিত বামগা নাড়ী প্রজ্ঞারূপিণী, এবং দক্ষিণ নাসারন্ধ্র থেকে প্রবাহিত দক্ষিণগা নাড়ী উপায়রূপিণী এবং এই দুই নাড়ীর মাঝখান দিয়ে যে নাড়ী প্রবাহিত সেই মধ্যগা নাড়ী অবধূতী বা অবধূতিকা— এই মধ্যগা নাড়ীপথেই অদ্বয় বোধিচিত্তের সাধনা করতে হয়। সাধারণ ভাবে বামগা ও দক্ষিণগা নাড়ীর গতি নিম্নমুখী, এদের একটি ধারায় সংসারে সৃষ্টি (ভব) ও অপর ধারায় সংসারের সংহার (নির্বাণ)। সাধক কোন বিশেষ একটি ধারার পক্ষপাতী নন। তিনি প্রজ্ঞা বা পরমজ্ঞানের মাধ্যমে জগৎকে শূন্যস্বভাব জেনে নিজের স্বার্থসীমাবদ্ধ সত্তা বিস্মৃত হন এবং বিশ্বজীবের কুশলের জন্য অপার করুণাবোধে আপ্লুত হন ; তাই তাঁর কাছে বামগা ও দক্ষিণগা নাড়ীর স্বাভাবিক ক্রিয়া ও ধারার কোন মূল্য নেই। শূন্যতা ও করুণার মিলনই যখন কাম্য তখন তিনি প্রথমে নাড়ীদ্বয়ের স্বাভাবিক নিম্নগতিকে যোগবলে রুদ্ধ করেন এবং তারপর দুই নাড়ীর ধারাকে মধ্য মার্গে একত্র করে ঊর্ধ্বগামী করেন। মধ্যমার্গে বা অবধূতী নাড়ীতে বাম ও দক্ষিণ নাড়ীর ক্রিয়াধারাকে বিশুদ্ধ ও একত্র করলে নাভিদেশের নির্মাণচক্রে বোধিচিত্ত উৎপন্ন হয় অর্থাৎ সাধকের চিত্তে সর্বভূতের মঙ্গলসাধনের জন্য একটি দৃঢ় চেতনা বা সঙ্কল্প উৎপন্ন হয়। এরপর নির্মাণচক্র থেকে বোধিচিত্তকে ঊর্ধ্বমুখী করে হৃদয়স্থিত ধর্মচক্রে, সেখান থেকে কণ্ঠস্থিত সম্ভোগচক্রে ও শেষে মস্তকস্থিত মহাসুখচক্রে প্রেরণ করলেই ক্রমোন্নতিশীল বোধিচিত্ত তার প্রাথমিক সাংবৃতিক রূপ থেকে পারমার্থিক রূপলাভ করে এবং সাধকের কাছে মহাসুখস্বরূপ বা সহজানন্দরূপে ধরা দেয়। মধ্যমার্গে বোধিচিত্তের ধারাকে ঊর্ধ্বগা করতে শুরু করলেই সাধকের কাছে আনন্দানুভূতি শুরু হয়। বোধিচিত্তের চতুর্বিধ চক্রাবস্থিতি অনুযায়ী এই আনন্দানুভূতির স্তরও চতুর্বিধ। বোধিচিত্ত যখন নাভিস্থিত নির্মাণচক্রে প্রথম উৎপন্ন হয় তখন যে ঊর্ধ্বস্পন্দনাত্মক অনুভূতি হয় তার নাম 'আনন্দ', বোধিচিত্তের ধর্মচক্রে অবস্থানকালীন অনুভূতি 'পরমানন্দ', সম্ভোগচক্রে অবস্থানকালীন অনুভূতি 'বিরমানন্দ' এবং মহাসুখচক্রে অর্থাৎ স্ব-স্বরূপে অবস্থানকালীন অনুভূতি 'সহজানন্দ'। বিরমানন্দের অর্থ পার্থিব সুখভোগের বিরাম এবং সহজানন্দ আত্যন্তিক আনন্দ।

চর্যাকারগণ পূর্বালোচিত সাধনপ্রণালীকে নানা রূপকের আবরণে ব্যক্ত করেছেন। সাধনপ্রণালীর অবলম্বন দেহ কোথাও নগরী (দেহনঅরী), কোথাও মায়াজাল, কোথাও রথ, কোথাও আবার বীণা রূপে পরিকল্পিত হয়েছে। সহজানন্দলাভের প্রধান সাধন এই দেহ বলেই তাঁরা বারংবার ধ্যান-সমাধি-শাস্ত্রপাঠের ব্যর্থতার কথা ঘোষণা করে

বলেছেন 'নিয়ড়হি বোহি মা জাহুরে লাঙ্ক'— বোধি নিকটেই আছে, তাকে পাবার জন্য লঙ্কায় যাবার দরকার নেই। উল্লিখিত চক্রগুলি চর্যায় কতকগুলি পদ্মের রূপকে গৃহীত হয়েছে এবং চক্রস্থিত বোধিচিত্ত যোগিনী, ডোম্বী, চণ্ডালী, শবরী, মাতঙ্গী, নৈরামনি প্রভৃতি নানা রমণীরূপে পরিকল্পিত হয়েছে। এছাড়া নাড়ী-তিনটি কোথাও কোথাও নদীতট-সাঁকো, চন্দ্রসূর্য, নৌকা-দাঁড়, ঘণ্টানূপুরের রূপকে গৃহীত হয়েছে। চর্যার প্রথম গানেই দুই নাড়ীকে একত্র করে সাধকের অদ্বয় মহাসুখে অবস্থানের কথা বলা হয়েছে:

ভণই লুই আমহে ঝাণে দিঠা।
ধমণ চমণ বেণি পিণ্ডি বইঠা॥

পঞ্চম গানটিতেও চাটিলপাদ এই অদ্বয় সাধনপ্রণালীর ইঙ্গিত দিয়েছেন নদী ও সাঁকোর রূপকে :

ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দু আন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী॥
ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই।
পারগামিলোঅ নিভর তরই॥
ফাড়িঅ মোহতরু পাটি জোড়িঅ।
আদঅ দিঢ় টাঙ্গী নিবাণে কোহিঅ॥
সাঙ্কমত চড়িলে দাহিণ বাম মা হোহী॥
নিয়ড্ডী বোহি দূর ম জাহী॥

নদীর দুই পাড়েই কাদা, মাঝখানে থৈ নেই। এই অথৈ মাঝখান দিয়ে যাবার জন্য চাটিল সাঁকো গড়লেন। এই সাঁকোতে দুই পাড়ের মিলন হল। সাঁকো গড়তে মোহরূপ তরুকে অদ্বয়রূপ টাঙ্গি দিয়ে ফেড়ে পাটাতন হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এই সাঁকোয় চড়লে ডান বাম কোন দিকেই ঝুঁকতে নেই। এই নদী-সাঁকোর রূপক সর্বপ্রকার দ্বিত্ববর্জিত মধ্যমার্গের অদ্বয় সহজ-সাধনারই প্রতিরূপ। নদীর দুই তীর দেহের বামগা-দক্ষিণগা দুই ধারা, সাঁকো মধ্যগামী অবধূতী মার্গ।

সরহপাদও অনুরূপভাবে বলেছেন :

বামদাহিণ জো খালবিখলা।
সরহ ভণই বাপা উজুবাট ভইলা॥

বাম ও দক্ষিণে খাল ও বিখাল, মাঝের পথই সহজ পথ।

৭ম গানে কাহ্নপাদ যেখানে বলেছেন 'আলিএঁ কালিএঁ বাটবুন্ধেলা' সেখানে আলি

ও কালি অর্থাৎ বামগা ও দক্ষিণগা নাড়ীকে অবধূতী মার্গে একত্র করে তাদের স্বাভাবিক নিম্নগা ধারাকে রুদ্ধ করার কথাই ব্যক্ত হয়েছে। আবার কাহ্নপাদ যখন বলেছেন :

আলি কালি ঘণ্টা নেউর চরণে।
রবি শশি কুণ্ডল কিউ আভরণে ॥ (১১)

কিংবা বীণাপাদ যখন বলেন :

সুজলাউ সসি লাগেলি তান্তী।
অণাহা দাণ্ডী বাকি কিঅ অবধূতি ॥ (১৭)

তখন দুই নাড়ীর নিঃস্বভাবীকরণ ও মধ্যখানে আনয়নের ভাবই প্রকাশ পায়। প্রথম ক্ষেত্রে আলিকালিকে চরণের নূপুর ও রবিশশীকে কর্ণের কুণ্ডল করার কথা বলা হয়েছে। আলি-কালি, রবিশশী দুই নাড়ীর প্রতিরূপ, এদের আভরণে পরিণত করার অর্থ এদের উপর সাধনার প্রভাব বিস্তার করা অর্থাৎ এদের নিঃস্বভাবীকৃত করা। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে একটি বীণার রূপক—এই বীণায় সূর্য হচ্ছে লাউ, চন্দ্র হচ্ছে তন্ত্রী এবং অবধূতী হচ্ছে মাঝখানকার দণ্ড। এই বীণার সুর শুনে 'গঅবর সমরস সান্ধি গুণিআ'—গজবর (অর্থাৎ বোধচিত্ত) সমরসে প্রবিষ্ট হল। কোনো কোনো গানে দেহকে নৌকার রূপকে গ্রহণ করা হয়েছে। সরহপাদ একটি গানে বলেছেন :

কাঅ ণাবড়ি খাণ্টি মণ কেডুআল।
সদ্‌গুরুবঅণে ধর পতবাল ॥
চীঅ থির করি ধরহু রে নাহী।
অন উপায়েঁ পরাণ জাই ॥ (৩৮)

কায় হল নৌকা, খাঁটি মন দাঁড়, সদগুরুর বচনে হাল ধর। চিত্ত স্থির করে নৌকা ধর—অন্য কোন উপায়ে পারে যাওয়া যায় না। পথে অবশ্য দুই বলবান দস্যু ('বাট অভঅ খাণ্টাবি বলআ') প্রধান প্রতিবন্ধক রূপে বিরাজমান, কিন্তু তাদের বশীভূত করেই অগ্রসর হতে হবে। অগ্রসর হবার পদ্ধতি ও গন্তব্যস্থল সম্পর্কে কবির বক্তব্য :

কুল লই খরে সোন্তে উজাঅ।
সরহ ভণই গঅণেঁ পমাঅ ॥

কুল থেকে খরস্রোতে উজান পথে চল এবং গগনে গিয়ে প্রবেশ কর। সুতরাং গন্তব্যস্থল গগন এবং গতি উজান। নৌকার গতি সাধারণভাবে স্রোতের অনুকূল ভাটির দিকে, কিন্তু তাকে স্বাভাবিক স্রোতের প্রতিকূলে উজান-গামী করতে হবে। অর্থাৎ দেহকে

ঊর্ধ্বগতির সাধনায় চালিত করে গগনে অর্থাৎ বিষয় থেকে শূন্যে, রূপ থেকে স্বরূপের দিকে উপনীত করতে হবে।

কম্বলাম্বরপাদও বলেছেন :

সোনে ভরিলী করুণা নাবী।
রূপা থোই নাহিক ঠাবী ॥(৮)

করুণা-নৌকা সোনায় পূর্ণ, রূপা রাখবার ঠাঁই নেই। অর্থাৎ করুণা ও শূন্যতার মিলন হলে রূপজগতের অস্তিত্ব থাকে না। এই নৌকার গতিও 'গঅণ উবেসে'—গগনের উদ্দেশে অর্থাৎ নিম্নস্থ নির্মাণচক্র থেকে ঊর্ধ্বস্থ মহাসুখচক্রে।

কোনো কোনো গানে মধ্যমার্গে উদ্বোধিত বোধিচিত্তকে চণ্ডালী, যোগিনী, ডোম্বী প্রভৃতি স্পর্শের অযোগ্য নীচকুলোদ্ভবা নারীর রূপকে বর্ণনা করা হয়েছে। এই সহজানন্দগামী বোধিচিত্ত ইন্দ্রিয়াতীত বলেই এই অস্পৃশ্য রমণীর পরিকল্পনা ('অস্পর্শা ভবতি যস্মাৎ তস্মাৎ ডোম্বী প্রকীর্ত্তিতা')। সাধকের যোগাভ্যাসের ফলে অবধূতীমার্গের নির্মাণচক্রে যখন বোধিচিত্তের জাগরণ হয় তখন সেই জাগ্রত বোধিচিত্ত সাধারণত চণ্ডালীরূপে পরিকল্পিত। এরপর ঊর্ধ্বতর স্তরে এই বোধচিত্ত ডোম্বী, সম্ভোগচক্রে নৈরামনি এবং মহাসুখচক্রে সহজসুন্দরী। তবে এই রূপক নামগুলি সর্বত্র খুব নির্দিষ্ট ভাবে ব্যবহৃত হয়নি এবং ডোম্বী, চণ্ডালী ছাড়াও যোগিনী, মাতঙ্গিনী, শবরী প্রভৃতি আরও কতকগুলি রূপকনাম ব্যবহৃত হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্মাণচক্রস্থিত সংবৃতি বোধচিত্ত এবং মহাসুখ চক্রস্থিত পারমার্থিক বোধচিত্ত উভয়কেই ডোম্বী নামে অভিহিত করা হয়েছে। ডোম্বীর এই দ্বিবিধ রূপের বিশদ পরিচয় আছে দশম গানে:

নগর বাহিরেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাহ সো বাহ্ম নাড়িআ ॥
আলো ডোম্বী তোএ সম করিব ম সাঙ্গ।
নিঘিণ কাহ্ন কাপালি জোই লাঙ্গ ॥

এই ডোম্বী পারমার্থিক বোধচিত্ত—সহজানন্দ। নগরের বাইরে এই ডোম্বীর বাস, ব্রাহ্মণেরা একে স্পর্শ করে না, কাপালিক কাহ্ন নির্ঘৃণ হয়ে এর সঙ্গে মিলিত হন। অর্থাৎ সহজানন্দ ইন্দ্রিয়ের অগোচর, একমাত্র কাপালিক (ক-পাল+ষ্ঠিক) অর্থাৎ যিনি 'ক' বা মহাসুখকে পালন করেন তিনিই ঘৃণার সংস্কার ত্যাগ করে এই সহজানন্দের সঙ্গ লাভ করেন। অন্যদিকে :

এক সো পদমা চৌসট্ঠী পাখুড়ী।
তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী ॥

* * *

তান্তি বিকণঅ ডোম্বি অবর না চঙ্গেড়া।
তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়এড়া ॥

এই ডোম্বী নির্মাণচক্রে উদ্বোধিত সাংবৃতিক বোধচিত্ত। এই ডোম্বী অবিদ্যার তাঁত ও বিষয়াসক্তির চাঙ্গাড়ি বিক্রয় করে থাকে, কিন্তু পদকর্তা কাহ্ন নৈরাত্মস্বরূপ অবগত হয়ে সংসার ত্যাগ করায় তাঁর কাছে ডোম্বী এসব বিক্রয় করে না।

সরবর ভাঙ্গীঅ ডোম্বী খাঅ মোলাণ।
মারমি ডোম্বী লেমি পরাণ ॥

অপরিশুদ্ধ সাংবৃতিক রূপে এই ডোম্বী দেহসরোবরের মৃণাল অর্থাৎ সারাংশ আহার করে। যোগী তাই তার প্রাণসংহার করতে চান অর্থাৎ যোগী সাধনার দ্বারা অপরিশুদ্ধ ডোম্বী তথা সাংবৃতিক বোধচিত্তকে পরিশুদ্ধা ডোম্বী তথা পারমার্থিক বোধিচিত্ত বা সহজানন্দরূপে পরিবর্তিত করতে চান।

ধামপাদের একটি গানে (৪৭ সংখ্যক) সাংবৃতিক বোধচিত্তের এই পরিবর্তনের কথা নির্দেশিত হয়েছে :

কমল কুলিশ মাঝেঁ ভইঅ মিঅলী।
সমতাজোএঁ জলিঅ চণ্ডালী ॥
ডাহ ডোম্বি ঘরে লাগেলি আগি।
সসহর লই যিণ্ডহুঁ পাণী ॥
ণউ খরজালা ধূম ন দিশই।
মেরু শিখর লই গঅণ পইসই ॥

কমল ও কুলিশের মধ্যে মিতালি হল, ফলে চণ্ডালী জ্বলে উঠল এবং ডোম্বীর ঘরেও আগুন লাগল। চন্দ্র সেই আগুনে জল সেচন করল। এই আগুনের প্রখর জ্বালা বা ধূম কিছুই দেখা যায় না। মেরুশিখরের উপরে গিয়ে এই আগুন গগনে প্রবেশ করল। কমল সৃষ্ট্যাত্মক উপায়রূপিণী দক্ষিণগা নাড়ী, কুলিশ (বজ্র) শূন্যতাময় প্রজ্ঞারূপিণী বামগা নাড়ী, অবধূতী মার্গে যখনই এরা নিঃস্বভাবীকৃত অবস্থায় মিলিত হল তখনই নির্মাণচক্রে বোধিচিত্ত জ্বলে উঠল অর্থাৎ জাগ্রত হল। আগুন ঊর্ধ্বগামী হয়ে ডোম্বীর ঘরে লাগল অর্থাৎ সমস্ত বিষয়াসক্তি দগ্ধ করে বোধচিত্ত বিভিন্ন চক্রের মধ্য দিয়ে ঊর্ধ্বগামী হল। চন্দ্র অর্থাৎ প্রকৃতি-প্রভাস্বর বোধিচিত্ত এই আগুনে জল সেচন করল। এই আগুন ভাবাভাব দহনকারী অদ্বয়জ্ঞানের বহ্নি, তাই এর জ্বালাও নেই, ধূমও নেই। মেরুশিখর অর্থাৎ মধ্যমার্গে অদ্বয়জ্ঞানের এই বহ্নি গগনে প্রবেশ করল অর্থাৎ বোধচিত্ত ক্রমে মধ্যগামী অবধূতীমার্গে নির্মাণচক্র থেকে মহাসুখচক্রে প্রবেশ করল।

নির্মাণচক্রের বোধিচিত্ত মহাসুখচক্রে পরমার্থিক রূপ লাভ করার আগে কণ্ঠস্থিত সম্ভোগচক্রে বিষয়ভোগ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে সাধকচিত্তে বিরমানন্দ সঞ্চার করে। ঘর-আঙিনার মতো এই বিরমানন্দ ও সহজানন্দ খুবই সন্নিকটবর্তী (আঙ্গণ ঘরপণ সুণ ভো বিআতী-২), তাই সহজানন্দপ্রত্যাশী সাধকের কাছে কণ্ঠলীন বোধচিত্তও খুবই প্রিয়। চর্যাকারের রূপক-কল্পনায় এই কণ্ঠলীন বোধচিত্তের নাম নৈরাত্মা বা নৈরামণি। শবরপাদ একটি গানে বলেছেন যে সাধকের পরম লক্ষ্য সহজ-সুন্দরী, নৈরামনি তার বিচিত্র রূপান্তর। উভয়কে পৃথক করে দেখা যায় না :

উমতো সবরো পাগল শবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহৌরী।
নিঅ ঘরিণী ণামে সহজসুন্দারী ॥
* * *
হিঅ তাঁবোলা মহাসুখে কাপুর খাই।
সুন নিরামণি কণ্ঠে লইআ মহাসুখে রাতি পোহাই ॥ (২৮)

সাংবৃতিক বোধিচিত্ত শেষপর্যন্ত মহাসুখচক্রে পারমার্থিক রূপে পরিণত হলে সাধকের যে চিত্তভাব হয় ভুসুকুপাদের একটি গানে তার সুন্দর অভিব্যক্তি আছে :

দহিঅ পঞ্চ পাটণ ইন্দিবিসআ ণঠা।
ণ জাণমি চিঅ মোর কহিঁ গই পইঠা ॥
সোণ রূঅ মোর কিম্পি ন থাকিউ।
নিঅ পরিবারে মহানেহে থাকিউ ॥
চউকোড়ি ভণ্ডার মোর লইআ সেস।
জীবন্তে মইলেঁ নাহি বিশেষ ॥(৪৯)

আমার পঞ্চপত্তন বা পঞ্চস্কন্ধ দগ্ধ হল, ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ নষ্ট হল। জানি না আমার চিত্ত গিয়ে কোথায় প্রবেশ করল। সোনা রূপা আমার কিছুই রইল না অর্থাৎ ভবনির্বাণরূপ বিকল্পজ্ঞান বিলুপ্ত হয়েছে, এখন আমি নিজ পরিবার অর্থাৎ সর্বশূন্যতায় লীন হয়ে মহাসুখে মগ্ন আছি। চতুষ্কোটি ভাণ্ডার নিঃশেষে লুণ্ঠিত হয়েছে অর্থাৎ সৎ, অসৎ, সদসৎ এবং ন সৎ ন অসৎ এই চতুর্বিধ বিচারের জ্ঞান পরম অদ্বয় জ্ঞানের মধ্যে নিঃশেষিত হয়েছে। এই অবস্থায় আমার জীবনমরণের বিকল্পবোধ অন্তর্হিত হয়েছে। অর্থাৎ গ্রাহ্যত্ব বা গ্রাহকত্ব-রহিত পরিপূর্ণ সহজানন্দ-মগ্নতা।

দর্শনতত্ত্ব :

'চর্যা' নাম থেকেই বোঝা যায় যে এই নামধেয় গানগুলিতে তত্ত্ব অপেক্ষা আচরণের দিকটিই সমধিক প্রাধান্য পেয়েছে। এর কারণ, চর্যাগীতিকারগণ যে গুহ্য ধর্ম-পন্থার

সাধক ছিলেন সেই সাধনার বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও সেই সাধনালব্ধ নিগূঢ় উপলব্ধির প্রকাশই তাঁদের গান রচনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তবে এইসব প্রক্রিয়া ও উপলব্ধিগুলি সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে এগুলির মাধ্যমে ভারতীয় চিন্তাধারার বিশেষ কতকগুলি দার্শনিক অভিপ্রায় ও উপলব্ধিই আত্মপ্রকাশ করেছে। অর্থাৎ দর্শনতত্ত্ব এখানে কেন্দ্রীয় বিষয় না হয়ে পটভূমি হিসাবে বর্তমান। চর্যাগীতির এই দার্শনিক পটভূমি মোটামুটি মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের সমবায়ে গঠিত এবং এইসব মতবাদের মধ্যে নাগার্জুনপাদের শূন্যবাদ বা মাধ্যমিকবাদ এবং মৈত্রেয়-অসঙ্গ-বসুবন্ধুর বিজ্ঞানবাদ বা যোগাচারবাদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই উভয়প্রকার দার্শনিক মতবাদে কিছু কিছু সিদ্ধান্তগত পার্থক্য আছে, কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে দর্শনতত্ত্ব নিছক পটভূমির কাজ করায় এই সব সিদ্ধান্তগত পার্থক্য সর্বত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি, অনেকটা অনতিস্পষ্ট আবেষ্টন হিসাবে কোথাও-বা পৃথকভাবে কোথাও-বা পরস্পর সংলগ্নভাবে বিরাজ করেছে। এমন কি এই তাত্ত্বিক অস্পষ্টতার জন্য চর্যাকারগণ কোথাও কোথাও স্বীয় সাম্প্রদায়িক ধর্ম-দর্শনের সীমা ছাড়িয়ে হিন্দুসম্প্রদায়ের ব্রহ্মবাদী দার্শনিক সিদ্ধান্তকে স্পর্শ করেছেন। চর্যাকারদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর এই সম্প্রসারণশীল শিথিলতার জন্য অবশ্য তাঁদের সমকালীন যুগপ্রভাব অনেকখানি দায়ী। যে সময়ে এই গানগুলি রচিত হয়েছিল বঙ্গীয় ইতিহাসের সেই পালযুগে বাঙালি সমাজে ধর্ম ও সংস্কৃতির দিক থেকে এক ধরনের সহজ সমন্বয়-প্রবণতা দেখা দিয়েছিল, তারই সুযোগে হিন্দু ও বৌদ্ধ দার্শনিক চিন্তাধারাতেও সমন্বয় বা সামঞ্জস্য ঘটেছিল। চর্যাগীতির দর্শনতত্ত্বে এই সামঞ্জস্যের ছাপ মুদ্রিত আছে।

উল্লিখিত সামঞ্জস্যের স্বরূপ অনুধাবন করতে হলে শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদের মূল সূত্রগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করা দরকার। নাগার্জুনের দার্শনিক সিদ্ধান্তের মূলসূত্র হচ্ছে শূন্যতা অর্থাৎ কোন বস্তুরই নিজস্ব স্বরূপ বা ধর্ম নেই। সব কিছুই তার অস্তিত্বের জন্য অন্য কিছুর উপর নির্ভরশীল, এই দ্বিতীয় নির্ভরযোগ্য বস্তু আবার তার নিজের অস্তিত্বের জন্য অন্যের উপর নির্ভরশীল। যে স্বরূপ বা ধর্ম নিজেই অন্যের উপর নির্ভরশীল, তাকে শাশ্বত বা সত্য বলা চলে না, আবার তাকে অসত্যও বলা চলে না, কেননা কোন কিছু অসত্য হলে তার বাহ্য স্বরূপও দেখা যেত না। সুতরাং বস্তুর যা পরমার্থ সত্তা তা সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়, তদুভয়ও নয়, অনুভয়ও নয়, অর্থাৎ তা আছে তাও বলা যায় না, তা নেই তাও বলা যায় না, তা আছেও বটে নেইও বটে তা-ও বলা যায় না, আবার তার অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্ব কোনটাই যে সত্য নয় তা-ও বলা যায় না। এইভাবে চারটি দিক থেকে নাগার্জুন প্রমাণ করলেন যে পরমার্থ সত্য আসলে চতুষ্কোটি-বিনির্মুক্ত এবং স্বভাবশূন্য। নাগার্জুনের এই শূন্যবাদী সিদ্ধান্তে অপর দুটি বৌদ্ধ দার্শনিক মতবাদ—বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক মতবাদের মাঝামাঝি একটি মধ্যম পথ অবলম্বিত হয়েছিল। বৈভাষিকেরা ধর্ম (phenomenon)-কে ভাবস্বভাব বা অস্তিত্বময় মনে করতেন, অন্যদিকে সৌত্রান্ত্রিকদের মতে তা শূন্যস্বভাব বা অলীক। নাগার্জুন পরমার্থ সত্যের পর্যালোচনায়, এই অস্তিত্ব-নাস্তিত্বের কোনটিকেই চূড়ান্তভাবে

গ্রহণ করেন নি, এই দুইয়ের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে একটি মধ্য পথ নির্দেশ করেছেন, এজন্য তাঁর মতবাদের অন্য নাম মাধ্যমিকবাদ। অন্যদিকে বিজ্ঞানবাদীরা বস্তুর স্বভাবশূন্যতা স্বীকার করলেও এই শূন্যতা শূন্যবাদের মতো একেবারে নেতিবাচক নয়। এঁদের মতে ধর্ম বা বস্তুর প্রকৃত কোনো সত্তা না থাকলেও আবভাসিক বা সাংবৃতিক (provisional) অস্তিত্ব আছে। চিত্ত যখন অবিদ্যার প্রভাবে বিক্ষুব্ধ হয় তখনই নানাবিধ অবভাস দেখা দেয়, বহির্বস্তুর উপলব্ধি হয়, দেশকালের বোধ জাগে এবং গ্রাহ্য-গ্রাহক ভাব সঞ্চারিত হয়। এই অবভাস তৈমিরিক বা চক্ষুরোগগ্রস্ত ব্যক্তির দেখা বস্তুসমূহের মতো অলীক (বিজ্ঞপ্তিমাত্রমেবেদমসদর্থাবভাসনাৎ। যদ্‌বৎ তৈমিরিকস্যাসৎ-কেশোণ্ডুকাদিদর্শনম্ ॥) সুতরাং বিজ্ঞানবাদীদের মতে পরিদৃশ্যমান কোন কিছুই পরমার্থ নয়, সমস্তই 'বিজ্ঞান'। এই বিজ্ঞানের পরিণামেই অলীক ত্রিজগতের অবভাস এবং বিজ্ঞানের নিবৃতিতে অর্থাৎ 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতায়' এই অবভাসের বিনাশ। বিজ্ঞানবাদীদের কাছে এই বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাই পরমার্থ সত্য। বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা যোগীর সিদ্ধিলাভের চূড়ান্ত অবস্থা। এই অবস্থার বর্ণনায় বসুবন্ধু বলেছেন :

অচিত্তোঽনুপলম্ভোঽসৌ জ্ঞানং লোকোত্তরং চ তৎ।
আশ্রয়স্য পরাবৃত্তির্দ্বিধা-দৌষ্ঠুল্যহানিতঃ ॥
স এবানাস্রবো ধাতুরচিন্ত্যঃ কুশলো ধ্রুবঃ।
সুখো বিমুক্তিকায়োঽসৌ ধর্মাখ্যোঽয়ং মহামুনেঃ ॥

"অর্থাৎ তখন লোকোত্তর জ্ঞান হয়। তখন চিত্ত থাকে না, উপলম্ভ বা গ্রাহ্যগ্রাহক সম্বন্ধে বিজ্ঞান থাকে না, দুই প্রকারের দৌষ্ঠুল্য বিনষ্ট হওয়ায় আশ্রয়ের পরাবৃত্তি ঘটে। সে লোক হচ্ছে অনাস্রব, অচিন্ত্য, কুশল, ধ্রুব বা অচল, সুখময় এবং বিমুক্তিবিশিষ্ট" (প্রবোধচন্দ্র বাগচী : বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য, পৃঃ ৪৩)। সাধক যোগাচারের দ্বারা এই অবস্থা লাভ করতে পারেন। বিজ্ঞানবাদে তত্ত্বের সঙ্গে সাধন-মার্গের সংযোগ থাকায় এর অপর নাম যোগাচারবাদ। বিজ্ঞানবাদীরা যে ভাবে বস্তুর সাংবৃতিক সত্তা এবং সাংবৃতিক সত্তার অতীতে 'অভূতপরিকল্প' 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা'র কথা চিন্তা করেছেন তার সঙ্গে শঙ্করাচার্যের অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের অনেকখানি সাদৃশ্য আছে। শঙ্করও সত্তাকে প্রাতিভাসিক, ব্যবহারিক ও পারমার্থিক এই তিন ভাগে ভাগ করেছেন। প্রাতিভাসিক ও ব্যবহারিক সত্তার প্রকৃত অস্তিত্ব নেই, অবিদ্যা বা মায়ার প্রভাবে এর সৃষ্টি, মায়ার প্রভাবেই অসার সত্তাকে সার সত্তা বলে মনে হয়। পরমার্থ সত্তার স্বরূপ নির্ণয়ে বৌদ্ধদর্শনের সঙ্গে মত-সাদৃশ্যের জন্যই শঙ্করাচার্য বৈষ্ণবদের কাছে 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ'। এছাড়া বিজ্ঞানবাদী গ্রন্থাদিতে 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা'-র যে বর্ণনা পাওয়া যায় তার সঙ্গে বেদান্ত-বর্ণিত ব্রহ্ম-স্বরূপের বিশেষ কোন পার্থক্য নেই, দুই-ই অনির্বাচ্য, অচিন্তনীয়, ধ্রুব এবং লোকোত্তর। শূন্যবাদীদের নির্বাণ-পরিকল্পনার সঙ্গেও বেদান্তের ব্রহ্মোপলব্ধির বেশ সঙ্গতি আছে। শূন্যবাদ, বিজ্ঞানবাদ ও বেদান্তের মধ্যে চিন্তাগত ঐক্যের অবকাশ আছে বলেই

চর্যাকারদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে একধরনের সহজ সমন্বয়ের প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। তাই চর্যাগীতির দর্শনতত্ত্বকে একেবারে নিঃশেষে বৌদ্ধ বা হিন্দু নামে চিহ্নিত না করে চিত্ত-প্রধান মায়াবাদী (idealistic) বলে অভিহিত করাই সম্ভবত অধিকতর নিরাপদ।

চর্যাগীতির কবিরা বিভিন্ন রূপকের মাধ্যমে অবিদ্যাপ্রভাবিত চিত্তের মায়াবিস্তার ও চিত্ত-নিরোধের প্রয়োজন ও পন্থা নির্দেশ করেছেন। চর্যাগীতির প্রথম গানেই চিত্তের অবিদ্যাপ্রভাবিত চাঞ্চল্যের কথা বলা হয়েছে—'চঞ্চল চীএ পইঠো কাল', অবিদ্যার প্রভাবেই চিত্ত চঞ্চল হয়, চিত্ত চঞ্চল হলেই ক্রমান্বয়ে কালজ্ঞান, দেশজ্ঞান ও বস্তুজ্ঞান সম্ভব হয়—ত্রিজগৎ অলীক হলেও সত্য বলে অবভাস ঘটে। ৭ম চর্যাতেও অনুরূপ তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে :

তে তিনি তে তিনি তিনি হো ভিন্না।
ভণই কাহ্ন ভব পরিচ্ছিন্না॥
জে জে আইলা তে তে গেলা।
অবণাগবণে কাহ্ন বিমণ ভইলা॥

যা কিছু তিন বা বহু বলে পৃথক পৃথক প্রতিভাত হয়, আসলে তা পৃথক্ বা স্বয়ং-সম্পূর্ণ বস্তু নয়, অবিদ্যার প্রভাবেই ভব বা সংসারকে পৃথক্ বা পরিচ্ছিন্ন বলে মনে হয়। ভব বা সংসারের অস্তিত্ব পারমার্থিক নয়, সাংবৃতিক, সেজন্য এখানে কোন কিছুই স্থায়ী নয়, যা আসে তা-ই যায়, সবই নিত্য পরিবর্তনশীল। পরিদৃশ্যমান সমস্ত কিছুই চিত্তের মায়াজাল—'ণিংদ বিহুনে সুইণা জইসো' (১৩) নিদ্রাহীন জাগ্রৎ স্বপ্নের মতো। এই চিত্তজাল ও চিত্তজাল-রচিত বস্তুজালের বন্ধনে আমরা নিজেরাই জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খলে নিজেদের বদ্ধ করি। আসলে জন্মও মিথ্যা, মৃত্যুও মিথ্যা, তত্ত্বজ্ঞানীর কাছে উভয়ের কোন পার্থক্য নেই। যিনি জন্মকেই মিথ্যা বলে জানেন, তাঁর মৃত্যুভয়ও থাকে না। সরহপাদের একটি গানে এই তত্ত্ব সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে :

অপণে রচি রচি ভবনির্বাণা।
মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অপণা॥
অন্তে ণ জাণহুঁ অচিন্ত জোই।
জাম মরণ ভব কইসণ হোই॥
জইসো জাম মরণ বি তইসো।
জীবন্তে মঅলেঁ ণাহি বিশেসো॥ (২২)

চিত্তের দুটিরূপ—একটি অবিদ্যাগ্রস্ত অপরিশুদ্ধ প্রকৃতিদুষ্ট সংবৃতি বোধিচিত্ত, অপরটি বিশুদ্ধ বিজ্ঞানরূপ, প্রজ্ঞালোকদীপ্ত প্রকৃতি-প্রভাস্বর। চর্যার বিভিন্ন গানে বিভিন্ন লৌকিক উপমানের মাধ্যমে চিত্তের এই দুইরূপের তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে। ভুসুকুপাদের একটি

গানে চঞ্চল সংবৃতি বোধিচিত্তকে হরিণ ও প্রকৃতি-প্রভাস্বর চিত্তকে হরিণীর রূপকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে :

কাহেরে ঘিণি মেলি অচ্ছহু কীস।
বেঢ়িল হাক পড়অ চৌদীস ॥
অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।
খনহ ন ছাড়অ ভুসুক অহেরী ॥
তিণ ণ চ্ছুপই হরিণা পিবই ন পাণী।
হরিণা হরিণির নিলঅ ণ জাণী ॥ (৬)

হরিণ চতুর্দিকে ব্যাধবেষ্টিত, তার নিজের মাংসেই সে নিজের শত্রু—চিত্ত সর্বদাই দুঃখবেষ্টিত। চিত্তের অবিদ্যাই চিত্তের এই অবস্থা-বিপর্যয়ের জন্য দায়ী। এই সময়েই হরিণীরূপ প্রকৃতি-প্রভাস্বর চিত্তের আহ্বানে চঞ্চল চিত্ত মুক্তির সন্ধান পায়। ভুসুকুর অপর একটি গানে এই চঞ্চল চিত্ত চঞ্চল মূষিকের সঙ্গে উপমিত :

নিসি অন্ধারী মুসার চারা।
অমিঅ ভখঅ মুসা করঅ আহারা ॥
মাররে জোইআ মুসা পবণা।
জেঁণ তুটঅ অবণাগবণা ॥
* * *
জবেঁ মুসাএর চার তুটঅ।
ভুসুকু ভণঅ তবেঁ বান্ধন ফিটঅ ॥(২১)

চঞ্চল মূষিক চঞ্চল চিত্ত, রাত্রির অন্ধকার অবিদ্যার অন্ধকার। চিত্ত-মূষিককে হত্যা করলেই ভব-সংসারের গতাগতি অর্থাৎ দেশ ও কালজ্ঞান লুপ্ত হয় এবং ভব-বন্ধন ছিন্ন হয়। জয়নন্দীর একটি গানেও চিত্তের এই দুই অবস্থার মনোজ্ঞ বর্ণনা আছে :

পেখু সুঅণে অদশ জইসা।
অন্তরালে মোহ তইসা ॥
মোহ বিমুক্কা জই মণা।
তবেঁ তুটই অবণাগমণা ॥
নৌ দাঢ়ই নৌ তিমই ন চ্ছিজই।
পেখ মোঅ মোহে বলি বলি বাঝই ॥
ছাআ মাআ কাঅ সমাণা।
বেণি পাখেঁ সোই বিণা ॥

চিঅ তথতা স্বভাবে যোহিঅ।
ভণই জঅনন্দি ফুড় অণ ণ হোই ॥ (৪৬)

স্বপ্নে এবং আরশিতে যা দেখা যায় তা যেমন আসলে সত্য নয়, এ জগৎ তেমনি মোহগ্রস্ত মনের সৃষ্টি—অলীক ও মিথ্যা। মন মোহবিমুক্ত হলে ভবচক্র স্থির হয়, সংসার-প্রবাহের আনাগোনা স্তব্ধ হয়। এই মোহমুক্ত মনই প্রকৃতি-প্রভাস্বর বিশুদ্ধ বিজ্ঞান—অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অচ্ছেদ্য। যখন বিজ্ঞানের গ্রাহ্যত্ব ও গ্রাহকত্ব রূপ দ্বৈতভাবে বজায় থাকে তখনই ছায়া-মায়া-কায়ের সৃষ্টি হয়, কিন্তু চিত্ত যখন তথতাস্বভাবে অর্থাৎ অদ্বয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন শুধু প্রকৃতি-প্রভাস্বর বিশুদ্ধ বিজ্ঞানরূপেরই প্রকাশ ঘটে, অন্য কিছু থাকে না।

সংসার-প্রবাহের অন্তরালে যে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানরূপের অস্তিত্ব বিদ্যমান—এই বিজ্ঞানবাদী চিন্তাধারার বিশদ নিদর্শন আছে লুইপাদের একটি গানে :

ভাব ন হোই অভাব ণ জাই।
আইস সংবোহেঁ কো পতিআই ॥
লুই ভণই বঢ় দুলক্খ বিণাণা।
তিঅ ধাএ বিলসই উহ ণাঠাণা ॥
জাহের বান চিহ্ন রূব ন জাণী।
সো কইসে আগমবেএঁ বখাণী ॥
কাহেরে কিষ ভণি মই দিবি পিরিচ্ছা।
উদকচান্দ জিম সাচ ন মিচ্ছা ॥ (২৯)

জলের উপর বিম্বিত চাঁদ যেমন সত্যও নয় মিথ্যাও নয়, ভাব ও অভাব—অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বও তেমনি সত্যও নয় মিথ্যাও নয়। সত্য শুধু দুর্লক্ষ্য বিজ্ঞান। বেদাদিশাস্ত্রগ্রন্থে এর সন্ধান পাওয়া যায় না, এই বিশুদ্ধ বিজ্ঞান সংসারের প্রাতিভাসিক রূপের আড়ালে দুর্লক্ষ্যভাবে বিরাজমান। কিন্তু শুধু বিশুদ্ধ বিজ্ঞানবাদই নয়, চর্যাকারদের কারো কারো কণ্ঠে শূন্যবাদী সুরও প্রতিধ্বনিত হয়েছে :

আইএ অণুঅনা এ জগরে ভাংতিএ সো পড়িহাই।
রাজসাপ দেখি জো চমকিই ষারে কিং তং বোড়ো খাই ॥
অকট জোইআ রে মা কর হথা লোহা।
আইস সহাবেঁ জই জগ বুঝষি তুট ষাযনা তোরা ॥
মরুমরীচিগন্ধনইরী দাপণ বিম্বু জইসা।
বাতাবত্তেঁ সো দিঢ় ভইআ অপেঁ পাথর জইসা ॥
বাংদ্ধিসুআ জিম কেলি করই খেলই বহুবিহ খেড়া।
বালুআতেলেঁ সসরসিংগে আকাশে ফুলিলা ॥

রাউতু ভণই কট ভুসুক ভণই কট সঅলা অইস সহাব।
জই তো মূঢ়া অচ্ছসি ভান্তী পুচ্ছতু সদ্‌গুরু পাব ॥ (৪১)

এই জগৎ আদি থেকেই অনুৎপন্ন বা অলীক, শুধু ভ্রান্তিবশেই জগতের এই রূপ প্রতিভাত হয়। কিন্তু রজ্জুসর্প দেখে যে-লোক বিভ্রান্ত হয় তাকে সত্যিই কি বোড়াসাপে কামড়ায়? জগৎ যখন অলীক তখন সংসারে আসক্ত হওয়া উচিত নয়, সংসারের স্বভাব জানতে পারলেই বাসনার বন্ধন ছিন্ন হয়। মরুমরীচিকা, গন্ধর্বনগরী, দর্পণ-প্রতিবিম্ব, জলস্তম্ভ দর্শনে প্রস্তর-প্রতীতি, বন্ধ্যাপুত্রের ক্রীড়া, বালুনিঃসৃত তেল, শশকের শৃঙ্গ, আকাশ-কুসুম যেমন প্রকৃতপক্ষে অলীক, এই ভব-সংসারও তেমনি মিথ্যা মায়া মাত্র। অর্থাৎ জগৎসংসার অনাদি অবিদ্যাজাত চিত্তবিকল্পের প্রতীতিমাত্র, এই প্রতীতির অন্তরালে কোন প্রকৃত অস্তিত্বের কথাও এখানে অনুচ্চারিত। পরম সত্য সম্বন্ধে এই নীরবতা শূন্যবাদী দর্শনের অন্যতম প্রধান লক্ষণ। এই সর্বাত্মক শূন্যবাদের পাশে আবার এমন গানও পাওয়া যায় যেখানে শূন্যকে শুধু শূন্য হিসাবেই দেখা হয়নি, পূর্ণতারই নামান্তর হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে:

চিঅ সহজে শূণ সংপুন্না।
কান্ধবিয়োএ মা হোহি বিসন্না ॥
ভণ কইসে কাহ্ন নাহি।
ফরই অনুদিনং তৈলোএ পমাই ॥
মূঢ়া দিঠ নাঠ দেখি কাঅর।
ভাগ তরঙ্গ কি সোষই সাঅর ॥
মূঢ়া অচ্ছন্তে লোঅ ণ পেখই।
দুধ মাঝেঁ লড় ণচ্ছন্তেঁ দেখই ॥ (৪২)

স্কন্ধবিয়োগ বা এই স্থূলদেহের অবসানেই সব শেষ হয় না, তার পরেও থাকে আনন্দময় সহজস্বরূপ—এই সহজস্বরূপই শূন্য, এই শূন্যেই ত্রিলোক ব্যাপ্ত। এই সর্বব্যাপী শূন্যস্বরূপ অস্তিত্ব যেন একটি সাগর, আর প্রতিটি ব্যক্তিজীবন তার ঢেউ। ঢেউয়ের উত্থানপতনে যেমন সাগরের অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব সূচিত হয় না, তেমনি স্থূল দেহের বিয়োগেও সেই সর্বব্যাপী শূন্যস্বরূপের কোন পরিবর্তন হয় না। মূঢ় ব্যক্তিই জন্মমৃত্যুতে সংসারের পরিবর্তন লক্ষ্য করে, কিন্তু দুধের মধ্যবর্তী স্নেহ পদার্থ যেমন বিদ্যমান থেকেও অদৃশ্য ওই সর্বব্যাপী আনন্দময় শূন্যস্বরূপও তেমনি বর্তমান থেকেও সাধারণ মানুষের চোখে প্রতিভাত হয় না। প্রজ্ঞাসম্পন্ন সাধকই এই আনন্দময় অস্তিত্ব উপলব্ধি করেন। এই উপলব্ধি বেদান্তের আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মোপলব্ধির সঙ্গে অনায়াসে সমন্বিত হয়েছে। চর্যাগীতির দার্শনিকতা তাই বিশিষ্টভাবে সাম্প্রদায়িক নয়, সাধারণভাবেই সমন্বয়পন্থী।

চর্যাগীতির দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর অপর বৈশিষ্ট্য, এখানে বৌদ্ধতন্ত্রের অন্তর্গত

চতুঃশূন্যের তত্ত্ব নানাভাবে গৃহীত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। নাগার্জুনপাদের নামে প্রচলিত 'পঞ্চক্রম' নামক বৌদ্ধতান্ত্রিক গ্রন্থে এই চতুঃশূন্যের বিস্তৃত আলোচনা আছে। এই চতুঃশূন্য তারই চতুর্বিধ স্তরভেদ। প্রথম স্তর শূন্য বা আলোক—এই স্তরে চিত্ত প্রজ্ঞামুখী হলে চিত্তে অবিশুদ্ধির কারণস্বরূপ শোক-ভয়-ক্ষুধা-তৃষ্ণা প্রভৃতি তেত্রিশ প্রকার প্রকৃতিদোষ জড়িত থাকে। এই শূন্যকে স্ত্রী, বাম, চন্দ্রমণ্ডলবর্তী পদ্ম, স্বরবর্ণরূপেও অভিহিত করা হয়েছে। দ্বিতীয় স্তর অতিশূন্য বা আলোকাভাস, প্রথমস্তর থেকেই এর উদ্ভব। এই স্তরে কাম,সন্তোষ, সুখ, বিস্ময়, ধৈর্য, গর্ব প্রভৃতি চল্লিশটি প্রকৃতিদোষ যুক্ত থাকে ; একে উপায়, দক্ষিণ, সূর্যমণ্ডল, বজ্ররূপেও অভিহিত করা হয়। তৃতীয়স্তর মহাশূন্য বা আলোকোপলব্ধি—প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলনেই এর উৎপত্তি। শূন্যের এই স্তর প্রথম দুইস্তর থেকে পরিনিষ্পন্ন বা বিশুদ্ধতর হলেও এর সঙ্গে বিস্মৃতি, বিভ্রান্তি, আলস্য প্রভৃতি সাতটি প্রকৃতিদোষ জড়িত থাকে। এই সমস্ত প্রকৃতিদোষ শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে দিবারাত্র প্রবাহিত হয়। চতুর্থস্তর সর্বশূন্য—সর্বপ্রকার প্রকৃতিদোষমুক্ত প্রকৃতিভাস্বর বা আত্মস্বরূপেই প্রভাস্বর। শূন্যের এই অবস্থাই আত্যন্তিক ; সর্বশূন্যই পরমবিশুদ্ধ, পরমসত্য, পরমবিজ্ঞান। এই সর্বশূন্য আদিও নয়, অনাদিও নয়, মধ্যও নয়, অমধ্যও নয়, অন্তও নয়, অনন্তও নয়, অস্তি-নাস্তি, পাপ-পুণ্য সব কিছুরই ঊর্ধ্বে।

চর্যাগীতিতে ও তার টীকায় প্রায়ই এই চতুঃশূন্য ও প্রকৃতিদোষের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে। শূন্যের উপলব্ধি ও জরামরণ-জন্মমৃত্যু-সুখদুঃখ-সৃষ্টিকারী বিবিধ প্রকৃতিদোষের উচ্ছেদই চর্যাকারদের প্রধান লক্ষ্য। টেন্টণপাদের একটি গানে এই শূন্য ও প্রকৃতিদোষের তত্ত্ব প্রহেলিকার আবরণে আলোচিত হয়েছে :

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী ॥
* * *
বলদ বিআএল গবিআ বাঁঝে।
পিটা দুহিএ এ তিনা সাঁঝে ॥ (৩৩)

টীকার ব্যাখ্যা অনুযায়ী হাঁড়ির ভাত পূর্বোক্ত প্রকৃতিদোষ, এই প্রকৃতিদোষসমূহ দূরীভূত হলে মহাসুখচক্রে (উচ্চ ডাঙা জায়গায় বা লোকালয়ে) সাধকের বাস হয়, সে সময়ে চন্দ্র-সূর্যরূপ প্রতিবেশীদ্বয় (বা গ্রাহ্যত্ব গ্রাহকত্বরূপ দ্বৈতাভাস) থাকে না। ত্রিবিধ প্রকৃতিদোষযুক্ত চিত্ত (বলদ)-ই প্রসব করে অর্থাৎ জগৎ প্রপঞ্চের জন্ম দেয়, চতুর্থ শূন্য বা সর্বশূন্য (গাভী) বন্ধ্যা অর্থাৎ সেখানে ভববিকল্প সৃষ্টির কোন সম্ভাবনা নেই। যোগী তাই ত্রিসন্ধ্যা এই পীঠ বা ত্রিবিধ প্রকৃতিদোষ দোহন করেন। দারিকপাদও যখন বলেন 'বিলসই দারিক গঅণত পারিম কুলেঁ' (৩৪)—গগনের অপর কূলে দারিক বিলাস করে তখন তিনি গগন অর্থাৎ প্রকৃতিদোষযুক্ত প্রথম ত্রিশূন্যের অতীত চতুর্থ শূন্যরূপ প্রভাস্বর মহাসুখেরই ইঙ্গিত দিয়েছেন। কাহ্নপাদ একটি চর্যায় দাবাখেলার রূপকে এই প্রকৃতিদোষ দূরীকরণের কথা বলেছেন :

ফীটউ দুআ মাদেসিরে ঠাকুর।
উআরি উএসেঁ কাহ্ন ণিঅড় জিনউর ॥
পহিলেঁ তোড়িআ বড়িআ মারিউ।
গঅবরেঁ তোলিআ পাণ্চজনা ঘালিউ ॥(১২)

দুই ধ্বংস হল, ঠাকুর তুমিও মরলে। উপকারিকের (গুরু) উপদেশে কাহ্ন দেখল নিকটেই জিনপুর। প্রথমে তেড়ে বড়েগুলি মারলাম, তারপর গজবর দিয়ে পাঁচজনকে ঘায়েল করলাম। এখানে 'দুই'য়ের অর্থ শূন্য ও অতিশূন্যরূপ প্রকৃতিদোষযুক্ত আভাসদ্বয়। ঠাকুর তৃতীয় মহাশূন্য অবিদ্যাচিত্ত। তিনশূন্য নষ্ট হলে গুরুর উপদেশে নিকটে জিনপুর মহাসুখধাম দেখা দেয়। বড়ে হচ্ছে একশো ষাটটি প্রকৃতিদোষ ('ষষ্ট্যুত্তরশত-প্রকৃতিদোষ"—টীকা), প্রথম তিনটি শূন্যের সঙ্গে যে মোট আশিটি প্রকৃতিদোষ যুক্ত থাকে, দিনরাত্রি-ভেদে তা সংখ্যায় দ্বিগুণ হয়। এই দ্বিগুণীকৃত প্রকৃতিদোষসমূহ বিনষ্ট হলে গজবররূপী চতুর্থ সর্বশূন্য তথতাচিত্ত অবশিষ্ট থাকে, এই তথতাচিত্ত দিয়ে পঞ্চস্কন্ধাত্মক পঞ্চবিষয়ে জাগরুক অহঙ্কারাদি প্রত্যয়সমূহকে আঘাত করলেই সহজস্বরূপের সন্ধান মেলে। শবরপাদের একটি গানে এই তত্ত্বেরই মনোরম অভিব্যক্তি আছে :

গঅণত গঅণত তইলা বাড়ী হেণ্ডে কুরাহী।
কণ্ঠেঁ নৈরামণি বালি জাগন্তে উপাড়ী ॥
* * *
তইলা বাড়ির পাসেঁর জোহা বাড়ি ভাএলা।
ফিটেলি অন্ধারীরে অকাশ ফুলিআ ॥ (৫০)

গগনে গগনে তল্লগ্ন বাড়ি, কুঠারের দ্বারা ছিন্ন করা হল। কণ্ঠে নৈরামণি বালিকাকে নিয়ে (যোগী) জাগেন। তল্লগ্ন বাড়ীর পাশে জ্যোৎস্না বাড়ি—এই বাড়ির উদয়ে অন্ধকার আকাশ-কুসুমের মত দূর হল। এখানে প্রথম গগন শূন্য, দ্বিতীয় গগন অতিশূন্য, তল্লগ্ন বাড়ি তৃতীয় মহাশূন্য। এই তৃতীয় শূন্যের কাছেই জ্যোৎস্নাধাম বা প্রভাস্বর ধাম। প্রথম তিন শূন্যধামকে কুঠার দ্বারা ছিন্ন বা বিনষ্ট করলেই প্রভাস্বর ধামের প্রকাশ এবং অলীক অন্ধকারের বিলয়।

তবে এই শূন্যতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, চর্যাকারেরা সাধারণভাবে মহাযান সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। এই মহাযান বৌদ্ধধর্মে শুধু শূন্যতাই সাধ্য নয়, শূন্যতা ও করুণার মিলনে যে অদ্বয় সত্যের প্রকাশ তারই উপলব্ধি মহাযানী বৌদ্ধ তথা চর্যাকাগণের লক্ষ্য। চর্যাগানে তাই সর্বত্রই শূন্যতার সঙ্গে করুণাকে অভেদে মিলিত করবার প্রস্তাব রয়েছে। কম্বলাম্বরপাদ তাই করুণা-নৌকা সোনা তথা শূন্যতায় পূর্ণ করেছেন। কাহ্নপাদও বলেছেন 'নিঅ দেহ করুণা শূন মেহেলী'(২০) ॥

॥ পরিশিষ্ট ॥

গুরুবাদ :

সাধনার বিষয়ে গুরুর উপরে আত্যন্তিক নির্ভরশীলতাই গুরুবাদের মূল কথা। এই গুরুবাদ বিশেষ কোনো ধর্মসম্প্রদায়ের আচরিত প্রথা নয়, ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত ধর্মসাধনাতেই গুরুবাদ বিশেষ স্থান অধিকার করেছে : "As a matter of fact, this guru-vada may be regarded as the special characteristic, not of any particular sect or line of Indian religion, it is rather the special feture of Indian religion as a whole" [Dr. S. B. Dasgupta : Obscure religious cults, appendix (A) p. 356]। ভারতীয় ধর্মসাধনায় গুরুবাদের এই প্রাধান্যের কারণ, ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনে পরম সত্যকে সাধারণ বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অতীত রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই অবাঙ্‌মনসগোচর পরম সত্যকে বাইরে উপলব্ধি করার উপায় নেই, গভীর অনুধ্যান ও বোধির দ্বারা কোন কোন ভাগ্যবান পুরুষ আপন অন্তরে সেই অতীন্দ্রিয় সত্যের সন্ধান পান। সাধারণ মানুষ আপন সীমাবদ্ধতার জন্য এই সত্যের সন্ধান পায় না, এবং সত্যলাভের উপায়ও যেহেতু বহিরঙ্গমূলক নয় সেইজন্য যিনি সত্যের সন্ধান পেয়েছেন তাঁরই উপদেশ-নির্দেশ গ্রহণ করতে হয়। এইভাবে গুরুবাদের উৎপত্তি। ভারতীয় ধর্মসাধনার প্রাচীন যুগ থেকে আরম্ভ করে মধ্যযুগের বিভিন্ন মরমিয়া-সহজিয়া ধর্মসম্প্রদায়ে গুরুকে বিশেষ মর্যাদার আসনে অভিষিক্ত করা হয়েছে। গুরুবাদী ধর্মসম্প্রদায়ের বিশ্বাস, গুরু অদ্বয় সত্যোপলব্ধির দ্বারা শিষ্যের সঙ্গে একীভূত হন এবং অনুগামী শিষ্যকে সত্যলাভের পথে চালিত করেন। গুরুর প্রতি এই অত্যধিক নির্ভরশীলতার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে গুরু ঈশ্বরেরই প্রতিনিধি বা বিকল্প হিসাবে বিবেচিত হয়েছেন, সেক্ষেত্রে শিষ্য বা ভক্তসম্প্রদায় গুরুকে সেবা করেই ঈশ্বর-সেবার আনন্দ পান।

চর্যাগীতিতেও গুরুবাদের বিশেষ স্বীকৃতি আছে। এই স্বীকৃতির কারণ চর্যাকারগণ যে ধর্মসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত তার সাধ্য ও সাধনপদ্ধতি অত্যন্ত গুহ্যসাধনার বিষয়। যে সহজানন্দ তাঁদের সাধ্য তা সাধকের গূঢ় উপলব্ধির বিষয়, বাইরে থেকে তা কেউ কাউকে দান করতে পারে না, আবার এই সহজানন্দলাভের উপায়ও পূজা-শাস্ত্রপাঠ-জপ-তপ প্রভৃতি বাহ্যানুষ্ঠান-নির্ভর নয়। চর্যাকারদের সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম বহুলাংশেই তান্ত্রিক যোগাচার দ্বারা প্রভাবিত। এই তান্ত্রিক যোগাচারে এমন কতকগুলি দুরূহ শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া আছে যা পূর্ব-অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন কোন ব্যক্তির নির্দেশ ও সহায়তা ছাড়া অভ্যাস করা সম্ভব নয়। কেননা, এই ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার বিচ্যুতিতে শুধু যে সাধ্য-লাভেরই বিঘ্ন ঘটে তা নয়, সাধকের শারীরিক ও মানসিক বিকৃতিরও সম্ভাবনা দেখা দেয়। তাই অন্যান্য তন্ত্রের মত বৌদ্ধতন্ত্রের গ্রন্থাদিতে গুরুকে বিশেষ সম্মান ও অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, যথা,

নান্যেন কথ্যতে সহজং ন কস্মিন্নভিলপ্যতে।
আত্মনা জ্ঞায়তে পুণ্যাদ্ গুরুপাদোপসেবয়া ॥

হেবজ্রতন্ত্র পুথি, পৃঃ ২২ (খ)।

অর্থাৎ পরমসাধ্য 'সহজ' আর কিছুতেই পাওয়া যায় না, গুরুর চরণ-সেবারূপ পুণ্যের দ্বারাই আপনা-আপনি 'সহজ' জ্ঞানলাভ করা যায়। গুরু সম্পর্কে বৌদ্ধতন্ত্রের এই সশ্রদ্ধ মানসিকতা বিভিন্ন চর্যাগীতিতে প্রতিফলিত হয়েছে। পরমসত্য বা সহজানন্দ সম্পর্কে চর্যাকারদের ধারণা এই যে সহজস্বরূপ ইন্দ্রিয়ের অগম্য, শাস্ত্রপাঠে অলভ্য :

জাহের বান চিহ্ন রূব ণ জাণী।
সো কইসে আগমবেএঁ বখাণী ॥

সুতরাং তাঁদের অন্য পন্থা অনুসরণ করতে হয়েছে এবং সেই পন্থা সদ্‌গুরু বা সদ্‌গুরুবচন। প্রথম চর্যাতেই আদি সিদ্ধাচার্য লুইপাদ বলেছেন "দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ। লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ ॥" মহাসুখকে পাবার উপায় গুরুকে জিজ্ঞাসা করে জান। এরপর ৫ম চর্যায় "পুচ্ছতু চাটিল অনুত্তর সামী", ৮ম চর্যায় "বাহতু কামলি সদ্‌গুরু পুচ্ছী", ১২শ চর্যায় "সদগুরু বোহেঁ জিতেল ভববল", ২১শ চর্যায় "তাব সে মুষা উগুল পাগুল।/সদ্‌গুরু বোহেঁ করিহ সো ণিচ্চল ॥" ২৩শ চর্যায় "সদ্‌গুরু বোহেঁ বুঝি রে কাসু কহি ণি", ৩৫ সংখ্যক চর্যায় "এতকাল হাঁউ অচ্ছিলেসু মোহে।/এবেঁ মই বুঝিল সদগুরু বোহেঁ ॥", ৩৮ নং চর্যায় "সদগুরু বঅণে ধর পতবাল", ৩৯ সংখ্যক চর্যায় "গুরুবঅণ বিহারেঁ রে থাকিব তই ঘুঙ কইসেঁ", "৪১নং চর্যায় "জই তো মূঢ়া অচ্ছসি ভান্তী পুচ্ছতু সদগুরু পাব, ৪৫ নং চর্যায় "বাঢ়ই সো তরু সুভাসুভ পাণী।/ছেবই বিদুজন গুরু পরিমাণী।"—সর্বত্রই সাধন-মার্গে গুরুর অপরিহার্যতা বিশেষ ভাবে স্বীকৃত। তবে চর্যাগীতির গুরুবাদের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে গুরুকে 'সহজ' লাভের উপায় হিসাবেই দেখা হয়েছে, উপেয় বা সহজস্বরূপের বিকল্প হিসাবে দেখা হয়নি। কেননা পরম সাধ্য সহজানন্দ প্রত্যেক সাধকের নিজস্ব অনুভূতির বিষয়, প্রত্যেক সাধক নির্দিষ্ট সাধনমার্গে আরূঢ় হয়ে এই অনুভূতি লাভ করেন। এই অনুভূতি তাঁদের মতে 'বাক্‌পথাতীত' বা বাক্যের অগোচর। সুতরাং গুরু তাঁর উপদেশ-বাক্যের দ্বারাই সহজানন্দের উপলব্ধিগত অনুভূতি শিষ্যের মধ্যে সঞ্চার করতে পারেন না। তিনি উপদেশ-বাক্যের দ্বারা শিষ্যকে শুধু ঠিক পথে চালিত করতে পারেন। সুতরাং গুরুর উপদেশ-বাক্য পরম সাধ্য সহজানন্দের স্বরূপ-ব্যাখ্যা নয়, সহজানন্দ-লাভের উপায় নির্দেশ মাত্র। এই সহজানন্দ ভাষণ ও শ্রবণের অতীত—তাই যিনি সদ্‌গুরু তিনি সহজানন্দের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন না, এবং যিনি উপযুক্ত শিষ্য তিনিও সহজ স্বরূপের আত্মগত উপলব্ধির জন্য শাস্ত্রবাণী বা গুরু-বচন শ্রবণ করেন না। এই দিক থেকে

চর্যাগীতিতে গুরু বোবা ও শিষ্য কালা (বধির) রূপে বর্ণিত :

ভণ কইসেঁ সহজ বোলবা জাঅ।
কাঅবাকচিঅ জসু ণ সমাঅ ॥
আলে গুরু উএসই সীস।
বাকপথাতীত কাহিব কীস ॥
জেতই বোলী তেতবি টাল।
গুরু বোব সে সীস কাল ॥
ভণই কাহ্ন জিণরঅণ বি কইসা।
কালেঁ বোব সংবোহিঅ জইসা ॥ (৪০)

কায়বাকচিত্ত যেখানে প্রবেশ করে না, বল, সেই সহজের কথা কি ভাবে বলা যায় ? গুরু বৃথাই শিষ্যকে উপদেশ দেন, বাকপথাতীত সেই 'সহজ' কি ভাবে বলা যায় ? যতই বলা যায় ততই ভুল হয়। গুরু বোবা শিষ্য কালা। কাহ্ন বলে, সেই জিনরত্ন (=সহজ) কেমন ?—কালা বোবাকে বোঝায় যেমন ॥

চতুর্থ অধ্যায়

কবিত্ব-প্রসঙ্গ

জীবনরস :

চর্যাগীতিগুলি মূলত ধর্মীয় সাধনসঙ্গীত, তাই এগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষ জীবনরস সরাসরিভাবে দুর্লভ। জীবন সম্পর্কে যে আবেগ ও অনুভূতির প্রেরণায় কবি কবিতার আধারে জীবন-সংক্রান্ত আত্মোপলব্ধিকে রূপদান করেন, চর্যাগীতিকারগণ এই গানগুলি রচনার সময় সেই ধরনের কোনো কবিত্বপ্রেরণা বোধ করেননি। তাঁদের গান রচনার পেছনে কাজ করেছিল প্রত্যক্ষ জীবনবোধের পরিবর্তে প্রথাসিদ্ধ সাম্প্রদায়িক কর্তব্যবোধ। সেকালে সহজপন্থী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে যে সব বিধিনিষেধ ও নিয়মকানুন প্রচলিত ছিল সেগুলি অদীক্ষিত ব্যক্তিদের কাছে গোপন রেখে নিজেদের মধ্যে পর্যালোচনার জন্য সিদ্ধাচার্যগণ ধর্মীয় তত্ত্ব ও নিয়মকানুনকে রূপকচিত্র ও সাঙ্কেতিক ভাষার মাধ্যমে গীতিরূপ দিয়েছিলেন। সেকালে এই ধরনের সাধনগূঢ় চর্যাগীতি ও বজ্রগীতি[১] রচনার একটা সাধারণ প্রথা সহজপন্থী সাধকদের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। বর্তমান গীতিসংগ্রহ এই ধরনের কতকগুলি আনুষ্ঠানিক ধর্ম-সঙ্গীতের নির্বাচিত সংকলন বিশেষ। একেবারে ধর্মীয় তত্ত্ব ও বিধিনিষেধের প্রথাগত অভিব্যক্তি বলেই এই গানগুলির মধ্যে সাহিত্যলভ্য জীবনরসের সন্ধান অনেকখানি ব্যাহত হতে বাধ্য। তাছাড়া, সাহিত্যে সাধারণত জীবনের যে লৌকিক বহিঃস্তরকে অবলম্বন করে জীবনের সত্য অন্বেষণ করা হয় বাস্তব সংসারের সেই বাহ্যস্তরকে উপেক্ষা করাই ছিল চর্যাকারদের অন্যতম ধর্মীয় লক্ষ্য। তাঁরা ধর্মীয় অনুশাসন অনুসরণ করে জীবন ও জগৎকে বারংবার 'নিংদ বিহুনে সুইনা জইসো', 'দাপণবিম্ব জইসা'—নিদ্রাহীনস্বপ্ন কিংবা দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের মতো অলীক ও অস্তিত্বহীন বলে ঘোষণা করেছেন। যে জীবন সাহিত্যের মুখ্য অবলম্বন সেই জীবনই যাঁদের কাছে অস্তিত্বহীন তাঁদের রচনায় জীবন সম্পর্কে কোন ব্যাপক আগ্রহ বা নিবিড় সত্যবোধ আশা করা নিরর্থক। অবশ্য অধ্যাত্মবোধের প্রেরণায় কবিচিত্তের বৈরাগ্যবোধ

---

১. "চর্যাগীতি উৎসবে ও অবসর বিনোদনে গাওয়া হইত, যেমন বাউল-কর্তা ভজারা করে। বজ্রগীতি গাওয়া হইত গুহ্য যোগকর্মে ও তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে, 'মণ্ডলচক্র'-এ, আনুষ্ঠানিক স্তবগানরূপে" (সুকুমার সেন, চর্যাগীতি পদাবলী, পৃঃ ২৮)

অনেকক্ষেত্রে নিবিড় কাব্যরূপ লাভ করতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে অধ্যাত্মবোধ ও কবির ব্যক্তিগত জীবনানুভূতির মধ্যে সংযোগ ও সমন্বয় প্রয়োজন। চর্যাকারদের যে ইহলোক-বৈরাগ্য তা এক সাধারণ ধর্ম-বিশ্বাসের দ্বারা অনুপ্রেরিত, তার সঙ্গে কবিদের ব্যক্তিগত ও জীবনানুভূতির বিচিত্রতা মিশ্রিত হয় নি। এই জন্যই চর্যাসঙ্গীত ধর্মসঙ্গীত হয়েও অধ্যাত্মকবিতা হয়ে উঠতে পারেনি।

কিন্তু পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত চর্যাসঙ্গীত সম্পর্কে সাহিত্যরসিকের সামগ্রিক দৃষ্টিনিক্ষেপের ফলশ্রুতি মাত্র। সামগ্রিকভাবে বিচার করলে চর্যাগীতের সাহিত্যমূল্য প্রাথমিকভাবেই অস্তিত্বহীন বলে ধরা পড়ে। কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে লক্ষ্য করলে চর্যাসঙ্গীতে জীবনের রূপ সন্ধান একেবারে ব্যর্থ হয় না। কেননা, চর্যাকারদের ধর্মতত্ত্ব ও সেই তত্ত্বের অভিব্যক্তির মধ্যে একটা স্পষ্ট আপাত-বিরোধ আছে। তত্ত্বের দিক থেকে তাঁরা এই জীবন ও জগৎকে নানাভাবে মিথ্যা-মায়া-অস্তিত্বহীন বলে মনে করেছেন, কিন্তু এই জাগতিক অস্তিত্বহীনতার তত্ত্বটিকে অভিব্যক্ত করার জন্য তাঁরা আবার এই তথাকথিত অস্তিত্বহীন জীবন ও জগতের নানা লৌকিক উপকরণকেই উপমান হিসাবে ব্যবহার করেছেন। সুতরাং চর্যাকারগণ তত্ত্বের দিক থেকে জীবনকে অস্বীকার করলেও তত্ত্বের রূপাভিব্যক্তির দিক থেকে জীবনকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। চর্যাকারগণ যেখানেই জীবনকে এই পরোক্ষ স্বীকৃতি জানিয়েছেন, সামগ্রিক বা একটি মৌল সাহিত্যিক অভিপ্রায়ের অনুবর্তী না হলেও, সেখানেই তাঁদের রচনার সাহিত্যমূল্য প্রতিষ্ঠিত। বৈষ্ণব কবিতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সাধারণ অধ্যাত্মবোধের আড়ালে কবিদের ব্যক্তিগত জীবনাবেগের যে প্রশ্নটি উত্থাপন করেছিলেন সেই প্রশ্নটি এখানেও অপ্রাসঙ্গিক নয়। চর্যাগীতের বিভিন্ন রচনায় ডোম-ব্যাধ-জেলে প্রভৃতি জীবন থেকে যে সব উপমান আহরণ করা হয়েছে তাতে হয়ত সুনির্দিষ্ট জীবনবোধের পরিচয় নেই, কিন্তু সংশ্লিষ্ট জীবন সম্পর্কে কবির ব্যক্তিগত অনুভূতির পরিচয় আছে। চর্যাগীতির কবিত্ব-বিচারে এই সব অনুভূতি একেবারে মূল্যহীন নয়।

জীবন সম্পর্কে এই অনুভূতি অবশ্য চর্যাগীতির প্রত্যেকটি গানে সমানভাবে ব্যক্ত নয়। যে সব পদে (যথা ১, ২৯, ৩৫) তত্ত্বকথা নিরাভরণ ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে সেখানে জীবনানুভূতি অপরিস্ফুট, আর যেখানে তত্ত্বকথা নৌযাত্রা, দাবাখেলা, মৃগয়া, মদ চোলাই, গজরাজের মদমত্ততা, চঞ্চল মূষিকের আনাগোনা ইত্যাদি লৌকিক উপমানের সাহায্যে ব্যক্ত করা হয়েছে সেখানে সমাজ ও পরিপার্শ্বের ছবি উজ্জ্বলভাবে ধরা পড়লেও জীবন সম্পর্কে সংরাগ-বিরাগমূলক কোনো অনুভূতি ধরা পড়েনি। তবে চর্যাগীতির এই সংকলনে এমন কতকগুলি গান আছে যেখানে মানব-জীবনের অসঙ্গতিবোধ এবং সুখদুঃখ প্রেমমিলনের বিচিত্র অনুভূতিকে তত্ত্বকথার উপমান হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে, এই সব গান সংখ্যায় বেশী না হলেও জীবনরসের তির্যক অভিব্যক্তিতে সজীব ও সরস। চর্যাকারদের নিজস্ব তত্ত্বপ্রসঙ্গ বাদ দিয়ে শুধু জীবনের দিক থেকে দেখলে চর্যাগানে তাই জীবনের দুটি ভাবকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়—বিষাদ ও শৃঙ্গার। চর্যাকবিদের বিষাদবোধ কোথাও পরিপার্শ্বের চাপ, কোথাও সামাজিক অত্যাচার, কোথাও

বা সাংসারিক অসঙ্গতি থেকে উৎসারিত হয়েছে। ভুসুকুপাদের একটি গানে (৪৯) নির্দয় দস্যু কর্তৃক লুণ্ঠিত ও সর্বস্বান্ত মানুষের রিক্ততার অনুভূতি সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে:

বাজণাব পাড়ী পউঁআ খালেঁ বাহিউ।
অদঅ দঙ্গালে দেশ লুড়িউ॥
আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী।
নিঅ ঘরিণী চণ্ডালেঁ লেলী॥
* * *
সোণ রুঅ মোর কিম্পি ণ থাকিউ।
নিঅ পরিবারে মহানেহে থাকিউ॥
চউকোড়ি ভণ্ডার মোর লইআ সেস।
জীবন্তে মইলেঁ নাহি বিশেষ॥

নির্দয় জলদস্যু দেশ লুণ্ঠন করল, নিজের গৃহিণীকেও চণ্ডালে হরণ করল। আগে আমি নিজ পরিবার নিয়ে মহাসুখে ছিলাম, এখন সোনারূপা কিছুই থাকল না, চার কোটি মূল্যের ভাণ্ডার নিঃশেষে লুণ্ঠিত হয়েছে, এখন মরা-বাঁচায় কোনো তফাত নেই— এই গানের তত্ত্বার্থ যাই হোক সাধারণ ব্যাচার্থে ব্যক্তিচিত্তের যে অসহায় নিঃস্বতার বেদনা ধরা পড়েছে ধর্ম-নিরপেক্ষ সাহিত্যরসিকের কাছে তার মূল্য কম নয়। সামাজিক নিরাপত্তার অভাবের সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক অসঙ্গতিজনিত বিপর্যয়ও কোনো কোনো কবিকে বিস্ময়বিমূঢ় করে তুলেছে :

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
হাঁড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী॥
* * *
বলদ বিআএল গবিআ বাঁঝে।
পিটা দুহিএ এ তিনা সাঁঝে॥
জো সো বুধী সৌ নিবুধী।
জো সো চৌর সৌ দুষাধী॥

লোকালয়ে বাস অথচ প্রতিবেশী নেই, ঘরে অন্ন নেই অথচ অতিথির নিত্য সমাগম। জনবিরল প্রদেশে বাস করলে যে পীড়াদায়ক নির্জনতার সৃষ্টি হয় তার চেয়ে বহুজনের মধ্যে বাস করা সত্ত্বেও পরিপার্শ্বের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের অসামঞ্জস্যজনিত যে আত্মসংবৃত নৈঃসঙ্গ্য তা আরো বেশী বিষাদময়। তত্ত্বকথা প্রকাশ করতে গিয়ে চর্যাকার যে কথা প্রহেলিকাছলে বলেছেন তাতে মানবমনের অনির্বচনীয় বিষাদরহস্য নিত্যকালের ভাষায় ধরা পড়েছে। আর বলদ প্রসূতি, গাভী বন্ধ্যা এবং যে বুদ্ধিমান সেই নির্বোধ, যে

চোর সেই সাধু—এই প্রহেলিকা শুধু তত্ত্বের আধার নয়, সমাজবৈষম্যের দ্বারা বিচলিত মূল্যবোধের চিরকালীন সংকেতচিত্র। সমাজ-ব্যবস্থায় যখন বিপর্যয় দেখা দেয় তখন যে ব্যক্তি সাধারণদৃষ্টিতে বুদ্ধিমান সেই বুদ্ধিহীন প্রমাণিত হয় এবং সনাতন ন্যায়বোধের নিরিখে যেঅসাধু বলে বিবেচ্য মূল্যবোধের বিপর্যয়ে সে-ই সাধু বলে বিঘোষিত। বিপন্ন বিস্ময়ে অসহায় মানুষ তখন সমাজবৈষম্যকে প্রহেলিকার মত বিভ্রান্তিকর মনে করে। এই বিভ্রান্তি ছাড়া নৈরাশ্যের বেদনাও ২০ সংখ্যক চর্যায় পরিত্যক্তা গর্ভিণী নারীর কাতরোক্তিতে ধরা পড়েছে। উক্ত তরুণী মায়ের কাছে নিজের দুঃখ নিবেদন করে বলেছে:

হাঁউ নিরাসী খমণ ভতারি।
মোহোর বিগোআ কহণ ন জাই॥
ফেটলিউ গো· মাএ অন্তউড়ি চাহি।
জা এথু বাহাম সো এথু নাহি॥
পহিল বিআণ মোর বাসনয়ুড়া।
নাড়ি বিআরন্তে সেব বায়ুড়া॥

স্বামী আমার বিবাগী, আমি তাই নিরাশ—আমার দুঃখ অবর্ণনীয়। মাগো, আমি প্রসব করলাম, তাই আঁতুড় খুঁজি। কিন্তু যা খুঁজি তা পাই না। প্রথম প্রসব আমার অনেক বাসনার ধন, নাড়ী কাটা মাত্র সে-ও হাওয়া হল—এ গানের তাত্ত্বিক অর্থ যাই হোক না কেন, স্বামীর উদাসীনতায় ও মাতৃত্বের ব্যর্থতায় নারীকণ্ঠে যে নৈরাশ্যময় বেদনার সুর উচ্চারিত হয়েছে তার তত্ত্বনিরপেক্ষ কাব্যোপযোগিতা কোনক্রমেই অস্বীকার করা চলে না।

সহজপন্থী চর্যাকারদের ধর্মানুষ্ঠানে যৌনাচারমূলক তান্ত্রিকতার বিশেষ প্রভাব ছিল, সম্ভবত এই কারণেই তাঁদের অনেক গানে শৃঙ্গার ভাব বিচিত্র রূপে অভিব্যক্ত হয়েছে। চর্যাকারগণ তত্ত্বের দিক থেকে জীবনের মায়ামমতা প্রভৃতি আসক্তি-বন্ধন অস্বীকার করলেও মহাসুখের প্রতি সাধকচিত্তের আসক্তি ও মহাসুখের সঙ্গে সাধকচিত্তের মিলনকে নরনারীর পারস্পরিক আসক্তি ও যৌনমিলনমূলক শৃঙ্গার-চেষ্টার রূপকে বর্ণনা করেছেন। রূপকের মধ্যে প্রেমানুভূতির যে পরিচয় পাই তা অত্যন্ত তীব্র ও বাসনাদীপ্ত। তত্ত্বের দিক দিয়ে ভিন্নতর অর্থের দ্যোতনা থাকলেও রসের দিক দিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে চর্যাকারদের প্রেমচেতনা বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ে উদ্দীপিত। সামাজিক অনুশাসন বা লোকলজ্জা তাঁদের কুণ্ঠিত বা দ্বিধাগ্রস্ত করে না—প্রেমিকাদের প্রতি তীব্র শারীরিক আকর্ষণ ও নিবিড় শৃঙ্গারবিলাসের মধ্যে সেই আকর্ষণের পরিতৃপ্তিতেই তাঁদের প্রেমচেতনা বিশেষভাবে চরিতার্থ। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে চর্যাকবিদের প্রেমচেতনার স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত বিশিষ্টতা লক্ষ্য করার মত। মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবিতায় যে প্রেমের ছবি আছে তাতে বাস্তবতার স্পর্শ থাকলেও আধ্যাত্মিকতার সংমিশ্রণে তা অনেকাংশে উর্ধ্বায়িত এবং শাস্ত্রীয় প্রথার অনুবর্তনে অনেকখানি আনুষ্ঠানিক। অন্য

দিকে মঙ্গল কাব্যের কাহিনীগুলি বিশেষভাবে প্রেম-নির্ভর নয়, সেখানে বিভিন্ন নরনারীর মধ্যে যে প্রণয়-সম্পর্কের ইঙ্গিত আছে তা প্রধানত দাম্পত্যজীবনের সামাজিক কর্তব্যবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলে প্রেমানুভূতির বিচিত্রতা সেখানে অনুপস্থিত। সেদিক থেকে চর্যাগীতিতে যে প্রেমের ছবি পাই তার তাত্ত্বিক অর্থ যাই হোক না কেন তার স্বাদ-বৈচিত্র্য বিশেষভাবে উপভোগ্য।

তত্ত্বব্যাখ্যায় যে সব কবি প্রেমের রূপক ব্যবহার করেছেন তাঁদের মধ্যে কাহ্নপাদ, গুণ্ডরীপাদ ও শবরপাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাহ্নপাদের গানে কবির প্রেমিকা এক নীচজাতীয়া ডোমরমণী। ডোমরমণী অস্পৃশ্য বলে নগরের বাহিরে তার বাস, উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণেরা তার যৌবনচাঞ্চল্যে বিভ্রান্ত হলেও বর্ণাভিমানবশত তাকে স্পর্শ করতে পারে না। নগরের বাহিরে এই কুটিরবাসী ডোমনী চাঙাড়ী তৈরী করে আর তাঁত বেচে। এই ডোম যুবতীর চালচলন বিশেষ চাতুর্যপূর্ণ :

কইসণি হালো ডোম্বী তোহোরি ভাভরিআলী।
অন্তে কুলিণজন মাঝেঁ কাবালী ॥(১৮)

ডোমনারী কুলীনদের বাহিরে রাখে, আর কাপালিককে (ঘরের) মধ্যে আনে, এই চতুরালীর জন্যই 'কেহো কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই। বিদুজণলোঅ তোরেঁ কণ্ঠ ন মেলই'—কেউ কেউ তাকে মন্দ বলে, কিন্তু কেউ কেউ তাকে কণ্ঠলগ্ন করে রাখে। এই বিচিত্র আচরণময়ী-নিম্নবর্ণীয়া বিত্তহীন রমণী কবির প্রেমিকা—এই প্রেমিকাকে পাবার জন্য তিনি উচ্চবর্ণ-সুলভ ঘৃণার সংস্কার ত্যাগ করেছেন, নটসজ্জা পরিহার করে গলায় হাড়ের মালা পরেছেন এবং ঘরে মা, শাশুড়ী, ননদ ও শালীকে হত্যা করে অর্থাৎ এককথায় নিজের প্রতিষ্ঠিত ঘরসংসার ছেড়ে এই প্রেমিকার জন্য বিবাগী কাপালিক হয়েছেন—প্রেমিকার জন্য প্রেমিকের এতখানি স্বার্থত্যাগ ! কিন্তু প্রেমিক যেমন প্রেমিকার প্রতি বিশ্বস্ত ও একনিষ্ঠ, প্রেমিকা ডোমযুবতী ঠিক তেমন নয়—'ডোংবিত আগলি ণাহি চ্ছিণালী'। প্রেমিক কাহ্ন লক্ষ্য করেন যার জন্য তিনি এত স্বার্থত্যাগ করেছেন সেই রমণী অন্যের নৌকায় যাওয়া-আসা করে। তীব্র সংশয়ে প্রেমিকাকে তাই প্রশ্ন করেন:

হালো ডোম্বী তো পুছমি সদভাবে।
আইসসি জাসি ডোম্বি কাহরি নাবেঁ ॥(১০)

এবং তীব্র ঈর্ষ্যায় পীড়িত হয়ে প্রেমিকাকে বলেন 'মারমি ডোম্বী লেমি পরাণ'। এই ঈর্ষ্যামিশ্র প্রেমের অকপট অভিব্যক্তি প্রাচীন বাংলার সাহিত্যে আর আছে কি না সন্দেহ। আর একটি গানে (১৯) কাহ্ন-কর্তৃক ডোমনী-বিবাহের যে ছবি আছে, তাতে প্রেমিকা-লাভের জন্য প্রেমিকের বিবাহব্যগ্রতা ও বিবাহান্তে নিবিড় আসঙ্গমত্ততার ভাব ধরা পড়েছে :

জঅ জঅ দুংদুহি সাদ উছলিআঁ।
কাহ্ন ডোম্বি বিবাহে চলিআ॥
ডোম্বি বিবাহিআ অহারিউ জাম।
জউতুকে কিঅ আণুতু ধাম॥

এই হল বিবাহের সাড়ম্বর উদ্যোগ, এরপর বিবাহান্তে :

অহিণিসি সুরঅ পসংগে জাঅ।
জোইণিজালে রএণি পোহাঅ॥
ডোম্বীএর সঙ্গে জো জোই রত্তো।
খণহ ণ ছাড়অ সহজ উন্মত্তো॥

'অহর্নিশ সুরত প্রসঙ্গ,' কাপালিক কাহ্ন প্রেমিকা ডোমবধূকে এক মুহূর্তের জন্যও ছাড়ে না।

গুণ্ডরীপাদ তাঁর গানে (৪) কমল (=স্ত্রীলিঙ্গ) ও কুলিশের (=পুংলিঙ্গ) মিলনসূচক যৌনপ্রতীকের সাহায্যে যোগী-যোগিনীর মিলনানন্দের মনোজ্ঞ ছবি এঁকেছেন : 'সাসুঘরে ঘালি কোপ্পা তাল'—শাশুড়ীর ঘরে তালাচাবি পড়ল, যোগিনী কামক্ষিপ্ত, জঘন চেপে সে যোগীকে আলিঙ্গন দেয়। এইভাবে 'কমল' ও 'কুলিশে'র যোগাযোগে বেলা পড়ে এল :

তিঅড্ডা চাপী জোইণি দে অঙ্কবালী।
কমলকুলিশ ঘাণ্টে করহুঁ বিআলী॥

এই নিবিষ্ট মিলনের মুহূর্তে প্রেমিক যোগিকণ্ঠে উচ্চারিত হয় :

যোইণি তঁই বিণু খনহিঁ ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি॥

যোগিনী, তোকে ছেড়ে একমুহূর্তও বাঁচি না, তোর মুখচুম্বন করে কমলমধু পান করি।

গুণ্ডরীপাদের রচনায় যেমন যৌনবোধের তীব্রতা, শবরপাদের রচনায় তেমনি মিলনচেতনার সঙ্গে নিসর্গচেতনার সমন্বয়ে কবির প্রেমানুভূতি নগ্ন যৌনতার ঊর্ধ্বে এক রোমান্টিক ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত হয়েছে। শবরপাদের গানে প্রণয়িনীর ভূমিকায় আছে এক পর্বতবাসিনী শবরকন্যা (২৮)—'মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী', সেই শবরীর পরনে আছে ময়ূরের পালক, গলায় আছে গুঞ্জাফুলের মালা—শবরীর এই বিচিত্র বেশ দেখে শবর শবরীকে নিজের স্ত্রী বলে চিনতে পারে নি, অন্য রমণী মনে করে

তাকে দেখে পাগল হয়ে উঠেছে। তাই শবরী শবরকে তিরস্কার করে বলে :

উমতো সবরো পাগল শবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহোরী।
নিঅ ঘরিণী ণামে সহজ সুন্দরী ॥

উন্মত্ত শবর, পাগল শবর, গোল কোরো না, দোহাই তোমার। (আমি) তোমারই ঘরনী, নাম সহজসুন্দরী। তারপর এক মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে শবর-শবরী মিলিত হয় :

ণাণা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলি ডালী।
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণ কুণ্ডল বজ্রধারী ॥
তিঅ ধাউ খাট পড়িলা সবরো মহাসুহে সেজিছাইলী।
সবরো ভুজঙ্গ ণইরামণি দারী পেম্ম রাতি পোহাইলী ॥
হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই।
সুন নিরামণি কণ্ঠে লইআ মহাসুখে রাতি পোহাই ॥

নানা তরু মুকুলিত, তাদের পুষ্পিত শাখা আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। শবরী নানা অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে এই সুন্দরবনে একাকিনী বিহার করছিল। তিন ধাতুর খাট পেড়ে সেই কাননে বিছানা পাতা হল। কর্পূর-সুবাসিত তাম্বূল খেয়ে প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরের কণ্ঠালিঙ্গন করে মহাসুখে সারা রাত্রি কাটিয়ে দিল। এই ছবিতেও দেহ-মিলনের আভাস আছে, কিন্তু শবর-শবরীর মিলন-শয্যার উপরে পুষ্পিত তরুশাখা ও বিস্তীর্ণ নৈশ আকাশের চন্দ্রাতপ সেই মিলনের উপর সৌন্দর্যের আচ্ছাদন বিস্তার করেছে। এই আচ্ছাদন আসলে নগ্ন যৌনতার উপর সৌন্দর্যপ্রয়াসী প্রেমানুভূতিরই আত্মবিস্তার।

শবরপাদের লেখা ৫০ সংখ্যক গানেও প্রেমানুভূতির সঙ্গে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যচেতনা মিলিত হয়ে শবর-শবরীর মিলনচিত্রকে অপরূপ সৌন্দর্যে মণ্ডিত করেছে। অনেক উঁচুতে অবস্থিত একবাড়িতে শবর-শবরীর মিলনকুঞ্জ, সেই কুঞ্জগৃহের চারপাশে কাপাসফুল ফুটে আছে :

তইলা বাড়ির পাসেঁর জোহ্না বাড়ি ভাএলা।
ফিটেলি অন্ধারীরে অকাশ ফুলিআ ॥
কঙ্গুচিনা পাকেলা রে শবরাশবরি মাতেলা।
অণুদিণ সবরো কিম্পি ন চেবই মহাসুহেঁ ভেলা ॥

সেই কুঞ্জগৃহের পাশে জ্যোৎস্নায় চারদিক ভরে গেছে, অন্ধকার কেটে গিয়ে মনে হচ্ছে যেন আকাশে অজস্র ফুল ফুটেছে। কঙ্গুচিনা শস্য পেকে উঠেছে, সেই পক্ব শস্যের গন্ধে শবর-শবরী মাতাল হয়ে মিলনমত্ত হল। সেই মিলনে বিহ্বল শবর দিনের পর

দিন বিবশ হয়ে রইল। শবর-মিথুনের এই বিবশমিলনে যে যৌনতার আভাস আছে, চারপাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পটভূমিকায় তার নগ্নতার উপর সৌন্দর্যানুভূতির আচ্ছাদন পড়েছে এবং কবির প্রেমানুভূতি এক ধরনের রোমান্টিক স্নিগ্ধতা লাভ করেছে।

তবে চর্যাগানে বিষাদ ও শৃঙ্গার—জীবনের এই দুটি ভাব প্রাধান্য পেলেও তার মাঝে মাঝে তির্যক কটাক্ষ-নির্ভর ব্যঙ্গের ক্ষণিক খরদীপ্তি কোন কোন চর্যায় উপভোগ্য রসবৈচিত্র্য সৃষ্টি রয়েছে। সামাজিক অসঙ্গতিই এই ব্যঙ্গের উৎস। যেমন, কাহ্নপাদের গানে জাতিভেদপ্রথার অন্তঃসারশূন্যতা সম্পর্কে ক্ষুরধার ব্যঙ্গ :

ডোম্বি বিবাহিআ অহারিউ জাম।
জউতুকে কিঅ আণুতু ধাম॥ (১৯)

ডোমনীকে বিয়ে করে জাত গেল, তবে যৌতুক যা পাওয়া গেল তাতেই ধর্মরক্ষা হল। এখানে দেখা যাচ্ছে, জাতিভেদের কঠোর অনুশাসনে ডোমনী বিবাহের অনুপযুক্ত, কিন্তু ভাল যৌতুক পেলে সামাজিক অনুশাসনও শিথিল হতে পারে। শাস্ত্রীয় মূল্যবোধ কাঞ্চনমূল্যের কাছে বশীভূত—এই অসঙ্গতিই পদটিকে রসঘন করে তুলেছে। অন্য দিকে ১০ সংখ্যক গানে

নগর বাহিরেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাহ সো বাহ্ম নাড়িআ॥

এখানে জাত-পাতের কঠোর অনুশাসনের আড়ালে ব্যভিচারের গোপন প্রশ্রয়। বর্ণাশ্রমের নিরিখে ডোমনী অস্পৃশ্য ও অন্ত্যজ শ্রেণীভুক্ত, তাই নগরের মধ্যে তার বসবাসের অধিকার নেই, সকলের স্পর্শ বাঁচিয়ে সে নগরের বাইরে কুঁড়েঘরে বাস করে, কিন্তু পরিস্থিতির এমনই পরিহাস যে, জাতিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বংশের দুলালরা তার গোপন স্পর্শ লাভের জন্য কাঙাল, ডোমনী তাদের গোপনে সঙ্গদান করে। এই পদের মধ্যে কাহ্নপাদ ব্রাহ্মণ্যশাসিত জাতিভেদ-প্রথার অন্তঃসারশূন্যতাকেই তীব্র ব্যঙ্গে বিদ্ধ করেছেন।

একই রকম সামাজিক ভ্রষ্টাচার ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ হয়েছে কুক্কুরীপাদের গানে :

দিবসই বহুড়ী কাউই ডরে ভাঅ।
রাতি ভইলেঁ কামরু জাঅ॥(২)

অন্তঃপুরিকা গৃহবধূ সামাজিক অনুশাসনের ভয়ে এতই কাতর যে দিনের বেলায় বাড়ির বাইরে যাওয়া দূরে থাক, বাইরে থেকে ভেসে আসা কাকের ডাক শুনলেও ভয় পায়, কারণ ঐ ডাক বহিরাগত। কাকের ডাক শুনে তার সন্ত্রস্ততা কুলধর্মের প্রতি তার আনুগত্যকেই প্রকাশ করে, কিন্তু এই সন্ত্রস্ততা আসলে কৃত্রিম ও লোকদেখানো। কারণ দিনের বেলায়

বহিরাগত কাকের ডাকে যে-বধূ সন্ত্রস্ত হয় সেই বধূই রাত্রিতে শ্বশুর ঘুমিয়ে পড়লে প্রেমিকের অভিসারে গোপনে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে পড়ে। কুলধর্ম এতটাই মজবুত!

শুধু ব্যক্তিগত ভ্রষ্টাচারই নয়, সামাজিক মূল্যবোধের বিপর্যয়ের মধ্যেও যে দুঃসহ অসঙ্গতি নিহিত আছে তা-ও চর্যার কবিকে আহত করেছে। আহত কবি টেণ্টনপাদ বলে ওঠেন :

জো সো বুধী সৌ নিবুধী।
জো যো চৌর সৌ দুযাধী॥ (৩৩)

যার শুভ বুদ্ধি আছে, সে আসলে বোকা। যে আসলে চোর, সেই দারোগা। মূল্যবোধ বিপর্যস্ত হলে সমাজে এমন অঘটনই সত্য হয়ে দাঁড়ায়। টেণ্টনপাদের এই উক্তির তাত্ত্বিক অর্থ যা-ই হোক, বাচ্যার্থে এই পদ বেদনাতুর ব্যঙ্গের গাঢ়তায় সমাহিত। স্বাদের দিক থেকে এইপদ একালের এক কবির সুপরিচিত পঙ্‌ক্তিচয়ের সমতুল্য :

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা,
যাদের হৃদয়ে কোন প্রেম নেই প্রীতি নেই করুণার আলোক নেই,
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।

কাব্যরূপ :

'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ে'র পুথিটি প্রকাশের সময় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাগুলি সম্পর্কে বলেছিলেন "গানগুলি বৈষ্ণবদের কীর্তনের মত, গানের নাম চর্যাপদ' (মুখবন্ধ,বৌদ্ধগান ও দোঁহা, পৃ. ৪)। এছাড়া অন্য প্রসঙ্গেও তিনি এই গানগুলিকে 'বৌদ্ধকীর্তন' বা 'বৌদ্ধ সঙ্কীর্তন' নামে অভিহিত করেছেন। বৈষ্ণব কীর্তনকে বৈষ্ণব পদ বা পদাবলী নামে অভিহিত করার যে ঐতিহ্য আছে সম্ভবত সেই ঐতিহ্য অনুসরণ করেই শাস্ত্রী মহাশয় চর্যাগুলিকে চর্যাপদ নামে অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু গানগুলির অভিধাসম্পর্কে শাস্ত্রী মহাশয়ের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার অপেক্ষা রাখে। কেননা, গানগুলিকে ঠিক কীর্তন বলা যায় কি না সে বিষয়ে সঙ্গীতশাস্ত্রীদের মধ্যে সংশয় আছে (দ্রঃ রাজ্যেশ্বর মিত্র, বাঙ্গলার সঙ্গীত পৃঃ ৪১, ৫০-৫১)। দ্বিতীয়ত, চর্যাগুলিকে পদ বলা কতখানি সঙ্গত তাও বিশেষ বিবেচনার বিষয়। গানগুলি কীর্তন কিনা তার বিচার বিশেষভাবে সাঙ্গীতিক, সুতরাং এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু গানগুলি পদ কি না তার বিচার গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এর উপরই গানগুলির সাহিত্যিক গঠন-প্রকৃতি অনেকখানি নির্ভরশীল।

চর্যাগুলির গেয় প্রকৃতি, আধ্যাত্মিক ভাবগূঢ়তা, আকার-সংক্ষেপ ও ভণিতার দৃষ্টান্তেই সম্ভবত শাস্ত্রীমহাশয় বৈষ্ণবপদের সঙ্গে এই গানগুলির বাহ্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছিলেন এবং গানগুলির 'চর্যা' নামের সঙ্গে 'পদ' কথাটি যোগ করেছিলেন। সঙ্গীত শাস্ত্রে অবশ্য

পূর্ণাঙ্গ গীত অর্থে 'পদ' শব্দের প্রয়োগ-দৃষ্টান্ত আছে, কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে চর্যাগুলিকে 'পদ' নামে অভিহিত করার কিছু ঐতিহাসিক বাধা আছে। শাস্ত্রী যে বৈষ্ণব কীর্তনের ঐতিহ্য অনুসরণে চর্যাকে পদ বলে অভিহিত করেছিলেন সেই ঐতিহ্য সময়ের দিক থেকে চর্যা বা তার টীকার রচনাকালের পরবর্তী। কেননা, চর্যার টীকাতেই দেখা যায় যে সে সময়ে 'পদ' কথাটি পুরো গানের অর্থে প্রযুক্ত হত না। পদ বলতে তখন গানের এক এক জোড়া পঙক্তি (couplet)-কে বোঝাত। টীকায় তাই প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় 'পদ' বলতে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় চরণযুগ্মক (couplet)-কেই বোঝানো হয়েছে এবং অন্যগানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে গিয়ে টীকাকার 'চর্যান্তরং' (১৭, ৩২ সংখ্যক গানের টীকা দ্রষ্টব্য) বলেছেন, 'পদান্তরং' বলেননি। 'পদ' ও গানের মধ্যে এই সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকার জন্যই চর্যাকারেরাও পূর্ণাঙ্গ গানের সম্পর্কে কোথাও 'চর্যা' (২) কোথাও 'গীত' (৩৩), কোথাও বা গানের ধরন অনুযায়ী নাম 'কামচণ্ডালী' (১৮) ব্যবহার করেছেন। তিব্বতী অনুবাদের মাধ্যমে যে সব লুপ্ত গীতাত্মক বৌদ্ধরচনার নাম পাওয়া যায় সেখানেও 'গীতি' বা 'গীতিকা' নাম উল্লিখিত হয়েছে, 'পদ' কথাটি ব্যবহৃত হয়নি। সুতরাং চর্যাগুলিকে পরবর্তীকালের বৈষ্ণব ঐতিহ্য অনুসরণে 'পদ' নামে অভিহিত করলে এক ধরনের কালবিরোধ-দোষ (anachronism) ঘটে। তাই চর্যাকার ও টীকাকারদের নিজস্ব অভিপ্রায় অনুযায়ী গানগুলিকে 'চর্যা' বা 'চর্যাগীতি' নামে অভিহিত করাই সঙ্গত।

প্রকৃতপক্ষে এক একটি চর্যা কতকগুলি 'পদ' বা চরণযুগ্মকের সমন্বয়ে গঠিত। এক একটি চর্যায় মোট কতগুলি পদ থাকবে বা চর্যাটি আকারে কত দীর্ঘ হবে সে ব্যাপারে সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের মতো কোন অমোঘ মানদণ্ড নির্দিষ্ট না থাকলেও চর্যার কাঠামো সম্পর্কে একটা মোটামুটি আদর্শ যে সেকালে প্রচলিত ছিল তা চর্যাগীতির রচনাকালের প্রায় সমসাময়িক কতকগুলি সাঙ্গীতিক গ্রন্থে জানা যায়। ঐ সময়পরিধির মধ্যে সঙ্কলিত 'মানসোল্লাস' (১১২৯ খ্রীষ্টাব্দ) নামক এক কোষগ্রন্থ এবং 'সঙ্গীতরত্নাকর' (১২১০-৪৭) নামক সঙ্গীত শাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে বোঝা যায় যে দশম শতাব্দী বা তারও কিছু আগে থেকে 'চর্যা' নামধেয় একধরনের আধ্যাত্মিক সঙ্গীত পূর্ব ভারতে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল এবং ক্রমে এই গান দক্ষিণ ভারতেও প্রচলিত হয়। সাঙ্গীতিক কাঠামোর দিক থেকে এই জাতীয় গানের স্বাতন্ত্র্য থাকায় এই গানগুলির পারিভাষিক নাম ছিল "প্রবন্ধ"। 'সঙ্গীতরত্নাকর' ও অন্যান্য সঙ্গীত শাস্ত্রগ্রন্থে চর্যাগীতির সাঙ্গীতিক গঠনরীতি সম্পর্কে বিশদ শাস্ত্রীয় (technical) আলোচনা আছে। এই সব আলোচনা থেকে চর্যার আকার-গত কাঠামো সম্পর্কে কিছু আভাস পাওয়া যায়। সঙ্গীতরত্নাকরে চর্যার লক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে :

পদ্ধড়ীপ্রভৃতিচ্ছন্দাঃ পাদান্তপ্রাসশোভিতাঃ।
অধ্যাত্মগোচরা চর্যা স্যাদ্ দ্বিতীয়াদিতালতঃ॥

"প্রতিপাদের শেষে অনুপ্রাসযুক্ত, পদ্ধড়ী প্রভৃতি ছন্দে রচিত, আধ্যাত্মিক বিষয়ীকৃত, দ্বিতীয় প্রভৃতি তালযুক্ত যে গীতি তাকে চর্যা বলা হয়" (বাংলার সঙ্গীত পৃঃ ৪৫)।

অন্যদিকে 'মানসোল্লাসে'ও 'চর্যাপ্রবন্ধে'র নমুনা হিসাবে চার লাইনের একটি বাংলাগান উদ্ধৃত করে সংকলনকর্তা চর্যার লক্ষণ সম্পর্কে বলেছেন :

অর্থশ্চাধ্যাত্মিকঃ প্রাসঃ পাদদ্বিতয়শোভনঃ।
উত্তরার্ধে ভবেদেবং চর্যা সা তু নিগদ্যতে ॥ (১৬. ৪. ৫৭)

"অর্থ অধ্যাত্মবিষয়ক, মিল আছে, দুই তিন জোড়া ছত্র। দ্বিতীয় অংশেও এমনি। তাহাকে বলে চর্যা" (সুকুমার সেন, চর্যাগীতি পদাবলী. পৃঃ ১৫৫)। সঙ্গীতরত্নাকর ও মানসোল্লাস— এই দুটি প্রাচীন ও চর্যাসমসাময়িক গ্রন্থে চর্যার লক্ষণ সম্পর্কে প্রায় একই ধরনের নির্দেশ থেকে বোঝা যায় যে চর্যার বিষয়বস্তু ও গঠনভঙ্গী সম্পর্কে একটা আদর্শ তখন দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। মানসোল্লাসে চর্যার পদসংখ্যা সম্পর্কে বলা হয়েছে, "পাদদ্বিতয়শোভনঃ" —দুই তিন জোড়া ছত্র, এবং উক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত চর্যাটির চার লাইনের অর্থাৎ দুটি পদের সমন্বয়ে গঠিত। এ থেকে অনুমান করা চলে যে গোড়ার দিকে চর্যাগুলি ছড়ার মত দুই লাইনে, চার লাইনে বা ধ্রুবপদসমেত ছয় লাইনে রচিত হত। এই অনুমান সত্য হলে, প্রাচীনতর কালে অন্ত্যানুপ্রাস ও ছন্দোবৈচিত্র্য-সমন্বিত দুই বা চার ছত্রে রচিত যে সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপভ্রংশ লৌকিক কবিতার ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছিল তার সঙ্গে এই অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত ছন্দোবদ্ধ গীতি-কবিতাগুলির কাব্যরূপগত সম্পর্ক সন্ধান করা চলে। এই ধরনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতিকবিতা রচনার রীতি প্রাচীন কাল থেকেই লোক-ব্যবহারে প্রচলিত ছিল এবং এর প্রাচীনতর লিখিত নিদর্শন মেলে কালিদাসের বিক্রমোর্বশীয় নাটকের চতুর্থ অঙ্কের কতকগুলি ক্ষুদ্র অপভ্রংশ গানে। ক্রমে লৌকিক ভাষায় এই ধরনের ছোট গান রচনার রীতি প্রায় সমস্ত আর্যাবর্তেই ছড়িয়ে পড়ে। জৈন-বৌদ্ধ-শৈব প্রভৃতি যে সব সাধক-সম্প্রদায়ের ধর্মচর্চার মূল অবলম্বন ছিল সংস্কৃতজ্ঞানহীন, অনভিজাত সাধারণ জনসমাজ, সেইসব সম্প্রদায়ের সাধকদের কাছে লৌকিক ভাষায় এই ধরনের ছোট ছোট গান রচনার রীতি ধর্মপ্রচার ও চর্চার দিক থেকে বিশেষ অনুকূল মনে হয়েছিল। তাই এই সব সাধক লৌকিক ভাষা হিসাবে অবহট্‌ঠ এবং অন্যান্য নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় ছড়া, গান ও অন্যান্য ধর্মবিষয়ক রচনা প্রণয়ন করেছিলেন। আমাদের আলোচ্য চর্যাগানগুলিরও সৃষ্টি এই ভাবে। তাই মনে হয় এই ধরনের ছোট গান রচনার প্রাথমিক রীতি অনুযায়ী প্রথমে দুই, চার বা ছয় লাইনে এক একটি চর্যা রচিত হত, এবং কখনো কখনো দুটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চর্যা মিলিয়ে একটি দীর্ঘতর চর্যাযুগ্মক গঠিত হত। এই ভাবে চর্যার চরণসংখ্যা বৃদ্ধি পেল এবং আকারও দীর্ঘতর হল, এবং শেষ পর্যন্ত এই বর্ধিত ও সম্প্রসারিত আকারই চর্যার কাব্যরূপাদর্শ হয়ে দাঁড়াল। চর্যার পুথিতে মোট যে ৪৬টি পূর্ণাঙ্গ গান আছে সেগুলির মধ্যে তিনটি (১০, ২৮, ৫০) চোদ্দ লাইনের, দুটি (২১,২২) বারো লাইনের, একটি (৪৩) আট লাইনের এবং বাকী সব কয়টি দশ লাইনের। চরণসংখ্যার এই বৈষম্য থেকেই বোঝা যায় যে চর্যার শিল্পরূপের সার্থকতা সনেটের মত চরণসংখ্যার

নির্দিষ্টতার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করত না। অর্থাৎ আকারের হ্রস্বতার দিকে তার লক্ষ্য থাকলেও চরণসংখ্যার ব্যাপারে কোনো অলঙ্ঘনীয় নিয়ম ছিল না। তবে পুথিতে দশ লাইনের চর্যার সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখে মনে হয় দশ লাইনই ছিল চর্যার সাধারণ মান। এই দশ লাইনের আদর্শ সম্ভবত চার বা ছয় লাইনের দুটি পৃথক চর্যার মিলিত চর্যাযুগ্মকের কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত। চর্যার ভণিতা ব্যবহার ও নামোল্লেখরীতি লক্ষ্য করলেই ব্যাপারটি পরিস্ফুট হয়। চর্যার কতকগুলি গানে (যথা ১, ২৬, ২৯) একাধিকবার ভণিতা আছে— ১ ও ২৯ সংখ্যক চর্যায় একবার দ্বিতীয় পদে আর একবার পঞ্চম পদে এবং ২৬ সংখ্যক গানে তদতিরিক্ত চতুর্থ পদে, কতকগুলি গানে (৬, ৭, ১২, ৩০, ৪২) পঞ্চম পদে ভণিতা আছে এবং দ্বিতীয় পদে কবিনাম আছে কিন্তু ভণিতা হিসাবে নয়, কতকগুলি গানে শেষ পদে ভণিতা আছে, কিন্তু দ্বিতীয় পদে কবিনাম নেই। এছাড়া কতকগুলি গানে ভণিতাও নেই, নির্দিষ্টভাবে কবিনামও নেই, গানের মধ্যে বীণা (১৭), শবর শবরী (২৮, ৫০), চাটিল (৫), কামলি (৮), ডোম্বী (১৪) প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ আছে। সম্ভবত এই সব উল্লেখের ইঙ্গিত গ্রহণ করেই টীকাকার সংশ্লিষ্ট গানগুলির কবিনাম নির্দেশ করেছেন। এই চার শ্রেণীর গানের মধ্যে যে সব গানে দুবার ভণিতা আছে সেগুলি সম্ভবত দুটি হ্রস্ব চর্যার মিলনে গঠিত দীর্ঘতর চর্যাযুগ্মক, সংশ্লিষ্ট চর্যাগুলির ভাবানুক্রম বিশ্লেষণ করলেই বিষয়টি পরিস্ফুট হয়। যেমন, পুথির প্রথম চর্যাটির কথা ধরা যাক : এই চর্যায় একবার দ্বিতীয় পদে আর একবার পঞ্চমপদে যথাক্রমে 'লুই ভণই' ও 'ভণই লুই' ভণিতা আছে— এ থেকে মনে হয় এই চর্যার প্রথম চার লাইন একটি হ্রস্ব চর্যা। শেষ ছয় লাইন আর একটি পৃথক চর্যা, দুয়ের মিলনে একটি সাধারণ মাপের অর্থাৎ দশ লাইনের চর্যাযুগ্মক গঠিত হয়েছে। ভাবের দিক থেকে দেখা যায় যে, প্রথম চার লাইনে বৃক্ষের রূপক বিস্তৃত করা হয়েছে, কিন্তু শেষ ছয় লাইনে যে যোগসাধনার কথা বলা হয়েছে, তা একেবারে নিরলঙ্কার এবং তার সঙ্গে প্রথম চার লাইনের 'কাআ-তরুবর" রূপকের কোন সম্পর্ক নেই। অনুরূপভাবে ২৯ সংখ্যক চর্যা সম্পর্কেও একই সিদ্ধান্ত করা চলে : এখানেও দ্বিতীয় পদে ও পঞ্চমপদে দুবার 'লুই-ভণই' ভণিতা আছে। এই চর্যায় যে তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে তা প্রথম চার লাইনেই স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত হয়েছে, তত্ত্বের দিক থেকে শেষ ছয় লাইন আসলে প্রথম চার লাইনের পরিপূরক মাত্র। ২৬ সংখ্যক চর্যার দ্বিতীয় ও চতুর্থ পদে যথাক্রমে 'সান্তি ভণই' ও 'শান্তি ভণই' এবং পঞ্চম পদে 'বোলথি সান্তি' ভণিতা পাওয়া যায়, এটিও সম্ভবত তিনটি ক্ষুদ্রতর চর্যার সমষ্টি, সম্ভাব্য পঙ্‌ক্তিক্রম এইরকম : (১—৪) + (৫—৮) + (৯—১০)। অন্যান্য চর্যাকারদের মধ্যে যাঁরা লৌকিক বিষয়কে তত্ত্বের উপমান হিসাবে ব্যবহার করেছেন, তাঁরা অল্পবিস্তর অস্ফুটতা ও অসংলগ্নতা সত্ত্বেও রূপক-ব্যবহারের মধ্যে মোটামুটি একটা ঐক্যপ্রবাহ রক্ষা করেছেন। বর্তমান চর্যায় (২৬) তূলাধোনার রূপক গৃহীত হয়েছে, এই রূপক প্রথম চার লাইনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু পরবর্তী চার লাইনে (৫—৮) এই রূপকের ঐক্য রক্ষিত হয়নি, ৫ম লাইনে তূলাধোনার কথা আছে কিন্তু ষষ্ঠ লাইনে এই উপমান-সূত্র ছিন্ন হয়েছে

এবং ৭ম-৮ম লাইনে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি উপমান (বাট = পথ) গৃহীত হয়েছে—এথেকে মনে হয়, এই চার লাইন একটি পৃথক চর্যা, এর প্রথম পঙ্‌ক্তির তূলাধোনা-প্রসঙ্গের সূত্র ধরে প্রথম চার লাইনের সঙ্গে একে যুক্ত করা হয়েছে। নবম দশম পঙ্‌ক্তি যে প্রথম আট লাইন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এ অনুমানের দুটি দৃঢ় ভিত্তি আছে, প্রথমত এই দুই লাইনের ভাব খুবই অস্ফুট এবং এর সঙ্গে পূর্ববর্তী ভাব বা ভাবসমুচ্চয়ের কোন প্রকার সঙ্গতি নেই, দ্বিতীয়ত প্রথম আট লাইনের ভণিতা-দুটিতে সাধারণ ক্রিয়াপদ 'ভণই' আছে, কিন্তু দশম পঙ্‌ক্তির ভণিতায় সম্ভ্রমাত্মক ক্রিয়াপদ 'বোলথি' আছে। শেষ পদের সম্ভ্রমাত্মক ক্রিয়াপদ দেখে মনে হয় শান্তিপাদের কোন অজ্ঞাতনামা শিষ্য এই ক্ষুদ্র চর্যাপদটি রচনা করে গুরুর নামে ভণিতা দিয়েছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য, শান্তি ভণিতাযুক্ত ১৫ সংখ্যক গানটিতেও ভণিতায় সম্ভ্রমাত্মক ক্রিয়াপদ 'বুলথেউ' আছে। মনে হয় এই চর্যাটিও শান্তিপাদের কোন শিষ্যরচিত। হয়ত ২৬ সংখ্যক চর্যার শেষ পদ ও ১৫ সংখ্যক চর্যার প্রকৃত রচয়িতা একই ব্যক্তি। ভাবের দিক থেকে উভয় ক্ষেত্রেই স্বসংবেদনের কথা বলা হয়েছে। যাই হোক, একাধিক ভণিতাযুক্ত চর্যাগুলি থেকে আমাদের পূর্বোক্ত অনুমানই দৃঢ়তর হয় যে, চর্যাগানগুলির একটা সাধারণ কাব্যরূপ দাঁড়িয়ে যাবার আগে এই ধরনের চর্যা আকারে হ্রস্বতর ছিল। তার দৈর্ঘ্য ছিল দুই, চার বা ছয় লাইন। চর্যাগুলি রচিত হবার একটা পর্যায়ে এই হ্রস্বতর চর্যাগুলির মিলনে দীর্ঘতর চর্যাযুগ্মক গঠিত হয় এবং এই চর্যাযুগ্মকের দৈর্ঘ্যের সাদৃশ্যে ক্রমে চর্যার সাধারণ দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় দশ লাইন। ৪৩ সংখ্যক চর্যায় যে ৮ লাইন দেখা যায়, তাতে সম্ভবত মূলগানের দ্বিতীয় পদটি অনুপস্থিত। এই অনুমানের কারণ, টীকাকার অন্যত্র প্রত্যেক গানের তৃতীয়-চতুর্থ লাইনকে ধ্রুবপদ বলে নির্দেশ করেছেন এবং ধ্রুবপদকে প্রথম-দ্বিতীয়াদি কোন ক্রমিক সংখ্যায় চিহ্নিত করেননি। ৪৩ সংখ্যাক গানের টীকায় 'সহজ ইত্যাদি' পদের পরের পদকে ধ্রুবপদ বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু পুথিতে উক্ত পদের পরে যে 'জিম ইত্যাদি' পদ পাওয়া যায় টীকাকার তাকেই দ্বিতীয় পদ বলে নির্দেশ করেছেন। টীকাকার আগাগোড়া যেভাবে টীকা রচনা করেছেন তাতে দেখা যায় গানের প্রথম দুই পঙ্‌ক্তির পরবর্তী তৃতীয়-চতুর্থ পঙ্‌ক্তিকে ধ্রুবপদ হিসাবে ধরে তিনি তাকে সংখ্যাগণনার বাইরে রেখেছেন এবং পঞ্চম ষষ্ঠ পঙ্‌ক্তিদ্বয়কে সর্বত্র দ্বিতীয়পদ বলে নির্দেশ করেছেন। টীকা প্রণয়নের এই সাধারণ রীতি অনুসরণ করলে মনে হয় পুথিতে প্রাপ্ত১-২ পঙ্‌ক্তি ও ৩-৪ পঙ্‌ক্তির মাঝখানে আরও দুটি পঙ্‌ক্তি মূলগানে ছিল এবং সেই লুপ্ত পঙ্‌ক্তিদ্বয়ই এই চর্যার ধ্রুবপদ। টীকা রচনার সময় হয়ত পঙ্‌ক্তিদ্বয় প্রচলিত ছিল, কিন্তু যে পুথি থেকে গান নকল করে হরপ্রসাদ-আবিষ্কৃত পুথিটি রচিত হয় সম্ভবত সেই পুথিতে পঙ্‌ক্তিদ্বয় না থাকায় তার টীকাও লিপিকার নকল করেন নি। লুপ্ত বলে অনুমিত এই পঙ্‌ক্তিদ্বয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করলে ৪৩ সংখ্যক গানের চরণ-সংখ্যা দাঁড়ায় দশ। যে সব চর্যার চরণসংখ্যা দশের বেশী সেগুলির দৈর্ঘ্যাতিরেক সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হিসাবেই গণ্য, তবে এই দৈর্ঘ্য-বৃদ্ধির পেছনে মূল গান রচনা ও টীকা রচনার মধ্যবর্তী কোন সময়ের প্রক্ষেপ থাকাও

অসম্ভব নয়, বিশেষত চৌদ্দ লাইনের তিনটি (১০, ২৮, ৫০) গানের কোনটিতেই প্রথাগত ভণিতা নেই এবং তিনটি গানেরই শেষ পঙ্‌ক্তিচতুষ্টয়কে ভাবানুক্রমের দিক থেকে চর্যার বাকী অংশের সঙ্গে কিছুটা অসংলগ্ন বলে মনে হয়। ১০ সংখ্যক গানে ডোম্বীর সঙ্গে কাহ্নের যে প্রণয়-সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে পঞ্চম পদেই সেই ভাব মোটামুটি সম্পন্ন হয়েছে, মূল ভাবকে আরো বিস্তৃত করার আগ্রহে হয়ত মূল কবির কোন শিষ্য বা অনুগামী গায়ক কর্তৃক পরবর্তী অংশ সংযোজিত হয়েছে। ২৮ সংখ্যক গানেও পঞ্চম পদ পর্যন্ত শবর-শবরীর রাত্রিযাপনের যে ছবি আছে তার সঙ্গে পরবর্তী চার লাইনে শবরের যে গুরুতর রুষ্ট হবার প্রসঙ্গ আছে তার কোন নিত্য পারম্পর্য নেই, এতে সমস্ত গানের ভাবগত ঐক্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে হয়। ৫০ সংখ্যক গানেও ফুল্ল-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীতে শবর-শবরীর যে মিলন-বিহ্বলতার ছবি আছে তার সঙ্গে শেষ চার লাইনের শবরের মৃত্যু ও সৎকারের ছবি অনেকটা বিসদৃশ মনে হয়। এই জাতীয় তিনটি গানেরই ভণিতা ও কবিনামের ব্যবহার-রীতি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে এই গানে ভণিতার বিশেষ গঠনগত গুরুত্ব ছিল। চর্যাগানের তিনটি ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ও পঞ্চম বা শেষপদে ভণিতার ব্যবহার আছে, এছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে পঞ্চম বা শেষ পদে ভণিতা ব্যবহৃত হয়েছে। ভণিতা সাধারণত রচনার শেষে দেওয়াই বিধি। এ থেকে বোঝা যায় যে চর্যারচনার একটা পর্যায়ে (সম্ভবত প্রাচীনতর পর্যায়ে) দ্বিতীয়পদ ও শেষ বা পঞ্চম পদ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কেননা চর্যা-যুগ্মককে ভেঙ্গে ফেললে দ্বিতীয় ও পঞ্চম পদই দুটি পৃথক চর্যার অন্তিম পদ হয়ে দাঁড়ায়। পরে যখন যুগ্মকের বদলে সাধারণ মাপের দীর্ঘতর চর্যা রচনার রীতি দাঁড়িয়ে গেল তখন কোথাও কোথাও পুরনো প্রথার আনুগত্য হিসাবে দ্বিতীয়পদে কবিনাম ব্যবহৃত হল বটে, কিন্তু ভণিতা হিসাবে নয়, বাক্যের সাধারণ পদ হিসাবে, এবং পঞ্চম বা শেষ পদে কবিনাম ভণিতা হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে গোটা চর্যাটির সমাপ্তি ঘোষণা করতে লাগল। সম্ভবত সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় পদে কবিনাম-উল্লেখের রীতি প্রথমে শিথিল ও শেষে অচল হয়ে যায়, কিন্তু শেষ পদে গোটা গানের সমাপ্তি-সূচনা হিসাবে ভণিতা ব্যবহার চর্যাগীতির একটা নির্দিষ্ট প্রথায় দাঁড়িয়ে যায়। এই প্রথা শুধু চর্যাতেই নয় পরবর্তী বাংলা কাব্যের সমস্ত মধ্যযুগীয় কবিই ভণিতাকে প্রত্যেকটি গান (বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীর ক্ষেত্রে) ও অনুচ্ছেদের (মঙ্গলকাব্য ও অনুবাদকাব্যের ক্ষেত্রে) শেষে প্রয়োগ করে গান বা অনুচ্ছেদের সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন। সুতরাং ভণিতাযুক্ত পদ এক হিসাবে রচনার উপসংহার। আলোচ্য তিনটি চর্যায় এই ধরনের উপসংহার-সূচক কোন ভণিতা না থাকায় মূল গানে প্রক্ষেপ প্রবেশ আরো সহজসাধ্য হয়েছে বলে মনে হয়।

যাই হোক, চর্যাগীতির পদসংখ্যা ও ভণিতারীতি পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় যে সুপ্রাচীন কাল থেকে সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যে মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্য রচনার যে রীতি প্রায় সর্বভারতীয় কাব্যাদর্শরূপে স্বীকৃত হয়েছিল সেই কাব্যাদর্শের বাইরে চর্যাগীতির গঠনভঙ্গী একটা নির্দিষ্ট রূপাদর্শ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। পরিমিত পদসংখ্যার গাঢ়বন্ধ আয়তনে

একটি নির্দিষ্ট তত্ত্ব বা ভাবের প্রতিষ্ঠা, নির্বস্তুক ভাবপ্রকাশে বস্তুগত উপমান-সন্ধান, গোপন ভাবপ্রকাশে প্রহেলিকা ও আভিপ্রায়িক অর্থপূর্ণ সন্ধ্যাভাষার ব্যবহার এবং রচনার শেষে ভণিতার তাৎপর্যপূর্ণ সন্নিবেশ—এই হচ্ছে চর্যাগীতির রূপাদর্শের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য। চর্যাগীতির এই সব রূপবৈশিষ্ট্য পরবর্তীকালে প্রায় সামগ্রিকভাবেই মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের সাধারণ রূপাদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রহেলিকা ও সন্ধ্যাভাষার প্রয়োগ সমেত অন্যান্য সব বৈশিষ্ট্যই বাউলগান, রাগাত্মিক পদাবলী ও অন্যান্য মরমিয়া গানে অনুসৃত হয়েছে এবং সঙ্কুচিত পরিসরে একটি প্রসঙ্গের বর্ণনা ও রচনার শেষে প্রসঙ্গসমাপক ভণিতা ব্যবহার-রীতি পদাবলী সাহিত্য, অনুবাদকাব্য ও মঙ্গলকাব্যে গৃহীত হয়েছে। চর্যাগীতির কাব্যরূপ তাই সমগ্র অনাধুনিক বাংলা কাব্যেরই রূপগঠনের পথপ্রদর্শক।

ছন্দ :

কাব্য বিশেষত গীতিকবিতায় ছন্দ ভাবের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। কেননা গীতিকবিতায় নিগূঢ় ভাবের অনেকখানিই ছন্দের ভাবানুকূল ধ্বনিব্যঞ্জনার সাহায্যে পরিস্ফুট হতে পারে। এই কারণে সফল গীতিকবিতায় ছন্দ একটি অপরিহার্য কাব্যোপকরণ হিসাবে দেখা দেয়। চর্যাগীতি অবশ্য ঠিক আধুনিক লিরিকের অর্থে গীতিকবিতা-পদবাচ্য নয়। তথাপি এখানে তত্ত্বগূঢ় ভাবকে পরিমিত পরিসরে আকারে দেবার যে চেষ্টা বিদ্যমান তাতে ছন্দের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভব করা যায়। পরিমিতি-গাঢ় প্রবচন, আভিপ্রায়িক সন্ধ্যাবচন, ভাবগূঢ় অর্থালঙ্কার ইত্যাদি যে সব উপাদানে চর্যার হ্রস্বায়তন কাব্যরূপ গঠিত হয়েছে তার সঙ্গে প্রতিচরণের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে যতিপাত, প্রতিপদের উভয়চরণে অন্ত্যানুপ্রাস প্রভৃতি ছান্দসিক উপকরণ মিলিত হয়ে চর্যার কাব্যরূপকে সম্পূর্ণতা দিয়েছে। সুতরাং রূপনির্মাণের প্রয়োজনেই অন্যতম উপকরণ হিসাবে চর্যাগীতিতে ছন্দের অধিষ্ঠান।

চর্যাগানগুলি যখন রচিত হয় তখন চর্যাকারদের সামনে দুটি ছান্দসিক আদর্শ বিদ্যমান ছিল—একটি অভিজাত সংস্কৃত ছন্দ, অন্যটি লৌকিক অপভ্রংশ ছন্দ। এই দুয়ের মধ্যে সংস্কৃতের ছান্দসিক আদর্শ চর্যাগানে একোবারেই গৃহীত হয়নি। কেন না, সংস্কৃত ছন্দে অক্ষর-সংখ্যা ও স্বরের লঘু-গুরুত্ব সম্পর্কে নিয়ম শৃঙ্খলা বড়ো কঠোর ও অনমনীয়। কিন্তু শব্দ বা শব্দগুচ্ছের আদ্যক্ষরে শ্বাসাঘাতবিশিষ্ট বাঙালির উচ্চারণে সংস্কৃতের এই লঘু-গুরু-সংক্রান্ত নিয়ম রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া, গানের তানের মধ্যে মাত্রা ও অক্ষরের অপূর্ণতা-ঘটিত ত্রুটিমোচনের সুযোগ থাকায় এতখানি নিয়ম-শৃঙ্খলা পালনের প্রয়োজনও তেমন অনুভূত হয়নি। তাছাড়া, রচনার লক্ষ্যও যখন সংস্কৃত-অনভিজ্ঞ লোক-সাধারণ, তখন ছান্দসিক আদর্শেও সংস্কৃত রীতি উপেক্ষিত হওয়াই স্বাভাবিক, তাই অপেক্ষাকৃত লৌকিক আদর্শ হিসাবে অপভ্রংশ ছন্দের রীতিই চর্যাকারদের রচনায় গৃহীত হয়েছে। কিন্তু সংস্কৃতের মত অপভ্রংশেও মাত্রা-সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি ও লঘু-গুরু-ক্রমবিন্যাসের ব্যাপারে কতকগুলি নিয়ম ছিল এবং এই সব নিয়মও বাংলার বিশেষ ধরনের শ্বাসাঘাতবিশিষ্ট

উচ্চারণের পক্ষে সর্বাংশে অনুকূল ছিল না। তাই অপভ্রংশের বহুবিচিত্র ছন্দোরীতির মধ্যে যেগুলিতে লঘু-গুরুক্রম সম্পর্কে কিছুটা শৈথিল্যের অবকাশ ছিল সেইগুলিই চর্যাগানের ছান্দসিক আদর্শ হিসাবে গৃহীত হয়েছে। এই ধরনের স্থিতিস্থাপক ছন্দের মধ্যে পাদাকুলকই সর্বপ্রধান। এই পাদাকুলক ছন্দোরীতি সম্পর্কে অপভ্রংশ ছন্দঃশাস্ত্রে বলা হয়েছে 'লহুগুরু এক্ক ণিঅম ণহি জেহা' অর্থাৎ পাদাকুলকে লঘুগুরু অক্ষরের স্থাপনা সম্পর্কে কঠোর নিয়ম নেই। পাদাকুলকের অন্যান্য লক্ষণ— এতে চারটি পাদ, প্রতিপাদে ১৬ মাত্রা এবং আট মাত্রার পর যতিপাত ঘটে। চর্যার পুথিতে প্রাপ্ত ৪৬$^{১}/_{২}$টি গানের মধ্যে ৩৬টি গানই পাদাকুলকের আদর্শে রচিত, তবে এই ৩৬টি গানের প্রতিক্ষেত্রেই পাদাকুলকের ৪ + ৪ + ৪ + ৪ = ১৬ মাত্রার আদর্শ যথাযথভাবে রক্ষিত হয় নি। অনেক ক্ষেত্রে উচ্চারণের বিশিষ্টতার জন্য মাত্রাহ্রাস ঘটেছে, ফলে কোন কোন পঙ্‌ক্তিতে মাত্রার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫ কিংবা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে ১৪। যেমন :

১. ১ ১ ১ ১। ২ ২ ॥ ১১১ ১। ২ ২
দু লি দু হি। পিটা ॥ ধরণ ন। জা ই = ৪ + ৪ + ৪ + ৪
১ ২ ১। ২ ১ ১। ২ ১ ১। ২ ২
রু খে র। তে ন্তলি ॥ কু ম্ভীরে। খা অ = ৪ + ৪ ॥ ৪ + ৪

২. ২ ২। ১ ১ ১ ১॥ ২ ১ ১। ২ ১
কা আ। ত রু ব র ॥ প ণ্ড বি। ডা ল = ৪ + ৪ ॥ ৪ + ৩
২ ১ ১। ২ ২ ॥ ১ ১ ২। ২ ১
চ ণ্ড ল। চী এ ॥ প ই ঠো। কা ল = ৪ + ৪ ॥ ৪ + ৩

৩. ২ ১ ১ ২ ২ ॥ ১ ১ ২ ২
মো হ বি মু ক্কা ॥ জ ই মা না = ৮ ॥৬
১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ২
ত বেঁ তু ট ই অ ব ॥ ণা গ ম ণা = ৮ ॥ ৬

উদ্ধৃত তিনটি দৃষ্টান্তের প্রথমটির [চর্যাসংখ্যা ২] মাত্রাসংখ্যা ১৬, দ্বিতীয়টির [চর্যাসংখ্যা ১] মাত্রাসংখ্যা ১৫ এবং তৃতীয়টির [চর্যাসংখ্যা ৪৬] ১৪।

এই উদাহরণগুলি থেকেই বোঝা যায় যে আদ্য স্বরাঘাতজনিত মাত্রাহ্রাসের পথ ধরেই ষোড়শমাত্রিক পাদাকুলক থেকে চতুর্দশমাত্রিক পয়ারের সূচনা সম্ভব হয়েছিল এবং চর্যাগীতগুলিতে এই ১৬ থেকে ১৪ মাত্রায় রূপান্তরের মধ্যবর্তী ছান্দসিক স্তর রক্ষিত হয়েছে। ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন চর্যার এই ছন্দোরীতিকেই 'অপকৃষ্ট পাদাকুলক' বা 'আদিম পয়ার' বলে অভিহিত করতে চেয়েছেন।

চর্যার বাকী ১০$^{১}/_{২}$ টি গানের পঙ্‌ক্তিগুলি আকারে দীর্ঘতর। এই দীর্ঘপঙ্‌ক্তিক গানগুলিতে অপভ্রংশের দোহা, চউপইআ, চউবোলা, মরহট্টা প্রভৃতি নানা দীর্ঘতর মাত্রার ছন্দের প্রভাব পড়েছে। তবে মাত্রার সংখ্যা ও যতিভাগের ব্যাপারে নানা বৈচিত্র্য থাকায় দীর্ঘপঙ্‌ক্তিক চর্যাগুলিকে সামগ্রিকভাবে অপভ্রংশের কোন সুনির্দিষ্ট দীর্ঘমাত্রিক ছন্দের

একান্ত অনুবর্তী বলে নির্দেশ করা কঠিন। অনেক ক্ষেত্রেই একই গানের এক পঙ্‌ক্তিতে এক ধরনের ছান্দসিক আদর্শ উপস্থিত আবার অন্য পঙ্‌ক্তিতে অন্য ধরনের ছান্দসিক রীতি অবলম্বিত, যেমন ৪১ সংখ্যক চর্যার পঞ্চম ও ষষ্ঠ পঙ্‌ক্তিদ্বয় :

১ ১ ১ ২ ১ ২ ১ ১ ১ ২ ২ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ২
ম রু ম রী চি গ ন্ধ ন ইরী ॥দা প ণ বি ন্ধু জ ই সা১৩ ॥১১ = ২৪ মাত্রা
২ ২ ২ ২ ২ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ২ ২ ১ ১ ১ ১ ২
বাতা বস্তেঁ ॥সোদি ঢ় ভ ইআ ॥অ পে পা থ র জ ই সা৮ ॥৮ ॥১১ = ২৭ মাত্রা

এখানে উদ্ধৃত প্রথম পঙ্‌ক্তিটিতে ২৪ মাত্রা আছে, কিন্তু দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির মাত্রাসংখ্যা ২৭। ছান্দসিক বিচারে প্রথম পঙ্‌ক্তিটি খাঁটি 'দোহা' ছন্দে রচিত, কিন্তু দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিটিকে কোন নির্দিষ্ট ছান্দসিক ছাঁচে ফেলা যায় না ; এতে ৪ × ৭ + ২ = ৩০ মাত্রার 'চউবেলা' ছন্দের আভাস থাকলেও এটি খাঁটি 'চউবোলার' উদাহরণ নয় ; কেননা খাঁটি 'চউবোলার' মাত্রাসংখ্যা ৩০, আর আলোচ্য পঙ্‌ক্তির মাত্রাসংখ্যা ২৭। তবে মাত্রাসংখ্যার অল্পস্বল্প তারতম্য থাকলেও চর্যাগীতিসংগ্রহের ১০, ১৪, ১৫, ১৬, ২৩, ২৮, ৩৪, ৩৯, ৪১, ৪৩, ৫০ [২৩ সংখ্যক গানটির অর্ধাংশ পাওয়া গিয়েছে] সংখ্যক মোট ১০$^{১}/_{২}$টি গান মোটের উপর দীর্ঘমাত্রিক। এই দীর্ঘমাত্রিক গানগুলির পঙ্‌ক্তিসমূহের মধ্যে কোথাও ত্রিপদী কোথাও দীর্ঘ দ্বিপদীর ছাঁদ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। যেমন :

১. ২ ২ ১ ২ ১১২ ২ ২১ ১ ১১১ ২ ২
মা আ মোহা সমুদা রে ॥ অন্ত ন বুঝসি থাহা ১৩ ॥১১
১ ১ ২ ১ ১ ২ ১২ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ২
অগে নাব ন ভেলা দীসঅ ॥ ভন্তি ন পুছ সি নাহা ১৩ ॥১১

২. ১ ১১ ১১১ ১১ ১ ১১ ১১১ ১১ ১ ১২ ১১১ ১২১
রাউতু ভণই কট ॥ ভুসুকু ভণই কট ॥ সঅলা অইস সহাব ৮ ॥ ৮ ॥ ১১
১১ ২ ২২ ২১১ ২ ২ ২১১ ২১১ ২ ১
জইতো মুঢ়া ॥ অচ্ছসি ভান্তী ॥ পুচ্ছতু সদ্‌গুরু পাব ৮ ॥৮ ॥১১

এখানে প্রথম উদাহরণে 'দোহা' ছন্দের প্রভার লক্ষণীয় এবং দীর্ঘ দ্বিপদীর ছাঁদ সুস্পষ্ট ; দ্বিতীয় উদাহরণে চউপইআ বা চউবোলার দূরগত প্রভাব আছে এবং ছন্দোবন্ধে ত্রিপদীর অভ্রান্ত আভাস পাওয়া যায়।

আগেই বলা হয়েছে, চর্যার মাত্রাসংখ্যা ও যতিভাগের ব্যাপারে নানা বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। এই বৈচিত্র্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল : সমগ্র গানে যেখানে মোটামুটি একই মাত্রার চরণবিন্যাস ঘটেছে সেখানে একটি বা দুটি পঙ্‌ক্তির আকস্মিক মাত্রাদৈর্ঘ্য—সাধারণত পাদাকুলকের আদর্শে রচিত গানগুলিতেই এই বৈশিষ্ট্য বেশী লক্ষ্য করা যায় ;

যেমন, প্রথম গানটির মোট দশ পঙ্‌ক্তির মধ্যে নয়টি পঙ্‌ক্তিতেই পাদাকুলক-প্রভাবিত ৮ + ৭ = ১৫ মাত্রা আছে, কিন্তু গানের সপ্তম পঙ্‌ক্তিটি দীর্ঘতর

২১ ২ ১ ২১১ ২১ ১১ ১১ ২১১ ২১
এড়ি এ উ ছান্দক বান্ধ। করণক পাটের আস = ১৩। ১১

এখানে পাদাকুলকের বদলে 'দোহা'-র প্রভাবই লক্ষণীয়। অন্যদিকে কোন কোন ক্ষেত্রে একই গানে বিভিন্ন মাত্রার পঙ্‌ক্তি সন্নিবিষ্ট হয়েছে— সাধারণত দীর্ঘমাত্রিক গানগুলিতেই এই বৈশিষ্ট্য বেশী লক্ষ্য করা যায়; যেমন ৪১ সংখ্যক গানে :

১। আইএ অনুঅনা এ জগরে ॥ ভাংতিএ সো পড়িহাই।
২। রাজসাপ দেখি জো চমকিই ॥ যারে কিং তং বোড়ো খাই ॥
৩। অকট জোইআ রে ॥ মা কর হথা লোহা।
৪। আইস সহাবেঁ ॥ জই জগ বুঝষি ॥ তুট বাষণা তোরা ॥
৫। মরুমরীচি গন্ধ নইরী ॥ দাপণবিম্ব জইসা।
৬। বাতাবত্তেঁ ॥ সো দিঢ় ভইআ ॥ অপেঁ পাথর জইসা ॥
৭। বান্ধি সুআ জিম কেলি করই ॥ খেলই বহুবিহ খেড়া।
৮। বালুআ তেলেঁ ॥ সসর সিংগে ॥ আকাশে ফুলিলা ॥
৯। রাউতু ভণই কট ॥ ভুসুকু ভণই কট ॥ সঅলা অইস সহাব।
১০। জই তো মূঢ়া ॥ অচ্ছসি ভান্তী ॥ পুচ্ছতু সদ্‌গুরু পাব ॥

এখানে :

পঙ্‌ক্তি	পঙ্‌ক্তির ছাঁদ	মাত্রাসংখ্যা
১	দীর্ঘ দ্বিপদী	১৪ + ১১
২	দীর্ঘ দ্বিপদী	১৪ + ১১
৩	হ্রস্ব দ্বিপদী	৮ + ১০
৪	দীর্ঘ ত্রিপদী	৮ + ৮ + ১১
৫	দীর্ঘ দ্বিপদী	১৩ + ১১
৬	দীর্ঘ ত্রিপদী	৮ + ৮ + ১১
৭	দীর্ঘ দ্বিপদী	১৪ + ১১
৮	হ্রস্ব ত্রিপদী	৮ + ৮ + ৮
৯	দীর্ঘ ত্রিপদী	৮ + ৮ + ১১
১০	দীর্ঘ ত্রিপদী	৮ + ৮ + ১১

চর্যাগানে এই বিষমমাত্রিক পঙ্‌ক্তিবিন্যাস সব সময় কবিদের অনবধানতার জন্য ঘটে নি বা এই বিষম পঙ্‌ক্তিবিন্যাসের ফলে চর্যাগীতিতে কলাবিধিঘটিত কোন অসংগতিও দেখা দেয় নি। কারণ এই ধরনের বিষম পঙ্‌ক্তিবিন্যাস অপভ্রংশের ছান্দসিক ঐতিহ্যের

অনুগামী এবং এর ফলে সমগ্র স্তবকবন্ধে এক ধরনের সুরবৈচিত্র্য ফুটে উঠত। চর্যাগুলি সুরসহযোগে গান করা হত বলে এই সুরবৈচিত্র্যের বিশেষ উপযোগিতা ছিল। তাছাড়া সুরের মধ্যে মাত্রার বৈষম্য চাপা গড়ে যেত বলে ছন্দপতনের ত্রুটিও অনুভূত হত না।

ছন্দের প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় আলোচনা করা দরকার— সেটি প্রতি পদের চরণপ্রান্তিক মিল। এই মিলের ব্যাপারে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় : (১) দুই পঙ্‌ক্তির অন্ত্য, উপান্ত্য স্বর এবং অন্ত্য ব্যঞ্জনধ্বনির ক্রমাগত মিল ; যেমন : ডাল—কাল [১], সান্ধে—কান্ধে [৩], নাবী—ঠাবী [৮] করিঅই—মরিঅই [১] জীবমি— পীবমি [৪], গাজই—ভাজই [১৬], সঙ্কা—কংখা [২২], জুঝঅ—বুঝঅ [৩৩], পহারী—অহারী [৩৬], ইত্যাদি ; (২) দুই পঙ্‌ক্তির শেষে ক্রমভ্রষ্ট মিল, এই ধরনের মিল দুরকম (ক) পঙ্‌ক্তির শেষে সমস্বর বা ব্যঞ্জন আবর্তিত হলেও তার পূর্ববর্তী স্বর বা ব্যঞ্জনের মধ্যে মিল বা সমতা নেই ; যেমন ঃ হরিণা বৈরী— ভুসুকু অহেরি [৬], রুন্ধেলা—ভইলা [৭], বট্টই—পইসই [৭], কাচ্ছি—পুচ্ছি [৮], উছারা—জিনউরা [১৪] ইত্যাদি ; (খ) পঙ্‌ক্তির শেষে ব্যঞ্জনের অসমতা, কিন্তু ব্যঞ্জন-নিহিত স্বরের সমতায় অন্ত্য মিল ; যেমন : খট্টে—নাদে [১১], সুইনা— মুনিআ [১৩], ভতারি— ন জাই [২০], নিবানেঁ— পণালেঁ [২৭], ইন্দিআল— দে উলাস [৩০], মহাসুহেঁ—পারিমকুলে [৩৪], অপা—কুণ্ডবাঁ [৩৯], লোহা—তোরা [৪১], কুঠার—ন ডাল [৪৫], আগি—পানী [৪৭], ভাএলা—ফুলিআ [৫০]। এই দুধরনের ক্রমভ্রষ্ট মিলই অন্ত্যানুপ্রাসের দৃষ্টান্ত হিসাবে খুব দুর্বল, তবে গানের সুরের সঙ্গে পদান্তের স্বরসাম্য সংগতি রচনা করত বলে অন্ত্যানুপ্রাসের এই দুর্বলতা তেমন শ্রুতিকটু হত না। (৩) দুই পঙ্‌ক্তির শেষে ই—অ বা অ—ই ধ্বনির সাহায্যে মিলরচনার প্রয়াস ; যেমন ঃ জাই—খাঅ [২], দীসঅ—পইসই [৬], বাজঅ—রাজই [৩১], পতিভাসঅ—পইসই [৩১], ষোহিঅ—ন হোই [৪৬]। একালের সুরবর্জিত পাঠ বা আবৃত্তিতে ই—অ বা অ—ই-র মিল বিসদৃশ মনে হবে, কিন্তু সেকালের উচ্চারণে এই দুই ধ্বনির মধ্যে হয়ত কোথাও কোন উচ্চারণ-গত-সমতাসূত্র ছিল এবং সেই সমতাসূত্রেই গানের সুরের মধ্যে এই দুই বিষম স্বরধ্বনির সামঞ্জস্য ঘটত।

যাই হোক, চর্যাকবিদের ছন্দচর্চা সম্পর্কে সবচেয়ে বড়ো কথা, তাঁরা ঠিক রূপসচেতন ছন্দোশিল্পী ছিলেন না। তাঁদের মনোযোগের প্রধান অংশ সুগভীর তত্ত্বকথার আভিপ্রায়িক অভিব্যক্তির দিকে আকৃষ্ট থাকায় তাঁরা অলংকার, সন্ধ্যাভাষা ও প্রহেলিকাচর্চার দিকে যতটা দৃষ্টি দিয়েছেন ছন্দের ত্রুটিহীনতার দিকে ততটা নজর দিতে পারেন নি। তা ছাড়া, আবৃত্তি বা পাঠযোগ্য কবিতার ক্ষেত্রে ছন্দ সম্পর্কে যে বিশেষ মনোযোগের প্রয়োজন, সুর সহযোগে গেয় রচনার পক্ষে সেই সতর্কতার তেমন প্রয়োজন নেই। কারণ ছন্দের ত্রুটি সুরের মধ্যে চাপা পড়ে। এ ছাড়া চর্যাগানগুলির যে রূপ আমাদের হস্তগত হয়েছে তাতে গায়ক ও লিপিকরকর্তৃক সংযোজিত মূলাতিরিক্ত কিছু বর্ণ বা শব্দ থাকাও অসম্ভব নয়। কোথাও কোথাও অসাবধানতাবশত মূলের বর্ণ বা শব্দ পরিত্যক্তও হতে পারে। এর ফলেও চর্যাগীতির ছন্দ-প্রক্রিয়ায় শিথিলতা দেখা দিয়ে থাকতে পরে। কিন্তু এই

শিথিলতা চর্যাকবিগোষ্ঠীর অপটুতার নামান্তর নয়, বাংলা ছন্দের ক্রমবিবর্তনে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক অভিপ্রায়। এখানে একদিকে আছে অপভ্রংশের বন্ধনমুক্তি, অন্যদিকে বাংলার নিজস্ব ছন্দোভঙ্গী পয়ার-ত্রিপদীর অমোঘ আগমনী।[১]

অলঙ্কার :

'রস'কে কাব্যের আত্মা বলে নির্দেশ করলেও প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রীরা কাব্যের রসবৃদ্ধির ব্যাপারে অলঙ্কারের বিশেষ ভূমিকা স্বীকার করেছিলেন। তাঁদের কাছে অলঙ্কার ছিল সৌন্দর্যের উপকরণ ("সৌন্দর্যমলঙ্কারঃ" —বামন এবং "কাব্যশোভাকরান্ ধর্মান্ অলঙ্কারান্ প্রচক্ষতে" —দণ্ডী)। সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের সূত্র অনুসরণে সংস্কৃত কবিরা দীর্ঘদিন ধরে অলঙ্কারচর্চা করে এসেছেন, কিন্তু এই অলঙ্কারচর্চার ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সংস্কৃত কবিদের অলঙ্কারচর্চা সর্বদাই সৌন্দর্যের পরিপোষক ছিল না। সংস্কৃত কাব্যরচনার প্রথমদিকে যতদিন পর্যন্ত কবিরা চিন্তা ও কল্পনাশক্তিতে মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন ততদিন পর্যন্ত অলঙ্কারও কল্পনাসৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে কাব্যের রস-সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন স্তরে যখন কল্পনাশক্তির দীনতা ও পূর্ব-ঐতিহ্যের অন্ধ পুচ্ছানুগ্রাহিতায় সংস্কৃত সাহিত্যে অবক্ষয়ের লক্ষণ দেখা দিল তখন কবিরা কাব্যের অভ্যন্তরীণ দৈন্যকে অলঙ্করণের বাহ্য শোভায় আচ্ছন্ন করতে গিয়ে অলঙ্কারকে রসের সজীব অনুষঙ্গী না করে প্রাণহীন বিকল্প করে তুললেন। এইজন্যই দেখা যায় কালিদাস বা ভবভূতির পর সংস্কৃত সাহিত্যে অলঙ্কারচর্চা রসসম্পর্কহীন কৃত্রিম পারিপাট্য-কলায় পর্যবসিত হয়েছিল। অলঙ্করণকর্ম তখন একটা আনুষ্ঠানিক কবিকৃত্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এবং অলঙ্কারের উপকরণ নির্বাচনে জীবনের প্রত্যক্ষ রূপের বদলে পূর্ব প্রসিদ্ধির অনুসরণ করায় অলঙ্কারগুলিও প্রাণহীন হয়ে পড়েছিল। অবক্ষীয়মাণ সংস্কৃত কাব্যের এই প্রথাসর্বস্ব অলঙ্কারচর্চার রীতি প্রাকৃত কাব্যেও সংক্রামিত হয়েছিল। লোকজীবনের সঙ্গে সংস্রব থাকায় অপভ্রংশ প্রকীর্ণ কবিতার অলঙ্কারচর্চায় কোথাও কোথাও জীবনের সাক্ষাৎ স্পর্শ পাওয়া গেলেও সামগ্রিক ভাবে অপভ্রংশ কাব্যও প্রাচীন অলঙ্কার-প্রথার ঐতিহ্য একেবারে অতিক্রম করতে পারে নি।

চর্যাকবিদের সামনে অলঙ্কার-প্রথার এই সুপ্রাচীন ঐতিহ্য বিরাজ করলেও তাঁদের রচনায় যে অলঙ্কারচর্চার পরিচয় পাওয়া যায় তা বহুলাংশে এই প্রাচীনতর অলঙ্কার-প্রথার প্রভাবমুক্ত ছিল। এর কারণ, প্রথমত চর্যাকবিরা সমস্ত প্রকার ব্রাহ্মণ্য সংস্কার সম্পর্কেই বিরূপ ছিলেন, সুতরাং যে অলঙ্কার-প্রথা ব্রাহ্মণ্য কাব্যসংস্কারের অঙ্গীভূত সচেতন বা অচেতন যেভাবেই হোক তার সম্পর্কে তাঁদের ঔদাসীন্য থাকাই স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত এবং মুখ্যত চর্যাগীতি ঠিক রসসৃষ্টির উদ্দেশ্যে রচিত আলঙ্কারিক কবিতা নয়,

---

১. দ্রষ্টব্য : চর্যাপদের ছন্দ—আবদুল কাদির : ভাষাসাহিত্যপত্র/৪র্থ বর্ষ : বার্ষিক সংখ্যা ১৩৮৩ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

গুহ্যপন্থী সাধকদের সাধনসঙ্গীত, তাই বিশেষভাবে বা পৃথকভাবে এই রচনার আলঙ্করিক সৌন্দর্য-বৃদ্ধির দিকে চর্যাকবিরা দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। তত্ত্বকথাই ছিল তাঁদের প্রধান লক্ষ্য, এই তত্ত্বকথাকেই কোথাও সমপন্থী সাধকদের কাছে ব্যাখ্যা করার জন্য, কোথাও-বা অদীক্ষিত ব্যক্তিদের কাছে গোপন রাখবার জন্য তাঁরা যে সব কলা-কৌশল অবলম্বন করেছেন তাতেই অলঙ্কারের আভাস ফুটে উঠেছে। নতুবা রসের সমৃদ্ধি বা নিছক সৌন্দর্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে চর্যাকবিগণ অলঙ্কারচর্চা করেন নি। রস বা সৌন্দর্যানুভূতির সঙ্গে সম্পর্ক না থাকায় চর্যার অলঙ্কার প্রধানত তত্ত্বের রূপক হয়ে দেখা দিয়েছে, সৌন্দর্যের প্রতিরূপ হিসাবে নয়। এই রূপকে সাধর্ম্যের আনুষ্ঠানিক তুল্যসম্পর্ক অক্ষুণ্ণ আছে, কিন্তু তুলনার মধ্যস্থতায় সৌন্দর্যের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হয় নি।

তত্ত্ব প্রকাশের প্রয়োজনে চর্যাকবিদের রচনায় যেসব আলঙ্কারিক প্রকরণ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তার মধ্যে শব্দালঙ্কারের স্থান খুবই সীমাবদ্ধ। কেন না, শব্দালঙ্কার বিশেষভাবে কবির ধ্বনিসৌন্দর্য-সৃষ্টির সচেতন আকাঙ্ক্ষার অপেক্ষা করে, কিন্তু তত্ত্বসর্বস্ব চর্যাকবিদের তত্ত্ব-নিরপেক্ষ ধ্বনিসৌন্দর্য সম্পর্কে কোন আগ্রহ ছিল না। যেখানে শব্দের বিশেষ ব্যবহারে তত্ত্বপ্রকাশের আনুকূল্য ঘটেছে সেখানেই তাঁরা শব্দ ব্যবহার সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি দিয়েছেন। নতুবা নিছক ধ্বনিমাধুর্যের খাতিরে শব্দচেতনা তাঁদের মধ্যে ছিল না। চর্যাগীতিতে শব্দের বিচিত্র ব্যবহার শুধু একটি ব্যাপারেই তত্ত্বপ্রকাশের সাপেক্ষতা করেছে, তা হল অদীক্ষিত ব্যক্তিদের সামনে ধর্মের মূল কথা তত্ত্বনিরপেক্ষ ভাষায় ব্যক্ত করার ব্যাপারে। এই গূঢ়ার্থগর্ভ তত্ত্বনিরপেক্ষ ভাষাকে বৌদ্ধ তান্ত্রিক পুথি সমূহে ও চর্যার টীকায় 'সন্ধ্যাভাষা' নামে অভিহিত করা হয়েছে। চর্যাগীতিতে ব্যবহৃত দ্ব্যর্থবোধক সন্ধ্যাশব্দগুলির মধ্যে যে সব শব্দের ধ্বনি-প্রকৃতিকে পুরোপুরি অবিকৃত বা প্রায় অবিকৃত রেখে আধ্যাত্মিক ও লৌকিক উভয়প্রকার অর্থেই গ্রহণ করা যায় সেগুলিকে লাক্ষণিক বিচারে শ্লেষ অলঙ্কার বলে নির্দেশ করা চলে। যেমন, শাসু (৪, ১১)— [১] শাশুড়ী [২] শ্বাস, মাঅ (১৩, ৪৩)— [১] জননী [২] মায়া ; সোনা-রূপা, সোন-রুঅ (৮, ৪৯)— [১] ধাতু বিশেষ [২] শূন্যতা ও রূপাদি পঞ্চস্কন্ধ ; হরিণী (৬)— [১] মৃগী [২] প্রকৃতিদোষ হরণকারিণী নৈরাত্মাদেবী ; বেঙ্গ (৩৩)— [১] ভেক [২] বিগতাঙ্গ শূন্যতা ; কুম্ভীর (২)— [১] প্রাণী অর্থে, [২] কুম্ভক যোগ ইত্যাদি। শব্দালঙ্কারের মধ্যে একমাত্র শ্লেষ অলঙ্কারই চর্যাগীতিতে স্থান পেয়েছে।

শ্লেষ অলঙ্কারের মাধ্যমে যেমন অভিপ্রেত অর্থকে একটি ছদ্ম অর্থের আবরণে আবৃত করা হয়েছে, অর্থালঙ্কারের মাধ্যমে তেমনি অভিপ্রেত বক্তব্যকে ছদ্ম রূপ-প্রতিমানের আড়ালে গোপন করা হয়েছে। প্রকৃত তত্ত্ব ও তার ছদ্ম প্রতিরূপকে অলঙ্কারের পরিভাষায় যথাক্রমে উপমেয় ও উপমান বলে চিহ্নিত করা যায়। এই উপমেয়-স্থানীয় তত্ত্ব ও উপমান-স্থানীয় প্রতিরূপ উভয়ের মধ্যে সাধর্ম্য প্রতিষ্ঠাতেই চর্যাগীতির অর্থালঙ্কারের বিকাশ। কিন্তু চর্যাগীতির অর্থালঙ্কার বিচার প্রসঙ্গে প্রথমেই একটা বিষয় উল্লেখ করা দরকার যে, চর্যাগীতির সর্বত্রই তুলনা-প্রসঙ্গ সমান গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপিত

হয় নি। তত্ত্বকথা যত বেশী গূঢ় ও গোপনীয়, তুলনার প্রসঙ্গ ততই প্রাধান্য পেয়েছে। যেখানে তত্ত্বকথা সোজাসুজি প্রকাশ পেয়েছে সেখানে অলঙ্কার-যোজনার অবকাশ ঘটেনি, গোটা গানটিই সে ক্ষেত্রে নিরলঙ্কার রয়ে গিয়েছে। যেমন, কাহ্নের ভণিতাযুক্ত সপ্তম চর্যা, সরহের ২২ সংখ্যক চর্যা, দারিকের ৩৪ সংখ্যক চর্যা, তাড়কের ৩৭ সংখ্যক চর্যা, কঙ্কণের ৪৪ সংখ্যক চর্যা। এই সব চর্যায় তত্ত্বকথা সরাসরি প্রকাশিত হওয়ায় অলঙ্করণের প্রাথমিক শর্তগুলিই এখানে অনুপস্থিত রয়েছে। এই সব নিরলঙ্কার চর্যার পর এমন কতকগুলি চর্যার উল্লেখ করা যায় যেখানে গোটা গানে তত্ত্বই প্রাধান্য পেয়েছে, তবে মাঝে মাঝে একটি দুটি পদকে আশ্রয় করে রূপক, উপমা, দৃষ্টান্ত, প্রতিবস্তূপমা, প্রবাদ প্রবচন-লোকোক্তি-নির্ভর অতিশয়োক্তি অলঙ্কার ফুটে উঠেছে। যেমন, লুইপাদের প্রথম চর্যা, শান্তির ১৫ সংখ্যক ও ২৬ সংখ্যক চর্যা, আজদেবের ৩১ সংখ্যক চর্যা, সরহের ৩২ ও ৩৯ সংখ্যক চর্যা, টেন্টণ পাএর ৩৩ সংখ্যক চর্যা, ভাদের ৩৫ সংখ্যক, কাহ্নের ৪০ সংখ্যক, ভুসুকুর ৪১ সংখ্যক, কাহ্নিলের ৪২ সংখ্যক, জয়নন্দীর ৪৬ সংখ্যক চর্যা। এইসব চর্যার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে সব রূপক ও উপমা ব্যবহৃত হয়েছে তা ব্যাপক ব্যঞ্জনাধর্মের অভাবে নিষ্প্রাণ, নির্বস্তুক তত্ত্বকে একটা বস্তুগত স্পষ্টতা দেবার অতিরিক্ত কোন সৌন্দর্যব্যঞ্জনা এদের নেই। যেমন, প্রথম চর্যায় কাআ-তরুবর, পঞ্চেন্দ্রিয়-পঞ্চডাল, ১৫ সংখ্যক চর্যায় সহজ-উজুবাট, মাআমোহ-সমুদা, ৩১ সংখ্যক চর্যায় করুণা-ডমরুলি, ৩৯ সংখ্যক চর্যায় গুরুবঅনবিহারে (গুরুবচনরূপ বিহারে) ও জগ-জলবিম্ব, ৪৩ সংখ্যক চর্যায় 'সহজ মহাতরু', ৪৫ সংখ্যক চর্যায় 'সুন তরুবর গঅন কুঠার' ইত্যাদি। এই সব সরল রূপক ছাড়া যেখানে উপমেয়-উপমানের সাধর্ম্যস্থাপনে কিছু জটিলতা আছে সেখানে দৃষ্টান্ত, প্রতিবস্তূপমা, দৃষ্টান্তকল্প সাধারণ উপমা ও রূপকাতিশয়োক্তি অলঙ্কারের উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন, ৪১ সংখ্যক চর্যায় :

আইএ অণুঅনা এ জগরে ভাংতিএ সো পড়িহাই।
রাজসাপ দেখি জো চমকিই ষারে কিং তং বোড়ো খাই।

৪২ সংখ্যক চর্যায় :

মূঢ়া অচ্ছন্তে লোঅ ন পেখই।
দুধ মাঝেঁ লড় ণচ্ছন্তেঁ দেখই॥

এবং ৪৩ সংখ্যক চর্যায়

জিম জলে পাণিআ টলিআ ভেউ ন জাঅ।
তিম মণ-রঅনা রে সমরসে গঅণ সমাঅ॥

উদ্ধৃত তিনটি পদের মধ্যে প্রথমটি দৃষ্টান্ত অলঙ্কারের উদাহরণ। এখানে উপমেয় আদৌ অনুৎপন্ন জগৎ এবং উপমান 'রজ্জুসর্প' দুটি স্বাধীন বাক্যে অবস্থিত, সাধারণ ভাবে উভয়ের ধর্মও পৃথক, কিন্তু প্রণিধানগম্য ভাবসাদৃশ্যে উভয় ধর্মই বিম্বপ্রতিবিম্ব ভাবাপন্ন সাধারণ ধর্মে (যথা 'প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্বহীন তবে ভ্রান্তি বশত প্রতীয়মান') পরিণত হয়েছে। দ্বিতীয় পদটি প্রতিবস্তূপমার উদাহরণ। এখানে 'অগোচর সত্য' উপমেয় এবং 'অগোচর লড়' (ননী) উপমান দুটি স্বাধীন বাক্যে বিদ্যামান, উভয়েরই সাধারণধর্ম অভিন্ন—'অস্তিত্ব সত্ত্বেও অগোচর' কিন্তু প্রকাশভঙ্গী অভিন্ন নয়, বস্তুপ্রতিবস্তুভাবাপন্ন অর্থাৎ একার্থক হয়েও ভিন্ন ভাষাশ্রিত (প্রথম বাক্যে 'ন পেখই', দ্বিতীয় বাক্যে 'ন... দেখই')। উদ্ধৃত তৃতীয় পদটিতে দৃষ্টান্ত অলঙ্কারের লক্ষণ বহুল পরিমাণে উপস্থিত, উপমেয়-উপমান দুটি বাক্যে রক্ষিত, উভয়ের ধর্মও পৃথক, কিন্তু দৃষ্টান্তের যেটি প্রধান লক্ষণ সেই বিম্বপ্রতিবিম্ব ভাব অর্থাৎ ভাবসাদৃশ্যের প্রণিধানগম্যতা এখানে অনুপস্থিত। সাদৃশ্যবাচক 'জিম-তিম' শব্দদুটির প্রয়োগে উপমেয়-উপমান সম্পর্ক আর বিশেষ চিন্তা করে আবিষ্কার করতে হয় না, বাচ্যার্থ থেকেই তা বোঝা যায়। এজন্য একে সাধারণ উপমা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। চর্যাগানের বহু ক্ষেত্রেই এই ধরনের একাধিক উদাহরণ পাওয়া যায় যেখানে দৃষ্টান্ত অলঙ্কারের অন্যান্য শর্ত পূর্ণ হলেও এই ভাবসাদৃশ্যের প্রণিধানগম্যতার শর্তটি অপূর্ণ থাকায় অলঙ্কারগুলি সাধারণ উপমায় পর্যবসিত হয়েছে। যেমন, ১৩ সংখ্যক চর্যার ৪র্থ পদ, ২৯ সংখ্যক চর্যার ৪র্থ পদ, ৩০ সংখ্যক চর্যার ৪র্থ পদ, ৩১ সংখ্যক চর্যার তৃতীয় পদ, ৪০ সংখ্যক চর্যার পঞ্চম পদ, ৪৬ সংখ্যক চর্যার প্রথম পদ, ইত্যাদি। এই তিন ধরনের অলঙ্কার ছাড়া চর্যাগীতির কোন কোন পদে দেখা যায় চর্যাকার আসল বক্তব্য গোপন রেখে তার পরিবর্তে কোন প্রসিদ্ধ প্রবাদ বা লোকোক্তি ব্যবহার করেছেন, যেমন, অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী (৬), হাথেরে কাঙ্কাণ মা লোউ দাপণ (৩২), বর সুণ গোহালী কি মো দুঠ্ঠ বলন্দেঁ (৩৯) ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে লোকোক্তিগুলি আসলে উপমান এবং এই উপমানের আড়ালে যে তত্ত্ব নিহিত রয়েছে তাই উপমেয়। উপমানের আড়ালে তত্ত্ব নিহিত থাকার আলঙ্কারিক ব্যাখ্যা হচ্ছে এসব ক্ষেত্রে 'রূপ্য' অর্থাৎ উপমেয় 'রূপক' অর্থাৎ উপমানের দ্বারা অতিশায়িত বা পূর্ণরূপে গ্রস্ত হয়েছে। সুতরাং সূক্ষ্ম বিচারে এগুলি রূপকাতিশয়োক্তির উদাহরণ (তুলনীয় 'রূপকাতিশয়োক্তিশ্চেৎ রূপ্যং রূপকমধ্যগম্" —পীযূষবর্ষ জয়দেব, দ্রষ্টব্য 'অলঙ্কারচন্দ্রিকা', পৃ. ১৫০)।

কিন্তু চর্যার অলঙ্কার ব্যবহার শুধু একটি-দুটি ছত্র সম্বলিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, চর্যাকবিরা অনেক ক্ষেত্রেই নিগূঢ় তত্ত্বকথা প্রকাশ করার জন্য গোটা পদেই উপমেয়-উপমান সম্পর্ক উপস্থাপিত করে আলঙ্কারিক অবকাশকে সম্প্রসারিত করেছেন। উপমেয়-উপমানের এই সম্পর্ক প্রায় সবক্ষেত্রেই রূপক অলঙ্কারের পরিপোষক। তবে সম্পর্কের অভিন্নতা সর্বত্রই সমান প্রাবল্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। কোথাও সম্পর্কের অভেদসত্ত্বেও উপমানের চেয়ে উপমেয়ের দ্যোতনাশক্তি প্রবল, কোথাও উপমান উপমেয় উভয় পক্ষই ব্যঞ্জনাশক্তিতে সমান প্রবল, কোথাও বা রূপকের

প্রকৃত সংজ্ঞা অনুযায়ী উপমানই উপমেয়ের চেয়ে প্রবল। এই প্রাবল্যের তারতম্য অনুসারে রূপকাশ্রিত চর্যাগুলিকে যথাক্রমে উপমেয়-প্রবল, তুল্যমূল্য ও উপমানপ্রবল[১] —এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়। চর্যাগীতিসংগ্রহের ৪, ৯, ১১, ১৬, ২৩, ২৭, ৩০, ৪৭ সংখ্যক গানগুলি উপমেয়-প্রবল রূপকের উদাহরণ। যেমন, ১৬ সংখ্যক চর্যায় মহাসুখমত্ত প্রকৃতিপ্রভাস্বর চিত্ত এবং মদমত্ত অস্থির গজেন্দ্র যথাক্রমে উপমেয় ও উপমান রূপে পরস্পরের অভেদ সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত :

মাতেল চীঅ গঅন্দা ধাবই।
নিরন্তর গঅণন্ত তুসেঁ ঘোলই ॥
পাপপুণ্য বেণি তোড়িঅ সিকল মোড়িঅ খম্ভাঠাণা।

এই পর্যন্ত উপমান আপন ধর্মের প্রতিষ্ঠায় উপমেয়কে সার্থকভাবে আচ্ছন্ন বা অপ্রধান করে রেখেছে, কিন্তু এর পরের পঙ্‌ক্তি 'গঅণ টাকলী লাগিরে চিত্তা পইঠ ণিবাণা' অংশে উপমেয়ের ধর্ম প্রবল হয়ে উঠে পূর্বের রূপকাভাসকে অতিক্রম করেছে, পরে নবম পঙ্‌ক্তিতে উপমানধর্ম পুনরুজ্জীবিত হলেও শেষ পঙ্‌ক্তিতে উপমেয়ের ধর্মই উপামানধর্মের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছে। সুতরাং এই সব ক্ষেত্রে রূপকের অবকাশ অনেকটা সংকুচিত হয়ে প্রায় উপমার সীমাকে স্পর্শ করেছে।

১৩, ৪৫ সংখ্যক গান-দুটি পূর্বোক্ত তুল্যমূল্য রূপকের উদাহরণ। দুটি ক্ষেত্রেই উপমানের ও উপমানের ধর্ম সমান্তরালভাবে বিকশিত, ফলে উভয়ে পরস্পর-সন্নিহিত হওয়া সত্ত্বেও কেউ কাউকে আচ্ছন্ন করে নি। যেমন, ১৩ সংখ্যক গানে :

তিশরণ নাবী কিঅ অঠকমারী।
নিঅ দেহ করুণা শূন মেহেলী ॥
তরিত্তা ভবজলধি জিম করি মাঅ সুইণা।
মঝ বেণী তরঙ্গ ম মুনিআ ॥
পঞ্চ তথাগত কিঅ কেডুআল।
বাহঅ কাঅ কাহ্নিল মাআজাল ॥
গন্ধ পরস রস জইসো তইসো।
ণিংদ বিহুনে সুইণা জইসো॥
চিঅ কণ্ডহার সুণত মাঙ্গে।
চলিল কাহ্ন মহাসুহ সাঙ্গে ॥

এক্ষেত্রে তত্ত্বকথা তথা উপমেয়-প্রবাহ (তিশরণ, করুণা, শূণ, ভব, পঞ্চতথাগত, মাআ, চিঅ, সুণ) এবং লৌকিক নৌযাত্রা তথা উপমা-প্রবাহ (নাবী, জলধি, তরঙ্গ,

১. দ্র. বাংলা কাব্যে উপমালোক, পৃ. ৩৭

কেড়ুআল, জাল, কঙহার, মাঙ্গ) মোটামুটি সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত, কোন পক্ষই অপরকে আচ্ছন্ন বা অপ্রধান করেনি। এই অলঙ্কারকে দৃষ্টান্ত বলা চলত, কিন্তু সাদৃশ্য সর্বত্র প্রণিধানগম্য নয় বলে সাধারণ রূপক বলাই সঙ্গত। তবে উপমানের পাশে উপমেয় সর্বত্র সমান প্রাধান্য পাওয়ায় রূপক হিসাবেও এটি খুব উৎকৃষ্ট নয়।

চর্যাগীতিতে প্রকৃত রূপকের উদাহরণ আছে পূর্বোক্ত উপমান-প্রবল গানগুলিতে, কেননা প্রকৃতপক্ষে উপমেয়ের উপর উপমানের প্রাবল্যেই রূপকের যথার্থ প্রতিষ্ঠা। চর্যাগীতির ২, ৩, ৫, ৬, ৮, ১০, ১২, ১৪, ১৭, ১৯, ২০, ২১, ২৮, ৩৬, ৩৮, ৫০— এই যোলটি গানকে উপমান-প্রবল রূপক তথা প্রকৃত রূপক অলঙ্কারের উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে গোটা গান জুড়েই রূপকের বিস্তার ঘটেছে বলে সংক্ষিপ্ত ধরনের কোন সাধারণ রূপক এই সব ক্ষেত্রে নেই, রূপকের বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে যে গুলি দীর্ঘতর ও বহু বিস্তৃত সেইগুলিই এখানে উদাহৃত হয়েছে। এই দীর্ঘতর রূপক-শ্রেণীর মধ্যে পরম্পরিত রূপকই বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। তৃতীয় চর্যায় যে মদচোলাই ও বিক্রয়ের রূপক গৃহীত হয়েছে তাতে পরম্পরিতরূপকের শর্ত মোটামুটি রক্ষিত হয়েছে। পঞ্চম চর্যায় গহন নদী ও সাঁকো নির্মাণের রূপকে এক ভবনদীর রূপকের সূত্র ধরে পর পর মোহতরু অদ্বয়-টাঙ্গী, পাটি জোড়া দেওয়া, সাঁকো তৈরীর রূপক সৃষ্টি হয়েছে। ষষ্ঠ চর্যার চিত্ত-হরিণের রূপক-কল্পনা পরপর আরো কতকগুলি অনুষঙ্গী রূপকের সৃষ্টি করেছে। এই অনুষঙ্গী রূপকগুলি কার্যকারণ ভাবের পরম্পরার দ্বারা সংবদ্ধ। তাই এগুলি সমস্তই পরম্পরিত রূপকের নিদর্শন। তবে এই রূপক পারম্পর্যের মধ্য দিয়েই কোথাও কোথাও আখ্যানের ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে। সেদিক থেকে এগুলিকে আখ্যানরূপক বা allegory বলা চলত। কিন্তু আখ্যানরূপকে আখ্যান যেমন তত্ত্বনিরপেক্ষ ভাবে উপস্থিত, এক্ষেত্রে পুরোপুরি তা হয় নি, এখানে আখ্যানের মাঝে মাঝে তত্ত্ব স্ব-স্বরূপেই সোচ্চার হয়ে উঠে আখ্যানের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করেছে। যেমন ১৯ সংখ্যক ডোম্বিবিবাহ বিষয়ক চর্যাটি একটি সুন্দর আখ্যানরূপক হতে পারত, কিন্তু মাঝে উপমেয় তথা তত্ত্বপ্রসঙ্গ সোচ্চার হয়ে ওঠায় (যথা, জউতুকে কিঅ আণুতু ধাম, কিংবা মণপবণ বেণি করণ্ডকসালা, খণহ ণ ছাড়অ সহজ উন্মত্তো) আখ্যানের স্বাধীন ধর্ম ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তাই এই ধরনের চর্যাকে পরম্পরিত এবং আখ্যানরূপকের মধ্যবর্তী মিশ্ররূপক রূপেই গণ্য করা সঙ্গত। কাহ্নের অন্ত্যজ ডোম্বীচর্যা (১০), দাবাখেলা চর্যা (১২), ডোম্বীর খেয়াপার চর্যা (১৪), কামলির নৌবাণিজ্য চর্যা (৮), বীণাপাদের বীণাবাদন চর্যা (১৭), কুক্কুরী পাএর মৃতবৎসা চর্যা (২০), ভুসুকুর মূষিক চর্যা (২১) ও কাহ্নিলের সহজ নিদ্রা চর্যা (৩৬) এই শ্রেণীর মিশ্র রূপকের উদাহরণ। এই ধরনের আখ্যানমিশ্র রূপকের সঙ্গে আর একটি আলঙ্করিক প্রবণতা লক্ষণীয়। শবরপাদের ২৮ ও ৫০ সংখ্যক চর্যা দুটি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এই দুটি চর্যায় আখ্যানের ইঙ্গিত আছে, কিন্তু আখ্যান-রূপকের মত এই আখ্যানাভাস তত্ত্বের সঙ্গে খাপে খাপে মেলানো নয়। এখানে আখ্যানাভাসের চারপাশে যে নিসর্গশোভা ও সৌন্দার্যানুভূতির ব্যঞ্জনাতিরেক আছে তারই ফলে উপমানের দ্বারা উপমেয় বিস্তৃতভাবে অতিশায়িত হয়েছে। এই কারণে এই দুটি চর্যা আখ্যানমিশ্র হয়েও রূপকাতিশয়োক্তি অলঙ্কারের লক্ষণাক্রান্ত।

চর্যাগীতির অলঙ্কার-প্রয়োগ সম্পর্কে শেষ কথা এই যে, এই সব গানে অলঙ্কারের ব্যবহার গানগুলির নিজের প্রয়োজনে দেখা দিয়েছে। গানগুলির নিজের প্রয়োজন হচ্ছে তৃণমূল স্তরের গ্রামীণ নিরক্ষর শ্রোতাদের সঙ্গে ভাষাবাহিত একাত্মতা ও নৈকট্য সৃষ্টির মাধ্যমে নিজের আকর্ষণ তথা গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করা। তাই আলঙ্কারিক উপকরণে কোনো প্রথাজীর্ণ কবিপ্রসিদ্ধির অনুবর্তন নেই, সাধারণ মানুষের সুখদুঃখে ভরা সংসার-জীবন, সমাজ-প্রতিবেশ ও লৌকিক অভিজ্ঞতা থেকেই উপমানের উপাদান সংগৃহীত হয়েছে। যে গানে অলঙ্কারের পরিমাণ যত বেশী বিচিত্র ও বহু-ব্যাপক, সেই গানের কাব্যোপযোগিতাও তত বেশী। সুতরাং অলঙ্কারের মূল্যেই চর্যার কবিত্ব, এ কথা বললে অত্যুক্তি হয় না ॥

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার

দেশ-কাল-সমাজ :

কাব্যের উদ্দেশ্য সামাজিক ইতিহাস প্রণয়ন না হলেও কাব্য যেহেতু জীবন-নির্ভর সেইজন্য কাব্যের মধ্যে জীবনের বাস্তব পটভূমি তথা সমাজ-পরিবেশ-সংক্রান্ত তথ্যাদি সন্ধান করলে ইতিহাসবেত্তারা একেবারে বিফল হন না। চর্যাগীতির মূল বিষয় অবশ্য জীবনের বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত বা সামাজিক সংস্থানের সঙ্গে অন্বিত নয়, বরং চর্যাকারদের দৃষ্টিভঙ্গী তত্ত্বের দিক থেকে জীবন-বিমুখ ছিল বলেই বলা চলে। সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশায় ভরা এই যে রক্তমাংসের জীবন চর্যাকারদের কাছে তা 'সুইণে অদশ জইসা'—স্বপ্নের ছবি ও দর্পণের প্রতিবিম্বের মতই সত্য বলে মনে হলেও আসলে সত্য নয়। জীবন সম্পর্কে যাঁদের ধারণা এতটা ইহলোক-পরাঙ্মুখ তাঁদের রচনায় সাক্ষাৎভাবে তাঁদের সমসময়িক সমাজজীবনের রূপ-রসের সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়। তবে চর্যাকারদের রচনারীতি সম্পর্কে একটি কৌতুককর সত্য এই যে, তত্ত্বের দিক থেকে তাঁরা যে জীবনরূপকে অস্বীকার করেছেন, তত্ত্বকে পরিস্ফুট করতে গিয়ে তাঁরা আবার সেই জীবনরূপ থেকেই উপমান সংগ্রহ করেছেন। অর্থাৎ জীবন যে মিথ্যা একথা প্রমাণ করতে গিয়ে তাঁরা জীবনের নানা লৌকিক রূপের উপরই সবচেয়ে বেশী নির্ভর করেছেন। তাই সাক্ষাৎভাবে জীবনকে অস্বীকার করেও তাঁরা পরোক্ষভাবে তাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। চর্যাগীতিতেও তাই সমাজের ও জীবনের যে রূপ পাওয়া যায় তা পরোক্ষ, খণ্ডিত ও আভাসময়।

ভৌগোলিক পরিবেশ : চর্যাগীতি মূলত বাংলাদেশের বৌদ্ধ সাধকদের সাধনসঙ্গীত, তাই তাঁদের রচনার উপমানব্যবহারে বাংলাদেশের ভৌগোলিক প্রকৃতির প্রভাব সবচেয়ে বেশী। এই ভৌগোলিক প্রকৃতির মধ্যে আবার প্রাধান্য অনুসারে নাব্য ভূপ্রকৃতির স্থান সর্বাগ্রগণ্য। কেন না, বাংলাদেশ বিশেষভাবে নদীমাতৃক,—সমুদ্র নদী খাল বিখালে বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে বিশেষভাবে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। পরমার্থসাধনার ক্ষেত্রে নদী ও সমুদ্রের রূপক অবশ্য ভারতীয় ভক্তিসাহিত্যে বহুদিন থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে, কিন্তু নদী-খাল-নৌকাচালনা ও সাঁকো-নির্মাণের রূপক চর্যাকারেরা যত ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন তার তুলনা অন্য কোথাও নেই। এর কারণ বাংলাদেশের বিশেষ নাব্য প্রকৃতি। চর্যাকার যখন বলেন :

ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দুআন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী ॥(৫)

তখন ভারতীয় সাহিত্যে ব্যবহৃত সাধারণ নদী-রূপক অতিক্রম করে কর্দম-পিচ্ছিল পাড়বিশিষ্ট বাংলাদেশের অথৈ জলের নদীর প্রতিচ্ছবিই বিশেষভাবে ফুটে ওঠে। শুধু নদীই নয়, এ দেশে বাম-ডাহিনে যত্রতত্র খাল-বিখালের যে প্রাচুর্য তারও উল্লেখ আছে বিভিন্ন প্রসঙ্গে :

বাম দাহিণ জো খালবিখলা।
সরহ ভণই বপা উজুবাট ভাইলা ॥(৩২)

যেখানে এত গভীর জলাশয়ের প্রাচুর্য সেখানে পারাপারের প্রধান উপায় সাঁকো ও নৌকা। চাটিলপাদের গানে এই সাঁকো নির্মাণের বিস্তৃত বিবরণ আছে :

ফাড্ডিঅ মোহতরু পাটি জোড়িঅ।
আদঅ দিঢ় টাঙ্গী নিবাণে কোহিঅ ॥(৫)

টাঙ্গি দিয়ে বড়গাছ ফেড়ে কাঠের পাটাতন জোড়া দিয়ে বেশ মজবুত সাঁকো তৈরি করা হয়েছে। সাঁকো স্থলপথের সহায়, কিন্তু নদী-খাল-বিল যেখানে প্রচুর সেখানে সব সময় সাঁকোতে কাজ চলে না, তাই সেকালের লোকে জলে ভেলা বা নৌকা ভাসিয়ে যাতায়াত করত। এই নৌকাযাত্রার ছবিও অনেকগুলি গানে বিশদ ভাবে অঙ্কিত হয়েছে:

খুন্টি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছী।
বাহতু কামলি সদ্‌গুরু পুচ্ছী ॥
মাঙ্গত চড়্‌হিলে চউদিস চাহঅ।
কেডুআল. নাহি কেঁ কি বাহবকে পারঅ ॥(৮)

কিংবা ৩৮ সংখ্যক চর্যায় :

কাঅ ণাবড়্‌হি খাণ্টি মণ কেডুআল।
সদ্‌গুরুবঅণে ধর পতবাল ॥
চীঅ থির করি ধরহুরে নাহী।
অন উপায়েঁ পার ণ জাই ॥
নৌবাহী নৌকা টাণঅ গুণে।
মেলি মেল সহজেঁ জাউ ণ আণেঁ ॥

১৪ সংখ্যক চর্যায় :

পাঞ্চ কেডুআল পড়ন্তেঁ মাঙ্গে পিটত কাচ্ছী বান্ধী।
গঅণদুখোলেঁ সিংচহু পাণী ন পইসই সান্ধী ॥

উদ্ধৃত গীতাংশগুলির তাত্ত্বিক অর্থ যাই হোক, এগুলির মধ্যে নৌকা বাইবার যে বিস্তারিত বর্ণনা, বিভিন্ন প্রকার নৌকার নাম (নাব, ন্যাবড়ি, ভেলা) এবং নৌকার বিভিন্ন অবয়বের নাম আছে তাতে বাংলাদেশের নাব্য ভূপ্রকৃতি বিশেষ সজীবরূপে ফুটে উঠেছে। চর্যাগীতিতে স্থলপথের যানবাহন হিসাবে রথ (১৪) ও হস্তী (৯,১৬) ব্যবহারের আভাস আছে, কিন্তু রথ অর্থাৎ স্থলযান অপেক্ষা জলযানের শ্রেষ্ঠতা চর্যাগীতির এক জায়গায় উল্লিখিত হয়েছে ('জো রথে চড়িলা বাহবা ণ জাই কুলেঁ কুল বুড়ই'—১৪)। এ থেকেই বোঝা যায় চর্যাকারদের রূপকচিন্তায় স্থলের চেয়ে জলাশয়ের প্রভাবই বেশী।

নদীপ্রসঙ্গের পরই চর্যাগীতিতে পর্বত ও অরণ্যপ্রসঙ্গ প্রাধান্য পেয়েছে। এই উভয় প্রসঙ্গের উল্লেখে বোঝা যায় চর্যাগীতির বাংলাদেশ ভৌগোলিক সীমার দিক থেকে আজকের বাংলা থেকে অনেক বেশী প্রসারিত ছিল। ২৮ সংখ্যক গানে এই পার্বত্য ও আরণ্য প্রকৃতির ছবি আছে :

উঞ্চা উঞ্চা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী ॥
* * *
গাণাতরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলি ডালী।
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণ কুণ্ডলবজ্রধারী ॥

শবর-শবরী বা সমাজে যারা সুপ্রতিষ্ঠিত নয়, পাহাড়ের গুহা বা মালভূমি এবং সংশ্লিষ্ট বনভূমিই ছিল তাদের আবাসস্থল।

সমাজ-সংস্থান : চর্যাগীতিগুলিতে সেকালের সমাজব্যবস্থা ও সামাজিক পরিস্থিতির কিছু কিছু আভাস আছে। যে সময়ে এই গানগুলি রচিত হয়েছিল সে সময়ে বাংলাদেশে সেন-রাজবংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত। সেনবংশের পূর্বেকার বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পালবংশীয় রাজারা ধর্ম ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কিছুটা উদারনৈতিক ছিলেন, নিজেরা বৌদ্ধ হলেও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সম্পর্কে তাঁদের কোন অসহিষ্ণুতার প্রমাণ ইতিহাসে নেই। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী সেনরাজগণ পরধর্ম সম্পর্কে বেশ অসহিষ্ণু ছিলেন এবং তাঁদের আমলেই ব্রাহ্মণ্যস্মৃতির প্রসার ও ব্রাহ্মণ্য বর্ণাশ্রম-প্রথা অনুযায়ী সামাজিক স্তরবিভাগের রীতি বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। এই বর্ণানুযায়ী সমাজব্যবস্থায় বেদাশ্রিত জনগোষ্ঠী ছিল অভিজাত এবং বেদধর্ম ও বেদাচার-বহির্ভূত জনগোষ্ঠী ছিল অনভিজাত, অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য। অভিজাত সমাজ অনভিজাত সমাজ সম্পর্কে সর্বদা একধরনের জুগুপ্সা

ও বিরূপতা পোষণ করত। সেকালে রচিত নানা শিলালিপি, তাম্রশাসন এবং স্মৃতিগ্রন্থাদি থেকে সেকালের সমাজব্যবস্থার যে ঐতিহাসিক তথ্যাদি পাওয়া যায় চর্যাগীতির বিভিন্ন অংশে তার পরোক্ষ সমর্থন আছে। চর্যাকারগণ ছিলেন তান্ত্রিক বৌদ্ধ, সুতরাং ধর্মাচারের দিক থেকে তাঁরা বেদবহির্ভূত। এই কারণে চর্যাগীতির রচয়িতারা ডোম্বী, কামলি, শবর প্রমুখ অন্ত্যজ শ্রেণীর ব্যক্তি এবং চর্যাগীতির পাত্রপাত্রীগণও ডোমনী, চণ্ডালী, শুণ্ডিনী, শবরী, শবর, ব্যাধ, জেলে প্রভৃতি অস্পৃশ্য শ্রেণীভুক্ত। সমাজের অভিজাত উচ্চবর্ণীয়েরা যে নিম্নবর্ণীয়দের সম্পর্কে একধরনের শুচিবায়ুগ্রস্ত জুগুপ্সা পোষণ করতেন তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় কাহ্নপাদের একটি চর্যায় :

নগর বাহিরেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাহ সো বাহ্মনাড়িআ ॥

ডোম-চাঁড়াল-শবর প্রভৃতি তথাকথিত নিম্নবর্ণীয়েরা নগরের বাইরে, জনপদের প্রাণকেন্দ্র থেকে বহুদূরে জঙ্গলের মধ্যে, পাহাড়ের গুহায় কিংবা মালভূমির উপরে বাস করত। ব্রাহ্মণেরা তাদের স্পর্শে সমাজজীবন কলুষিত করতে চাইতেন না বলেই এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা। অবশ্য চর্যাগীতির ডোমনী, শবরী, চণ্ডালী কেউই প্রকৃত নারীচরিত্র নয়, মহাসুখ বা সহজানন্দের রূপকবিগ্রহ। কিন্তু সহজানন্দের অতীন্দ্রিয় স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে চর্যাকবিগণ যে ভাবে অস্পৃশ্য রমণীর রূপক ব্যবহার করেছেন তাতে বোঝা যায় যে সেকালের সমাজব্যবস্থায় এই স্পর্শযোগ্যতার প্রসঙ্গটি কত প্রত্যক্ষ ছিল।

জীবিকা : বর্ণভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় নিম্নবর্ণীয়েরা শুধু যে নিম্নতর সমাজমানেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তাই নয়, তাঁদের আর্থিক মানও অত্যন্ত অনুন্নত ছিল। চর্যাগীতিতে যেকয়টি জীবিকা বা বৃত্তির ইঙ্গিত আছে তা খুব একটা উচ্চমানের নয়। চর্যাগীতিতে ডোম, ব্যাধ, শুঁড়ি, সূত্রধার ইত্যাদি যেসব বৃত্তিনির্ভর চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় তা থেকে বোঝা যায় যে সমাজের নিম্নস্তরের ব্যক্তিদের আর্থিক অবস্থা বিশেষ অনুন্নত ছিল। ডোমদের প্রধান বৃত্তি ছিল তাঁত বোনা ও চাঙাড়ি তৈরি করা (১০), এ ছাড়া খেয়াপারাপার করাও ডোমদের কাজ ছিল। এই পাটনীবৃত্তি খুব একটা অর্থকরী ছিল না, পারাপারের বিনিময়ে পারার্থীর কাছ থেকে পারিশ্রমিক পাওয়া যেত যৎসামান্য—কড়ি বা বুড়ি(১৪)। তাছাড়া পারিশ্রমিক আদায়ের ব্যাপারটিও সবসময় সহজসাধ্য ছিল না। অনেক সময় পারার্থীরা পারিশ্রমিক দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করত, তখন তার শরীর তল্লাশি করে তবে পারিশ্রমিক উদ্ধার করতে হত। ডোমপুরুষদের মধ্যে কেউ কেউ চরণে নূপুর ও কর্ণে কুণ্ডল ধারণ করে কাপালিক বেশে নগরের মধ্যে বিহার করত। এই কাপালিক নটবৃত্তিও সেকালের নিম্নবর্ণীয়দের অন্যতম পেশা ছিল। অন্যান্য বৃত্তির মধ্যে মদচোলাই করা (৩), শিকার করা (৬, ২৩), গাছ কেটে কাঠের কাজ করা (৫, ৪৫) তুলো ধোনা ও মোটা কাপড় বোনার কথা (২৬, ২৫) চর্যাগীতিতে উল্লিখিত হয়েছে। এই সব বৃত্তির কথা থেকে বোঝা যায় যে, সমাজের নিম্নস্তরের ব্যক্তিরা সকলেই ছিল শ্রমজীবী, বুদ্ধিচর্চা অপেক্ষা কায়িক শ্রমই ছিল এদের জীবিকার মুখ্য মূলধন।

পক্ষান্তরে সমাজের উচ্চস্তরের ব্যক্তিদের জীবিকার কথা বিশদ ভাবে উল্লিখিত না হলেও তাঁদের জীবনধারা সম্পর্কে যে সব বিচ্ছিন্ন আভাস পাওয়া যায় তাতে মনে হয় আর্থিক অসাচ্ছল্য তাঁদের ছিল না। যাঁদের ঘরে হরি, হর, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবমূর্তির (৪৭) প্রতিষ্ঠা ছিল অর্থাৎ যাঁরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মাচারের সাপেক্ষতা করতেন আর্থিক ব্যাপারে তাঁদের কায়িক শ্রমের উপর নির্ভর করতে হত না। আগম-পুথিপাঠ ইষ্টমালা-জপ ইত্যাদি (৪০) বেদানুকূল বুদ্ধিচর্চাতেই তাঁদের সময় অতিবাহিত হত। রাজা শাসনপড়া (=তাম্রশাসন)র দ্বারা তাঁদের যে নিষ্কর ভূসম্পত্তিভোগের অধিকার দিতেন তাতেই তাঁদের অর্থের সংস্থান হত। রাজানুগ্রহে তাঁদের ঘরে থাকত সোনারূপার ভাণ্ডার (৪৯)। কায়িক শ্রম ও শাস্ত্রপাঠাদি বুদ্ধিচর্চা—জীবিকার্জনের এই দুটি ঋজু উপায় ছাড়াও অন্য তির্যক উপায়ও সেকালে বেশ প্রচলিত ছিল—চৌর্যবৃত্তি ('কানেট চৌরি নিল অধরাতী'—২, 'জো সো চৌর সৌ দুষাধী'-৩৩) এবং দস্যুবৃত্তি ('বাট অভঅ খাণ্টা বি বলআ'—৩৮, 'অদঅ দঙ্গালে দেশ লুড়িউ'—৪৯)। তবে এই তির্যক জীবিকা একেবারে বাধাহীন ছিল না। দস্যুতস্করের উপদ্রব নিবারণে সেকালেও প্রহরীনিয়োগ ('সুণ বাহ তথতা পহারী'—৩৬) ও তালাচাবি ('কোণ্ঢা তাল'—৪)র ব্যবস্থা ছিল, এবং চোর ধরার জন্য দারোগা ('দুষাধী'৩৩) ছিল, পথে ঘাটে থানা (১৫) বা কাছারি ('উআরি'—১২) ছিল।

জীবনযাপন : চর্যাগীতিতে দৈনন্দিন জীবনের যে ছবি পাওয়া যায় তার পটভূমি প্রধানত নিম্নশ্রেণীর জনগণ। কবি ও তাঁদের লক্ষ্য দল (target group) নিম্নশ্রেণীর বলেই বোধহয় নিম্নশ্রেণীর জীবনযাত্রার রূপকই বেশী ব্যবহৃত হয়েছে। সেকালের পারিবারিক কাঠামো ছিল যৌথ প্রকৃতির। শ্বশুর-শাশুড়ী-ননদ-শালী-স্ত্রী পুত্রবধূ ('বহুড়ী') সকলকে নিয়ে এই পারিবারিক সংগঠন। একাধিক চর্যায় (২,৪,১১) এই যৌথ প্রকৃতির-পারিবারিক কাঠামোর ইঙ্গিত আছে। এই পারিবারিক সম্পর্ক সম্ভবত বেশ দৃঢ়বদ্ধ ছিল। পরিবারের মধ্যে থেকে প্রকাশ্যে ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচারের তেমন অবকাশ ছিল না। তাই কাহ্ন যখন ডোম্বীর প্রতি আসক্ত হন তখন তাঁকে পরিবারের শাশুড়ী-ননদ-শালী প্রভৃতি সকল পরিজনকে হত্যা করে (১১) গৃহত্যাগী হয়ে তবে প্রেমিকার সঙ্গে মিলিত হতে হয়। অন্যদিকে পুত্রবধূ মনে মনে পরপুরুষের প্রতি আসক্ত হলেও তাকে প্রকাশ্যে পারিবারিক আনুগত্য স্বীকার করতে হয় এবং প্রেমিকের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য শ্বশুরের নিদ্রাকর্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। এছাড়া, চর্যাগীতিতে জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ প্রসঙ্গে যে আচার-অনুষ্ঠানের উল্লেখ আছে তার সঙ্গে আধুনিক বাঙালি সমাজের সামঞ্জস্য বিদ্যমান, অর্থাৎ আধুনিক কালেও উক্ত উপলক্ষে যে সব সামাজিক অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে, তা আসলে প্রায় হাজার বছরের পুরাতন জীবনাচরণেরই অনুবৃত্তি। সন্তান প্রসবের জন্য একটি পৃথক আঁতুড় ঘরের ব্যবস্থা সেকালেও ছিল। উপযুক্ত আঁতুড় ঘরের অভাবে যে নবজাতকের প্রাণ বিপন্ন হবার আশঙ্কা ছিল কুক্কুরীপাদের চর্যায় তার ইঙ্গিত আছে:

ফেটলেউ গো মাএ অন্তউড়ি চাহি।
জা এথু বাহাম সো এথু নাহি॥

পহিল বিআণ মোর বাসনয়ূড়া।
নাড়ি বিআরন্তে সেব বাপুড়া ॥(২০)

বাঙালি হিন্দু সমাজে মৃতদেহ সৎকারের যে রীতি প্রচলিত আছে ৫০ সংখ্যক চর্যায় তারও কিছু আভাস পাওয়া যায় :

চারি বাসে তাভলা রেঁ দিআঁ চণ্ডালী।
তঁহি তোলি শবরো ডাহ কএলা কান্দ সগুণ শিআলী ॥
মারিল ভবমত্তা রে দহদিহে দিধলি বলী।
হের সে শবরো ণিরেবণ ভঈলা ফিটিলি ষবরালী ॥

চার বাঁশের চাঁচারি দিয়ে খাট গড়া হল। তাতে তুলে শবরকে দাহ করা হল, শকুন শিয়াল কাঁদতে লাগল। ভবমত্তকে মারা হল, দশ দিকে পিণ্ড দেওয়া হল। শবর নিশ্চিহ্ন হল, তার শবরালিও ঘুচল।

বিবাহের উদ্যোগ ও পদ্ধতির মধ্যেও একালের সঙ্গে সেকালের বেশ মিল ছিল। বাদ্যভাণ্ড সহযোগে সাড়ম্বর বিবাহযাত্রা, যৌতুক গ্রহণ, যুবতী রমণীদের বাসর জাগা—একালেও যেমন, সেকালেও তেমনি প্রচলিত ছিল। কাহ্নপাদের একটি চর্যায় (১৯) সেকালের বিবাহযাত্রার একটি সুন্দর ছবি পাওয়া যায় :

ভব নির্ব্বাণে পড়হ মাদলা।
মণ পবণ বেণি করঙ কসালা ॥
জঅ জঅ দুন্দুহি সাদ উছলিআঁ।
কাহ্ন ডোম্বি বিবাহে চলিআ ॥
ডোম্বী বিবাহিআ অহারিউ জাম।
জউতুকে কিঅ আণুতু ধাম ॥
অহিণিসি সুরঅ পসংগে জাঅ।
জোইণি জালে রএণি পোহাঅ ॥

এই ধরনের আড়ম্বরবহুল বিবাহ ছাড়াও সেকালে ডোম প্রভৃতি তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর সম্প্রদায়ের মধ্যে 'সাঙ্গা' বা বিধবাবিবাহের প্রচলন ছিল, কাহ্নের দুটি চর্যায়—'আলো ডোম্বী তোএ সম করিব ম সাঙ্গ'(১০), 'চলিল কাহ্ন মহাসুহ-সাঙ্গে' (১৩)—তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

শবর-পাদের দুটি চর্যায় (২৮,৫০) সেকালের আদিবাসীদের দাম্পত্য জীবনের সুখসমৃদ্ধ চিত্র পাওয়া যায়। পাহাড়ের উপরে টিলায় শবরদম্পতির বাস। বাড়ির পাশেই কাপাস আর ধানের ক্ষেত। কাংনি ধান পেকে উঠলে তার থেকে তৈরি মাদক পানীয়

পান করে শবর-শবরী জ্যোৎস্নারাতে প্রমত্ত হয় এবং মিলনসুখে রত হয় :

হেরি যে মেরি তইলা বাড়ী খসমে সমতুলা।
যুকড় এসে রে কপাসু ফুটিলা।
তইলা বাড়ির পাসেঁর জোহ্না বাড়ি ভাএলা।
ফিটেলি অন্ধারী রে অকাশ ফুলিআ॥
কঙ্গুচিনা পাকেলা রে শবরাশবরি মাতেলা।
অণুদিণ সবরো কিম্পি ন চেবই মহাসুহেঁ ভেলা॥ (৫০)

শবর-শবরীর দাম্পত্য জীবনে সাময়িক ভুল বোঝাবুঝির অবকাশে কখনো আবার মধুরতর বৈচিত্র্য আসে। শবরী বিচিত্র বসনভূষণে সজ্জিত হওয়ায় শবর তাকে চিনতে না পেরে পরনারী বলে ভুল করে উন্মত্ত হয়ে ওঠে, শবরী তখন অনুনয় করে বলে:

উমত সবরো পাগল শবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহৌরী।
নিঅ ঘরিণী ণামে সহজ সুন্দারী। (২৮)

তারপর তিনধাতুর খাট পেতে তাতে উভয়ের মিলনশয্যা রচিত হল। তারপর কর্পূরবাসিত তাম্বূল চর্বণ করে শবরদম্পতি নিবিড় মিলনে রজনী অতিবাহিত করল। এই বর্ণনার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা যাই হোক, শবর-শবরীর দাম্পত্য জীবনযাপনের একটি বিশ্বাস্য চিত্র হিসাবে এর বাস্তব মূল্য অপরিসীম।

আমোদ-প্রমোদ : চর্যাগীতির কতকগুলি অংশে সেকালের বাঙালিরা অবসর সময়ে, উৎসবে ও সামাজিক অনুষ্ঠানে যে ভাবে কালাতিপাত করত তার আভাস পাওয়া যায়। অবসর বিনোদনের অন্যতম প্রধান উপায় ছিল দাবাখেলা ("নয়বল"-১২)। সেকালের দাবাখেলার রীতিপদ্ধতির আভাসও উক্ত চর্যায় (১২) আছে :

পহিলেঁ তোড়িআ বড়িআ মারিউ।
গঅবরেঁ তোলিআ পাঞ্চজনা ঘালিউ॥
মতিএঁ ঠাকুরক পরীনিবিত্তা।
অবশ করিআ ভববল জিতা॥

প্রথম তুড়ে বড়ে মারা হল, গজ দিয়ে পাঁচজনকে ঘায়েল করা হল। মন্ত্রীকে দিয়ে ঠাকুরকে (রাজাকে) ঘিরে খেলা জয় করা হল।

অবসরের সময় মদ্যপান সেকালের অন্যতম সামাজিক ব্যসন ছিল। যে সমাজের অধিকাংশ মানুষই ছিল শ্রমজীবী, সেখানে দৈহিক ক্লান্তি অপনোদনের জন্য ব্যাপক মদ্যপানের অভ্যাস প্রচলিত থাকাই স্বাভাবিক। সমাজজীবনে এই ব্যাপক মদ্যাসক্তিকে

কেন্দ্র করে মদ চোলাইয়ের কুটিরশিল্প সেকালে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। সেকালের মদ চোয়ানোর পদ্ধতি, মদের পসরা সাজানোর রীতি এবং শুঁড়িবাড়ির বিশেষ চেহারার একটি প্রত্যক্ষ চিত্র বিরুআর চর্যায় (৩) পাওয়া যায় :

এক সে শুণ্ডিনি দুই ঘরে সান্ধঅ।
চীঅণ বাকলঅ বারুণি বান্ধঅ ॥
* * *
দশমি দুআরত চিহ্ন দেখইআ।
আইল গরাহক অপণে বহিআ ॥
চউশঠী ঘড়িয়ে দেঢ় পসারা।
পইঠেল গরাহকা নাহি নিসারা ॥

চর্যাগীতিতে উল্লিখিত বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর নাম এবং বাদ্যযন্ত্র ও নাচগানের প্রসঙ্গ থেকে বোঝা যায় যে সেকালের আনন্দানুষ্ঠানে নৃত্য-গীতাদির বিশেষ প্রাধান্য ছিল। ১৭ সংখ্যক চর্যায় 'হেরুকবীণা' নামে এক শ্রেণীর বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে। লাউয়ের খোল, তন্ত্রী ও দণ্ড দিয়ে এই যন্ত্র নির্মিত, করপার্শ্ব দিয়ে চেপে ধরে এই যন্ত্র বাজালে মধুর ধ্বনি উত্থিত হয় :

সুজলাউ সসি লাগেলি তান্তী।
অণাহা দাণ্ডী বাকি কিঅ অবধূতি ॥
* * *
জবে করহা করহকলে চাপিউ।
বতিশ তান্তি ধনি সএল ব্যাপিউ।

যন্ত্রের গঠন ও বাদন-পদ্ধতি দেখে মনে হয় এটি একতারা বা গোপীযন্ত্র-জাতীয় কোন বাদন-যন্ত্র। এই চর্যারই শেষে আছে :

নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী।
বুদ্ধনাটক বিসমা হোই।

(পুরুষ) বজ্রাচার্য নাচছেন আর (নারী) দেবী গান করছেন—এর ফলে বুদ্ধনাটক বিপরীতভাবে অনুষ্ঠিত হল। এই পদ থেকে বোঝা যায় যে সেকালে উৎসবে বা আনন্দানুষ্ঠানে নাটগীতির পালা অভিনীত হত। সেই পালায় স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই অংশগ্রহণ করত। স্ত্রীলোকের পক্ষে নর্তকীর ভূমিকা ও পুরুষের পক্ষে গায়কের ভূমিকাই ছিল নাটগীতির সাধারণ রীতি।

এছাড়া চর্যাগীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেকালের বাঙালির দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ব্যবহৃত নানা ছোটো-খাটো উপকরণের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। যথা, নিত্য ব্যবহৃত তৈজসপত্র—হাঁড়ী, "পিটা" (দুধ দোহনের পাত্র), "ঘড়ি" (ঘড়া) "ঘড়ুলী" (গাড়ু)। শৃঙ্গার দ্রব্য—'দাপন,' 'অদশ' (আরশি), কাপুর (কর্পূর), 'তাঁবোলা' (তাম্বূল)। অলঙ্কার দ্রব্য—'কানেট' (কর্ণভূষণ), ঘণ্টা-নেউর (নূপুর), কাঙ্কণ (কাঁকন), মুত্তিহার (মুক্তাহার), কুণ্ডল। বাদ্যভাণ্ড ও বাদ্যযন্ত্র—পড়হ (পটহ), মাদলা (মাদল), করঙ (ঢোল ?), কশালা (কাঁসি), ডমরু, ডমরুলি (ছোট ডমরু), বীণা, বাঁশি। অস্ত্রশস্ত্রাদি অন্যান্য জিনিসপত্র—কুঠার, টাঙ্গি, কোণ্ডাতাল (তালাচাবি), পিণ্ডি, পিহাড়ি (পিঁড়ি), ইত্যাদি ॥

অনুবর্তন :

যে ধর্মীয় ও সামাজিক পরিবেশের আনুকূল্যে চর্যাগীতিসমূহের সৃষ্টি সেই পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চর্যাগীত রচনার ধারা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এসেছিল, তবে এই ধারা একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় নি। বাংলাদেশে তুর্কী আক্রমণের পর ধর্মীয় উপপ্লব দেখা দিলে ধর্মচর্চার সঙ্গে এই জাতীয় ধর্মসঙ্গীত রচনার ধারাও এ দেশে ক্রমে লুপ্ত হয়ে এসেছিল, কিন্তু নেপাল ও তিব্বতের বৌদ্ধমঠে এই ধর্মচর্চা অক্ষুণ্ণ ছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে চর্যাগীতি রচনার ধারাও অব্যাহত ছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আবিষ্কারের পর রাহুল সাংকৃত্যায়ন প্রমুখ গবেষকগণ নেপাল ও তিব্বত থেকে আরও কিছু চর্যাগীত আবিষ্কার করেছেন। নবাবিষ্কৃত চর্যার ভাষা থেকেই এগুলির অর্বাচীনত্ব প্রতিপন্ন হয়, কিন্তু কালগত নবীনত্বে বিষয়বস্তু ও রচনারীতির বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নি, রূপ ও রূপকের দিক থেকে এই নতুন গানগুলি পুরাতন গানগুলিরই অভ্রান্ত অনুবর্তন। যেমন, 'বিনয়শ্রী'-ভণিতাযুক্ত একটি অর্বাচীন চর্যা :

মেহলি চণ্ডালী ঘরবি বাহ্মণ
জগ বিটালন্তি তে দুই লাম্বন।
হল সহি কামণ্ডি [কা মঞি ?] অচাভুঅ দিট্ঠা
বাহ্মণ মনুস চণ্ডালিএঁ তুট্ঠা।
অইসি নিরাজ কমাল ণ দিশই
মাউগ চণ্ডালী বাহ্মণে পইসই।
দেখু চণ্ডালীর বাহ্মণ জার
পাঞ্চ বান্ন ভইল্ল একাকার।
তে দুই নাসন্তি সম সাঁজোএ
ভণই বিনয়শ্রী সদ্‌গুরু বোহেঁ ॥

(ডঃ সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস,
প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ, পৃঃ ৫৩ থেকে পুনরুদ্ধৃত)।

"মহিলা (গৃহিণী) চণ্ডাল, গৃহপতি ব্রাহ্মণ। তারা দুইজন (পরস্পর) অবলম্বন করে জগৎকে অশুদ্ধ করেছে। ওলো সই, আমি কি অত্যদ্ভুত (বিষয়) দেখলাম। ব্রাহ্মণ মানুষ চণ্ডালীতে তুষ্ট। এমন অরাজক ব্যাপার দেখা যায় না। চণ্ডালী স্ত্রীলোক ব্রাহ্মণে প্রবেশ করেছে। দেখুক (বা 'দেখ') চণ্ডালীর ব্রাহ্মণ জার, পঞ্চবর্ণ একাকার হল। তারা দুইজন সমসংযোগে নাশ হয়। সদগুরুর উপদেশে বিনয়শ্রী বলে"। রূপ, রূপক ও স্বরূপের দিক থেকে প্রাচীন চর্যাগীতগুলির সঙ্গে এর তেমন কোনো তফাৎ দেখা যায় না। উদ্ধৃত চর্যাটিতে "কাহ্নের দুইটি চর্যাগীতির(১০,১৮) প্রতিধ্বনি শোনা যায়" (ডঃ সুকুমার সেন, তদেব পৃঃ ৭৩)।

রাহুল সাংকৃত্যায়নের পর অধ্যাপক আর্নল্ড বাকে ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দে নেপালে গিয়ে এক নেপালী সন্ন্যাসীর কাছ থেকে বাইশটি গান সংগ্রহ করেন। অধ্যাপক বাকের সূত্র ধরে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত কয়েক বছর পর (১৯৬৩) নেপাল ও সন্নিহিত অঞ্চল থেকে আরও কতকগুলি সমজাতীয় গান সংগ্রহ করেন। "তাঁহার সংগৃহীত চর্যাগীতিকার মোট সংখ্যা দাঁড়াইল আঠানব্বই। প্রাপ্ত গানগুলিতে তিনি দেখিলেন যে, বজ্রবারাহী, বাশুলি প্রভৃতি দেবদেবীরও উল্লেখ রহিয়াছে। তাঁহার অনুমান, পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যে যে শাক্ত সাহিত্যের বিকাশ হয়, তাহার পূর্বসূচনা এই বজ্রগীতিকাগুলিতে পাওয়া যাইবে। নেপালের সাধুসন্ত ও বৌদ্ধসমাজে এগুলি সাধারণতঃ 'চা-চা' গান নামে পরিচিত। ডঃ দাশগুপ্তের মতে এটি বোধহয় 'চর্যা'র অপভ্রংশ। তিনি এই পদগুলিকে ভাষাতাত্ত্বিক ও সাধন সম্প্রদায়গত বৈশিষ্ট্য ধরিয়া তিনভাগে সাজাইলেন। তাঁহার অনুমান ইহার উনিশটি পদ দশম হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে, চুয়াল্লিশটি পদ ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকের মধ্যে এবং অবশিষ্ট পঁয়ত্রিশটি পদ পঞ্চদশ বা তাহার পরবর্তীকালে রচিত" ('চর্যাগীতিকার নবাবিষ্কৃত উপাদান : শশিভূষণ দাশগুপ্ত সংগৃহীত'—বাংলা সাহিত্য পত্রিকা, পৃ. ৯, প্রথম বর্ষ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, মার্চ ১৯৬৯)। আচার্য শশিভূষণের এই সংগ্রহ ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুযোগ্য সম্পাদনায় 'নব চর্যাপদ' নামে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছে (১৯৮৯)। এই সংগ্রহ থেকে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের মধ্যে রচিত বলে অনুমিত একটি গান এখানে নমুনাস্বরূপ উদ্ধার করা গেল :

রাগ—রামকরী। তাল-জটি

উর্ধ্ব রক্ত পিঙ্গল কেশা।
নাচই হেরুঅ উন্মত্ত বেশা ॥ ধ্রু ॥
হেরুও হেরুও দে মোরু কোলা।
ডোম্বি চণ্ডালি লইআ ন ভোলা ॥
বামে ডোম্বি দহিনে চণ্ডালি।
মাঝে বিলাসই হেরুও বালী ॥

দহিনে ডমরু বামে খট্টাঙ্গ।
অষ্টজোইনি মোর হেরুঅ সঙ্গ॥
গাবন্তি কর্ণ পা হেরুও দাসা।
কায় বাক চিত্ত হেরুও নিরাসা॥[১]

চর্যাগীতির ধারা বাংলা দেশে লুপ্ত হলেও তার ঐতিহাসিক প্রবর্তনা বাংলা সাহিত্যে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়নি। চর্যা-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যেরও মূল ভিত্তি ছিল ধর্ম, এই সব ভিত্তিস্থানীয় ধর্মসাধনার সঙ্গে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের সাক্ষাৎ সম্পর্ক না থাকলেও কোন কোন ক্ষেত্রে অগোচর সংযোগ ছিল। চর্যাসাধকদের ধর্মাচরণের রীতিবৈচিত্র্য অবিকল অনুসৃত না হলেও তাঁদের ধর্মসাধনার মূল সহজিয়া তান্ত্রিক প্রকৃতিটি পরবর্তী বাংলাদেশের নাথ সম্প্রদায়, বৈষ্ণবধর্মের সহজিয়া শাখায় এবং বাউল-কর্তাভজা সম্প্রদায়ের ধর্মভাবুকতায় গৃহীত হয়েছিল। নাথ সম্প্রদায়ের সাধকেরা অবশ্য চর্যাকারদের মত ক্ষুদ্রাকৃতি গান রচনা করেন নি, তাঁরা আখ্যান-নির্ভর বড় কাহিনীকাব্য রচনা করেছিলেন। কিন্তু সাধনা ও সাধনপদ্ধতির দিক থেকে চর্যাসাধক ও নাথসাধকদের মধ্যে মিল ও সংযোগ থাকায় নাথপন্থীদের রচনায় রূপক-কল্পনা ও উৎপ্রেক্ষা ব্যবহারে চর্যাকবিদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। চর্যাকবিদের চন্দ্রসূর্য, গঙ্গাযমুনা, দেহনৌকা-মনকেডুয়ালের উপমা নাথপন্থীদের রচনাতেও বহুল পরিমাণে দেখা যায়। যেমন,

১। এদেশিয়া হাড়ী নয় বঙ্গদেশে ঘর।
চান্দ্রসুরুজ রাখেছে দুই কানের কুণ্ডল॥
(গোপীচন্দ্রের গান, ক. বি. পৃ, ১)

২। যমরাজা হয় যার নিজের চাকর।
চন্দ্রসূর্য দুইজন কুণ্ডল কানের॥
(গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস, ক. বি. পৃ. ৪৪০-৪৪১)।

নাথপন্থীদের অপর কাব্য 'গোরক্ষ বিজয়ে'ও চর্যার অনুরূপ রূপক-কল্পনা ও প্রহেলিকা ব্যবহারের রীতি লক্ষ্য করা যায় :

১। ইড়া পিঙ্গলা দুই নদীর যে মাঝে।
দশমীতে তালি দিয়া রহিবা সহজে॥ (পুঃ ১৪৪)

---

১. নব চর্যাপদ সম্পর্কে বিশদ অবগতির জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত 'নব-চর্যাপদ' গ্রন্থটির অন্তর্গত (পৃ ২২-৯৭) অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মজুমদারের 'নব চর্যাপদ ও ভাষাপ্রসঙ্গ'-শীর্ষক নিবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

২। ডুবিল তোমার নৌকা কাছি গেল ছিঁড়ি।
তোমার সকল ভরা করিলেক চুরি ॥ (পৃ ১০৭)

৩। নগরে মনুষ্য নাহি ঘরে ঘরে চাল।
আন্ধলে দোকান দিয়া খরিদ করে কাল ॥ (পৃ ১৩৮)

৪। মৎস্যের প্রহরী তুমি রাখিয়াছ উদ।
বিড়াল প্রহরী দিলা ঘন আউটা দুধ ॥
(তুলনীয় : চর্যা : ৩৩)

পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপক অঞ্চলে যে ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচলিত আছে, সেই ধর্মঠাকুরের পরিকল্পনায় বাংলাদেশে ক্ষীয়মাণ বৌদ্ধ ধর্ম-বিশ্বাসের লৌকিক সংযোগ ছিল, তাই ধর্মমঙ্গলে, ধর্মঠাকুরের গানের ছড়ায় এবং-ধর্মপূজা-সংশ্লিষ্ট শূন্যপুরাণেও চর্যাগীতির রূপক ও ভগ্নাংশ রক্ষিত হতে দেখা যায়। যেমন,

১। মন হৈল নৌকা পবন কেরআল।
সুনার নৌকা রূপার কেরআল ॥
(শূন্য পুরাণ, চারু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত পৃ ১০৫)

২। মন কর নৌকা পবন কেরআল।
আপুনি তো নিরঞ্জন হোইলা কাণ্ডার ॥ (তদেব, পৃ ২০৯)

৩। পখুর পাড়েতে সদা-ডোমের কুড়িয়া।
ঘন ঘন আইসে যায় ব্রাহ্মণ বড়ুয়া ॥
(ধর্মপূজাপদ্ধতি—তু. চর্যা ১০)।

নাথপন্থী সাধকদের রচনায় চর্যাগীতির অনুরূপ যোগনির্ভর সাধনতত্ত্ব ও রূপক-কল্পনা প্রাধান্য পেলেও চর্যাগানের সাঙ্গীতিক রূপটি সেখানে অনুসৃত হয়নি। সাধনতত্ত্বের গূঢ়তা ও সহজিয়া প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে সাঙ্গীতিক প্রকৃতি অনুসৃত হয়েছে বৈষ্ণব রাগানুগা সাধনার রাগাত্মিক পদাবলীতে এবং তারপর অষ্টাদশ শতাব্দীর কর্তাভজাবাউল সম্প্রদায়ের সাধনসঙ্গীতে। চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর বাংলা দেশের বৈষ্ণব ধর্মসাধনায় নানা শাখাবিস্তার ঘটে এবং সেই সূত্রে লৌকিক তন্ত্রাচারও বৈষ্ণবধর্মের কোন কোন শাখার অঙ্গীভূত হয়। এই বৈষ্ণব সাহিত্যেও পূর্বতন তন্ত্রনির্ভর সাহিত্যের রূপ ও রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়, বৈষ্ণব কবিদের রাগাত্মিক পদাবলী এর উদাহরণস্থল। বৈষ্ণব রাগাত্মিক পদাবলীতে রূপক ব্যবহার, সন্ধ্যাবচনের প্রয়োগ ও প্রহেলিকা বিলাসে

ঠিক চর্যাগীতির ঐতিহ্যই অনুসৃত হয়েছে :

১। গোপন পিরীতি গোপনে রাখিবি
সাধিবি মনের কাজ।
সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাবি
তবে ত রসিকরাজ ॥
যে জন চতুর সুমেরু-শিখর
সূতায় গাঁথিতে পারে।
মাকসার জালে মাতঙ্গ বাঁধিলে
এ রস মিলয়ে তারে ॥

২। ফলের উপরে ফুলের বসতি
তাহার উপরে গন্ধ
গন্ধ উপরে এ তিন আখর
এ বড় বুঝিতে ধন্ধ ॥

৩। হরিণ দেখিয়া বেয়াধ পলায়
কমল গেল সে ভৃঙ্গ।
যমের ভিতরে আলসের বসতি
রাহুতে গিলিল চন্দ্র ॥
সুমেরু উপরে ভ্রমর পসিল
এ কথা বুঝিল কে।
চণ্ডীদাস কহে রসিক হইলে
বুঝিতে পারিবে সে ॥

বৈষ্ণব সহজিয়াদের কাছে যা 'গোপন পীরিতি', বাউলদের কাছে তা-ই মনের মানুষের সন্ধান হয়ে দেখা দিয়েছে। অবশ্য নানাদিক থেকেই সহজিয়া বৈষ্ণব ও চর্যাসাধকদের সঙ্গে বাউল সম্প্রদায়ের যথেষ্ট প্রভেদ থাকা সম্ভব। কিন্তু সাধনা, সাধনতত্ত্ব, তত্ত্বপ্রকাশের রূপকভঙ্গী এবং গুরুবাদ—এই সব লক্ষণের দিক থেকে পূর্বগামী সহজিয়া বৈষ্ণব এবং বিশেষত চর্যাসাধকদের সঙ্গে বাউল সাধকদের আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এই সাদৃশ্য একেবারে আকস্মিক না-ও হতে পারে, চর্যাসাধকদের দেহাশ্রয়ী যোগসাধনার ঐতিহ্য পরবর্তীকালে উত্তরাপথে প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল, বাউলদের সাধনা হয়ত তারই একটা কালোপযোগী অভিব্যক্তি। তাই বাউলের গানে চর্যাগীতির মতই দেহতত্ত্বের প্রাধান্য, সন্ধ্যাভাষার আলো-আঁধারি প্রচ্ছন্নতা এবং অর্থগূঢ় প্রহেলিকা-বিলাস লক্ষ্য করা যায়। চর্যাগানের মতই জীবনের সহজ, ঘরোয়া ও লৌকিক উপকরণ থেকে তত্ত্বের উপমান সংগৃহীত :

১। কুলের বৌ হয়ে মন আর কত দিন থাকবি ঘরে।
ঘোমটা খুলে চলনা রে যাই সাধবাজারে ॥
কুলের ভয়ে কাজ হারাবি, কুল কি নিবি সঙ্গে করে।
(লালন-গীতিকা)

২। ওরে আমার মন-গোয়াল।
দুবেলা তুই দুধ যোগাবি একথাটি আটা আটি।
দুধ তুই আমারে দিবি।
ঘরে আছে ধর্ম-গাভী তাহার দুধ লইয়া লবি। (হারামণি)

৩। খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কেমনে আসে যায়।
ধরতে পারলে মনবেড়ী দিতাম তাহার পায় ॥
আঠ কুঠুরী নয় দরজা আঁটা,
মধ্যে মধ্যে ঝলক কাটা,
তার উপর আছে সদর-কোটা—
আয়না মহল তায় ॥
(লালন-গীতিকা)

৪। চিনায়ে দে গুরু ধন, চিনায়ে দে।
জলের তলে তালের গাছটি,তারি তলে চিতে
মায়ে পুতে যায় সহমরণে দাঁড়িয়ে দেখে পিতে।
(হারামণি)

কিন্তু চর্যাগীতির ভাবগত উত্তরাধিকার বাউলগানের মধ্যেই নিঃশেষিত হয় নি। বাউল গানের মধ্য দিয়ে তার ধারা আধুনিক সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রবেশ করেছে। রবীন্দ্র-সাহিত্য এই প্রাচীন অধ্যাত্মসাহিত্য ও আধুনিক ব্যক্তিচেতন সাহিত্যের মধ্যে যোগসূত্রবিশেষ। রবীন্দ্র-সাহিত্যে যে একধরনের সহজ ও প্রসন্ন অধ্যাত্মভাবুকতা লক্ষ্য করা যায় তার সঙ্গে বাউল সম্প্রদায়ের সহজ অধ্যাত্মভাবুকতার অদ্ভুত মিল আছে। এই সাদৃশ্য একেবারে আকস্মিক নয়। রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মভাবনার একদিকে যেমন উপনিষদের অধ্যয়নগত প্রভাব প্রবল অন্যদিকে তেমনি বাউল গায়কদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত যোগাযোগের প্রভাবও কম নয়। কবি নিজেই একজায়গায় স্বীকার করেছেন "শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউলদলের সঙ্গে আমার সদা-সর্বদাই দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হত। আমার অনেক গানে আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি এবং অনেক গানে অন্য রাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত-বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিল ঘটেছে। এর থেকে থেকে বোঝা যাবে, বাউলের সুর ও বাণী আমার মনের মধ্যে সহজভাবে বিঁধে গেছে" ভূমিকা : হারামণি ১ম খণ্ড)। 'বাউলের সুর ও বাণী' রবীন্দ্রনাথের মনে 'সহজভাবে বিঁধে গেছে' বলেই তাঁর প্রায় প্রতিটি প্রধান নাটকেই বাউল জাতীয়

চরিত্রের আবির্ভাব এবং গানেও সেই একই সুরের অনুসরণ :

আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে,
তাই হেরি তায় সকল খানে ॥
আছে সে নয়নতারায় আলোক ধারায়, তাই না হারায়—
তাই দেখি তায় যেথায় সেথায়
তাকাই আমি যেদিক পানে।

প্রকৃতপক্ষে উপনিষদের ব্রহ্মচিন্তা ও বাউলদের মনের মানুষ সন্ধানের গোষ্ঠীগত মানসিক প্রয়াস রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত অধ্যাত্মচেতনার আধারে সুষ্ঠু সমন্বয় লাভ করেছিল। এই সমন্বিত অধ্যাত্মোপলব্ধির সঙ্গে এদেশের প্রাচীনতর সাধনার কোন পদ্ধতিগত সম্পর্ক নেই, তবে মূলগত অনুভূতির দিক থেকে নিগূঢ় সারূপ্য ও সাযুজ্য বিদ্যমান। সুতরাং রাবীন্দ্রিক অধ্যাত্মভাবনাকে এদেশের প্রাচীন অধ্যাত্মভাবনার আধুনিকতর অভিব্যক্তি বললে ভুল করা হয় না এবং সেদিক থেকে চর্যাগীতির মর্ম-সত্যও সেখানে একেবারে অনুপস্থিত নয়।

শুধু ভাবের দিক থেকেই নয়, রূপের (form) দিক থেকেও পরবর্তী সাহিত্যের সঙ্গে চর্যাগীতের পরোক্ষ সংযোগ লক্ষ্য করা যায়। কয়েকটি চরণের সমন্বয়ে একটি ভণিতা-যুক্ত যে কাব্যরূপ চর্যাগীতে পাওয়া যায় পরবর্তীকালের বৈষ্ণব ও শাক্তপদাবলীতে তারই অনুবর্তন ঘটেছে। শুধু তাই নয়, বাংলা সাহিত্যের মূল সুর যে গীতলতা বা lyricism তারও সূচনা এই চর্যাগীতগুলিতে। সুতরাং বাংলা সাহিত্যে চর্যাগীত এক মহৎ ঐতিহ্য, পরবর্তী সাহিত্য সেই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারকেই নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে আধুনিক কাল পর্যন্ত বহন করে এনেছে ॥

‘চর্যাগীতিকোষবৃত্তি’

মূল পুথির পাঠ, পাঠান্তর ও পাঠবিচারসমেত।

ভুসুকুপা

কাহ্নপা

সরহপা

লুইপা

রাহুল সাংকৃত্যায়নের তিব্বতী সংগ্রহ থেকে পুনর্মুদ্রিত চর্যাগানের কয়েকজন বিশিষ্ট কবির পটচিত্র।

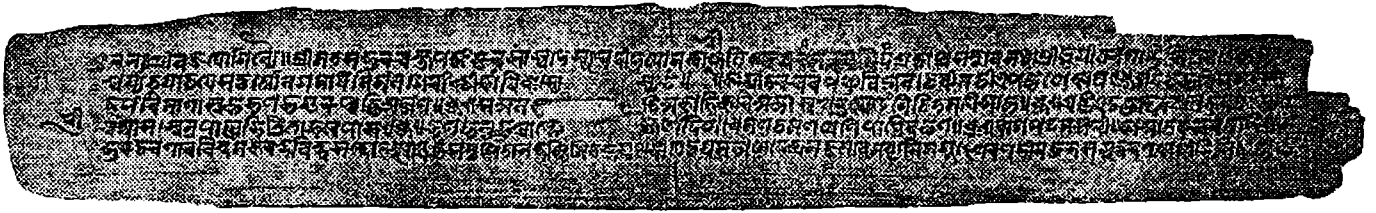

নমঃ শ্রীবজ্রযোগিনৈ্যে ॥ শ্রীমৎসদ্‌গুরুবক্ত্রপঙ্কজরসাস্বাদস্ফুরদ্ধীদয়ো নত্বা শ্রীকুলিশেশমদ্দ্বয়ধিয়ং শ্রদ্ধাপ্রসন্নাননঃ। শ্রীলূয়ীচরণাদিসিদ্ধরচিতেপ্যা
শ্চর্য্যচর্য্যাচয়ে সদ্বর্ত্মাবগমায়[১] নির্মলগিরাং টীকাং বিধাস্যে স্ফুটং ॥ কাআ তরুবর পঞ্চবি ডাল। চঞ্চল চীএ পইঠো কাল ॥ ধু ॥ দিঢ় করিঅ মহাসু
হ পরিমাণ। লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ ॥ ধু ॥ সঅল স[মা][২] হিঅ কাহি করিঅই। সুখদুখেতেঁ নিচিত মরিআই ॥ ধু ॥ এড়িএউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটে
র আস। সুন্নু পাখ ভিড়ি লাহু রে পাস ॥ ধু ॥ ভণই লুই আহ্মে ঝাণে[৩] দিঠা। ধমণ চমণ বেণি পাণ্ডি বইণ[৪] ॥ ধু ॥ রাগ পটমঞ্জরী ॥ কাআ তরুবরেত্যাদি শ্রীম
দ্‌গুরুচরণারবিন্দমকরন্দবিন্দুসন্দোহশান্তসন্তর্পিতানন্দস্তিমিহ্ন[দ]য়ঃ। সত্যদ্বয়মহামোহভ্রমজলধিমধ্যনিমগ্নাঽশরণদীনজনসমুদ্ধরণকাম্যো হি সিদ্ধাচার্য্য

১. পুথিতে সদ্বর্ত্মো ২. পুথিতে বন্ধনরজ্জুর ঘর্ষণে 'মা' লুপ্ত ৩. পুথিতে স-এর উপরে over-writing আছে ৪. সম্ভবত লিপিকর-প্রমাদ

পুথির প্রথম পাতা (folio)-র দ্বিতীয় পৃষ্ঠা (১/খ)র আলোকচিত্র এবং ঐ পৃষ্ঠার প্রতি পঙ্‌ক্তির অবিকল প্রতিলিপি

[পুথিপৃষ্ঠা ৩।খ]

॥ রাগ পটমঞ্জরী—লুইপাদানাম্ ॥

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো[১] কাল ॥ ধু ॥
দিঢ়[২] করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
[৩]লুই ভণই[৩] গুরু পুচ্ছিঅ জাণ। ধু ॥
সঅল [৪]স[মা] হিঅ[৪] কাহি করিঅই।
সুখদুখেতেঁ নিচিত মরিআই[৫] ॥ ধু ॥
এড়িএউ[৬] ছান্দক বান্ধ[৭] করণক পাটের[৭] আস।
সুন্ন[৮]পাখ [৯]ভিড়ি[৯] লাহু রে পাস ॥ ধু ॥
ভণই লুই আম্হে ঝাণে[১০] দিঠা।
ধমণ চমণ বেণি[১১] পিণ্ডি[১১] [১২]বইঠা[১২] ॥ ধু ॥

পাঠান্তর ॥

১. পইঠা (বাগচী, শহী)
২. দিট (শাস্ত্রী, সেন),
৩-৩ ভণই লুই (টী)
৪-৪ সমাহি (টী)
৫. মরিঅই (বাগচী)
৬. এড়িঅউ (বাগচী)
৭-৭ করণ কপটের (বাগচী)
৮. সুনু (শাস্ত্রী, বাগচী, শহী, সেন)
৯-৯ ভিতি (শাস্ত্রী, সেন)
১০. সাণে (পুথি, সেন)
১১-১১ পাণ্ডি (পুথি)
১২-১২ বইণ (পুথি)

পাঠবিচার ও শাব্দিক টীকা। বি<অপি। (আদিস্বরলোপ), নির্দেশক প্রত্যয়। চীএ—চিত্ত>চীঅ+এ (অধিকরণ বিভক্তি)=চীএ। পইঠো—প্রবিষ্ট ঃ>পইট্ঠ (সমীভবন)>পইঠো। পুথির স্পষ্টাক্ষরে লেখা 'পইঠো' পাঠ নিরর্থক বা অসংগত নয়, কাজেই পাঠান্তর নিষ্প্রয়োজন। করিঅ—কৃ+ক্ত=*করিত (=কৃত)> করিঅ। পুচ্ছিঅ—পৃচ্ছ+ক্ত= *পৃচ্ছিতঃ (=পৃষ্টঃ)>পুচ্ছিঅ। সমাহিঅ—সং সমাধ্যা>প্রাঃ সমাহিঅ (সম্প্রসারণ), এক্ষেত্রে প্রাচীন বাংলার নিজস্ব করণবিভক্তি প্রযুক্ত না হয়ে প্রাকৃতের প্রাচীন পদটিই রক্ষিত হয়েছে। পুথিতে 'সমাহিঅ' কথাটির মাঝামাঝি জায়গায় বন্ধনসূত্রের জন্য ব্যবধান আছে। এখন সুতোর ঘসা লেগে 'সমা' অংশটি নষ্ট হয়েছে, শাস্ত্রীর সময়ে 'স' অক্ষুণ্ণ ছিল, 'মা' নষ্ট হয়েছিল। কাহি—কস্য>কস্স>কাস.কাহ+ই (নিশ্চয়ার্থক প্রত্যয়)=কাহি। করিঅই—কৃ+কর্মবাচ্য য+তে= *কর্যতে (=ক্রিয়তে)>করিঅই (সম্প্রসারণ)। মরিআই—সং*মর্যতে (=ম্রিয়তে)>মরিঅই, মরিআই। সুন্ন<শূন্য, পুথিলিপিতে 'ন্ন' ও 'নু' অনেকটা একরকম

হওয়ায় পাঠান্তর 'সুনু', কিন্তু অন্যান্য স্থানের নিশ্চিত 'ন্ন'-র সঙ্গে তুলনা করলে বোঝা যায় পাঠটি 'সুন্ন'। ভিড়ি—√ভিড্ (দেশী)+ইত >ভিড়িঅ >ভিড়ি ; অর্থ 'ঘেঁসে', 'সংলগ্ন হয়ে'। আম্হে—অস্মাভিঃ>অম্হাহি>অম্হহি>অম্হে, আম্হে। ঝাণে—ধ্যান>ঝাণ+এ (করণ-অধিকরণ বিভক্তি)= ঝাণে, টীকার 'ধ্যানবশেন' পদ থেকে 'ঝাণে' পাঠের সমর্থন মেলে। পুথিতে 'ঝ' ও 'স' প্রায় এক ছাঁদের হওয়ায় কোন কোন বিশেষজ্ঞ অবশ্য ঝাণে-র বদলে 'সাণে' পাঠান্তর গ্রহণ করেছেন, সেক্ষেত্রে সাণে—সংজ্ঞা (=ইসারা) >সণ্ণা (মূর্ধন্যীকৃত সমীভবন) >সাণ+এ (বিভক্তি)। তিব্বতী অনুবাদে (bsam-gtan=) 'ঝাণে' সমর্থিত। দিঠা—দৃষ্ট>দিট্ঠ>(দীঠ) দিঠা। ধমন<ধম্+অন ; নিঃশ্বাসবাহী বামগা নাড়ী ; তু-ধমনী। চমন<চম্+অন ; প্রশ্বাসবাহী দক্ষিণগা নাড়ী ; তু. আচমন, চুমুক দেওয়া। বেণি—*দ্বীনি (ত্রীণির সাদৃশ্যে) >বেণ্নি >বেণি অর্থাৎ দুই। বইঠা—উপবিষ্টঃ >বইট্ঠ>বইঠা। পুথির 'বইণ' লিপিকরপ্রমাদ।

বাচ্যার্থ ॥ ১-২ কায় [রূপ] তরুবর। পাঁচটি [তার] ডাল। চঞ্চল চিত্তে কাল প্রবিষ্ট হয়েছে। ৩-৪ দৃঢ় করে মহাসুখ পরিমাণ কর। লুই ভনে, গুরুকে পুছে (=জিজ্ঞাসা করে) জান। ৫-৬ সমাধি-সকল দিয়ে কি হবে, সুখদুঃখে নিশ্চিতভাবে মরতেই হবে (অর্থাৎ ধ্যান-সমাধিতে সুখদুঃখের নিশ্চিত নিবৃত্তি নেই)। ৭-৮ [অতএব] ছন্দের (=বাসনার) বন্ধন (ও) করণের (=ইন্দ্রিয়ের) পটুত্বের আশা এড়াও (অর্থাৎ ত্যাগ কর)। শূন্যতা-পক্ষের দিকে ভিড়ে পাশ নাও (ফের)। ৯-১০, লুই ভনে, আমরা ধ্যানে (পাঠান্তরে 'ইশারায়' [এই যুগনদ্ধ রূপ] দেখেছি। ধমন-চমন (=নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস) দুই পিঁড়িতে বসেছি। ধু=ধ্রুবপদ।

গূঢ়ার্থব্যাখ্যা ॥ গানটিকে টীকাকার মুনিদত্ত 'মহারাগনয়চর্যা' অর্থাৎ মহাঅনুরাগের পদ্ধতির রূপে উল্লেখ করেছেন। সহজসাধনার পদ্ধতিগত ইঙ্গিত থাকাতেই বোধ হয় এই নামকরণ। এই গানে সাধনপদ্ধতি ছাড়াও সাধকদের দার্শনিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে। পদকর্তা লুই বলেছেন যে, আমাদের এই দেহ পঞ্চশাখাবিশিষ্ট তরুর মতো রূপ-বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার-বিজ্ঞান নামক পঞ্চকায়ের সমবায়ে গঠিত। আমাদের মন প্রকৃতি-আভাস দোষে নিয়ত চঞ্চল, মনের এই চঞ্চল অবস্থা থেকেই আমাদের কাল-বোধ জন্মে এবং কাল-বোধ থেকেই প্রবৃত্তিমূলক ভববোধ বা সংসার-জ্ঞানের উৎপত্তি। এই চঞ্চল চিত্তকে নিঃস্বভাবীকৃত করতে হলে তাকে মহাসুখের মধ্যে বিলীন করতে হবে এবং এই সাধনায় গুরুর নির্দেশ গ্রহণ করা প্রয়োজন। বিবিধ ধ্যান-সমাধির দ্বারা কিছু লাভ হয় না, কেননা এসব সত্ত্বেও সংসারের সুখদুঃখ ভোগ করতে হয় এবং মৃত্যুও সুনিশ্চিত। অতএব সর্ববিধ ইন্দ্রিয়ভোগের আশা পরিহার করে শূন্যতার পক্ষ তথা বাসনানিবৃত্তির পথ অবলম্বন করতে হবে। শুধু প্রবৃত্তিমূলক ভববোধেও সহজানন্দ নেই, শুধু নিবৃত্তিমূলক শূন্যতাতেও সুখ নেই—এই দুইয়ের অদ্বয় সামরস্যেই সহজানন্দরূপ মহাসুখের উপলব্ধি। লুই বলেছেন যে, তিনি ধমন অর্থাৎ নিঃশ্বাসবাহী নাড়ী ও চমন বা প্রশ্বাসবাহী নাড়ীদ্বয়ের স্বাভাবিক নিম্নগা ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে অবধূতীমার্গাসীন হয়েছেন এবং সেই অবস্থায় সহজস্বরূপের যুগনদ্ধ রূপ দর্শন করেছেন।

২

[পুথিপৃষ্ঠা ৪। খ]

॥ রাগ গবড়া—কুক্কুরীপাদানাম্ ॥

দুলি দুহি পিটা[১] ধরণ ন জাই।
রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ[২] ॥
আঙ্গণ ঘরপণ সুণ ভো বিআতী।
কানেট চৌরি[৩] নিল অধরাতী। ধ্রু ॥
সুসুরা[৪] নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ।
কানেট চোরে নিল কা গই মাগঅ[৫] ॥ ধ্রু ॥
দিবসই বহুড়ী[৬] কাউই[৬]ডরে ভাঅ।
রাতি ভইলেঁ কামরু জাঅ ॥ ধ্রু ॥
অইসন[৭] চর্যা কুক্কুরীপাএঁ গাইউ।
কোড়ি মঝেঁ একু হিঅহিঁ সমাইউ ॥ ধ্রু ॥

পাঠান্তর ॥

১. পীঢ়া (শহী)। ২. খাই (শহী) ৩. চোরে (শহী), চৌরী (বাগচী)
৪. সসুরা (টী) ৫. পুথিতে 'মাগঅই' লিখে 'ই'তে বর্জন-চিহ্ন দেওয়া হয়েছে।
৬. কাড়ই (শাস্ত্রী) ৭. অইসনি (টীকা)

পাঠবিচার ও শাব্দিক টীকা ॥ দুলি=মাদী কাছিম [দেশীনামমালা (৫, ৪২)]। *দুহিতঃ (=দুগ্ধঃ) >দুহিঅ>দুহি। ধরণ ন জাই <ধরণং ন যাতি, এই বাক্যাংশে বাংলা ভাষার কর্ম ভাববাচ্যের নিজস্ব বহুভাষিত (Periphrastic) রীতিটি গৃহীত হয়েছে। রুখের—বৃক্ষ>রুক্খ>রুখ+এর =রুখের। কুম্ভীরে—কুম্ভীর+এ (অনুক্তকর্তায় করণবিভক্তি)। ঘরপণ <*গৃহত্বন=ঘরসংসার। বিআতী < বিবাহ-পাত্রিকা-বিবাহ-যোগ্য নারী বা বধূ (দক্ষিণরাঢ়ে এখনো প্রচলিত)। কানেট—কর্ণবেষ্ট>কণ্ণএট্ঠ>কানেট। চৌরি—ছন্দের দিক থেকে সংশোধিত 'চোরে' পাঠের চেয়ে পুথির 'চৌরি' পাঠ প্রশস্ততর। বহুড়ী <বধূটিকা। কা—কস্য>কস্স>কাস>কাহ>কা= কার (কাছে)। গই = গম্ + ক্ত = *গমিত (=গতঃ) > গইঅ > গই = গিয়ে। মাগঅ-মার্গ্যতে>মগ্গই>মাগই, মাগঅ (=খোঁজা যায়)। দিবসই-দিবস+ই (সংস্কৃত-স্মিন্ জাত অধিকরণ বিভক্তি হি>ই) (=দিনের বেলায়)। কাউই—শুদ্ধপাঠ সম্ভবত 'কাউ'<কাক। কারণ যে বর্ণটিকে 'ই' মনে করে অনেকে 'কাউই' পাঠ নিয়েছেন সেই বর্ণটি পুথির অন্যান্য 'ই'র মত দেখতে নয়। বরং দু/দ্ধ-র সঙ্গে এর সাদৃশ্য নিকটতর। সম্ভবত লিপিকর পরবর্তী 'ডরে' পদের 'ড' লিখতে গিয়ে ভুলক্রমে দু/দ্ধ লিখে ফেলেছিলেন। পরে তা প্রত্যাহার না করেই যথারীতি পুনরায় 'ড' লিখেছেন। ভায়-ভাবয়তি>ভাঅঅই >ভাঅই>ভাঅ (=ভাবিত হয় বা ভীত হয়)। ভইলেঁ—

ভূ+ক্ত=*ভবিত (=ভূত)>ভইঅ+ইল্ল>ভইল+এঁ<এন (ভাবে সপ্তমীর অনুরূপ)—অসমাপিকা ক্রিয়া। কামরু<কামরূপ। অইসন—*অবাদৃশন>অইসন। টীকার 'অইসনি' পাঠও গ্রহণযোগ্য। কারণ স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ 'চর্যা'র বিশেষণ হিসাবে (ই) স্ত্রীপ্রত্যয়ান্ত 'অইসনি' শব্দের ব্যবহার প্রাচীন বাংলার ব্যাকরণসম্মত। গাইউ<গাথিতঃ। চর্যার লিপিতে ড-ড়-উ এর মধ্যে আকার-গত সাদৃশ্যের জন্য শাস্ত্রী উ-কে 'ড়' মনে করে 'গাইড়' পাঠ নিয়েছিলেন। কিন্তু চর্যার লিপি ভাল করে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে 'ড়'-এর ক্ষেত্রে বক্ররেখা ডানদিকে একটু বেশী উঠে যায় এবং নীচের আঁকড়ি বাঁদিকে বেশী এগোয় না, পক্ষান্তরে উ-এর ক্ষেত্রে নীচের আঁকড়ি বাঁদিকে বেশী এগিয়ে যায়। আলোচ্য অংশে উ-এর বৈশিষ্ট্যই লক্ষণীয়। হিঅহি—হৃদয়+স্মিন্>হিঅঅ+হিঁ>হিঅহিঁ। সমাইউ—*সমায়িত (=সমায়াতঃ) >সমাইঅ>সমাইউ।

বাচ্যার্থ ॥ পংক্তি ১-২ মাদি কাছিম দোহন করা হল, পাত্রে [দুধ] ধরে না (বা ধরা যায় না)। গাছের তেঁতুল কুমীরে খায়। পংক্তি ৩-৪, আঙিনাতেই ঘর-সংসার (বা অন্য ব্যাখ্যায়, ঘরের কাছে আঙিনা)। ওগো বধূ, শোন। অর্ধরাত্রে চোর [এসে] কানেট (=কর্ণভূষণ) নিয়ে গেল। ৫-৬, শ্বশুর নিদ্রা গেল, বধূ [রইল] জেগে। চোরে কানেট নিলে কার কাছে গিয়ে সন্ধান করা যায় (বা চাওয়া যায়) ? পংক্তি ৭-৮ দিনে বধূ কাকের ভয়ে ভীত হয়, রাত্রিতে কামসেবার্থে (বা কামরূপ) যায়। পংক্তি ৯-১০ এইরকম চর্যা কুক্কুরীপাদের দ্বারা গাওয়া হল, কোটির মধ্যে মাত্র একটি হৃদয়েই তা প্রবেশ করল।

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা ॥ টীকাকার মুনিদত্ত এই চর্যার ব্যাখ্যারম্ভে বলেছেন "তমেব মহাসুখ-রাজানম্...কুক্কুরীপাদাঃ সন্ধ্যাভাষয়া প্রকটয়িতুমাহুঃ" অর্থাৎ মহাসুখলাভের তত্ত্ব এখানে সন্ধ্যা ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে। সন্ধ্যা ভাষা বলেই এই চর্যার প্রায় প্রত্যেক কথারই বাচ্যার্থের ভিতরে আর একটি করে আভিপ্রায়িক অর্থ নিহিত আছে। সেই অনুসারে 'দুলি'র অর্থ সর্বপ্রকার দ্বৈতত্ব বা তার প্রতীক দেহের দুই পাশের দুই নাড়ী। দোহনজাত বস্তু 'সংবৃত্তি বোধিচিত্ত', পীঠ নাভিদেশে অবস্থিত মণিপুর চক্র। বৃক্ষ দেহবৃক্ষ, তেন্তুলি বক্রগামী বোধিচিত্ত, কুম্ভীর যৌগিক কুম্ভক, কুম্ভীর কর্তৃক তেঁতুল ভক্ষণের অর্থ কুম্ভক যোগে বোধিচিত্তকে নিঃস্বভাবীকৃত করা। বিআতী ও বহুড়ী হল অবধূতিকা। সহজানন্দের আশ্রয় মহাসুখচক্রই হল ঘর এবং অঙ্গন হল বিরমানন্দস্থান। কানেট হল প্রকৃতিদোষ, চোর সহজানন্দ। অর্ধরাত্রি হল সহজানন্দে বিলীন হবার পূর্বক্ষণ। শ্বশুর শ্বাসবায়ু, দিবস চিত্তের প্রবৃত্তিময় অবস্থা, রাত্রি নিবৃত্তির অবস্থা এবং কামরূপ মহাসুখচক্র। এই সব সন্ধ্যাশব্দের মাধ্যমে আসলে সহজানন্দ উপভোগের উপায়ই বর্ণনা করা হয়েছে, এই উপায় অদীক্ষিত ব্যক্তিদের কাছে গোপন রাখার জন্যই প্রহেলিকার অবতারণা। এই প্রহেলিকার আসল অর্থ হচ্ছে, বামগা ও দক্ষিণগা দুই নাড়ীর দ্বৈতত্ব ও স্বাভাবিক গতি নষ্ট করে তাদের মধ্যমার্গে একত্র করলে বোধিচিত্তকে আর নাভিস্থিত মণিপুরচক্রে ধরে রাখা যায় না, তখন তা ঊর্ধ্বগামী হয়। কুম্ভকযোগের দ্বারাই দেহতরুর ফলস্বরূপ এই বোধিচিত্তকে নিঃস্বভাব বা বিশুদ্ধ করা যায়। বোধিচিত্তকে নিঃস্বভাবীকৃত করে

মধ্যমার্গে ঊর্ধ্বগামী করলে সাধকের যে আনন্দ হয় সেই আনন্দানুভূতির তৃতীয় ও চতুর্থস্তর যথাক্রমে বিরমানন্দ ও সহজানন্দ আঙিনা ও ঘরের মতই পরস্পরের সমীপবর্তী, সহজানন্দে বিলীন হবার পূর্বক্ষণে সাধক যদি কুম্ভকযোগে চিত্তের প্রকৃতিদোষ হরণ করেন তবে তিনি এই আনন্দ লাভ করেন। এই সময়ে শ্বাসবায়ু যোগনিদ্রায় নিশ্চল ও নিষুপ্ত হয়ে পড়ে এবং ভববিকল্পাদিমুক্ত প্রকৃতিপরিশুদ্ধ অবধূতিকা নাড়ীর জাগরণ ঘটে, এবং প্রকৃতিদোষ লুপ্ত হওয়ায় গ্রাহ্যগ্রাহক ভাবও অন্তর্হিত হয়। সাধকের পক্ষে এই প্রকৃতিপ্রভাস্বর সর্বশূন্য অবস্থাই পরম কাম্য, এ অবস্থায় উপনীত হলে আর কিছুই প্রার্থনীয় থাকে না। সাংবৃতিক বা প্রবৃত্তিময় অবস্থায় চিত্ত জরামরণপূর্ণ এই জগতের দৃশ্যে সন্ত্রস্ত হয়, কিন্তু পারমার্থিক অবস্থায় পরিশুদ্ধ চিত্ত নির্বিকল্পাকারে মহাসুখচক্রে গমন করে।

কুক্কুরীপাএর গাওয়া এই গান এমনি (প্রহেলিকাময়) যে কোটির মধ্যে হয়ত মাত্র একজনের হৃদয়েই এর তত্ত্ব প্রবেশ করবে।

৩

পুথিপৃষ্ঠা। ৬ ক-খ

॥ রাগ গবড়া-বিরুবাপাদানাম্ ॥

এক সে [১]সুঙিনি[১] দুই ঘরে সান্ধঅ।
চীঅণ বাকলঅ বারুণি বান্ধঅ ॥ ধ্রু ॥
সহজে থির করী বারুণি [২]সান্ধে[২]।
জেঁ অজরামর হোই[৩] দিঢ়[৩] [৪]কান্ধে[৪] ॥ ধ্রু ॥
দশমি দুআরত চিহ্ন[৫] দেখইআ[৫]।
আইল গরাহক অপণে বহিআ ॥ ধ্রু ॥
চউশঠী ঘড়িয়ে[৬] দেঢ়[৬] পসারা।
পইঠেল গরাহকা[৭] নাহি নিসারা ॥ ধ্রু ॥
এক [৮]ঘড়ুলী[৮] সরুই নাল।
ভণন্তি বিরুআ থির করি চাল ॥ ধ্রু ॥

পাঠান্তর ॥

১—১ সুঙিনিণী (পুথি)। ২—২ সান্ধ (শহী)। ৩—৩ দিট (শাস্ত্রী।
৪—৪ কান্ধ (শহী), কান্ধঃ (পুথি)। ৫—৫ দেখিআ (শহী)
৬—৬ দেল (বাগচী), দেউ (শহী), দেট (শাস্ত্রী, সেন)।
৭ গরাহক (শাস্ত্রী, সেন, বাগচী, শহী) ৮ সড়ুলী (পুথি, শাস্ত্রী)।

পাঠবিচার ও শাব্দিক টীকা। সুণ্ডিনি—বাহ্য অর্থ শুঁড়ী-বৌ, গূঢ় অর্থ অবধূতিকা। পুথিতে লিপিকার অসতর্কতাবশত একটি অতিরিক্ত 'ণী' লিখেছেন। টীকায় অবশ্য 'সুণ্ডিনী' পাঠ আছে। 'সুণ্ডিনিণী' দ্বিলিখন' বা dittogrphy-র উদাহরণ। সান্ধঅ—সাঁধায়—সম্-ধা+তি=সন্ধায়তি>সন্ধাঅই>সন্ধাঅ, সান্ধঅ। চীঅণ—চিক্কণ>চীকণ>চীঅণ, অর্থ সুপারী গাছ বা সুপারী ফল (দ্র. SED)। তু 'কী গুয়া ? চিকি গুয়া' [প্রচলিত বাংলা ছড়া]। বাকলঅ—বল্কল>= বাকল+এ(তৃতীয়া এন জাত)> বাকলঅ, অর্থ, গাছের ছাল থেকে প্রস্তুত মদ গাঁজানোর উপযোগী কিণ্ব বা সুরাবীজ। পশ্চিম বঙ্গীয় উপভাষায় সুরাবটিকা অর্থে 'বাখর'/'বাকর' শব্দ এখনো প্রচলিত আছে (দ্রষ্টব্য 'বাখর'—বঙ্গীয় শব্দকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৮৭)। 'বাখর/বাকর' দেখতে সাদা মার্বেলগুটির মত গোলাকার। এই বড়ি দিয়ে তণ্ডুলজাত দেশী মদ তৈরি হয়। বাখর/বাকর তৈরি হয় গাছের ছাল থেকে। আলোচ্য অংশে সম্ভবত সুপারি গাছের ছাল থেকে তৈরি করা বাখরের কথা বলা হচ্ছে। বান্ধঅ—*বন্ধয়তি (=বধ্নাতি)> বন্ধঅই>বন্ধঅ, বান্ধঅ, (মদ) বাঁধে বা মদ ফেনিয়ে তোলে। সান্ধে—সম্-ধা (=অভিষব বা সজ্জীকরণ, মদ গাঁজানো বা চোয়ানো)—*সন্ধাপ্যতে>সন্ধাঅই>সন্ধাই>সান্ধে=মদ গাঁজায়। তু. সান্দা [ক্রিয়াপদ]=পাক করা বা রান্না করা অর্থে পূর্ববঙ্গের বাখরগঞ্জ জেলায় প্রচলিত—'তাড়াতাড়ি বাত সান্দি আন' (আ-ভা-অ, পৃ. ৪৯৯)। টীকার 'বন্ধনং কৃত্বা' অনুসারে সেন বিকল্পে 'বান্ধ' পাঠ সমর্থন করেন। তবে পুথির স্পষ্টাক্ষরে লেখা 'সান্ধে' পদটি নিরর্থক নয় বলে বিকল্প পাঠসন্ধানের প্রয়োজন হয় না। জেঁ<যেন। হোই-ভবতি>ভোদি>হোই।

দিঢ়<দৃঢ়। পুথিতে 'ট' ও 'ঢ'-এর ছাঁদ এক রকম বলে শাস্ত্রী 'দিট' পাঠ রেখেছেন, তবে 'দৃঢ়'-এর সাযুজ্যে 'দিঢ়' পাঠ প্রশস্ততর।

কান্ধে < স্কন্ধে (?)। পুথিতে স্পষ্টত 'কান্ধঃ' পাঠ লেখা আছে। শাস্ত্রী বিকল্পসূচক 'কান্ধ' পাঠ রক্ষা করেছেন। শহীদুল্লাহ— 'কান্ধ'। অন্ত্য মিলের অনুরোধে বাগচী— 'কান্ধে'। সেন শাস্ত্রী-পাঠের পক্ষপাতী। তবে তদ্ভব শব্দ 'কান্ধ' -তে সংস্কৃতের অনুরূপ 'সু' -বিভক্তিজাত বিসর্গের ব্যবহার অসম্ভব বিবেচনা করে বাগচীর অন্ত্যানুপ্রাসবিশিষ্ট 'কান্ধে' পাঠ এখানে গৃহীত হল। বৌদ্ধ শাস্ত্রের মতে রূপ, বেদনা প্রভৃতি পাঁচটি স্কন্ধের সমবায়েই আমাদের দেহ গঠিত। এই পাঁচটি স্কন্ধ দৃঢ় হলেই দেহ যোগসাধনার উপযোগী হয়। সাধকের দেহই দৃঢ়স্কন্ধবিশিষ্ট, সাধারণ মানুষের নয়। এই দৃঢ়স্কন্ধ দেহ নিয়ে যোগী জন্মমৃত্যুর বন্ধন অতিক্রম করেন। দশমি দুআরত— দশমী দ্বারে। 'দশমী দ্বার' কথাটি যোগসাধনায় ব্যবহৃত একটি পারিভাষিক পদ। যোগশাস্ত্রে বলা হয় যে শরীরের সারনির্যাস অমৃত-রূপে মস্তকের সহস্রার পদ্মের নীচে চন্দ্রে সঞ্চিত থাকে এবং এই রস নীচে ক্ষরিত হলে নাভিস্থিত সূর্য তা শোষণ করে নেয়, ফলে মানুষ মৃত্যু-কবলিত হয়। যোগশাস্ত্রে শরীরের মোট দশটি দ্বার। যৌগিক প্রক্রিয়ার দ্বারা এই দশম দ্বার রুদ্ধ করলে অমৃতরস আর নিম্নগামী হতে পারে না, সেই রস যোগী স্বয়ং পান করে অমরত্বের অধিকারী হন। এই প্রক্রিয়ায় যোগী চন্দ্র-সূর্যকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত করে একত্র মিলিত করেন। বর্তমান ক্ষেত্রে দশম দ্বার বা বৈরোচন দ্বার বলতে প্রত্যক্ষভাবে ঠিক

এই যোগসাধনার ইঙ্গিত করা না হলেও যোগসাধনায় এই দ্বারকে যে-প্রাধান্য দেওয়া হয়, এক্ষেত্রেও তার অনুরূপ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কেন না তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে রূপবেদনাদি পঞ্চস্কন্ধের অধিষ্ঠাতা হিসাবে যে পঞ্চধ্যানিবুদ্ধের কল্পনা করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে বৈরোচনবুদ্ধই সর্বপ্রধান, এই বৈরোচনের অধিষ্ঠান মস্তকে। তান্ত্রিক যোগসাধনায় সাধক মস্তকে এই বৈরোচনের অবস্থিতি অনুভব করে দেহশুদ্ধি করেন। সুতরাং আলোচ্য ক্ষেত্রে দশমী দ্বারের অর্থ মহাসুখ চক্রে প্রবেশের দ্বার। দেখইআ <* দৃক্ষিত (= দৃষ্ট)। শহীদুল্লাহ্ 'দেখিআ' পাঠ গ্রহণ করলেও ছন্দের সৌষম্যের দিক থেকে পুথির 'দেখইআ' পাঠ অপরিবর্তনীয় মনে হয়।

গরাহক < গ্রাহক (স্বরভক্তি)। অপণে— *আত্মনেন (=আত্মনা) > অপ্‌পণে > আপণে > অপণে ; চউশঠি < চতুঃষষ্টি। ঘড়িএ— ঘটী > ঘড়ি + এ (করণ-অধিকরণ)। দেঢ়— পুথিতে 'ট' ও 'ঢ়' অক্ষরের আকারসাদৃশ্যের জন্য এই পদটিকে 'দেট' বা 'দেঢ়' দুভাবেই পড়া যায়। তবে অধিকাংশ গবেষকই 'দা' ধাতুর সঙ্গে এর ব্যুৎপত্তিগত সম্পর্ক অনুমান করে দা-ধাতু-নিষ্পন্ন একাধিক পাঠান্তর কল্পনা করেছেন। শাস্ত্রী মূল পুথির যে অনুলিপি তৈরি করিয়েছিলেন তাতেও দা-ধাতু-ঘনিষ্ঠ 'দেত' পদ পাওয়া যায়। কিন্তু পাঠান্তর গ্রহণের আগে দেখা দরকার, স্পষ্টাক্ষরে লেখা পুথির মূল পাঠ কি একেবারেই নিরর্থক ? 'দেট' পাঠের অর্থ স্পষ্ট নয় বলে 'দেত' 'দেল', 'দেউ' ইত্যাদি স্পষ্টতর পাঠের পরিকল্পনা। কিন্তু 'দেঢ়' পাঠ ধরলে কি কোনই অর্থাভাস পাওয়া যায় না ? দ্ব্যর্ধ > দেঢ় > দেড় > ডেড় + ই = ডেড়ি শব্দ মধ্য বাংলায় অধিক বা উদ্বৃত্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে : 'যেদিন যতেক পায় তাহা সেই দিনে খায়/ডেড়ি অন্ন নাহি থাকে ঘরে' (কবিকঙ্কণচণ্ডী)। এই দেঢ় > দেড় > ডেড় শব্দের সঙ্গে প্রাচুর্যবোধক 'ঢের' ও '(অ) ঢেল' শব্দের সংযোগ থাকা সম্ভব। বলা বাহুল্য এখানে দেড় = দেড়গুণ > বহুগুণ > প্রচুর— এই ক্রমানুসারে দেঢ় = 'দেড়' শব্দের অর্থবিস্তার ঘটেছে। প্রকৃতপক্ষে, এখানেও 'দেঢ়' পদটিকে 'ঢের' বা 'প্রচুর' অর্থে গ্রহণ করলে অর্থের ব্যত্যয় বা অস্পষ্টতা থাকে না। কাজেই ভিন্নতর পাঠ গ্রহণের আগে 'দেঢ়' পাঠের যাথার্থ্য যাচাই করা দরকার। পুথির প্রায় সব ক্ষেত্রেই যখন সদৃশ ট ও ঢ়-এর মধ্যে 'ঢ়' পাঠকেই প্রশস্ততর বলে স্বীকার করা হয়েছে (যেমন 'দিট'-র বদলে দিঢ়', 'মূটা'-র বদলে 'মুঢ়া') তখন এক্ষেত্রেও 'ট' ও ঢ-এর মধ্যে 'ঢ়'-এর অগ্রাধিকার বিবেচ্য ; বিশেষত 'দেঢ়' পাঠ যখন নিরর্থক নয়। 'দেঢ়' পাঠ গ্রাহ্য হলে বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায় ; চৌষট্টি ঘড়ায় ঢের (বা অঢেল) পসরা। (ওড়িয়াতে 'দেঢ়' বানান লক্ষণীয়)। পসারা < প্রসার— পসার, পসরা। পইঠেল— প্রবিষ্ট > পইট্‌ঠ > পইঠ + এল। গরাহকা —গ্রাহক > গরাহক (স্বরভক্তি। অর্ধতৎসম শব্দ) + আঁ (< আহ < আস < অস্‌স < অস্য), চর্যায় সম্বন্ধ বিভক্তি রূপে 'আ' বহু জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন মুঢ়া (৬) = মূঢ়ের, সমুদা (১৫) = সমুদ্রের ইত্যাদি। এক্ষেত্রেও আ সম্বন্ধবিভক্তি। অর্থ 'গরাহকা' = গ্রাহকের। পুথিতে 'ক' -এর পর 'আ'-কারের দাঁড়িটি ঈষৎ বিশ্লিষ্টভাবে লিখিত হওয়ায় শাস্ত্রী এটিকে অনাবশ্যক দাঁড়িচিহ্ন মনে করে 'গরাহক' পাঠ গ্রহণ করেছিলেন ; তাঁকে অনুসরণ করে এযাবৎ 'গরাহক' পাঠই চলে আসছে।

কিন্তু গোটা বাক্যটির গঠনকাঠামো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে দাঁড়িচিহ্নটি অনাবশ্যক বিরামচিহ্ন নয়, বিশ্লিষ্ট আ-কারচিহ্ন। 'পইঠেল গরাহকা নাহি নিসারা' আসলে একটি সরল বাক্য —এর কর্তৃপদ 'নিসারা', ক্রিয়াপদ বা ক্রিয়াবাচী অব্যয় 'নাহি' ; 'গরাহকা' 'নিসারা'-র সম্বন্ধপদ এবং 'পইঠেল' 'ক্রিয়াপদ নয়, 'গরাহকা'-র কৃদন্ত বিশেষণপদ। কাজেই আধুনিক বাংলায় এর আক্ষরিক রূপান্তর হবে 'প্রবিষ্ট গ্রাহকের নিঃসরণ নেই'। প্রকৃতপক্ষে চর্যায় ল, ইল, এল-জাত পদগুলি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে সমাপিকা ক্রিয়াপদ হিসাবে ব্যবহৃত হলেও কৃদন্ত বিশ্লেষণ রূপেই বেশী ব্যবহৃত, বিশেষত বিশেষ্যের পূর্বে এর ব্যবহার এর বিশেষণ হওয়ার সম্ভাবনাই উজ্জ্বলতর করে। এক্ষেত্রে 'পইঠেল' পদটি বিশেষ্যপদ 'গরাহক'র আগে বসে এর বিশেষণ হবার সম্ভাবনাকেই স্ফুটতর করছে। 'পইঠেল' বিশেষণ পদ হলে বাক্যের কর্তা 'গরাহক' নয়, 'নিসারা'। সেদিক থেকে 'গরাহক' পাঠ বর্জন করে পুথির 'গরাহকা' পাঠ গ্রহণ করা যেতে পারে। কারণ 'গরাহকা' ছন্দ, ব্যাকরণ ও পুথিলিপি-- কোন দিক থেকেই অসংগত নয়। ঘড়ুলী— ঘট > ঘড় + লী (ক্ষুদ্রার্থে) = ঘড়লী > ঘড়ুলী, ছোট ঘড়া বা গাড়ু। পুথির 'সড়ুলী' সম্ভবত লিপিভ্রম। টীকাতে 'ঘড়ুলী' পাঠ। ভণন্তি— প্রাচীন পদ, গৌরবে বহুবচন।

বাচ্যার্থ ॥ ১—২, এক সে শুঁড়ি-মেয়ে দুইকে নিয়ে ঘরে সাঁধায় (বা ঢোকে)। সুপারির ছালের বাখর দিয়ে মদ বাঁধে (ফেনায়)। ৩—৪, সহজে থিতিয়ে (স্থির করে) মদ গাঁজায় যাতে অজরামর ও দৃঢ়স্কন্ধ হওয়া যায়। ৫—৬, দশমী দুয়ারে চিহ্ন দেখে গ্রাহক নিজেই এসে উপস্থিত হল। ৭—৮, চৌষট্টি ঘড়ায় [মদের] ঢের (অঢেল) পসরা ; প্রবিষ্ট গ্রাহকের নিষ্ক্রমণ নেই। ৯—১০, ছোট একটি ঘড়া, নল তার সরু। বিরুআ বলেন, স্থির করে চালাও।

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা ॥ বর্তমান গানে মদ চোলাই ও বিক্রয়ের রূপকে বামগা-দক্ষিণগা নাড়ীদ্বয়কে নিঃস্বভাবীকৃত করে মধ্যমার্গে এনে মহাসুখলাভের যৌগিক সাধনপদ্ধতির কথা বর্ণিত হয়েছে। দেহের বাম দিকে প্রজ্ঞানাড়ী, দক্ষিণ দিকে উপায়-নাড়ী ; প্রজ্ঞানাড়ীর গ্রাহকভাব ও উপায়-নাড়ীর গ্রাহ্যভাব, এদের মাঝখানে অবধূতী-নাড়ী গ্রাহ্য-গ্রাহকভাব-বর্জিত। এই অবধূতী ইন্দ্রিয়ের অস্পৃশ্য বলে অন্যত্র ডোম্বী, চণ্ডালী বা শবরীরূপে কল্পিত, এখানে শৌণ্ডিকরমণী। এক অবধূতীর মধ্যে দুই নাড়ী প্রবেশ করেছে অর্থাৎ গ্রাহ্যগ্রাহকভাব বিসর্জন দিয়ে অবধূতী মার্গে প্রজ্ঞোপায়ের মিলন ঘটেছে। এই অবস্থায় অবিদ্যা-মল দূরীভূত হওয়ায় যোগীর চিত্ত এক সূক্ষ্ম (চিকণ) প্রভাস্বর-শূন্যতা (বাকল)য় পরিশুদ্ধ হয়ে মহাসুখের আনন্দে (বারুণী) বদ্ধ হয় অর্থাৎ সহজানন্দ-প্রয়াসী বোধিচিত্তের উদ্বোধন হয় এবং সাধক যোগদেহ (দৃঢ়স্কন্ধ) লাভ করে জরামরণের ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন। মহাসুখচক্রের প্রবেশ-দ্বারে মহাসুখপ্রমোদের চিহ্ন দেখে বোধিচিত্ত তা-নিজেই উপভোগ করার জন্য উপস্থিত হল এবং চতুর্দিকে আনন্দের উপকরণ দেখে মহাসুখে বিভোর হল। অবধূতী হচ্ছে মদের ঘটী, অর্থাৎ অবধূতী মার্গে সাধনা করলেই মহাসুখামৃতের সন্ধান মেলে। মহাসুখ সংঘটন করে বলেই অবধূতী ঘটী এবং গ্রাহ্য-গ্রাহকদ্বৈতাভাসবর্জিত বলে অবধূতী সরু বা সূক্ষ্ম। বিরুআর উপদেশ, এই সূক্ষ্ম অবধূতী মার্গেই বোধিচিত্তকে স্থিরভাবে চালনা কর।

৪

[পুথিপৃষ্ঠা ৭ । খ]

॥রাগ অরু—গুঞ্জরীপাদানাম্ ॥

[১]তিঅড্ডা[১] চাপী[২] জোইণি[২] দে অঙ্কবালী।
কমলকুলিশ[৩] ঘাণ্টে[৩] করহুঁ বিআলী ॥ ধ্রু ॥
যোইণি তঁই বিণু খনহিঁ ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি ॥ ধ্রু ॥
খেপহুঁ [৪]জোইণি[৪] লেপ ন জায়।
মণিকূলে বহিআ ওড়িআণে[৫] সমাঅ[৫] ॥ধ্রু ॥
সাসু ঘরেঁ ঘালি কোঞ্চা তাল্।
চান্দসুজ বেণি[৬] পখা[৬] হাল ॥ ধ্রু ॥
ভণই গুডরী অম্হে কুন্দুরে[৭] ধীরা[৭]।
[৮]নরঅ[৮] নারী মঝেঁ উভিল চীরা ॥ ধ্রু ॥

পাঠান্তর ॥

১-১ তিঅড়া (টীকা), হিয়ন্ডা (শহী)।
২-২ জোইনি (শাস্ত্রী, শহী)।
৩-৩ ঘাণ্ট (শাস্ত্রী, বাগচী)।
৪-৪ জোইনি (শাস্ত্রী, বাগচী, শহী)
৫-৫ সগাঅ (পুথি, শাস্ত্রী)।
৬-৬ ফাল (শাস্ত্রী, বাগচী, শহী, সেন)
৭-৭ বীরা (শাস্ত্রী, বাগচী, শহী)
৮-৮ সরঅ (সেন)

পাঠবিচার ও শাব্দিক টীকা ॥ তিঅড্ডা— বাচ্যার্থ ত্রিকোণ, "*tiaddā* literally means 'that which is triangular'. cf. modern Bengali '*tedā*'. But in the Carya it seems to *be* taken in the sense of *yoni*. One of the synonyms of *yoni* is *varāngam* and that sense seems to have been rendered in the Tib. translation". (P.C. Bagchi. JDL, vol. xxx, p. 8), তিঅড্ডা = তিব্বতী 'ka-mgo' = 'chief thing, principal part' (ibid p. 7) ত্রিবৃত্তক > তিঅড্ডা, পারিভাষিক অর্থ ললনা (বামগা)-রসনা (দক্ষিণগা)- অবধূতী (মধ্যগা) নাড়ীত্রয়। অঙ্কবালী <* অঙ্কপালিকা, অর্থ সঙ্গম, আলিঙ্গন, তু, 'আঁকড়ি' 'আঁকোড়ি' (বাহুবেষ্টন, সমাশ্লেষ)- 'আঁকড়ি করিয়া ভৈমী ধরিল রাজারে' (কাশীদাসী মহাভারত, বঙ্গবাসী সং, পৃ 88)। ঘাণ্টে--ঘট্ট (= ঘর্ষণ, আলোড়ন) > ঘণ্ট > ঘাণ্ট (শ্বাসাঘাতহেতু আদি স্বরের দীর্ঘতা) + এ (করণ-অধিকরণ বিভক্তি)। পাঠান্তর 'ঘাণ্ট'-তে অর্থ পরিষ্কার হয় না, কাজেই পুথির পাঠই গ্রাহ্য। করহুঁ— কর + হুঁ < ধ্বম্ (সংস্কৃত অনুজ্ঞা মধ্যম পুরুষের ক্রিয়াবিভক্তি)।

বিআলী < বিকালিক। তঁই— *ত্বয়েন (= ত্বয়া) > তএঁ > তঁই। খনহিঁ < ক্ষণ + স্মিন্। খেপহুঁ <* ক্ষেপ + ভ্যম্ (প্রাচীন অপাদানের পদ)। ওড়িআণে —উড্ডীয়ানে, মহাসুখচক্রে। পুথিতে ও-র পর একটি আ-কার আছে। এটি লিপিপ্রমাদ হতে পারে। সমাঅ < সমায়াত ; পুথির 'সগাঅ' পাঠের অর্থ পরিষ্কার নয়। তাছাড়া টীকায় যে প্রাসঙ্গিক 'অন্তর্ভবতি' পদটি পাওয়া যায় অন্য চর্যায় (২) সেই 'অন্তর্ভবতি' পদ ব্যবহৃত হয়েছে 'সম্-আ-যা' ধাতুর অর্থে। কাজেই এখানে 'সমাঅ' পাঠ প্রশস্ত বলে মনে হয়। 'সগাঅ' সম্ভবত লিপিকরপ্রমাদ। সাসু < শ্বশ্রূ। পখা < পক্ষ।

হাল— হল্যতে > হল্লই > হালই > হাল (আদ্যক্ষরে শ্বাসাঘাতহেতু অন্ত্যস্বরলোপ) [হল্ ধাতুর অর্থ 'খাঁজ কাটা', ধাতুপাঠ ২০.৭ ; দ্র. SED] সুতরাং 'হাল' = কাটা পড়ে। পুথিতে স্পষ্টাক্ষরে 'হাল' লেখা আছে, কিন্তু এই পাঠের অর্থ দুর্বোধ্য বিবেচনা করে গবেষকগণ এ যাবৎ √ পাটয় > ফাড় > √ ফাল = 'ফাল' পাঠান্তর নির্দেশ করেছেন। কিন্তু পুথির 'হাল' পাঠ যেহেতু নিরর্থক নয়, সেজন্য পুথির পাঠই রক্ষণীয়। গুডরী— পুথিতে গানের শীর্ষে কবিনাম গুণ্ডরী, ভণিতায় গুডরী ও টীকায় গুড্ডরী আছে। কুন্দুর— যোগী-যোগিনীর যৌনমিলনমূলক হঠযোগবিশেষ। ধীরা < ধীর। পুথির বিভিন্ন জায়গায় 'বী' অক্ষরের সঙ্গে এখানকার প্রথম অক্ষরের তুলনা করলে স্পষ্টতই দেখা যায় যে 'বী'-র সঙ্গে এর প্রভেদ আছে ; তাছাড়া এই পদের লিপিতে 'ধ' এর ঊর্ধ্ব আঁকড়ি স্পষ্ট থাকায় পদটিকে 'ধীরা' রূপে পড়াই সংগত। 'ধীর' শব্দের একটি অর্থ 'স্থিত', 'উপবিষ্ট' (বঙ্গীয় শব্দকোষ, পৃ ১১৬১)। গুডরী কুন্দুরযোগে ধীর অর্থাৎ অবস্থিত বা উপবিষ্ট—এমন অর্থ পরের পঙ্‌ক্তির বক্তব্যের সঙ্গে বিশেষভাবে সংগতিশীল। তবে টীকার 'বীরোহং' পদ এবং তন্ত্রপ্রচলিত বিশেষার্থবহ 'বীর' শব্দের দৃষ্টান্তে 'বীর' পাঠান্তরটিও একেবারে উপেক্ষা করা যায় না (শশিভূষণ-সংগৃহীত গানটিতেও 'বীরা' পাঠ পাওয়া যায়)।

নরঅ— পুথিতে 'ন' অক্ষরটি স্পষ্ট নয়, 'ন'-এর মধ্যে 'স' অক্ষরের আভাস ফুটে উঠেছে। সম্ভবত লিপিকর 'ন'-কে কেটে 'স' কিংবা 'স' কে কেটে 'ন' লিখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কোন্ অক্ষরটি তাঁর অভিপ্রেত তা পরিষ্কার বোঝা যায় না। সেজন্য 'নরঅ' ও 'সরঅ' দুটি পাঠ পরিকল্পিত হয়েছে। নরঅ—শাস্ত্রী, বাগচী, শহীর গ্রাহ্য, 'সরঅ'— সেন-গ্রাহ্য। 'নরঅ' পাঠে ব্যুৎপত্তি ; নরঅ < নর-ক, 'সরঅ' পাঠে সরঅ < সর্ব। টীকার 'তেষাং (যোগিনীযোগিনাং) মধ্যে' দেখে দুই পাঠের মধ্যে 'নরঅ' পাঠই প্রশস্ততর মনে হয়, কারণ পাঠটি 'সরঅ নারী' হলে টীকায় 'তেষাং' এর বদলে 'তাসাং' থাকত। 'নরঅ'-এর অন্ত্য 'অ' বর্ণ সম্ভবত ছন্দের অনুরোধে সংযোজিত।

উভিল— ঊর্ধ্বিত > উব্‌ভিঅ > উভিঅ + ইল > উভিল। চীরা < চীর।

বাচ্যার্থ ॥ ১-২ তেওড়া (জঘন) চেপে যোগিনী [সাধককে] আলিঙ্গন দেয়, পদ্ম ও বজ্রের [বৌদ্ধতন্ত্রে পদ্ম ও বজ্রকে যথাক্রমে স্ত্রী ও পুরুষ জননাঙ্গের প্রতীক হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে] সংঘর্ষে বিকাল কর বা কাল কাটিয়ে দাও। ৩-৪ যোগিনী, তোকে ছাড়া মুহূর্তও বাঁচি না, তোর মুখ চুম্বন করে কমলরস পান করি। ৫-৬ ক্ষেপণ (সঞ্চালন)

হেতু উৎক্ষিপ্ত যোগিনী [মণিমূলে] লিপ্ত হয় না ; মণিমূল (বা মণিকুল) বয়ে ওড়িয়ানে প্রবেশ করে। ৭-৮ শাশুড়ীর ঘরে চাবি-তালা লাগানো হল, চন্দ্রসূর্য দুইপাখা খণ্ডিত হল। ৯-১০ গুডরী বলে, আমি সুরত ক্রিয়ায় [কুন্দুর নামক যৌনমিলনমূলক যোগ] ধীর। নরনারী মাঝে বস্ত্র তোলা হল।

গূঢ়ার্থব্যাখ্যা ॥ মুনিদত্ত এই গানের এক অংশের টীকায় "দ্বীন্দ্রিয়সমাপত্তিযোগে"র উল্লেখ করেছেন। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে যে যৌনযোগাচার একসময়ে প্রাধান্য পেয়েছিল বর্তমান গানে তারই পরিচয় আছে এখানে কমলকুলিশের সংযোগ ও সংঘর্ষে যে মহাসুখ-লাভের যৌন ইঙ্গিত আছে তা প্রজ্ঞোপায়ের মিলনে অদ্বয় মহাসুখ লাভেরই রূপক মাত্র। ললনা-রসনা ও অবধূতী নাড়ী এই তিনটিকে চেপে অর্থাৎ তাদের গ্রাহ্যগ্রাহক-গ্রহণভাব নাশ করে পরিশুদ্ধাবধূতিকা নৈরাত্মা নিজের স্বরূপ (অঙ্কবালী) বা নৈরাত্মতা সাধককে দান করেন। সাধক এই অবস্থায় প্রজ্ঞোপায়ের (কমলকুলিশ) মিলনে কালরহিত হয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে সহজানন্দ লাভ করেন। নৈরাত্মাযোগিনীর সঙ্গে নিয়ত সংযোগের ফলে সাধক মহাসুখচক্রস্থিত উষ্ণীষকমলের মধুপান করেন অর্থাৎ সহজানন্দ লাভ করেন। আমাদের চিত্ত অশুদ্ধ অবস্থায় অবিদ্যামোহে লিপ্ত বা অভিভূত থাকে, কিন্তু নৈরাত্মা যোগিনীর সঙ্গে মিলনের উদ্দীপ্ত জাগলে অর্থাৎ নাভিচক্রে প্রজ্ঞোপায়ের মিলনে বোধিচিত্তের জাগরণ ঘটলে তা আর মোহলিপ্ত থাকে না, ক্রমে মণিপুর তথা নাভিচক্র থেকে ঊর্ধ্বগামী হয়ে ওড়িয়ান তথা মহাসুখচক্রে প্রবেশ করে। বোধিচিত্তকে এইভাবে উদ্দীপিত ও ঊর্ধ্বগামী করতে হলে শ্বাসের ঘরে তালাচাবি লাগাতে হবে এবং চন্দ্রসূর্য দুই পক্ষ ছেদন করতে হবে অর্থাৎ বামগা-দক্ষিণগা নাড়ীতে যে প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস প্রবাহিত হয় তার স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ করতে হবে এবং গ্রাহ্যত্ব-গ্রাহকত্ব দুই ভাব বিনষ্ট করতে হবে (চন্দ্র ও সূর্য যথাক্রমে গ্রাহকত্ব ও গ্রাহ্যত্বের প্রতীক)। গুণ্ডরীপাদ বলেন যে, কুন্দুর-নামক যোগের দ্বারা অক্ষয় সুখলাভ করে তিনি ক্লেশশত্রুজয়ী বীর হয়েছেন এবং যোগিযোগিনীদের মধ্যে অষ্টগুণৈশ্বর্যাদি যোগীন্দ্রচিহ্ন ধারণ করেছেন।

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য** ॥ শশিভূষণসংগৃহীত চা-চা গানের সংকলনে এই গানের একটি পাঠভেদ পাওয়া যায়।]

৫

[পুথিপৃষ্ঠা ৯। ক-খ]

॥রাগ গুর্জরী-চাটিল্লপাদানাম্ ॥

ভবণই গহণ[১] গম্ভীর[২] বেগেঁ বাহী।
দু আন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী ॥ ধ্রু ॥
ধামার্থে [২]চাটিল[২] সাঙ্কম [৩]গঢ়ই[৩]।
পারগামিলোঅ নিভর তরই ॥ ধ্রু ॥

[৪]ফাড়িঅ[৪] মোহতরু[৫] পাটি[৫] জোড়িঅ।
আদঅ[৬] দিঢ়[৬] টাঙ্গী নিবাণে[৭] কোহিঅ[৭] ॥ ধ্রু।
সাঙ্কমত চড়িলে দাহিণ বাম মা হোহী।
ণিয়ড্ডী বোহি দূর ম জাহী ॥ ধ্রু ॥
জই তুম্হেলোঅ হে হোইব পারগামী।
পুচ্ছতু চাটিল অনুত্তরসামী ॥ ধ্রু ॥

পাঠান্তর ॥

১—১, পুথিতে গম্ভীর-এরপর একটি কাটা আ-কারচিহ্ন আছে। তদনুসারে 'গম্ভীরা' (সেন)।
২—২ পুথিতে চাটিব লিখে তার 'ব' কেটে মাথায় 'ল' লেখা আছে।
৩—৩. গটই (শাস্ত্রী)। ৪—৪ ফাড়িঅ (টীকা) ৫—৫ পটি (পুথি. শাস্ত্রী, সেন)
৬—৬। দিটি (শাস্ত্রী), দিঢ়ি (সেন, শহী)।
৭—৭ কোড়িঅ (সেন, শহী, বাগচী)

পাঠবিচার ও শাব্দিক টীকা ॥ বেগেঁ < বেগেন। চিখিল < অবহট্‌ঠ চিখিল্ল, অর্থ 'কর্দমাক্ত', তুলনীয়— রোমনী ভাষায় 'চিকলো পানী' = কাদাঘোলা জল। গাথা সপ্তশতীতে কর্দম অর্থে 'চিক্‌খল্ল' ও 'চিক্‌খিল্ল' দুটি পদই ব্যবহৃত হয়েছে (দ্র. ১/৬৭, ৪/২৪)। থাহী— স্থাঘ + ইক = স্থাঘিক > থাহিঅ > থাহী, অর্থ থৈ [সংস্কৃতে স্থাঘ = অগভীর জলমগ্ন চড়া, দ্র. SED]। ধামার্থে—ধর্ম > ধাম + অর্থে (নিমিত্তার্থক অনুসর্গ) = ধর্মের জন্য, মতান্তরে চর্যাকর্তা ধামপাদের জন্য। সাঙ্কম < সঙ্ক্রম, অর্থ 'সাঁকো'। গঢ়ই— গ্রথতি > গঢই > গঢ়ই। চর্যায় ট ও ঢ় এর ছাঁদ প্রায় একরকম বলে শাস্ত্রী 'গটই' পড়েছেন, তবে 'গঢ়ই' পাঠ অধিকতর ভাষাতত্ত্বসম্মত। ফাড্ডিঅ— স্ফাটিত > ফাড্ডিঅ, ফাড়িঅ [স্ফট্ = ফেটে যাওয়া, বেড়ে যাওয়া, ধাতুপাঠ ৩২/৯০]। পাটি < পট্টিকা। পুথিতে 'পটি' লেখা আছে, কিন্তু 'পাটি' পাঠ ছন্দ ও ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে প্রশস্ততর। 'পটি' হয়ত 'পাটি'রই লিপিভ্রম। জোড়িঅ—'যুক্ত'-জাত প্রাকৃত ধাতু 'জোড + ইঅ (সংস্কৃত ক্ত-জাত) > জোড়িঅ > জোড়িঅ, অর্থ 'জোড়া হল'। আদঅ < অদ্বয়। দিঢ় < দৃঢ়। এই পদটির প্রকৃত পাঠ নিয়ে সমস্যা আছে, কারণ এই পদের দ্বিতীয় অক্ষরের মাথায় ই-কারের ঊর্ধ্ব আঁকড়ির মত একটি অর্ধবর্তুল বক্র রেখা আছে, এই বক্ররেখাকে অনেকে ই-কারের চিহ্ন ভেবে 'দিটি' বা 'দিঢ়ি' পাঠ নিয়েছেন। কিন্তু পুথির অন্যত্র ই-কারের ক্ষেত্রে আধুনিক ই-কারের মতই সংশ্লিষ্ট অক্ষরের বাঁদিকে একটি লম্বাকৃতি দাঁড়ি চিহ্ন ও মাথার উপরে একটি অর্ধবর্তুল বক্ররেখা আছে, অথচ আলোচ্য ক্ষেত্রে পদটির দ্বিতীয় অক্ষরের মাথার উপরে বক্ররেখা থাকলেও বাঁদিকে কোন দাঁড়ি চিহ্ন নেই, এজন্য একে ই-কার বলে গ্রহণ করা অসুবিধা-জনক। প্রকৃতপক্ষে, 'দিঢ়ি' পদটি নজীরবিহীন। এই চর্যা ছাড়াও অন্যত্র যেখানে দৃঢ়তাবোধক ক্রিয়াবিশেষণ (চর্যা ১, ১১) ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে 'দিঢ়' পদই লেখা হয়েছে। এখানেও 'দিঢ়' ক্রিয়াবিশেষণ, কাজেই 'দিঢ়' পাঠই প্রশস্ততর। লিপিকর হয়ত ঊর্ধ্ব আঁকড়ি দিয়ে ই-

কার লিখতে শুরু করে পরে ভুল বুঝতে পেরে বাঁ-দিকের দাঁড়িটি আর দেন নি। নীলরতন সেন 'দিঢি'কে 'ফিঢি' পড়েছেন, এই পাঠেরও কোন যুক্তি নেই। পুথির অন্য সব 'দি'ও 'ফি'-র সঙ্গে এই পদের প্রথম অক্ষরের তুলনা করলেই বোঝা যায় উদ্দিষ্ট পাঠ 'ফি' নয়, 'দি'। কোহিঅ < 'কোষিত' বা 'কষিত' [সংস্কৃতে √ কুষ্ ধাতুর অন্যতম অর্থ ছিন্ন করা। √ কষ্ = আঘাত করা ; দ্র. SED। √ কষ্ ধাতুর সঙ্গে সম্পর্ক ধরলে 'কহিঅ' 'কাহিঅ' পাঠ হওয়াই সঙ্গত ছিল, সেদিক থেকে কুষ্ + ণিচ্-জাত বলে ধরলে 'কোহিঅ' পাঠ পাওয়া যায়]। বাগচী তিব্বতী 'phig' (=cut asunder) অনুসারে 'কোড়িঅ' (> √ কুট = ছিন্ন করা) পাঠ গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু 'কুষ্' ধাতু-জাত 'কোহিঅ' পাঠেই যদি ছিন্ন করার ভাব প্রকাশ পায় তবে পাঠ সংশোধনের প্রয়োজন কোথায় ? সাঙ্কমত = সংক্রম > সাঙ্কম + ত (< অন্তঃ), সাঁকোতে। হোহী— ভব > হো + হি + (প্রাচীন অনুজ্ঞা ক্রিয়াবিভক্তি রক্ষিত) > হোহী। ণিয়ড্ডী— নিকট > ণিঅড + হি (প্রাচীন বাংলার অন্যতম অধিকরণবিভক্তি) > ণিঅড্ডি > ণিয়ড্ডী। জাহী— যা > জা + হি (প্রাচীন অনুজ্ঞা ক্রিয়াবিভক্তি রক্ষিত) > জাহী। তুম্হে— *তুষ্মাভিঃ (= যুষ্মাভিঃ) > তুম্হাহি > তুম্হহি > তুম্হে। 'তুম্হেলোঅ' পাঠ ধরলে 'লোঅ' (< লোক) কথাটিকে বহুবচনদ্যোতক উত্তরপদ বলে গ্রহণ করতে হয়। সামী < স্বামী।

বাচ্যার্থ ॥ ১—২, গহন ভবনদী গম্ভীর বেগে বয়। দুই পাড়ে কাদা, মাঝে থৈ নেই। ৩—৪, ধর্মের জন্য চাটিল সাঁকো গড়ে, পারগামী লোক নিশ্চিন্তে পার হয়। ৫—৬, মোহতরু ফাড়া হল, পাটি জোড়া হল, অদ্বয় টাঙ্গী নির্বাণে দৃঢ় ভাবে হানা হল ৭—৮, সাঁকাতে চড়লে ডান-বাঁ হোয়ো না। বোধি নিকটেই, দূরে যেয়ো না। ৯—১০, ওহে, যদি তোমরা পারগামী হবে তবে শ্রেষ্ঠ সাঁই চাটিলকে জিজ্ঞাসা কর।

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা ॥ বর্তমান গানে বৌদ্ধ দর্শনতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব উভয়ই আলোচিত হয়েছে। প্রথম চার পঙ্‌ক্তিতে বৌদ্ধদর্শনের মূলকথা ও বাকী অংশে অদ্বয় সাধনতত্ত্বের ইঙ্গিত আছে। বৌদ্ধ দর্শনে এই জীব ও জগৎ প্রতিভাস মাত্র, এর কোনো প্রকৃত অস্তিত্ব নেই। কতকগুলি আপেক্ষিক ও নিত্যপরিবর্তনশীল ইন্দ্রিয়বোধ বা 'ধর্ম' এবং উক্ত ইন্দ্রিয়বোধের সমষ্টি বা 'সংস্কারে'র প্রবাহেই বহির্জগতের অস্তিত্ব, এর পৃথক কোনো সত্তা নেই। বর্তমান গানে ভব বা অস্তিত্ব-প্রবাহকে নদীপ্রবাহের সঙ্গে তুলনা করে এই অস্তিত্বপ্রবাহের প্রকৃতিদুষ্টতা ও প্রাতিভাসিক স্বরূপের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। দিবারাত্র বিষয়তরঙ্গের উত্থানপতনে এই অস্তিত্বপ্রবাহ গহন বা ভয়ঙ্কর, বিবিধ দোষের সংস্পর্শে এই প্রবাহ গভীর। এর দুইদিকেই প্রকৃতিদোষের পঙ্ক, মাঝখানেও থৈ মেলে না— অর্থাৎ এই ভবপ্রবাহ পার হওয়া অত্যন্ত দুষ্কর। এই ভবপ্রবাহ পার হবার জন্য ধর্মগুরু চাটিল এক সেতু নির্মাণ করেছেন। পারগামী লোকেরা সেই সেতুতে নিশ্চিন্তে পার হতে পারবে। অর্থাৎ গুরু-নির্দেশিত মধ্যমার্গে বিচরণ করলেই লক্ষ্যোত্তীর্ণ হওয়া যাবে। অদ্বয়রূপ টাঙ্গী দিয়ে মোহরূপ তরুকে ছেদন করে তার পাটা দিয়ে এই সেতু গড়া হয়েছে। সেতুতে চড়ে বাম-দক্ষিণে ঝুঁকতে নেই। বোধি নিকটেই, দূরে যাবার প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ নাভিচক্রে বোধিচিত্তের উদ্বোধন হলেই ক্রমে সহজানন্দ-রূপ বোধি বা সিদ্ধি লাভ করা

যায়। এই সিদ্ধি দেহেই আছে, তার জন্য দূর তীর্থে যাবার দরকার নেই। দৃঢ় অদ্বয় জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যামোহ বা গ্রাহ্য-গ্রাহকভাব বিনষ্ট করে, সাঁকোয় যেমন নদীর দুই পাড়কে যুক্ত করা হয় তেমনি অবধূতী মার্গে দেহের বামগা-দক্ষিণগা নাড়ীর ক্রিয়াধারাকে যুক্ত করে বোধিচিত্তকে জাগ্রত ও ঊর্ধ্বগামী করলেই চরম প্রাপ্তি ঘটে। যারা পারগমনে ইচ্ছুক অর্থাৎ চরম প্রাপ্তির প্রয়াসী তারা শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরু চাটিলকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করুক।

৬

[পুথিপৃষ্ঠা ১১। ক]

॥রাগ পটমঞ্জরী—ভুসুকুপাদানাম্॥

[১]কাহেরে[১] ঘিণি মেলি অচ্ছহু কীস।
[২]বেঢ়িল[২] [৩]হাক[৩] পড়অ চৌদীস॥ ধ্রু॥
অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।
খনহ ন ছাড়অ [৪]ভুসুকু[৪] অহেরী॥ ধ্রু॥
তিণ ন [৫]চ্ছুপই [৫]হরিণা পিবই ন পাণী।
হরিণা হরিণির নিলঅ ণ জাণী॥ ধ্রু॥
হরিণী [৬]বোলঅ হরিণা সুণ হরিআ[৬] তো।
এ বণ চ্ছাড়ী হোহু ভান্তো॥ ধ্রু॥
[৭]তরঙ্গন্তে[৭] হরিণার খুর ন দীসঅ।
ভুসুক ভণই মূঢ়া হিঅহি ণ [৮]পইসঈ[৮]॥ ধ্রু॥

পাঠান্তর॥

১—১ কাহৈরি (পুথি, শাস্ত্রী), ২—২ বেটিল (শাস্ত্রী, সেন)
৩—৩ ড়াক (সেন), ৪—৪ ভুকু (পুথি), ভুকুঅ (শাস্ত্রী)
৫—৫ ছুবই (শহী), খণ্ডই (টীকা)
৬—৬ বোলঅ সুণ হরিণা (বাগচী), বোলই হরিণা সুণ (শহী)
৭—৭ তরঙ্গন্তে (শাস্ত্রী), তরঙ্গতেঁ (শহী), তরঙ্গতে (টীকা)।
৮—৮ পুঁথিতে 'পয়ইসই' লিখে য় বর্ণটি বর্জনের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

পাঠবিচার ও শাব্দিক টীকা॥ কাহেরে— কস্য > কাহ + এরে (কর্মবিভক্তি), পাঠান্তর 'কাহৈরি', কিন্তু এই পাঠ অশুদ্ধ বলেই মনে হয়, কেন না পদটির পরে আছে অসমাপিকা ক্রিয়া 'ঘিণি'। এই ক্রিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচারে সম্বন্ধবিভক্তিযুক্ত 'কাহৈরি' পদটি ব্যাকরণের দিক থেকে অপ্রযোজ্য এবং টীকায় প্রাপ্ত দ্বিতীয়াবিভক্তি-যুক্ত 'কাহেরে' পদই প্রযোজ্য। ঘিণি— গ্রহ্ + ক্ত = *গৃহ্নিত (= গৃহীত) > ঘিণিঅ > ঘিণি। মেলি— অর্থ 'ত্যাগ করে',

প্রাকৃত ও অপভ্রংশে 'ত্যাগ করা' অর্থে 'মেল্ল' ধাতুর প্রয়োগ আছে, তুলনীয় 'মেল্লই নীসাসু' (হেমচন্দ্র), 'মিল্লিবি' (পাহুড় দোহা)। পুরাতন বাংলায় বিদায় বা ত্যাগ করে যাওয়া অর্থে 'মেলানি' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। সুতরাং সম্ভাব্য ব্যুৎপত্তি মেল্ল + ইঅ (সংস্কৃত-ক্ত প্রত্যয়জাত) > মেল্লিঅ > মেলি। অচ্ছহু—অচ্ছ (< অস্) + হু < সংস্কৃত-ধ্বম্)। কীস— কীদৃশ > কীস, অথবা কস্য > কিস্স > কীস। বেঢ়িল—বেষ্টিত > বেড্ঢিঅ > বেঢ়িঅ + ইল্ল > 'বেঢ়িল', পাঠান্তর 'বেটিল' চর্যালিপির ট ও ঢ় অক্ষরের রূপসাদৃশ্যের আধারে অনুমিত। তবে ভাষাতাত্ত্বিক দিক থেকে কৃদন্ত বিশেষণ রূপ 'বেঢ়িল' পাঠ সঙ্গততর। হাক—প্রা. হক্ক > অপ. হাক্ক ; তু. 'হাক্ক তরাসই ভিচ্চগণা' (প্রাকৃতপৈঙ্গল)। পুথিতে 'হা' অক্ষরটি যে ভাবে লেখা আছে তাতে সেটিকে আধুনিক বাংলার 'ডা' অক্ষরের মত মনে হয় এবং সেদিক থেকেই 'ডাক' পাঠান্তরটি কল্পিত হয়েছে। কিন্তু পুথির অন্য জায়গার সুনিশ্চিত 'ডা' ও 'হা' অক্ষরের সঙ্গে এর তুলনা করলে দেখা যায় এটির 'ডা'-র পরিবর্তে 'হা' হবার সম্ভাবনাই বেশী। সেদিক থেকে 'হাক' পাঠ প্রশস্ত। টীকাতে 'হাক' পাঠের সমর্থন আছে ("মারমারতি হাকং") ; পড়অ—পততি > পড়ই (মূর্ধন্যীভবন ও ঘোষীভবন) > পড়অ। অপণা —* আত্মনস্য (= আত্মনঃ) > অপ্পণাহ > অপণা। খনহ— ক্ষণস্য > খণস্স > খনহ। ভুসুকু অহেরী— পাঠান্তর ভুকু— লিপিকর সম্ভবত 'ভুসুকু' লিখতে গিয়ে অসতর্কতাবশত 'সু' অক্ষরটি ছেড়ে গিয়েছেন। শাস্ত্রীর 'ভুকুঅ হেরী' পাঠ সম্ভবত ভ্রান্ত পদবিশ্লেষের ফল। 'ভুকু'র বদলে 'ভুসুকু' পাঠ ছন্দের দিক থেকেও সংগততর। অহেরী— অক্ষবাটিক > আখেটিক > আহেড়ী, আহেরী, অহেরী। চ্ছুপই <* ক্ষুভ্যতি। পুথিতে স্পষ্টত 'চ্ছুপই' লেখা আছে এবং এই পাঠ অর্থহীন নয়। কাজেই 'ছুবই' এই পাঠশুদ্ধি অপ্রয়োজনীয়। টীকায় 'চ্ছুপই'-এর পরিবর্তে 'খণ্ডই' (= কাটে) পাঠ পাওয়া যায়। এ থেকে বোঝা যায়, টীকাকার গানের যে পুথি অবলম্বন করে টীকা লিখে ছিলেন, সেই পুথিতে এখানে 'খণ্ডই' পাঠ ছিল। হরিণী বোলঅ হরিণী সুণ হরিআ তো— পুথির এই পাঠ নিয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে। কারণ : (১) এই পাঠের অর্থ সুস্পষ্ট ও সুসংগত নয়, (২) টীকা ও তিব্বতী অনুবাদের সূত্র ধরে এই অংশের একটি ভিন্ন অথচ অর্থের দিক থেকে সংগততর পাঠের আভাস পাওয়া যায়। অনুবাদের আধারে বাগচী এই অংশের টীকার যে সংশোধিত পাঠ নিয়েছেন তা হল : '[ষড়্] বিষয়ান্ ভাবগ্রহান্ হরতি খণ্ডয়তি [ইতি] হরিণীতি সন্ধ্যাভাষয়া সৈব জ্ঞানমুদ্রা। নৈরাত্ম্যভাবকস্য অভ্যাস প্রকর্ষবশাদ্ আশ্বাসং [অবলম্বয়তি] ভো চিত্তহরিণ' —টীকার এই অংশ থেকে মূল গানের যে পাঠের আভাস পাওয়া যায়, তা হল [ষড়্ ...জ্ঞানমুদ্রা =] হরিণী + [নৈরাত্ম্যভাবকস্য ∴ অবলম্বয়তি =] বোলঅ + ['ভো চিত্তহরিণ' =] হরিণা (তো)—মূল গানের তিব্বতী অনুবাদে 'হরিণা'র আগে rtsva med (= তৃণশূন্য, অতৃণ) যুক্ত আছে, হয়ত মূল গানের 'সুণ' পদটিকেই তিব্বতী অনুবাদক 'তৃণশূন্য'-এর সমার্থক ভেবে ঐ রকম অনুবাদ করেছিলেন। এই অনুমান ঠিক হলে, এখানে যে পাঠের আভাস ফুটে ওঠে তা হল : হরিণী + বোলঅ + সুণ + হরিণা (তো) = হরিণী বোলঅ সুণ হরিণা তো। বাগচী এই পাঠ গ্রহণ করেছেন।

বলা বাহুল্য এই পাঠ অর্থের দিক থেকে পুথির পাঠের চেয়ে অধিক তাৎপর্যপূর্ণ [পুথির পাঠের আক্ষরিক অর্থ : "হরিণী বলে, হরিণ শোন্, তুই চোর বা জুয়াড়ী"]। পুথির পাঠের এই অর্থক্লিষ্টতা দেখে মনে হয়, মূল গানে হয়ত বাগচী-নির্দেশিত পাঠই বজায় ছিল। লিপিকর নকল করতে গিয়ে ভুল করে 'সুণ'-এর আগে 'হরিণা' লিখেছেন এবং সেই ভুল সংশোধন করতে গিয়ে পঙ্‌ক্তির শেষে আর একটি ভুল করেছেন : 'হরিণা' না লিখে 'হরিআ' লিখেছেন। শুধু তাই নয়, 'হরিআ' লিখেও আগেকার 'হরিণা' পদটি কাটেন নি। এমন ভ্রান্ত দ্বিলিখন (dittography) পুরনো পুথিতে অনেক সময়েই লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত পুথির ১১ সংখ্যক পত্রের সম্মুখ পৃষ্ঠার তৃতীয় পঙক্তিতে গানের এই চরণটি আছে, পুথির এই তৃতীয় পংক্তির দক্ষিণ প্রান্তে একটি কাটা চিহ্ন (×) আছে, এ থেকে মনে হয় লিপিকর অথবা কোন লিপি-পরীক্ষক পুথির এই পঙ্‌ক্তিতে কোন ত্রুটি লক্ষ্য করেছিলেন। এই পঙ্‌ক্তিতে অবশ্য 'পয়ইসঙ্গ' পদে লিপিভ্রম ছিল, কিন্তু লিপিকর নিজেই 'য়' বর্ণটির উপর বর্জন-চিহ্ন দিয়েছেন। এ থেকে মনে হয় প্রান্তিক কাটা চিহ্নটির লক্ষ্য সম্ভবত ঐ পঙ্‌ক্তির প্রথম অংশ "হরিণা... হরিআ তো"। কাজেই পুথির পাঠের চেয়ে বাগচীর পাঠই প্রশস্ততর ; তথাপি মূল গানে পুথির পাঠই রাখা হল, কারণ গানের পঞ্চম পঙ্‌ক্তি 'তিণ ন চ্ছুপই... পাণী'র সঙ্গে এর একটি ছান্দসিক ঐক্য (উভয় চরণই ১২।৮ মাত্রায় রচিত) লক্ষ্য করা যায়। হয়ত আদিতে বাগচীর পাঠই প্রচলিত ছিল, পরে লোকমুখে গানের পঞ্চম পঙ্‌ক্তির সঙ্গে তাল রেখে পুথির পাঠ প্রচলিত হয়। এই গানের যে অন্তত দুটি ভিন্ন পাঠ প্রচলিত ছিল তা পঞ্চম পঙ্‌ক্তির 'চ্ছুপই/খণ্ডই' পাঠভেদ থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। হরিআ < হরিক, অর্থ 'চোর, জুয়াড়ী, ফেরারী'। চ্ছাড়ী— ছর্দিত > ছড্ডিঅ > ছাড়ী। হো + হু—ভব > হো + হু < ধ্বম্। তরসঁন্তে— √ ত্রস্ + শতৃ = ত্র্যস্যন্ত্ > তরসন্ত + এঁ = তরসন্তেঁ > তরসঁন্তে (নাসিক্যধ্বনির পূর্বসংক্রম)। তিব্বতী অনুবাদের 'phyoṅs shin brgyugs pas (= সন্ত্রস্তধাবনাৎ)-ও √ ত্রস্ ধাতুর সঙ্গে যোগ নির্দেশ করে। তবে টীকার 'তরঙ্গতে' পাঠও অর্থবহ : তরঙ্গ [= লম্ফ] + তে। কিন্তু শাস্ত্রীর 'তরঙ্গন্তে' পাঠের কোন যুক্তি নেই। কারণ পুথিতে বেশ বড়ো করে 'স' লেখা আছে। তা ছাড়া সঁ-কে 'গ' পড়লেও পাঠ 'তরঙ্গন্তে' হয় না, হয় 'তরগঁন্তে বা "তরগংন্তে',কারণ নাসিক্য-চিহ্ন 'র'-এর মাথায় নেই, আছে তার পরবর্তী বর্ণের মাথায়। দীসঅ—দৃশ্যতে > দিস্‌সই > দীসই, দীসঅ, পাঠান্তর দীসই। মূঢ়া— মূঢ়স্য > মুঢ়স্‌স > মুঢ়া ; পাঠান্তর 'মূঢ়া' (সেন এবং বাগচী)। মূঢ়া— চর্যা-পুথির ট ও ঢ-এর আকৃতি-সাদৃশ্যের অবকাশে কল্পিত। কিন্তু অর্থবোধের দিক থেকে মূঢ় + আ (সম্বন্ধ বিভক্তি) = 'মূঢ়া' পাঠই প্রশস্ত। বাগচী তিব্বতী অনুবাদ 'blun-sñin-la mi-', 'jug' [=মূঢ়হৃদয়ং ন প্রবিশতি]-এর আধারে 'মূঢ়হিঅহি' পাঠ নির্দেশ করেছেন। কিন্তু পুথিতে স্পষ্ট 'মূঢ়া হিঅহি' আছে এবং এই পাঠ অর্থহীন না হওয়ায় পাঠান্তর অপ্রয়োজনীয় মনে হয়।

বাচ্যার্থ ॥ ১—২, কাকে নিয়ে কাকে ছেড়ে কি ভাবে আছি, চারদিক বেষ্টন করে হাঁক পড়েছে। ৩—৪, হরিণ তার নিজের মাংসে নিজেরই শত্রু, ভুসুকু ক্ষণিকের জন্যও

শিকার ছাড়ে না। ৫—৬, হরিণ ঘাস ছোঁয় না, জল পান করে না। হরিণ হরিণীর নিলয় (আবাস) জানে না। ৭—৮, হরিণী হরিণকে বলে, শোন, জুয়াড়ি তুই (পাঠান্তরে—হরিণী হরিণকে বলে, তুই শোন) এ বন ছেড়ে পলাতক হ। ৯—১০, ভয়ে-পালানো হরিণের খুর দেখা যায় না। ভুসুকু বলে, [এই চর্যার তাৎপর্য] মূঢ়ের হৃদয়ে প্রবেশ করে না।

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা ॥ বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকেরা চিত্তের দুটি অবস্থা নির্দেশ করেছিলেন —একটি সাংবৃতিক, অপরটি পারমার্থিক। সাংবৃতিক অবস্থায় চিত্ত নানা প্রকৃতিদোষে দুষ্ট হয়ে এই জরামরণ-সুখদুঃখপূর্ণ জগৎ প্রপঞ্চের সৃষ্টি করে। অবিদ্যার প্রভাবে চিত্ত এই অবস্থায় সর্বদাই চঞ্চল এবং নানাবিধ বিপর্যয়-বেষ্টিত। অন্যদিকে পারমার্থিক অবস্থায় চিত্ত সর্ববিধ প্রকৃতিদোষ ও অবিদ্যাবিক্ষোভ থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃতিপ্রভাস্বর-রূপে আনন্দময় সহজস্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়। চিত্তকে সাংবৃতিক অবস্থা থেকে পারমার্থিক অবস্থায় পরিণত করাই বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের লক্ষ্য। এখানে হরিণ-হরিণী ও মৃগয়ার রূপকে চিত্তের এই দুই অবস্থা ও অবস্থান্তরের কথা বলা হয়েছে। সাংবৃতিক চিত্ত চঞ্চলতার জন্য হরিণরূপে কল্পিত এবং পারমার্থিক চিত্ত ভবগ্রহ হরণ করে বলে হরিণীরূপে বর্ণিত। হরিণরূপ সাংবৃতিক চিত্তের চতুর্দিকে কালরূপ শিকারীর মারণহুঙ্কার যখন চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হয় তখন সেই অবস্থায় কাকে অর্থাৎ নৈরাত্মাকে গ্রহণ করে তিনি কি ভাবে সেই আবেষ্টন থেকে মুক্তি পেয়েছেন কবি ভুসুকুপাদ এই চর্যায় তারই বর্ণনা দিয়েছেন। হরিণের নিজের মাংস যেমন তার নিজেরই শত্রুতা বা দুঃখের কারণ, ঠিক তেমনি চিত্ত প্রকৃতি-দোষ ও অবিদ্যার প্রভাবে নিজেই যে-জগৎপ্রপঞ্চের সৃষ্টি করে সেই আত্মসৃষ্টিই চিত্তের দুঃখের কারণ। অবিদ্যা-প্রভাবিত চিত্তের এই দুর্গতি অনুধাবন করে ভুসুকু গুরুবচনরূপ বাণ-দ্বারা চিত্তকে সর্বক্ষণ প্রহার করেন। এই প্রহারে প্রবুদ্ধ হয়ে চিত্ত তার পারমার্থিক সহজস্বরূপ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এবং পানাহার-রূপ জাগতিক ভোগ ত্যাগ করে হরিণীরূপা নৈরাত্মার কাছে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়। কিন্তু অশুদ্ধ অবস্থায় এই নৈরাত্মার সন্ধান পাওয়া যায় না, তাই চিত্ত-হরিণের কাছে নৈরাত্মাহরিণীর উদ্দেশ্য অজ্ঞাত। চিত্ত হরিণের এই বিপন্ন অবস্থায় নৈরাত্মা-হরিণীর আহ্বান আসে, কায়বন ত্যাগ করে, বনান্তরে যাও অর্থাৎ শারীরিক বা ভবের যাবতীয় মোহ ত্যাগ করে নৈরাত্মার আবাসস্বরূপ মহাসুখকমলবনে বিভ্রান্তিবিকারহীন অবস্থায় বিচরণ কর। নৈরাত্মার আহ্বানে চিত্ত সাড়া দেয়। তীব্রগতিতে অবধূতী মার্গে চিত্তের ঊর্ধ্বায়ন চলে, চিত্তের সাংবৃতিক রূপ তখন আর দেখা যায় না। ভুসুকুর অভিমত, যাঁরা শাস্ত্রাভিমানী পণ্ডিত তাঁরা মূঢ়বৎ এই ধর্মতত্ত্ব থেকে বহুদূরে বিরাজ করেন, তাঁদের হৃদয়ে এই তত্ত্ব কিছুমাত্র প্রবেশ করে না।

৭

[পুথিপৃষ্ঠা ১২ । খ]

॥ রাগ পটমঞ্জরী—কাহ্নপাদানাম্ ॥

[১]আলিএঁ[১] কালিএঁ বাট [২]রুন্ধেলা[২] ।
তা দেখি[৩] কাহ্নু[৩] বিমন ভইলা ॥ ধ্রু ॥
[৪]কাহ্নু [৪]কহিঁ[৫] গই করিব নিবাস ।
জো মণগোঅর সো উআস ॥ ধ্রু ॥
তে তিনি তে তিনি তিনি হো ভিন্না ।
ভণই[৬] কাহ্নু[৬] ভব পরিচ্ছিন্না ॥ ধ্রু ॥
জে জে আইলা তে তে গেলা ।
অবগাবণে [৭]কাহ্নু[৭] [৮]বিমণ[৮] [৯]ভইলা[৯] ॥ ধ্রু ॥
হেরি সে কাহ্নি [১০]ণিঅড়ী[১০] জিনউর বট্টই ।
ভণই [১১]কাহ্নু[১১] [১২]মো হিঅহি[১২] ন পইসই ॥ ধ্রু ॥

পাঠান্তর ॥

১—১ অলিএঁ (পুথি, শাস্ত্রী)
২—২ রেন্ধেলা (পুথি)
৩—৩ কাহ্নু (শাস্ত্রী), কাহ্নু (বাগচী),
৪—৪ কাহ্নু (শাস্ত্রী, সেন), কাহ্নু (বাগচী)
৫—৫ কহিঁর (পুথি)
৬—৬ কাহ্নু (শাস্ত্রী, বাগচী, সেন)
৭—৭ কাহ্নু (শাস্ত্রী, বাগচী, সেন)
৮—৮ বিমন (শাস্ত্রী, বাগচী, সেন)
৯—৯ ভইইলা (পুথি) ভইঈলা (শাস্ত্রী)
১০—১০ ণিয়ড়ি (শাস্ত্রী) নিয়ড়ি (বাগচী, শহী), নিঅড়ী (সেন)
১১—১১ কাহ্নু (শাস্ত্রী, বাগচী, সেন)
১২—১২ মোহিঅহি (শাস্ত্রী)।

পাঠবিচার ও শাব্দিক টীকা ॥ আলিএঁ—আলি+এঁ (তৃতীয়া-এনজাত), কালিএঁ—কালি + এঁ ; আলি-কালি, সাধকদের পারিভাষিক শব্দ, 'আলি' নিঃশ্বাসবাহী বামগা এবং 'কালি' প্রশ্বাসবাহী দক্ষিণগা নাড়ীর প্রতিশব্দ। আলি—অ+আলি (=শ্রেণী, সমূহ) = আলি অর্থাৎ 'অ' প্রভৃতির স্বরবর্ণসমূহ ; কালি—ক+আলি (= শ্রেণী, সমূহ) = কালি অর্থাৎ 'ক' প্রভৃতি ব্যঞ্জন বর্ণসমূহ। তন্ত্রমতে স্বরবর্ণ বামগা নাড়ী ও ব্যঞ্জনবর্ণ দক্ষিণগা নাড়ীর প্রতিশব্দ। আলি=প্রজ্ঞা (ইড়া), কালি=উপায় (পিঙ্গলা)। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, তিব্বতী ভাষায় স্বরবর্ণমালা ও ব্যঞ্জনবর্ণমালা যথাক্রমে 'আলি' ও 'কালি' নামে অভিহিত। পুথির 'অলিএঁ' পাঠ সম্ভবত লিপিপ্রমাদ, অসাবধানতায় আ-কার বর্জিত। বাট—বর্ত্ম> বট্ট>বাট। রুন্ধেলা—রুধ্+ক্ত=*রুন্ধিত (=রুদ্ধ)> রুন্ধিঅ>রুন্ধি+লা (অতীতের ইল্লজাত) =রুন্ধিলা>রুন্ধেলা। পুথির 'রেন্ধেলা' পাঠ স্পষ্টত লিপিপ্রমাদ, অসতর্কতাবশত লিপিকর বোধ হয় 'রু'-র আগে একটি অযথা এ-কার লিখে ফেলেছেন।

কাহ্ন<কৃষ্ণ। পুথিতে 'উ'-কারের চিহ্ন স্পষ্ট নয়, সেজন্য উ-কার-বর্জিত পাঠ গৃহীত হল। তিব্বতী লিপ্যন্তরেও উ-কার বর্জিত। ভইলা—ভূ+ক্ত=* ভবিত (=ভূত) >ভইঅ+লা (ইল্লজাত) =ভইলা। কহিঁ—কস্মিন্>কস্সিং>কহিং>কহিঁ। কহিঁর—লিপিকর সম্ভবত অসতর্কতাবশত একটি অতিরিক্ত 'র' বসিয়ে ফেলেছেন। কিংবা পরবর্তী পদ 'গই'-এর 'গ' লিখতে 'র' লিখেছেন, কিন্তু তা লিখেও 'র'-তে বর্জন-চিহ্ন দেন নি। টীকায় 'কহিঁ গই' আছে। গই—গম্+ক্ত=*গমিত (=গত)>গবিঅ>গই। করিব—কৃ+তব্য=*করিতব্য (=কর্তব্য)>করিঅবব>করিব। তিনি—ত্রীণি>তিণ্নি>তীনি, তিনি। আইলা—আয়াত>আআঅ>আঅ+ইলা>আইলা। বিমণ<বিমনাঃ। শাস্ত্রী, বাগচী, সেন 'বিমন' পাঠ নিলেও পুথিতে স্পষ্টত 'বিমণ' পাঠ আছে। ভইহেলা—পুথির এই পাঠ স্পষ্টত লিপিভ্রম, এটি লিপিদ্বিত্ব বা dittography-র উদাহরণ। হেরি—হের্ (প্রাকৃত ধাতু)+ইঅ=হেরিঅ>হেরি [হের=দেখা, বোধ করা, বিবেচনা করা]। কাহ্নি—কৃষ্ণ>কাহ্ন+ই (আদরে বা সম্বোধনে)। ণিঅড়ি—নিকট>ণিঅড+ই (অধিকরণ-বিভক্তি)>ণিঅড়ি। বট্টই—বর্ত্ততে>বট্টই (মূর্ধন্যীভবন ও সমীভবন)। মো হিঅহি—মো<মম। হিঅহি—হৃদয়>হিঅ+হি (<স্মিন্)। শাস্ত্রী 'মোহিঅই' (মুহ্যতে) মুগ্ধ হয় এই অর্থ গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তিব্বতী অনুবাদে 'মো হিঅহি' পাঠের আভাস আছে bdag gi sniṅ = আমার হৃদয়ে। পইসই—প্রবিশতি>পবিসই>পইসই।

বাচ্যার্থ ॥ ১—২. আলিতে কালিতে পথ রুদ্ধ করল। তা দেখে কাহ্ন বিমনা হল। ৩—৪. কাহ্ন কোথায় গিয়ে নিবাস করবে। যারা মনগোচর (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল) তারা [সত্য সম্পর্কে] উদাস (বা অজ্ঞ)। ৫—৬, তারা [স্বর্গমর্ত্যরসাতল বা কায়বাক্‌চিত্ত বা দিবা-রাত্রি-সন্ধ্যা সংখ্যায়] তিন, তারা [সংখ্যায়] তিন, তিন হয় ভিন্ন। কাহ্ন বলে, [ইন্দ্রিয়জ্ঞানীর নিকট] ভব পরিচ্ছিন্ন [রূপে দেখা দেয়]। ৭—৮. যারা যারা এল তারা তারা গেল। আনাগোনায় কাহ্ন বিমনা হল। ৯—১০. ওরে কাহ্নি, মনে হয় সেই জিনপুর নিকটেই রয়েছে। কাহ্ন বলে, আমার হৃদয়ে পশে না।

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা ॥ বর্তমান চর্যায় সত্যের সাংবৃতিক ও পারমার্থিক এই দুটি রূপের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অবিদ্যাবিক্ষুব্ধ চিত্তে সত্যের সাংবৃতিক রূপই ধরা পড়ে, জগৎকে তখন বহুধাবিভিন্ন বলে মনে হয়, কিন্তু যিনি পরমার্থবিদ্ যোগী তাঁর এই ভেদোপলব্ধি থাকে না। দেশজ্ঞান-কালজ্ঞান প্রভৃতি যাবতীয় ইন্দ্রিয়জ্ঞান দূর হলে মহাসুখের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথম পঙ্‌ক্তিদ্বয়ের ব্যাখ্যা দুভাবে করা যায় : প্রথমত, আলিকালি অর্থাৎ লোকজ্ঞান বা লোকভাসের দ্বারা পরমার্থের পথ রুদ্ধ হতে কাহ্ন বিমনা হলেন। দ্বিতীয়ত, আলি ও কালি অর্থাৎ প্রজ্ঞা ও উপায়-নাড়ীদ্বয়কে একত্র করে অবধূতীমার্গকে রুদ্ধ বা দৃঢ় করা হল। দেখে কাহ্ন বিমন বা বিশুদ্ধমনাঃ হলেন। নিজেকে সম্বোধন করে কবি বলেছেন, তুমি এখন কোথায় গিয়ে বাস করবে অর্থাৎ বিশুদ্ধ হলে মহাসুখলাভের জন্য অন্যত্র গমনের প্রয়োজন হয় না। যে সমস্ত যোগী 'মনগোচর' অর্থাৎ মন ও ইন্দ্রিয়বোধের উপর নির্ভরশীল তারা এই ধর্ম সম্পর্কে উদাস বা অজ্ঞ। কেননা ইন্দ্রিয়জ্ঞানীর নিকট এই ভব বা সৃষ্টি স্বর্গ-মর্ত্য-রসাতল, কায়-বাক-

চিত্ত বা দিবা-রাত্রি-সন্ধ্যা ভেদে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন তিন-তিন রূপে প্রতিভাত হয়, কিন্তু পরমার্থজ্ঞানীর এই ভেদোপলব্ধি থাকে না। অবিদ্যার প্রভাবেই জগতে আসা-যাওয়া-থাকা বা উৎপাদস্থিতিভঙ্গ বা সৃষ্টিস্থিতি-বিনাশের প্রতিভাসঘটে। এই প্রতিভাসপ্রবাহ সংবৃতি-সত্য মাত্র, পরমার্থ-সত্য নয়। সংবৃতি-সত্যের স্বভাব জ্ঞাত হয়ে কাহ্ন যোগবলে মন বিশুদ্ধ করলেন। কাহ্ন বলছেন যে, মন বিশুদ্ধ হওয়ায় জিনপুর বা মহাসুখকে নিকটবর্তী বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু শূন্যতাজ্ঞান পূর্ণ না হওয়ায় এখনও তা তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করে নি।

৮

[পুথিপৃষ্ঠা ১৩।খ-১৪।ক]

॥ রাগ[১] দেবক্রী[১]—কম্বলাম্বরপাদানাম্ ॥

সোনে[২] ভরিলী[২] করুণা নাবী।
রূপা থোই[৩] নহিকে[৩] ঠাবী ॥ ধ্রু ॥
বাহতু কামলি গঅণ উবেসেঁ।
[৪]গেলী[৪] জাম[৫] বহুড়ই[৫] কইসেঁ ॥ ধ্রু ॥
খুন্টি উপাড়ী মেলিলি[৬] কাচ্ছী[৬]।
বাহতু কামলি সদ্‌গুরু[৭] পুচ্ছী[৭] ॥ ধ্রু ॥
মাঙ্গত[৮] চড়িলেঁ[৮] চউদিস চাহঅ।
কেডুআল নাহি কেঁ কি বাহবকে পারঅ ॥ ধ্রু ॥
বাম দাহিণ চাপী মিলি মিলি[৯] মাগা[৯]।
বাটত মিলিল মহাসুখ[১০] সঙ্গা[১০] ॥

পাঠান্তর ॥

১—১ দেবক্রীড়া (তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে) ২—২ ভরিতী (শাস্ত্রী, বাগচী, সেন)
৩—৩ মহিকে (শাস্ত্রী, শহী, সেন), নাহিক (বাগচী).
৪—৪ গেলা (বাগচী) ৫—৫ বহু উই (শাস্ত্রী), বাহুড়ই (বাগচী, শহী)
৬—৬ কাচ্ছি (শাস্ত্রী, বাগচী) কাছি (শহী) ৭—৭ পুচ্ছি (শাস্ত্রী, বাগচী) পুছি (শহী)
৮—৮ চন্‌হিলে (শাস্ত্রী, চড়্‌হিলে (বাগচী), চড়িলে (শহী)
৯—৯ মাঙ্গা (বাগচী, শহী)
১০—১০ সুন্না (পুথি, শাস্ত্রী), সান্না (বাগচী, শহী) স্বন্না (সেন)

পাঠবিচার ও শাব্দিক টীকা ॥ সোনে—সুবর্ণ>সোণ+এ (করণ-অধিকরণবিভক্তি)। ভরিলী—ভরিত>ভরিঅ+ইল=ভরিল+ঈ (স্ত্রীপ্রত্যয়), স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ 'নাবী'-র বিশেষণ। পুথিতে এই অংশের পাঠ স্পষ্ট নয়। তথাপি 'ভরিলী' ও 'ভরিতী' এই দুই পাঠের

মধ্যে 'ভরিলী' পাঠই প্রশস্ততর মনে হয়। কারণ চর্যায় ইল-অন্ত কৃদন্ত বিশেষণের ব্যবহারই বহুল পরিমাণে পাওয়া যায় [যথা, চড়িলী, গেল, মাতেল], ইত-অন্ত বিশেষণ পদ সে তুলনায় বিরল। তাছাড়া তৎসম শব্দ 'ভরিতী'র অবিকৃত বা অপরিবর্তিত ভাবে অবস্থান করা একটু অস্বাভাবিক মনে হয়। ইল-প্রত্যয় যুক্ত না হলে 'ভরিতী' পদের প্রাকৃত-ব্যবহিত তদ্ভব 'ভরিঈ' বা 'ভরী' রূপই প্রত্যাশিত। তাছাড়া, চর্যার পরেও মধ্যবাংলার কৃদন্ত বিশেষণ হিসাবে 'ভরিল' পদের প্রয়োগ আছে : ভরিল যমুনাত তোহ্মাকে কৈলোঁ পার (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)। কাজেই 'ভরিলী' পাঠই সংগততর। নাবী—নাব+ইকা (ক্ষুদ্রার্থে)>নাবিকা>নাবী (=ছোট নৌকা)। থোই—স্থপ (=স্থাপ)>থব>থো+ই<তি।

নহিকে—নহি+কে। নহি—নহি (তৎসম পদ) ; কে<ক ঃ, অর্থ 'কোন'। পুথিতে ম-এর উপর ন-এর overwriting আছে বলে মনে হয় অর্থাৎ ভুলক্রমে লেখা 'ম'-এর উপর 'ন' লেখার প্রয়াস আছে। অন্যদিকে বাগচীর 'নাহিক' পাঠ অপ্রয়োজনীয় মনে হয়, কারণ 'নাহিক' (নাহি+ক) পদে যে স্বার্থিক 'ক' প্রত্যয় পাওয়া যায় তা মধ্য বাংলা থেকে বাংলায় বহু প্রচলিত হলেও প্রাচীন বাংলায় এর বিশদ নজীর-পাওয়া যায় না। প্রাচীন বাংলায় স্বার্থিক প্রত্যয় হিসেবে 'ক'-র বদলে-কে প্রত্যয়ই ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন : বাহবকে। তাছাড়া টীকার 'স্থানভেদং নাস্তি' বাক্যাংশ থেকে 'জায়গা নেই'-এর বদলে 'কোন জায়গা নেই' এমন ভাবই পরিস্ফুট হয়। সেদিক থেকে 'কোন' অর্থবোধক-কে (<কঃ) প্রত্যয়ের ব্যবহার খুবই যুক্তিসংগত। কাজেই 'নহিকে' পাঠ গ্রহণযোগ্য। সোনা-রূপা শব্দ দুটি শ্লিষ্ট বা দুই অর্থে ব্যবহৃত : (১) ধাতু অর্থে (২) সোনা—শূন্য বা শূন্যতা, রূপা—(১) ধাতু (২) রূপাদি বিকল্পজ্ঞান। ঠাবী—স্থায় (=স্থান, দ্র. SED)+ইক>ঠাইঅ>ঠাঈ, ঠাবী (ব-শ্রুতি)। উবেসেঁ—'উপদেশেন' বা 'উদ্দেশেন'>উএসেঁ>উবেসেঁ (ব-শ্রুতি)। গেলী—গত>গঅ+ইল>গইল>গেল +ঈ (স্ত্রী প্রত্যয়)। এক্ষেত্রে স্ত্রী প্রত্যয়ের ব্যবহার অযৌক্তিক, কারণ 'গেলী' যার বিশেষণ সেই বিশেষ্যপদ 'জাম' পুংলিঙ্গ। এক্ষেত্রে স্ত্রীত্ববোধক ঈ-কারের পরিবর্তে স্বার্থে আ-কার যুক্ত হওয়াই সংগত। মনে হয় লিপিকর আ-কার লিখতে ঈ-কার লিখে ফেলেছেন। জাম<জন্ম। বহুড়ই—ব্যাঘুটতি>বাহুড়ই, বহুড়ই, অর্থ 'ফেরে'। কইসেঁ—*কদৃশেন>কইসেন>কইসেঁ। উপাড়ী—উৎপাটিত>উপ্পাডিঅ>উপাড়ী। মেলিলি—অপভ্রংশ 'মেল্ল' ধাতু + ইঅ (কৃজাত)> মেলিঅ+ইল>মেলিল+ই (ঈ—স্ত্রী-পত্যয়), স্ত্রীলিঙ্গ 'কাচ্ছী'-র বিশেষণ। কাচ্ছী—কক্ষিকা>কচ্ছিআ>কচ্ছি, কাচ্ছী। মাঙ্গত—মার্গ (?) >মাঙ্গ + ত (অন্তঃজাত—অধিকরণে), *'Māngo* is found as *mango* in Hemachandra, Abhidhāna-cintāmaṅi, III. 542 in the sense of upper part of the boat' P.C.Bagchi, JDL, vol. XXX. p. 30) মাঙ্গ=তিব্বতী অনুবাদে gruyi mjug la=নৌকার পশ্চাদ্‌ভাগ। সুতরাং মাঙ্গ='গলুই' অর্থ প্রশস্ত। চড়হিলেঁ—অপভ্রংশ ধাতু চড়+ইঅ (-কৃত জাত)>চড়িঅ>চড়হিঅ (=চড়িঅ) + ইল = চড়হিল+এঁ (অধিকরণ—ভাবে সপ্তমীর অনুরূপ ভূতার্থ অসমাপিকা ক্রিয়া)। পুথিতে ড + হ্ যুক্তাক্ষররূপে লিখিত। এই যুক্তাক্ষরকে কেউ কেউ ন্+হ্-এর সমন্বয় বলে মনে করে 'চন্‌হিলে' পাঠ নিয়েছেন, কিন্তু এই পাঠ তেমন অর্থবহ

নয়। অন্যদিকে যাঁরা 'চড়্হিলে' বা 'চড়িলে' পাঠের সমর্থক তাঁরা পুথিতে লেখা নাসিক্য-চিহ্নটি বাদ দিয়েছেন,কিন্তু নাসিক্যচিহ্ন বর্তমান প্রসঙ্গে অযৌক্তিক বা ব্যাকরণদুষ্ট নয়। কাজেই 'চন্হিলে' 'চড়হিলে' 'চড়িলে' ও 'চড়্হিলেঁ'--এই চারটি পাঠের মধ্যে শেষোক্ত পাঠটিই গ্রহণযোগ্য। চাহঅ<চষ্টে | =চষ্>চাহ+তে>ই, অ]>চাহঅ। চউদিস চাহঅ—তিব্বতী অনুবাদে এই অংশের পাঠান্তরের আভাস আছে, কারণ এই অংশের অনুবাদে তিব্বতীতে আছে : mtshen (mtshed) shin' gro=গর্তে বা খালে পড়ে। এখানে "টীকার 'সংসারে পততি। তথাচ চর্যাপাদঃ। খালত পড়িলেঁ কাপুর নাশই' অংশটি লক্ষণীয়। হয়ত 'চউদিস চাহঅ'-এর জায়গায় 'খালত পড়অ' বা ঐ জাতীয় কোন পাঠান্তর প্রচলিত ছিল। কেড়ুআল— কৃপীটপাল>কঈড়বাল>কেড়আল>কেড়ুআল। কেঁ<কেন। বাহবকে— বহ্+ণিচ্+তব্য>বাহিতব্য>বাহিঅব্ব>বাহব+কে (গৌণকর্ম-সম্প্রদান-বিভক্তি—তুমর্থ অসমাপিকা অর্থে)। মাগা—মার্গ > মগ্গ >মাগ+আ (স্বার্থে) =মাগা। বাগচী ও শহীদুল্লাহ্ ক্রমিক অন্ত্যানুপ্রাসের জন্য 'মাঙ্গা'-পাঠ নিয়েছেন, কিন্তু পুথিতে স্পষ্টই 'মাগা' লেখা আছে এবং 'মাগা' পাঠ নিলে অন্ত্যানুপ্রাসের যে ক্রমভঙ্গ হয় তা চর্যার ভাষায় নজীরবিহীন নয়। কাজেই পাঠশুদ্ধি অপ্রয়োজনীয় বলেই মনে হয়।

সঙ্গা<সঙ্গ। পুথির 'সুঙ্গা' পাঠ সম্ভবত লিপিভ্রম। পুথির 'সুঙ্গা'-কে কেউ কেউ 'স্বঙ্গা' পড়েছেন : পুথির উ-কার ও ব-ফলার ছাঁদ প্রায় একরকম বলে এই পাঠান্তর। তবে এই উ-কার ও ব-ফলার সূক্ষ্ম তফাৎ আছে : উ-কারের ক্ষেত্রে মূল বর্ণের নিম্নবর্তী ত্রিকোণ 'ব'-এর মাঝখানটি ফাঁকা থাকে না, সবটুকু মসীলিপ্ত, কিন্তু ব-ফলার ক্ষেত্রে 'ব' অর্থাৎ তিনটি রেখার মধ্যবর্তী জায়গাটুকু ফাঁকা থাকে। বর্তমান ক্ষেত্রে স-এর নিম্নবর্তী 'ব' সর্বাংশে মসীলিপ্ত,কাজেই এখানে ব=উ-কার। অন্যদিকে, 'সঙ্গা'কে শুদ্ধ করে 'সাঙ্গা' পাঠের প্রয়োজন নেই, কারণ মাগা—সঙ্গা মিল চর্যায় অপ্রত্যাশিত নয়।

বাচ্যার্থ ॥ ১-২. [ছোট] করুণা-নৌকা সোনায় ভর্তি, রূপা রাখতে কোন ঠাঁই নেই। ৩-৪ কামলি, তুমি গগন-উদ্দেশে [নৌকা] বাও। বিগত জন্ম ফিরে আসে কি ভাবে ? ৫-৬. খুঁটি উপড়ে কাছি মেলা হল। কামলি তুমি সদ্‌গুরুকে জিজ্ঞাসা করে বেয়ে চল। ৭-৮. [নৌকার] গলুইতে চড়লে চতুর্দিকে চায়। কিন্তু কেড়ুয়াল (দাঁড় বা বৈঠা) নেই, কেউ কি বাইতে পারে ? ৯-১০ পথের সঙ্গে মিলে মিলে বাম ডান চাপা হল। পথে মিলল মহাসুখসঙ্গ।

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা ॥ আলোচ্য চর্যায় নৌচালনার উৎপেক্ষায় মহাসুখলাভের উপায় নির্দেশ করা হয়েছে। শূন্যতার দ্বারা করুণানৌকা পূর্ণ হয়েছে—অর্থাৎ প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলন হয়েছে এবং ভ্রান্ত ইন্দ্রিয়জ্ঞান লুপ্ত হওয়ায় ভবসংসারের মিথ্যা রূপজ্ঞানও বিলুপ্ত হয়েছে। এই অবস্থায় সর্বশূন্যরূপ গগনের দিকে যাত্রা করলে গত জন্ম আর ফিরে আসবে না, অর্থাৎ পুনর্জন্মরহিত নির্বাণ লাভ হবে। এই নৌচালনা তথা শূন্যাভিমুখী যাত্রার উপায় হচ্ছে প্রথমে খুঁটিরূপ আভাসদোষ-সমূহ উৎপাটিত করে পরে কাছিরূপ অবিদ্যাসূত্র খুলে ফেলতে হবে। খুঁটি ও কাছি যেমন নৌকার অগ্রগতিকে বাধা দেয়, তেমনি প্রকৃতিদোষ ও অবিদ্যা শূন্যাভিমুখী যাত্রার পরিপন্থী। এই বন্ধনগুলি মুক্ত করে সদ্‌গুরুর উপদেশ অনুসারে

চিত্ত-নৌকাকে চালিত করতে হবে। এই মহাসুখের পথে যাত্রা শুরু করলে চতুর্দিকে তাকানো চলবে না। তা হলে সংসারগর্তে পতিত হবার সম্ভাবনা আছে। এই চিত্তনৌকা চালনায় গুরুবচনরূপ কেড়ুয়াল বা বৈঠা অবলম্বন করতে হবে। তা না করলে এই ভবজলধি অতিক্রম করা যায় না। গুরুবচন গ্রহণ করে বামগা ও দক্ষিণগা নাড়ীদ্বয়কে একত্র করে মধ্যগা নাড়ীতে মিলিত করলে বিরমানন্দের পথে মহাসুখের সঙ্গ লাভ করা যায়।

৯

[পুথিপৃষ্ঠা ১৫। ক-খ]

॥ রাগ পটমঞ্জরী—কাহ্নপাদানাম্ ॥

এবংকার[১] দৃঢ়[১] বাখোড় [২]মোড্ডিউ[২]।
বিবিহ বিআপক বান্ধণ [৩]তোড়িউ[৩]। ধ্রু ॥
[৪]কাহ্ন[৪] বিলসঅ আসবমাতা।
সহজ নলিনীবণ পইসি [৫]নিবিতা[৫] ॥ ধ্রু ॥
জিম জিম করিণা করিণিরেঁ [৬]রিসঅ[৬]।
তিম তিম তথতা মতগল [৭]বরিসঅ[৭] ॥ ধ্রু ॥
[৮]ছড়গই[৮] সঅল সহাবে সূধ।
ভাবাভাব বলাগ ন ছুধ ॥ ধ্রু ॥
[৯]দশবল[৯]রঅণ হরিঅ দশ দিসেঁ।
[১০]অবিদ্যাকরিকুঁ দম[১০] অকিলেসেঁ ॥ ধ্রু ॥

পাঠান্তর ॥

১—১ দিঢ় (বাগচী, শহী),
২—২ মোড়িউ (বাগচী, শহী),
৩—৩ তোড়িঅ (টীকা)
৪—৪ কাহ্নু (শাস্ত্রী), কাহ্নু (বাগচী)
৫—৫ নিচিতা (বাগচী), নিবীতা (শহী)
৬—৬ রিসই (শহী)
৭—৭ বরিসই (শহী)
৮—৮ ছড়িগই (টীকা)
৯—৯ দশবর (পুথি), দশবর (সেন)
১০—১০ বিদ্যাকরি দমকু (পুথি, শাস্ত্রী) বিদ্যাকরিকু দম (শহী)

পাঠবিচার ও শাব্দিক টীকা ॥ এবংকার—'এ' ও 'বং' পারিভাষিক শব্দ, 'এ' বামগা প্রজ্ঞানাড়ী ও 'বং' দক্ষিণগা উপায়-নাড়ীর প্রতিশব্দ। দৃঢ়—পুথিতে স্পষ্টই 'দৃঢ়' লেখা আছে, কাজেই 'দিঢ়' পাঠের পরিকল্পনা অপ্রয়োজনীয়। বাখোড়—*দ্বা(দে)>বা+খোড়<ক্ষোড (=বন্ধনস্তম্ভ) =বাখোড়, অর্থ—হাতি বাঁধার স্তম্ভদ্বয়। মোড্ডিউ<মর্দিত। বিবিহ<বিবিধ। বিআপক<ব্যাপক। তোড়িউ—ত্রোটিত>তোড়িঅ>তোড়িউ, প্রাচীন বাংলায় অপভ্রংশের পদটি অবিকল গৃহীত হয়েছে। আসবমাতা<আসবমত্ত। নিবিতা<নির্বৃত। তিব্বতী অনুবাদ

অনুসারে বাগচী sems-med=নিশ্চিত্ত>'নিচিতা' পাঠের আভাস দিয়েছেন, যদিও নিজে 'নিবিতা' পাঠটিই রক্ষা করেছেন। জিম জিম—*যেমন্ত্—>জেম, জিম। রিসঅ—রিষ্যতি>রিসই>রিসঅ, মূল অর্থ আঘাত করা, প্রাসঙ্গিক অর্থ : প্রেম বা মিলনকালে পারস্পরিক আক্রমণাত্মক আচরণ। মঅগল<মদকল। ছড় গই<ষড়্গতি ; অণ্ডজ, জরায়ুজ, উপপাদুক, সংস্বেদজ, দেব ও অসুর এই ছয় প্রকার প্রাণীর গতি বা আশ্রয় অর্থাৎ যাবতীয় বস্তুজগৎ। সূধ-শুদ্ধ>সুদ্ধ>সূধ। বলাগ<বালাগ্র, অর্থ কেশের অগ্রভাগ। ছুধ—ক্ষুব্ধ>ছুদ্ধ>ছুধ। দশবল—পুথিতে যে 'দশবর' পাঠ পাওয়া যায় তা সম্ভবত লিপিভ্রম, টীকাতে 'দশবল' পাঠ আছে। মনে হয়, লিপিকর 'ল' লিখতে 'ব' লিখেছেন। ৫নং গানেও লিপিকর 'চাটিল' লিখতে প্রথমে 'চাটিব' লিখে পরে 'ব' কেটে 'ল' করেছেন। এখানে অবশ্য 'ব' কেটে 'ল' করা হয় নি। তবে 'ব'-কে 'র' পড়ারও কোন যুক্তি নেই, কারণ পুথিতে স্পষ্টাক্ষরে 'ব' লেখা আছে। তাছাড়া 'বর' কথাটি অর্থবহ হলেও বর্তমান প্রসঙ্গে অবান্তর। কারণ শাস্ত্রে বিদ্যা প্রভৃতি যে দশটি 'বল' বা কার্য সাধনের উপায়ের কথা বলা আছে, এখানে সেই বলের কথাই সুসংগত। কাজেই 'দশবল'পাঠই গ্রাহ্য। অবিদ্যাকরি দমকুঁ—পুথিতে 'বিদ্যাকরি দমকু' পাঠ আছে, কিন্তু এই পাঠ সংশয়িত। এর জায়গায় টীকার 'অবিদ্যাকরীন্দ্র' অনুসরণে 'অবিদ্যাকরি' পাঠ নিলে পূর্বপঙ্‌ক্তির সঙ্গে অর্থের সংগতি থাকে। পূর্ব পঙ্‌ক্তিতে দশদিক থেকে বিদ্যা প্রভৃতি যে দশটি বল বা কার্যসাধনোপায় আহরণের কথা বলা হয়েছে, পরের পঙ্‌ক্তিতে তারই সূত্র ধরে বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যাকরীকে দমন করার প্রসঙ্গটি বেশ সংগতিশীল বলে মনে হয়। অন্যদিকে 'দমকুঁ অকিলেসেঁ' পাঠটিও সংশয়িত। কারণ টীকার 'মদনং (দমনং) কুরু' থেকে মূল গানে একটি অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদের আভাস পাওয়া যায়, সেদিক থেকে 'দম' <দময় (=দমন কর) পাঠ সংগততর। পুথির 'দমকুঁ' পাঠের 'কুঁ'—কে 'অবিদ্যাকরি'র সঙ্গে যুক্ত করলে যে অবিদ্যাকরিকুঁ পাঠ পাওয়া যায়' সেটি ব্যাকরণের দিক থেকেও সংগততর হয়ে ওঠে—অবিদ্যাকরিকুঁ=অবিদ্যাকরীকে [কুঁ (<কৃতম্)=কে—কর্মবিভক্তি]। সম্ভবত লিপিকর অসতর্কতাবশত 'কুঁ' বিভক্তির অবস্থান বিপর্যয় ঘটিয়েছেন। তাছাড়া

১ ১ ২। ২ ১ ১ ১ ১ ১। ২ ২।
'অবিদ্যা। করিকুঁ ॥ দম অকি। লেসেঁ

পাঠ নিলে ঐ পাঠে ৪+৪+৪+৪=১৬ মাত্রার যে ছান্দসিক আদর্শ পাওয়া যায় তা গানের অন্য পঙ্‌ক্তির মাত্রাদর্শের সঙ্গে সংগতিশীল হয়, পুথির পাঠে এই সংগতি নেই। এ দিক থেকেও বাগচীর পাঠ সংগততর।

বাচ্যার্থ। ১-২. এবং-কার রূপ দৃঢ় স্তম্ভ ভাঙ্গা হল। বিবিধ ব্যাপক বন্ধন ছেঁড়া হল। ৩—৪. কাহ্ন মদমত্ত হয়ে বিলাস (বা ক্রীড়া) করে, সহজরূপ নলিনীবনে প্রবেশ করে [তবে] নির্বৃত (শান্ত) হয়। ৫—৬ করী যেমন [আসক্তিহেতু] করিণীকে আক্রমণ করে, [নৈরাত্মার অসঙ্গ হেতু] মদমত্ত [চিত্তগজেন্দ্রও] তেমনি তথতা বর্ষণ করে। ৭—৮. সকল ষড়্গতি স্বভাবে শুদ্ধ। ভাব-অভাব কেশাগ্রও ক্ষুব্ধ [করে] না। ৯—১০. দশ বলরূপ [তথতা] রত্ন

দশদিক থেকে আহৃত হল। [তাদের সাহায্যে] অবিদ্যাকরীকে অক্লেশে দমন কর।

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা ॥ আলোচ্য চর্যায় মত্তহস্তীর উৎপ্রেক্ষায় মহাসুখমত্ত প্রকৃতি-প্রভাস্বর চিত্তের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। একটি হস্তী যেন দুটি দৃঢ় স্তম্ভে আবদ্ধ ছিল, কিন্তু মদমত্ততা বশত সে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে কমলবনে প্রবেশ করে ক্রীড়ারত হল। সাধকের চিত্তও যখন মহাসুখলাভে প্রয়াসী হয় তখন তা চন্দ্রসূর্যাভাসরূপ দ্বৈতজ্ঞান ধ্বংস করে এবং অবিদ্যারূপ বন্ধন ছিন্ন করার পর সহজানন্দরূপ কমলবনে প্রবেশ করে নির্বিকল্প শান্তিলাভ করে। হস্তিনীর আসঙ্গহেতু হস্তিগণ যেমন আসক্তিমদবর্ষণ করে, সাধক কাহ্নের হস্তী-চিত্তও তেমনি নৈরাত্মা-হস্তিনীর আসঙ্গলাভহেতু তথতা-রূপ মদ বর্ষণ করছে ; এই অবস্থায় উপনীত হয়ে তিনি ভাব ও অভাবের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন এবং বুঝতে পেরেছেন, দেব, অসুর, মনুষ্য প্রভৃতি ষড়্গতিশীল তাবৎ জীব এক বিশ্বব্যাপী বিশুদ্ধ সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত ধর্মকায় থেকে উদ্ভূত হওয়ায় সমস্তই মূলত বিশুদ্ধ। বিকল্পাত্মক বলে ভাবেরই যখন অস্তিত্ব নেই তখন অভাবেরই বা অস্তিত্ব কোথায় (অর্থাৎ সৃষ্টি না হলে ধ্বংসও হয় না) ? সুতরাং ভাব এবং অভাবের মধ্যে কেশাগ্রপরিমাণ সূক্ষ্মতম পার্থক্যও নেই এবং একটিকে শুদ্ধ ও অপরটিকে অশুদ্ধ মনে করার হেতুও নেই। ভাব ও অভাবে কোন পার্থক্য না থাকায় সর্বত্র পরমার্থস্বরূপ 'তথতা' বিরাজমান। অনুভব অভ্যাসের দ্বারা এই তথতা আহরণ করে অবিদ্যাজাত মিথ্যা জ্ঞান অক্লেশে দূর করা যায়॥

১০

[পুথিপৃষ্ঠা ১৬। ক-খ]

॥ রাগ দেশাখ [১]কাহ্নুপাদানাম্[২] ॥

নগর[২]বাহিরেঁ[২] ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
[৩]ছোই[৩] ছোই [৪]জাহ[৪] সো [৫]বাহ্ম[৫]নাড়িআ ॥ ধ্রু ॥
[৬]আলো[৬] ডোম্বী তোএ সম [৭]করিব ম[৭] সাঙ্গ।
নিঘিণ [৮]কাহ্ন [৮]কাপালি জোই [৯]লাগ[৯] ॥ ধ্রু ॥
এক সো[১০] পদমা[১০] [১১]চৌসট্ঠী[১১] পাখুড়ী ॥
তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী ॥ ধ্রু ॥
[১২]হা লো[১২] ডোম্বী তো পুছমি সদভাবে ॥
[১৩]আইসসি[১৩] জাসি [১৪]ডোম্বি[১৪] কাহরি নাবেঁ। ধ্রু ॥
তান্তি বিকণঅ ডোম্বি অবর না [১৫]চঙ্গেড়া[১৫]।
তোহোর অন্তরে ছাড়ি [১৬]নড়এড়া[১৬] ॥ ধ্রু।
তু লো ডোম্বী [১৭]হাঁউ[১৭] কপালী।
তোহোর অন্তরে মোএ [১৮]ঘলিলি[১৮] হাড়েরি মালী ॥ ধ্রু ॥

সরবর ভাঞ্জীঅ ডোম্বী [১৯]খাঅ[১৯] [২০]মোলাণ[২০]।
মারমি ডোম্বী লেমি পরাণ ॥ ধ্রু ॥

পাঠান্তর ॥

১—১ অন্যান্য গানের মত এখানে গানের গোড়ায় কবিনাম নেই, কবিনাম আছে টীকায়।
২—২ বারিহিরেঁ (পুথি), বাহিরে রে (বাগচী), বাহিরি রে (শহী)
৩—৩ ছই ছোই (পুথি, শাস্ত্রী, সেন)
৪—৪ যাই (শাস্ত্রী, সেন), জাহি (বাগচী), জাসি (শহী)
৫—৫ বাহ্মণ (বাগচী), বামহণ (শহী), ব্রহ্মণ (টীকা)
৬—৬ অলো (টীকা)।
৭—৭ করিবো মো (বাগচী), করিব মই (শহী), করিবে (পুথি)
৮—৮ কহ্ন (পুথি)
৯—৯ লাঙ্গ (বাগচী, শহী, সেন)
১০—১০ পদুমা (বাগচী)
১১—১১ চৌষঠী (বাগচী), চউসট্ঠী (শহী), চৌসডী (সেন)
১২—১২ হঞ লো (টীকা)
১৩—১৩ অইসসি (পুথি)
১৪—১৪ পুথিতে 'ম্বি'-অক্ষরের অন্তর্গত ই-কারের বাঁদিকের দাঁড়িটি নেই।
১৫—১৫ চাংগেড়া (বাগচী), চাঙ্গিড়া(শহী), চগেড়া (রাহুল)
১৬—১৬ নড় এট্টা (শাস্ত্রী), নড়পেড়া (বাগচী, শহী, রাহুল) নড়এত্তা (সেন)।
১৭—১৭ হউঁ (টীকা), হাউ (শাস্ত্রী), হাউঁ (বাগচী, সেন)
১৮—১৮ ঘেণিলি (বাগচী, রাহুল)
১৯—১৯ খাহ (শহী)
২০—২০ পুথিতে 'মোলানণ' লিখে 'ন' কাটা হয়েছে।

পাঠবিচার ও শাব্দিক টীকা ॥ বাহিরে—বাহির<বহিঃ+এঁ<-এন (করণ-অধিকরণ বিভক্তি)। পুথিতে অসতর্কতাবশত বারিহিরেঁ লেখা হয়েছে। এটি বর্ণবিপর্যয় (anagrammatism)-এর উদাহরণ। ছন্দের সৌষম্যের দিক থেকে অন্যান্য পাঠান্তরের চেয়ে এই পাঠই প্রশস্ত। ছোই ছোই—ক্ষোভিত>ছোহিঅ>ছোইঅ>ছোই। পৌনঃপুনিকতা বোঝাতে শব্দদ্বিত্ব। পুথিতে 'ছই ছোই' সম্ভবত লিপিভ্রম। জাহ<যাথ। অন্যান্য পাঠান্তর অপ্রয়োজনীয়, কারণ পুথিতে স্পষ্টাক্ষরে 'জাহ' লেখা আছে এবং এই 'জাহ' (=যাও—নিত্য বর্তমানকালে) টীকার 'গচ্ছসি' পদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সংগতিশীল। সো<সঃ, এখানে নির্দেশক সর্বনাম হিসাবে ব্যবহৃত। বাহ্ম<ব্রাহ্ম [ব্রহ্মণ্+অ (অপত্য অর্থে)=ব্রাহ্ম]। বাগচীর 'বাহ্মণ' পাঠও অযৌক্তিক নয়, তাতে বরং ছন্দের মাত্রাসৌষম্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হয়। হয়ত লিপিকর পাশাপাশি দুটো 'ন' (বাহ্মন নাড়িআ) লিখতে গিয়ে ভুল করে একটা 'ন' বাদ দিয়েছেন (haplography)। টীকার 'ব্রহ্মণ' (=ব্রাহ্মণ) পাঠ এই সম্ভাবনাকেই দৃঢ়তর করে। তবে 'বাহ্ম' পদ নিরর্থক নয় বলে পুথির

পাঠই রাখা হল। নাড়িআ—√লড্+ণিচ্=লাড্ (=লালন করা)+ইত=লাডিত>লাডিঅ>লাড়িঅ> নাড়িঅ>নাড়িআ—মূল অর্থ 'লালিত', সম্প্রসারিত অর্থ 'সন্তান' বা 'বালক' [তুলনীয় হিন্দী 'লড়কা'] তিব্বতী অনুবাদেও 'নাড়িআ'র অর্থ করা হয়েছে 'bu' (=বালক)। টীকার 'বটুকং' পদটিও এই অর্থের ইঙ্গিত দেয়। তোএ<ত্বয়া। করিব <কর্তব্য। পুথির 'করিবে' সম্ভবত লিপিভ্রম। 'করিব' পাঠেই অর্থ স্পষ্ট ও ব্যাকরণসংগত থাকায় পাঠান্তর নিষ্প্রয়োজন। ম—ময়া>মএ>মই>ম। সাঙ্গ<সঙ্গ। নিঘিণ—<নির্ঘৃণ। কাহ্ন<কৃষ্ণ ; পুথিতে আ-কার ছাড় পড়ে পাঠ দাঁড়িয়েছে 'কহ্ন'। কাপালি<কাপালিক বা কপালী। এখানে সম্ভবত 'কাপালিক' বলতে তান্ত্রিক সাধক ছাড়াও তথাকথিত নিম্নবর্ণীয় 'কপালী' জাতির ইঙ্গিতও আছে। কারণ চর্যায় প্রায় সর্বত্র উপমান হিসাবে তথাকথিত নিম্নবর্ণীয় জাতির প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে। সেদিক থেকে 'কাপালি' একটি দ্ব্যর্থবোধক সন্ধ্যাশব্দ : (১) কপালী জাতিভুক্ত ব্যক্তিবিশেষ, (২) [ক (=মহাসুখ) পাল (=পালন) + ইক=কাপালিক] মহাসুখলাভকারী। জোই<যোগী।লাগ—নগ্ন>নগ্গ>নাগ>লাগ, অর্থ 'বস্ত্রহীন' ; সম্প্রসারিত অর্থ 'সন্ন্যাসী' [তুলনীয় (১) 'নগ্গ' = 'বস্ত্রহীন' দেশীনাম মালা ৪।২৮ ; (২) নাগা সন্ন্যাসী]। তিব্বতী অনুবাদে এই অংশে আছে Spans=পরিত্যক্ত। তিব্বতী অনুবাদ থেকে মনে হয় 'লাগ' শব্দটির একটি অর্থ ছিল 'নিঃসঙ্গ'। কাহ্ন নিঃসঙ্গ বলেই ডোম্বীর সঙ্গ কামনা করেছেন—এমন অর্থ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই অর্থে 'লাগ' শব্দের অর্থ 'নিঃসঙ্গ' হওয়া অসম্ভব নয়। 'লাঙ্গ' পাঠান্তরটি অন্ত্যানুপ্রাসের দিক থেকে সংগততর মনে হলেও তিব্বতী অনুবাদ বা টীকায় এই পাঠান্তরের কোন সমর্থন না থাকায় এই পাঠান্তরের যাথার্থ্য সম্পর্কে সংশয় থেকে যায়।

পদমা<পদ্ম ; পাঠান্তরের প্রয়োজন নেই। চৌসট্ঠী<চতুঃষষ্টি ; পুথিতে ট্+ঠ্ যুক্তাক্ষর রূপে লিখিত, একে 'ড' পড়ার যুক্তি নেই। পাখুড়ী<পক্ষপুটিকা। নাচঅ-নৃত্যতি>ণচ্চই>নাচই, নাচঅ। বাপুড়ী—বর্পবৃত্তিক>বপ্পউড্ডিঅ>বাপুড়িঅ>বাপুড়ী [তুলনীয় 'কাবালিয় বপ্পুড়া'—সিদ্ধহেমশব্দানুশাসন ৩৮৭।৩]। ঋগ্বেদে 'বর্পস্' শব্দ পাওয়া যায়, এর অর্থ 'অভিনীতরূপ' (দ্র. SED)। সেকালে নটবৃত্তি অবলম্বনকারী কাপালিকেরা একালের বহুরূপীর মত নানা রূপ বা মূর্তি ধারণ করে ভিক্ষা অর্জন করতেন। বর্তমান চর্যার পরবর্তী অংশে কাপালিক কাহ্ন কর্তৃক নটসজ্জা বর্জনের কথা উল্লিখিত আছে। টীকার 'নাট্যং কুরু হেরুকরূপেণ' উদ্ধৃতাংশ থেকেও কাহ্ন কর্তৃক হেরুক রূপ ধারণের আভাস পাওয়া যায়। কাজেই 'বাপুড়ী' শব্দটির অর্থ 'বহুরূপী' বা 'নাটুয়া' বলে অনুমিত হয়। একালের জাতি বা সম্প্রদায়বিশেষের নাম হিসাবে ব্যবহৃত 'বাউড়ি' শব্দটি এই 'বাপুড়ী' শব্দ থেকে উৎপন্ন হতে পারে। হা লো—সম্বোধনসূচক অব্যয়। টীকায় পাঠান্তর 'হঞ লো'—সংস্কৃতে হঞ্জিকা=দাসী ; সংস্কৃত নাটকে নীচজাতীয়া রমণীকে সম্বোধন করতে 'হঞ্জে' পদ ব্যবহৃত হয়। এখানে সেই অর্থেই পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। 'হঞ' পদটিকে শাস্ত্রী প্রমুখ সমস্ত বিশেষজ্ঞই 'হঞ্ণ' রূপে পড়েছেন, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে দেখলে 'ঞ্ণ'-এর সঙ্গে এই পদের দ্বিতীয় বর্ণের প্রভেদ ধরা পড়ে এবং দেখা যায় পুথিতে 'হঞ' লেখা রয়েছে, 'হঞ্ণ' নয়।

তো<তব। পুছমি—√পৃচ্ছ>√পুচ্ছ + (অ) মি (উত্তম পুরুষ বর্তমান ক্রিয়া বিভক্তি)। আইসসি—আ—√বিশ্>আইস্+(অ)সি (মধ্যমপুরুষ বর্তমান ক্রিয়াবিভক্তি)। পুথির 'অইসসি'-তে আ-কার সম্ভবত অসতর্কতাবশত বর্জিত হয়েছে। জাসি—যা>জা+সি। কাহরি—কস্য>কস্স>কাস>কাহ-(প্রতিপাদিক)+র (সম্বন্ধ বিভক্তি)=কাহর+ই (ঈ)—স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ 'নাব'-এর বিশেষণ। তান্তি—তন্ত্রিকা>তন্তিআ>তন্তী, তান্তি, অর্থ 'তাঁত'। বিকণঅ—বি-ক্রী>বিকীণ (ক্রীণাতি-রূপ থেকে)+ অ (বর্তমানকালের মধ্যম পুরুষের বিভক্তি)>বিকীণঅ, বিকণঅ। অবর<অপর। না—ননু>ণং>ণ>না। চঙ্গতা—তিব্বতী অনুবাদে এখানে আছে me-tog stegs (=ফুলের সাজি) এ থেকে মনে হয় পদটি হয়ত আসলে 'চঙ্গড়া' (<পালি চঙ্গোটক কিংবা<চঙ্গবের)। লিপিকর হয়ত অসাবধানে 'ড়'-এর নীচের দিকের বক্ররেখাটি সংক্ষিপ্ত করেছেন, ফলে বর্ণটির চেহারা দাঁড়িয়েছে 'ত'-এর অনুরূপ। তোহোর অন্তরে—তুভ্যং>তুহুঁ, তোহ (তির্যককারকের প্রাতিপদিক), তোহ+র (ষষ্ঠী বিভক্তি)=তোহোর, অন্তরে (নিমিত্তার্থক অনুসর্গ)। নড়এড়া<নটপেটক। নট>নড়, অর্থ, 'নর্তক' বা 'নট'; এড়া<পেটক, নড়এড়া=নটের ঝাঁপি। তু—ত্বম্>তুঅং>তু। হাঁউ—অহকং (=অহং)>হকং>হউঁ, হাঁউ। ভাঞ্জীঅ—*ভঞ্জিত (=ভগ্ন)>ভঞ্জিঅ>ভাঞ্জীঅ (শ্বাসাঘাত হেতু আদ্যস্বর দীর্ঘ)। মোলাণ—মৃণাল>মুণাল>মোলাণ (বর্ণ বিপর্যয়)।

বাচ্যার্থ ॥ ১-২. নগরের বাইরে, ডোমনী, তোর কুঁড়েঘর। ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাস সেই ব্রাহ্মণ বালককে। ৩-৪. ওলো ডোমনী, তোর সঙ্গে আমি সাঙ্গা করব। [আমি] কাহ্ন—ঘৃণাহীন, নগ্ন, কাপালিক যোগী। ৫-৬. এক সে পদ্ম, চৌষট্টি পাপড়ি। তাতে চড়ে নাচে ডোমনী ও বহুরূপী [কাহ্ন]। ৭-৮ ওলো ডোমনী, তোকে সদ্‌ভাবে জিজ্ঞাসা করি, তুই আসিস যাস কার নায়ে? ৯-১০ ডোমনী, তুই না তাঁত আর চাঙাড়ি বিক্রয় করিস, তোর তরে [আমি] নটের ঝাঁপি ত্যাগ করলাম। ১১-১২. ওলো, তুই ডোমনী [আর] আমি কাপালিক। তোর তরে আমি হাড়ের মালা নিলাম (পরলাম)। ১৩-১৪. সরোবর-ভেঙে ডোমনী মৃণাল খায়। ডোমনীকে মারি (বা ডোমনী তোকে মারি)। প্রাণ নিই।

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা ॥ চর্যাকারগণ বহুক্ষেত্রে সহজানন্দকে বিবিধ নারীরূপে কল্পনা করেছেন এবং এই সমস্ত নারী স্পর্শের অযোগ্য নীচকুলোদ্ভব বলে বর্ণিত। এই সহজানন্দ ইন্দ্রিয়াতীত বলেই উপমান নারীগণকেও স্পর্শের অযোগ্য ডোমনী, শবরী, চণ্ডাল, মাতঙ্গী বলে কল্পনা করা হয়েছে। বর্তমান চর্যায় সহজানন্দ ডোমনী রূপে কল্পিত। তবে এই ডোমনীর দুই রূপ 'ডোমনী দ্বিধাভেদমাহ' (টীকা)—এক পরিশুদ্ধাবধূতী নৈরাত্মা, অপরটি অবিদ্যাচিত্ত অপরিশুদ্ধাবধূতী। পরিশুদ্ধাবধূতী নৈরাত্মার সঙ্গে কাপালিক কাহ্নের লীলাই এই গানের মুখ্যবিষয়। দেহনগরের বাইরে ইন্দ্রিয়াদির অতীতলোকে এই সহজানন্দরূপিণী নৈরাত্মার অধিষ্ঠান। শাস্ত্রাভিমানী যোগীদের চপল চিত্ত নৈরাত্মার আভাস পায় মাত্র, কিন্তু তাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারে না। নৈরাত্মা স্পর্শাতীত ও ইন্দ্রিয়ের অনধিগম্য বটে, কিন্তু কাহ্নও নগ্ন ও ঘৃণালজ্জাদোষরহিত হয়ে অর্থাৎ সমস্ত লোকাচারের প্রভাবমুক্ত হয়ে কাপালিক বা মহাসুখ পালনের (ক-পাল +ইক—'ক' অর্থে মহাসুখ) উপযোগী

হয়েছেন, তাই তিনি অস্পর্শা নৈরাত্মার সঙ্গে মিলনে উৎসুক। নৈরাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে উভয়েই যেন চৌষট্টী দলবিশিষ্ট পদ্মের উপর নৃত্য করছে অর্থাৎ কাহ্ন পরিশুদ্ধাবধূতী মার্গে আরূঢ় হওয়ায় তাঁর নির্মাণচক্রে কল্পিত নাভিকমলে বোধিচিত্তের জাগরণ ঘটেছে। নৈরাত্মার অতীন্দ্রিয় স্বরূপ (সদ্‌ভাব) উপলব্ধি করে তিনি তাকে জিজ্ঞসা করছেন যেসে সংবৃতিবোধিচিত্তরূপ নৌকায় যাতায়াত করে কিনা। কেন না সাংবৃতিক অবস্থায় চিত্ত অশুদ্ধ থাকে, এই অশুদ্ধ চিত্তে নৈরাত্মার অধিষ্ঠান ঘটে না। অশুদ্ধ অবিদ্যাচিত্ত অবিদ্যারূপ তাঁত ও বিষয়াভাসরূপ চাঙাড়ি বিক্রয় বা বিস্তার করে, কিন্তু শুদ্ধ চিত্তে অবিদ্যাজনিত বিষয়াভাস পরিত্যক্ত হয়। এই জন্য কাহ্নও এই সংসাররূপ নটসজ্জা ত্যাগ করে চিত্তকে নৈরাত্মালাভের উপযোগী পরিশুদ্ধ করেছেন। নৈরাত্মা যেমন ডোমরমণীর তুল্য ইন্দ্রিয়ের অস্পর্শ,কাহ্নও তেমনি সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি লুপ্ত করে মৃত ব্যক্তির ন্যায় নির্বিকার হয়ে কুণ্ডলকণ্ঠিকাদি হাড়ের মালা পরিধান করে কাপালিক হয়েছেন অর্থাৎ মহাসুখলাভের উপযুক্ত হয়েছেন। নৈরাত্মা যেমন ইন্দ্রিয়াতীত কাহ্নও তেমনি ইন্দ্রিয়বিকারহীন। তাই তিনি পরিশুদ্ধাবধূতী নৈরাত্মার সঙ্গে মিলিত হন। কিন্তু সাংবৃতিক অবস্থায় চিত্তে যখন অবিদ্যার প্রভাব থাকে তখন অপরিশুদ্ধাবধূতী কায়রূপ সরোবর ভেঙে তার মৃণালরূপ বোধিচিত্তকে ভক্ষণ করে। এ অবস্থায় অবিদ্যা নাশ হয় না এবং নৈরাত্মানুভূতিও ঘটে না, তাই যোগী তার প্রাণ হরণ করতে চান অর্থাৎ সাধনার দ্বারা অপরিশুদ্ধাবধূতীকে নিঃস্বভাবীকৃত করে পরিবর্তিত করতে চান॥

১১

[পুথিপৃষ্ঠা ১৮। ক-খ]

॥রাগ পটমঞ্জরী— কৃষ্ণাচার্যপাদানাম্॥

নাড়ি শক্তি [১]দিঢ়[১] ধরিঅ[২] খট্টে[২]।
অনহা ডমরু[৩] বাজএ[৩] বীরনাদে॥ ধ্রু॥
কাহ্ন [৪]কাপালী[৪] যোগী পইঠ[৫] অচারে[৫]।
দেহনঅরী [৬]বিহরএ[৬] একারেঁ॥ ধ্রু॥
আলি কালি ঘণ্টা নেউর চরণে।
রবিশশি কুণ্ডল কিউ আভরণে॥ ধ্রু॥
রাগ [৭]দেশ মোহ লাইঅ ছার[৭]।
পরম মোখ লবএ[৮] মুত্তিহার[৮]॥ ধ্রু॥
মারিঅ [৯]সাসু[৯] ননন্দ ঘরে [১০]সালী[১০]।
মাঅ[১১] মারিঅ[১১] কাহ্ন[১২] ভইঅ[১২] কবালী॥ ধ্রু॥

পাঠান্তর॥

১--১ দিট (শাস্ত্রী, সেন) ২—২ খদ্ধে (পুঁথি), খদে (সেন), খাটে (বাগচী, শহী)

৩—৩ বাজই (বাগচী, শহী) ৪—৪ কপালী (বাগচী)
৫—৫ পচারে (শহী), পইঠঅ চারে (সেন)
৬—৬ বিহরই (বাগচী, শহী)
৭—৭ দ্বেষ মোহ লাইঅ (বাগচী), দেশ মোহ লইআ (শহী)
৮—৮ লভই মুক্তিহার (শহী)
৯—৯ শাসু (শাস্ত্রী) ১০—১০ শালী (শাস্ত্রী, বাগচী)
১১—১১ মারি (শহী) ১২—১২ ভইল (বাগচী)

পাঠবিচার ও শাব্দিক টীকা ॥ ধরিঅ— *ধরিত (= ধৃত) > ধরিঅ। খট্টে < খ-ত্বে, অর্থাৎ শূন্যত্বে। মূল পুথিতে 'খদ্ধে' পাঠ দেখা যায়। এটি সম্ভবত লিপিপ্রমাদ। সুকুমার সেনের পাঠ 'খদে'। অন্ত্যানুপ্রাসের প্রয়োজনে বাগচী ও শহীদুল্লাহ্ 'খাটে' পাঠের পক্ষপাতী। টীকার 'খট্টাঙ্গমিতি' অনুসরণে গৃহীত শাস্ত্রীর 'খট্টে' পাঠ প্রশস্ততর। তিব্বতী অনুবাদে 'খট্ট' শব্দের অনুবাদ করা হয় নি, শুধু তিব্বতী বিভক্তি যোগ করে লিপ্যন্তর করা হয়েছে। এই তিব্বতী লিপ্যন্তরও 'খট্টে' পাঠের সমর্থক। অনহা < অনাহত। বাজএ— বাদ্যতে > বজ্জই > বাজই, বাজএ। পুথিতে 'বাজএ' পাঠ। বাগচী ও শহীদুল্লাহ-র পাঠ 'বাজই', তবে পুথির পাঠ নিরর্থক বা ব্যাকরণভ্রষ্ট নয়। সুতরাং গ্রাহ্য। বীরনাদে— টীকা, শাস্ত্রী, বাগচী ও সেন এই পাঠের সমর্থক। তবে অন্ত্যানুপ্রাসের প্রয়োজনে রাহুল সাংকৃত্যায়ন 'বীরনাটে' পাঠের পক্ষপাতী। বাগচী ও সেন এই বিকল্প পাঠের সম্ভাবনা উপেক্ষা করেন নি। পইঠ < প্রবিষ্ট। অচারে— তিব্বতী অনুবাদে Spyod = চর্যা, আচার। টীকার 'প্রবিশ্য প্রচারেণ' অনুসারে শহীদুল্লাহ 'পইঠ পচারে' পাঠের পক্ষপাতী। তবে পুথির পাঠ নিরর্থক নয় বলে পরিত্যাজ্য নয়। বিহরএ < বিহরতি। বাগচী ও শহীদুল্লাহ্-র পাঠ 'বিহরই' ; তবে পুথির 'বিহরএ' ব্যাকরণভ্রষ্ট নয় বলে অগ্রাহ্যও নয়। একারেঁ (পুথির পাঠ) < একাকারেণ। টীকার 'একাকারতয়া' অনুসারে বাগচী ও সেনের পাঠান্তর 'একাকারে'। বাগচী অবশ্য তিব্বতী অনুবাদের 'gcig pa de yis spyod' অনুসারে 'একাচারে' পাঠের সম্ভাবনাও অনুমান করেছেন। তবে পুথির পাঠ অগ্রাহ্য নয়। নেউর < নূপুর। দেশ < দ্বেষ। কিউ < কৃত। লাইঅ (পুথি)— সেনের মতে একটি 'লইঅ' (< লব্ধ)-এর লিপ্যন্তর, শহীদুল্লাহ্-র পাঠ 'লইআ'। কিন্তু বাগচী তিব্বতী অনুবাদের byugs = 'having anointed' অনুসারে পুথির 'লাইঅ' পাঠ সমর্থন করেছেন ; সম্ভাব্য ব্যুৎপত্তি লাইঅ < লেইঅ <* লেপিত। টীকার 'বিলিপ্তাঙ্গো' দেখে বাগচীর ব্যুৎপত্তি সত্য বলে মনে হয়। ছার < ক্ষার। লবএ— লভ্যতে > লবভই > লভই > লবই, লবএ। শহীদুল্লাহ্ পাঠ 'লভই', কিন্তু মূল পাঠ অসিদ্ধ নয় বলে পাঠশোধন অপ্রয়োজনীয়। মারিঅ (পুথি) < মারিত। টীকায় 'মারি' পাঠ, সেই অনুসারে পাঠান্তর 'মারি' (শহী)। ভইঅ (পুথি) —ভইঅ <* ভবিত (= ভূতঃ) ; পাঠান্তর 'ভইল' (বাগচী, রাহুল)। শাসু— শ্বশ্রূ > সস্সু > সাসু, শাসু, দ্ব্যর্থক শব্দ (১) শাশুড়ী (২) শ্বাস। ননন্দ < ননন্দা, দ্ব্যর্থক শব্দ (১) স্বামীর ভগিনী (২) ইন্দ্রিয়— চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় নব নব আনন্দ দান করে বলে ইন্দ্রিয়-সমূহ ননন্দ। শালী—দ্ব্যর্থক (১) স্ত্রীর ভগ্নী (২) শাল দেয় অর্থাৎ নিঃস্বভাবীকৃত করে।

বাচ্যার্থ ॥ ১—২, নাড়ীশক্তিকে দৃঢ়ভাবে খাটে ধরা হল। অনাহত ডমরু বীরনাদে বাজে। ৩—৪, কাপালিক যোগী কাহ্ন যোগাচারে প্রবিষ্ট হয়ে দেহনগরীতে একাকারে (= অদ্বয়ভাবে) বিহার করছেন ; ৫—৬. আলি-কালিকে চরণের ঘণ্টা নূপুর এবং রবিশশীকে [কর্ণের] কুণ্ডলাভরণ করা হল। ৭—৮. রাগ-দ্বেষ-মোহকে [দগ্ধ করে তার] ক্ষার (= ভস্মাবশেষ) [অঙ্গে] লেপন করা হল। পরমমোক্ষ [-রক্ষ] মুক্তাহার পরা হল। ৯-১০. ঘরে শাশুড়ী, ননদ ও শালীকে মারা হল। মা-কে (= মায়াকে) মেরে কাহ্ন কাপালিক হল।

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা ॥ আলোচ্য চর্যায় যোগাচার, কায়সাধনা, শ্বাসসংযম, ইন্দ্রিয়দমন ইত্যাদি অবলম্বনে কাপালিক হবার উপায় নির্দেশ করা হয়েছে। এখানে কাপালিকের বেশভূষা, আচার-আচরণ ও সংসার-বৈরাগ্য নানাবিধ যোগাচার-সম্মত রূপকের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে। বত্রিশ নাড়ীর মধ্যে প্রধানস্থানীয়া বিরমানন্দরূপা শক্তিময়ী অবধূতী নাড়ীকে মণিমূলে ধারণ করে মস্তকস্থিত প্রভাস্বর-শূন্যতার দিকে চালনা করা হয়েছে ; ডমরুতে শূন্যতারূপ সিংহনাদ বাদিত হচ্ছে— এই অবস্থায় কাহ্ন যোগাচারে প্রবিষ্ট হয়ে ক্লেশাদি ধ্বংস করেছেন এবং দেহনগরীকে অধিকার করে অদ্বয়ভাবে বিরাজ করছেন। এই কায়সাধনায় তিনি আলি-কালি বা লোকজ্ঞান ও লোকাভাস এবং রবিশশী বা গ্রাহ্য-গ্রাহকভাবকে পরিশুদ্ধ করে যথাক্রমে চরণের ঘণ্টানুপুর ও কর্ণের কুণ্ডল করেছেন অর্থাৎ সমস্ত দ্বৈতজ্ঞানের উপর নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করে তাদের ধ্বংস করেছেন। এছাড়া মহাসুখরূপ বহ্নিতে রাগদ্বেষমোহকে দগ্ধ করে তাদের ভস্মাবশেষ অঙ্গে লিপ্ত করেছেন এবং পরমমোক্ষ-রূপ মুক্তাহার পরিধান করে কাহ্ন তাঁর যোগিবেশ পূর্ণ করেছেন। তিনি শ্বাসরোধ করে নব নব আনন্দদায়ক ইন্দ্রিয়সমূহকে নিঃস্বভাবীকৃত করেছেন এবং প্রজ্ঞা ও উপায়ের অভিন্ন মিলনে মায়ারূপ অবিদ্যাকে ধ্বংস করে কাপালিক (ক = মহাসুখ-পাল + ইক) অর্থাৎ মহাসুখপালনের উপযোগী হয়েছেন ॥

১২

[পুথিপৃষ্ঠা ১৯ ক-খ]

॥ [রাগ] ভৈরবী— কৃষ্ণপাদানাম্ ॥

করুণা [৩]পিহাড়ি[৩] খেলহুঁ[১] নয়বল[১]।
সদগুরু বোহেঁ জিতেল ভববল ॥ ধু ॥
ফীটউ দুআ মাদেসিরে ঠাকুর।
[২]উআরি[২] [৩]উএসেঁ[৩] [৪]কাহ্ন[৪] ণিঅড় জিনউর ॥ ধু ॥
পহিলেঁ তোড়িআ বড়িআ[৫] মারিউঁ[৫]।
গঅবরেঁ তোলিআ পাঞ্চজনা[৬] ঘালিউ[৬] ॥ ধু ॥
মতিএঁ ঠাকুরক[৭] পরীনিবিত্তা[৭]।
[৮]অবশ[৮] করিআ ভববল জিতা ॥ ধু ॥

ভণই কাহ্ন আমহে [৯]ভাল দান[৯] দেহুঁ।
চউষঠ্ঠি কোঠা গুণিআ লেহুঁ ॥ ধ্রু ॥

পাঠান্তর ॥

০—০ পিড়ি (টীকা)

১—১ নঅবল (শাস্ত্রী, বাগচী, সেন, শহী)।

২—২ তআরি (শাস্ত্রী) ৩—৩ উএসঁ (পুথি)। উএস (শাস্ত্রী, সেন)।

৪—৪ কাহ্ন (শাস্ত্রী)।

৫—৫ মরাড়িইউ (পুথি, শাস্ত্রী, সেন), মরাডিউ (বাগচী), মরাড়িউ (শহী)।

৬—৬ ঘোলিউ (পুথি, শাস্ত্রী), খেলিউ (তিব্বতী rtses অনুসারে)।

৭—৭ পরিনিবিতা (বাগচী)। ৮—৮ অবস (পুথি)

৯—৯ ভলি দাহ (পুথি, শাস্ত্রী)।

পাঠবিচার ও শাব্দিক টীকা ॥ পিহাড়ি— (১) পীঠ > পীহ + ড (অপভ্রংশের স্বার্থিক প্রত্যয়) = পীহড়— (২) পীঠ > পিঢ় > পিহড় (বর্ণবিপর্যয়) ; পিহড় (নামধাতু) + ইঅ (ক্ত প্রত্যয়-জাত) > পিহড়িঅ > পিহড়ি > পিহাড়ি, অর্থ 'পিঁড়ি বা ছক করে'। খেলহুঁ— খেল + হুঁ (-ধ্বম্ জাত, উত্তম পুরুষের ক্রিয়াবিভক্তি)। নয়বল— নব অর্থাৎ চতুর্থ যে বল বা আনন্দ অর্থাৎ সহজানন্দ। 'নঅবল' পাঠান্তরটি নিষ্প্রয়োজন। কারণ তৎসম শব্দ 'নয়'-এর একটি অর্থ দ্যূতক্রীড়া বা দ্যূতক্রীড়ার উপকরণবিশেষ। সেদিক থেকে 'নয়' পাঠ রক্ষা করলে গানের মূল প্রসঙ্গ দাবা খেলার সঙ্গে কোন অসংগতি ঘটে না। তাছাড়া, টীকাতেও 'নয়' পদটি আছে, তবে দুটি ভিন্ন অর্থে (১) 'নীতি' অর্থে 'নয়ং মন্ত্রনয়রহস্যং'। (২) 'চতুর্থ' অর্থে 'চতুর্থানন্দবলং'। প্রকৃতপক্ষে 'নয়' এখানে একটি দ্ব্যর্থবোধক সন্ধ্যাশব্দ, বাহ্যার্থে এটি তৎসম শব্দ— অর্থ দ্যূতক্রীড়া বা দাবা -খেলা ; গূঢ়ার্থে এটি তদ্ভব শব্দ (নয় < নব), অর্থ চতুর্থ। 'চতুর্থ' অর্থে নব < নঅ < ন আধুনিক বাংলার সমাসবদ্ধ পদে অদ্যাবধি ব্যবহৃত হয়, যেমন ন-কাকা, ন-দিদি ইত্যাদি। তিব্বতী অনুবাদের 'rgyan-po' -ও 'নয়বল' পাঠের সমর্থক। জিতেল— জিত + এল (ইল) (অতীত বাচক বিভক্তি) > জিতেল। ফীটউ— অপভ্রংশ ফিট্ট (= মোচন করা, সরিয়ে দেওয়া) + অউ (< ক্ত) = ফীটউ। দুআ— দ্বিক > দুঅ > দুআ। মাদেসি < মর্দয়সি, অর্থ 'মর্দন বা মাৎ কর'। উআরি— উপকারিক > উঅআরি > উআরি, দাবা খেলায় যিনি চাল বলে দেন। শাস্ত্রীর 'তআরি' পাঠ সম্ভবত পাঠভ্রমজাত ; পুথিতে 'তআরি'-র 'ত' যেভাবে লেখা হয়েছে তাতে তাকে 'উ'-এর সঙ্গে ভুল করা অসম্ভব নয়। সুতরাং 'উআরি' পাঠই গ্রাহ্য। উএসেঁ— উপদেশেন > উঅএসেন > উএসেঁ ; ব্যাকরণের দিক থেকে 'উএসেঁ' পাঠই সংগত, পুথির 'উএসঁ' সম্ভবত লিপিকর-প্রমাদ এবং শাস্ত্রীর 'উএস' আবার সেই লিপিভ্রমের পাঠভ্রম। ণিঅড় < নিকট। পহিলেঁ <* প্রথিল্লেন। তোড়িআ— ত্রোটিত > তোড়িঅ > তোড়িআ। বড়িআ < বটিকা। মারিউ—মারিত > মারিঅ > মারিউ। 'মারিউ' পাঠ তিব্বতী gsod-par gyur (= মারিতবান্ = হত)-এর আধারে পরিকল্পিত। তবে অন্যান্য পাঠ অর্থ ও ব্যুৎপত্তির দুর্বোধ্যতা সত্ত্বেও অগ্রাহ্য নয়। শাস্ত্রী 'মরাড়িইউ' পদের অর্থ করেছেন 'মটকাইয়া

দাও'। পাঞ্জনা = পঞ্চস্কন্ধাত্মক পঞ্চবিষয়গত অহঙ্কারাদি। ঘালিউ— ঘাত > ঘাঅ + ইল (অতীত) > ঘাইল > ঘালিঅ (বর্ণবিপর্যয়) > ঘালিউ (অপভ্রংশ)। পাঠান্তরের 'ঘোলিউ' পদের চেয়ে 'ঘালিউ' পদ অর্থের দিক থেকে প্রশস্ততর। মতিএঁ— মন্ত্রী- > মন্তি > মতি + এঁ (তৃতীয়া-এন জাত), অর্থ দ্বিবিধ (১) মন্ত্রীর দ্বারা (২) মতি বা প্রজ্ঞাপারমিতারূপ বুদ্ধি দ্বারা। পরীনিবিতা < পরিনির্বৃত। অবশ < অবশ্য। পুথির 'অবস' বোধ হয় লিপিপ্রমাদ। তিব্বতী 'ñes-par' = 'অবশ্য' অনুসারে 'অবশ' পাঠই প্রশস্ত বলে মনে হয়। দান— পাঠান্তরে 'দাহ' (শাস্ত্রী), অর্থ দাঁও'। পাঠান্তরের 'ভলি' হয় 'ভাল' পদের লিপিভ্রম নতুবা * ভদ্রিক পদ জাত। 'দাহ' দানবাচক 'দায়' শব্দের রূপান্তর। টীকায় 'দায়' শব্দের উল্লেখ আছে। চউষট্টি কোঠা— দাবার ছকে ৬৪টি ঘর থাকে, অন্যদিকে নির্মাণ চক্রের পদ্মেও ৬৪টি পাপড়ি অনুমিত, সুতরাং 'চউষট্ঠি কোঠা'-র অর্থ নাভিস্থিত নির্মাণচক্র।

বাচ্যার্থ ॥ ১—২ করুণাকে পিড়ি (=ছক) করে নয়বল (= দাবা) খেলছি। সদ্‌গুরুর বোধে (= উপদেশে) ভববল (= সংসার-ঘুঁটি) জেতা হল। ৩—৪ উপকারিকের (= গুরুর) উপদেশে দুয়াকে সরানো হল। ওরে ঠাকুর (= রাজা) -কে মাৎ করেছিস। কাহ্নের নিকটে জিনপুর (= মহাসুখধাম)। ৫-৬ প্রথমে তুড়ে বড়েকে মারা হল। গজবর দিয়ে তুলে পাঁচজনকে ঘায়েল করা হল। ৭-৮ মন্ত্রীর দ্বারা ঠাকুরকে পরিনির্বৃত (= পরিনির্বাণে আরোপ) করা হল। অবশ্য করে (= নিশ্চিত ভাবে) ভববল জেতা হল। ৯-১০ কাহ্ন বলে —আমি ভাল দান দিই। চৌষট্টি ঘর গুনে নিই।

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা ॥ আলোচ্য চর্যায় দাবাখেলার রূপকে সংসার-মুক্তি ও মহাসুখলাভের তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। কাহ্ন তাঁর সিদ্ধাবস্থার বর্ণনা করে বলেছেন যে, চিত্তের সঙ্গে যুক্ত প্রকৃতিদোষসমূহ নিরাকৃত করে, স্বাধিষ্ঠান বা স্বরূপে অবস্থিত করুণাময় চিত্তকে যেন পিড়ি বা ছকে পরিণত করে তিনি চতুর্থানন্দ বা সহজানন্দ রূপ দ্যূতক্রীড়ায় ব্যাপৃত হয়েছেন। এই ক্রীড়ায় সদ্‌গুরুর উপদেশ তাঁর সহায়, গুরুর উপদেশে তিনি ভব-বিকল্পরূপ ঘুঁটিকে অনায়াসে জয় করেছেন অর্থাৎ বিষয়াভাসকে ধ্বংস করেছেন। ফলে চিত্তের শূন্য, অতিশূন্য, মহাশূন্য ও সর্বশূন্য-রূপ চারটি স্তরের মধ্যে প্রথমে শূন্য ও অতিশূন্য রূপ দুটি শূন্য ও পরে ঠাকুর অর্থাৎ তৃতীয় বা মহাশূন্য বিনষ্ট হয়েছে অর্থাৎ উক্ত শূন্যত্রয়ের সঙ্গে দিবারাত্র মিলে মোট যে একশো ষাটটি প্রকৃতিদোষ, জড়িত থাকে, সেগুলি দূরীভূত হয়েছে। কাহ্নের চিত্ত এখন প্রকৃতিদোষ-রহিত প্রকৃতিপ্রভাস্বর সর্বশূন্যে অধিষ্ঠিত, তাই জিনপুর বা মহাসুখধাম তাঁর নিকটবর্তী মনে হচ্ছে। এই মহাসুখ লাভের উপায় পুনরায় ব্যাখ্যা করে কবি বলছেন যে, প্রথমে তিনি চিত্তের ১৬০ প্রকার প্রকৃতিদোষ দূর করে চিত্ত-গজেন্দ্র অর্থাৎ সর্বশূন্যরূপ তথতাচিত্তদ্বারা পঞ্চস্কন্ধাত্মক পঞ্চবিষয়ের অহঙ্কর-মমকারাদি প্রত্যয়কে ধ্বংস করেছেন এবং পরে মতি বা প্রজ্ঞার দ্বারা ঠাকুর বা অবিদ্যাচিত্তকে পরিনির্বাণে আরোপ করেছেন অর্থাৎ দোষমুক্ত করেছেন এবং ঠাকুরকে অবশ করে অর্থাৎ অবিদ্যাচিত্তকে অচিত্ততায় লীন করে নিশ্চিত ভাবে ভববল বা রূপাদি বিষয়াভাস বিনষ্ট করেছেন। তাই পরিশেষে বলছেন যে তাঁর খেলার দান ভাল অর্থাৎ

তাঁর বিরমানন্দ-সাধনা একান্তভাবে সাধনসম্মত, কেননা তিনি চৌষট্টি দলবিশিষ্ট নির্মাণচক্রে স্বচিত্তকে স্থির করে প্রকৃতিপ্রভাস্বররূপ সর্বশূন্যকে লাভ করেছেন ॥

১৩

[পুথিপৃষ্ঠা ২০। খ]

॥রাগ কামোদ— [১]কৃষ্ণ[১]পাদানাম্ ॥

তিশরণ ণাবী কিঅ [২]অঠকমারী[২]।
নিঅ দেহ করুণা[৩] শূন মেহেলী[৩] ॥ ধু ॥
তরিত্তা ভবজলধি জিম করি মাঅ সুইণা।
মঝ বেণী তরঙ্গ ম মুনিআ ॥ ধু ॥
পঞ্চ তথাগত কিঅ [৪]কেডুআল[৪]।
বাহঅ কাঅ কাহ্নিল মাআজাল ॥ ধু ॥
গন্ধ[৫] পরস রস[৫] [৬]জইসো তইসো[৬] ॥
[৭]ণিংদ[৭] বিহুনেঁ[৮] সুইণা[৮] জইসো ॥ ধু ॥
চিঅ [৯]কণ্ডহার[৯] সুণত মাঙ্গে।
চলিল কাহ্ন মহাসুহ সাঙ্গে ॥ ধু ॥

পাঠান্তর ॥

১—১ কৃষ্ণা (পুথি)। ২—২ অঠকুমারী (টীকা)। অঠক মারী (শাস্ত্রী ; বাগচী), আঠক মারী (শহী), অঠ কমারী (সেন)। ৩—৩ শূনমে হেরী (শাস্ত্রী), শূন মেহেরী (বাগচী, সেন, শহী)।

৪—৪ কেদুআল (সেন) ৫—৫ পরসর (পুথি)

৬—৬ জইসোঁ তইসোঁ (শাস্ত্রী, বাগচী, শহী) জইসো তইসৌ (সেন)

৭—৭ নিংদ (শাস্ত্রী, বাগচী) নিন্দ (সেন)

৮—৮ সুইনা (শাস্ত্রী, বাগচী, সেন) ৯—৯ কণ্হার (শাস্ত্রী, বাগচী)

পাঠবিচার ও শাব্দিক টীকা ॥ তিশরণ < ত্রিশরণ। ত্রিশরণের আদি অর্থ বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ— সাধনার এই তিন আশ্রয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে অর্থ—কায়, বাক্য, চিত্ত। ত্রিশরণ-নৌকা বলতে কায়-বাক্-চিত্তের শরণ বা আশ্রয় মহাসুখকায়-রূপ নৌকা। অঠকমারী—এর সঠিক পাঠ ও অর্থ নিয়ে মতভেদ আছে। পুথিতে একটানা লেখা আছে 'অঠকমারী', এই একটানা পদ বিশেষজ্ঞদের হাতে দুভাবে বিশ্লিষ্ট হয়েছে : (১) 'অঠক মারী' অর্থাৎ আটকে মেরে এবং (২) 'অঠ কমারী' অর্থাৎ আট কামরাবিশিষ্ট। এই দুই ধরনের বিশ্লেষণের মধ্যে প্রথমটি প্রশস্ততর। এই পাঠ গ্রহণ করলে অর্থ দাঁড়ায় 'আটকে' অর্থাৎ স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন ও পাঁচটি ইন্দ্রিয়— এই অষ্টবিধ বিকল্পকে মেরে বা ধ্বংস করে ত্রিশরণকে নৌকা করা হল। দ্বিতীয় বিশ্লেষণ অনেকটা কষ্টকল্পিত মনে হয়, কারণ ঐ যুগে গ্রীক উৎসজাত 'কমারী' শব্দ বাংলায় গৃহীত হয়েছিল কি না তার বিশদ প্রমাণ নেই। অন্য দিকে শহীদুল্লাহ-

এর পাঠশুদ্ধিও অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। কারণ আট অর্থে 'অট' বা 'অঠ' অন্যত্রও পাওয়া যায়। টীকার 'অঠকুমারী' পাঠও অবশ্য অগ্রাহ্য নয়। কারণ এতে ভিন্নতর অর্থের আভাস আছে। টীকায় আছে 'অঠকুমারীতি বুদ্ধৈশ্বর্যাদিসুখমনুভূতম্' অর্থাৎ অঠকুমারী = বুদ্ধের অষ্ট ঐশ্বর্য বা শক্তি। হিন্দু শাস্ত্রে ঈশ্বরের আট শক্তিকে আটটি নারী মূর্তিতে কল্পনা করা হয়েছে। এখানে তার প্রভাব থাকতে পারে। তাহলে অঠকুমারী = আট কুমারী বা আট নারী। তিব্বতী অনুবাদের gžon-nu-ma-rnans brgyad = eight maids (Kvaerne, p. 128) পদগুচ্ছেও 'অঠকুমারী' পাঠের সমর্থন মেলে। এই অর্থ গ্রাহ্য হলে এই চর্যার প্রথম দুই পঙ্‌ক্তির অর্থ হতে পারে এই রকম : (কায়-বাক্-চিত্ত—এই) তিনের শরণ-স্বরূপ নিজের দেহকে নৌকা করা হল (এবং সেই মহাসুখকায় নৌকায়) করুণা ও শূন্যতা-নারী (মিলিত হলে) আট কুমারী (আবির্ভূত হল)। শূন মেহেলী, শূনমে হেরী, শূন মেহেরী—এই তিন পাঠের মধ্যে 'শূন মেহেলী'ই গ্রাহ্য, অন্য দুটি অপ্রয়োজনীয়। কারণ পুথিতে 'শূন মেহেলী' পাঠই আছে। তবে পুথিতে 'মেহেলী'র 'ল' অক্ষর লিখতে গিয়ে লিপিকার একটু বেশী টান দিয়ে ফেলায় 'ল' অনেকটা আধুনিক ব বা র-এর মত দেখতে হয়েছে। কিন্তু চর্যার পুথিতে 'র'-এর যে নিজস্ব চেহারা আছে তার সঙ্গে এর পার্থক্য স্পষ্ট ; উপরন্তু ৫০ সংখ্যক গানের 'মেহেলী' শব্দের লিপির সঙ্গে এই গানের 'মেহেলী' পদটির চেহারা মিলিয়ে দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে পদটি আসলে 'মেহেরী' নয়, 'মেহেলী'। অন্য দিকে 'শূনমে হেরী' ('শূন্যে দেখিয়া')—শাস্ত্রীর এই পদবিশ্লেষ ব্যাকরণসিদ্ধ নয়, কারণ অধিকরণসূচক 'মে' বিভক্তি হিন্দী ভাষার অন্তর্গত এবং এই 'মে' বিভক্তি হিন্দীতেও ষোড়শ শতকের আগে উদ্ভূত হয় নি। অন্যদিকে 'শূন মেহেরী' পাঠের 'মেহেরী' পদটি নজীরবিহীন না হলেও তার তুলনায় মহিলা-বাচক 'মেহেলী' পদটি অধিক পরিচিত। ৫০-সংখ্যক গানে ও অন্য অর্বাচীন চর্যায় সম অর্থে 'মেহেলী' পদ পাওয়া যায়। বাংলা লৌকিক প্রবাদে আছে : 'চোরা গাই, বাঁঝী ছাগলী, ঘরে আছে দুষ্টা নেহলী। খল পড়শী, পো মুরুখ, ডাক বলে এ বড় দুখ' ('বাংলা প্রবাদ' —২২৭২)। কাজেই 'শূন মেহেলী' পাঠটিই প্রশস্ত। তরিত্তা— তরিত (= তীর্ণ) > তরিত্তা (শ্বাসাঘাতহেতু দ্বিত্ব)। জিম— *যিমন্ত > জিম। মাঅ < মায়া। সুইণা-স্বপ্ন > সুপিণ (স্বরভক্তি) > সুইণ + আ (পাদপূরণে) = সুইণা। বেণী—স্রোত, প্রবাহ (তু. ত্রিবেণীসঙ্গম = তিন স্রোতের সঙ্গম), পারিভাষিক অর্থ মধ্যমা 'নাড়ী'। মুনিআ— মন্ + ক্ত = *মনিত (= মত) > মনিঅ > মুনিআ। পঞ্চতথাগত— মহাযানী বৌদ্ধধর্মের বজ্রযান শাখায় ধর্মসাধনার শীর্ষস্থানে আছেন বজ্রসত্ত্ব বুদ্ধ। এই আদিবুদ্ধের ধ্যান থেকে পঞ্চস্কন্ধাত্মক বা পঞ্চভূতাত্মক জগৎপ্রপঞ্চের সৃষ্টি। এই পঞ্চ ধ্যানিবুদ্ধের নাম বৈরোচন, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি ও অক্ষোভ্য। এই পঞ্চধ্যানিবুদ্ধই পঞ্চতথাগত। এই পঞ্চতথাগত রূপবেদনাদি পঞ্চস্কন্ধের অধিষ্ঠাতা এবং দেহের মধ্যে পঞ্চস্কন্ধাত্মক পাঁচটি নাড়ী অথবা মস্তক-হৃদয়াদি পাঁচটি স্থানে এদের অধিষ্ঠান। সাধক যখন যোগসাধনার দ্বারা দেহ শুদ্ধ করতে চান তখন তাঁকে দেহের মধ্যে পঞ্চতথাগতের তত্ত্ব সম্যক উপলব্ধি করতে হয় অর্থাৎ দেহের পাঁচটি স্থানে পঞ্চ দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করে দেহের তত্ত্বময় রূপটি অনুভব করতে হয়। কেড়ুয়াল— কর্পটপাল > কঙ্গড়বাল > কেড়আল > কেড়ুয়াল। চর্যায় লিপিতে

'ডু' ও 'দু'-র খানিকটা সাদৃশ্য থাকলেও পার্থক্যও অস্পষ্ট নয়। সেদিক থেকে 'কেদুআল'-এর চেয়ে 'কেড়ুআল' পাঠই স্পফুটতর। কাহ্নিল— কাহ্ন + ইল (আদরার্থে বা অবজ্ঞার্থে)। পরস রস = স্পর্শরস ; পুথির 'পরসর' পাঠটিতে সম্ভবত লিপিকরের অসর্তকতার জন্য পদান্তের 'স'টি বাদ পড়ে গিয়েছে। জইসো— যাদৃশ > জইস > জইসো। তইসো— তাদৃশ > তইস > তইসো। পুথিতে 'জইসো' 'তইসো' পদদ্বয়ে নাসিক্যীকরণের কোন চিহ্ন নেই, এবং নাসিক্যীকরণ ছাড়াই এই দুটি পদের ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করা চলে। এই জন্য নাসিক্যীকৃত 'জইসোঁ' তইসোঁ' পাঠান্তর অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। বিহুনেঁ— বিধূত > বিহুণ্ণ (দত্ত > দিণ্ণ-র সাদৃশ্য) > বিহু (হূ)ন + এঁ। কণ্ডহার < কর্ণধার।

বাচ্যার্থ ॥ ১-২ আটকে মেরে ত্রিশরণকে নৌকা করা হল। [এখন] নিজ দেহ [হল] করুণা (অর্থাৎ পুরুষ) এবং শূন্য [হল] মহিলা। ৩-৪, মায়াস্বপ্নের মত এই ভবজলধি পার হওয়া গেল। স্রোতের মধ্যে আমি [স্বাধিষ্ঠান-চিত্তের] তরঙ্গ (= উল্লোলসুখ অর্থাৎ ঢেউয়ের দোলা) অনুভব করলাম। ৫-৬ পঞ্চতথাগতকে [নৌকার] দাঁড় করা হল, কাহ্ন কায় [নৌকো] বেয়ে মায়াজাল [উত্তীর্ণ হও] (অথবা, পঞ্চতথাগতকে নৌকার দাঁড় করে কাহ্ন কায়নৌকা বেয়ে মায়াজাল পার হও) ৬-৮ গন্ধ স্পর্শ রস (যেমন) তেমনই, নিদ্রা বিনা স্বপ্ন যেমন [অস্তিত্বহীন]। ৯-১০ চিত্তকর্ণধার শূন্যতা-মাঙ্গে (= গলুই, মার্গে) [উপবিষ্ট]। কাহ্ন চলল মহাসুখসঙ্গমে।

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা ॥ বর্তমান চর্যায় নৌযাত্রার রূপকে মহাসুখসন্ধানের কথা বর্ণিত এই হয়েছে। ('অঠকুমারী' পাঠ ধরলে ব্যাখ্যা নিম্নরূপ:) কায়-বাক-চিত্ত-ত্রিশরণ যেখানে লীন হয় সেই মহাসুখকায়কে নৌকা করায় নিজ দেহেই শূন্যতা ও করুণার অভেদ মিলন ঘটেছে। নিজের দেহেই শূন্যতা ও করুণার এই যুগনদ্ধ রূপ দর্শন করে আটপ্রকার বুদ্ধৈশ্বর্যাদিসুখ অনুভূত হচ্ছে। ('অঠক মারী' পাঠ ধরলে) স্কন্ধ-ধাতু- আয়তন ও পঞ্চেন্দ্রিয়-ঘটিত অষ্টবিধ বিকল্পাত্মক জ্ঞান বিনাশ করে কায়-বাক-চিত্তের দ্বারা মহাসুখকায়রূপ নৌকা নির্মাণ করা হয়েছে এবং কায়বাক্‌চিত্তকে সামরস্যে অধিষ্ঠিত করে মহাসুখলাভের উপযোগী করা হয়েছে। এই অবস্থায় সাধক নিজের দেহেই করুণা ও শূন্যতার যুগনদ্ধ রূপ উপলব্ধি করেন। এই সময় সমস্ত পার্থিব বিষয়কে মায়াময় ও স্বপ্নোপম জ্ঞান করে সাধক মহাসুখকায়রূপ নৌকার সাহায্যে এই ভবজলধি অতিক্রম করেন এবং মধ্যগা অবধূতী নাড়ীতে স্বাধিষ্ঠান-চিত্ত তথা প্রকৃতি-প্রভাস্বর চিত্ত থেকে উৎসারিত মহাসুখের তরঙ্গ নিবিড়ভাবে অনুভব করেন। কাহ্ন তাই নিজেরই উদ্দেশে বলছেন যে তাঁর পঞ্চতথাগতাত্মক দেহকে বৈঠা করে অর্থাৎ দেহের পঞ্চস্থানে পঞ্চতথাগতের প্রতিষ্ঠার দ্বারা দেহকে শুদ্ধ করে মহাসুখকায়রূপ নৌকার সাহায্যে মায়াজালবৎ স্কন্ধধাত্বাদিবিষয়-সমুদ্র তাঁকে অতিক্রম করতে হবে। নিদ্রায় ছাড়া জাগরণে যেমন স্বপ্নের অস্তিত্ব নেই, তেমনি অবিদ্যাবিমোহিত চিত্তে গন্ধরসস্পর্শাদি ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহ যথারীতি বিরাজ করলেও অবিদ্যামুক্ত প্রকৃতিপ্রভাস্বর বিশুদ্ধ চিত্তে এগুলির কোন অস্তিত্ব নেই। তাই চিত্তকে কর্ণধার করে কায়নৌকাকে শূন্যতামার্গে চালনা করে কাহ্ন মহাসুখসঙ্গমের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

১৪

[পুথিপৃষ্ঠা। ২২ ক]

॥[১]ধনসী[১] রাগ—ডোম্বীপাদানাম্॥

গঙ্গা জউণা মাঝেঁরে বহই [২]নাই[২]।
তহিঁ [৩]চড়িলী[৩] মাতঙ্গি পোইআ লীলে পার করেই ॥ধু॥
বাহ তু ডোম্বী বাহ লো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা।
সদগুরু [৪]পাঅ পএঁ [৪]জাইব পুণু জিণউরা॥ ধু॥
পাঞ্চ কেডুআল পড়ন্তেঁ মাঙ্গে পিটত কাচ্ছী বান্ধী।
গঅণদুখোলেঁ সিংচহুঁ পাণী ন পইসই সান্ধী॥ ধু
চন্দসূজ দুই চকা সিঠি সংহার পুলিংদা।
বাম দাহিণ দুই মাগ ন [৫]রেবই [৫]বাহতুচ্ছন্দা॥ ধু॥
কবড়ী ন লেই বোড়ী ন লেই সুচ্ছড়ে পার করেই।
জো রথে চড়িলা বাহবা [৬]ণ জাই [৬]কুল্লে কুল বুড়ই॥ ধু॥

পাঠান্তর॥

১—১ তিব্বতী লিপ্যন্তর 'ধ-নি-সা'।
২—২ নাঈ (শাস্ত্রী, শহী)।
৩—৩ চুড়িলী (পুথি), বুড়িলী (শাস্ত্রী, বাগচী, সেন)।
৪—৪ পাঅপএ (শাস্ত্রী), পাঅপসাএঁ (বাগচী, শহী)।
৫—৫ চেবই (বাগচী, শহী)।
৬—৬ নি জাই (পুথি), বাহবাণ জাই (শাস্ত্রী), বাহ্‌বাণ জানি (শহী), বাহবান জাবাই (সেন)।

পাঠবিচার ও শাব্দিক টীকা॥ নাই—নাবিকা > ণাইআ > নাই, অর্থ 'নৌকা'। চড়িলী—√ চড্ (সিদ্ধ হেমচন্দ্র ৪.২০৬) + ইঅ (< ক্ত), = চড়িঅ, চড়িঅ + ইল + ঈ (স্ত্রী প্রত্যয়— 'মাতঙ্গি'র বিশেষণ)। পুথির 'চুড়িলী' পাঠ সম্ভবত লিপিকরপ্রমাদ। কিন্তু 'বুড়িলী' পাঠান্তর-নির্দেশের কোন যুক্তি নেই, কারণ পুথিতে স্পষ্টতই 'চুড়িলী' লেখা আছে ; চর্যা-পুথির 'বু' ও 'চু' অক্ষরের ছাঁদ এক নয় এবং সেই অনৈক্য এখানেও স্পষ্ট। এই গানের 'চুড়িলী' ও 'বুড়ই' পদ দুটির পুথিলিখিত আদ্যক্ষরের তুলনা করলেই বোঝা যায় যে, পুথিতে 'চুড়িলী' লেখা আছে, 'বুড়িলী' নয়। তাছাড়া অর্থের দিক থেকেও 'বুড়িলী' পাঠ অসংগত। চড়িলী (চুড়িলী) = যে চড়ে আছে, এবং বুড়িলী = যে ডুবে আছে। 'চড়িলী' পাঠে অর্থ দাঁড়ায়— মাতঙ্গী নৌকায় চড়ে পোইআ-কে পার করছে, আর 'বুড়িলী' পাঠে অর্থ দাঁড়ায়— মাতঙ্গী নৌকায় ডুবে পোইআকে পার করছে। এক্ষেত্রে 'নৌকায় ডোবা'র চেয়ে 'নৌকায় চড়া'র অর্থটিই প্রশস্ত ও সমর্থনযোগ্য। তাছাড়া,

তিব্বতী অনুবাদের 'shugs' (= that which enters) পদটি 'চড়িলী' পাঠকেই সমর্থন করছে। টীকাতেও 'তত্র স্থিত্বা' আছে। সুতরাং গ্রাহ্য পাঠ 'চড়িলী' হওয়াই বাঞ্ছনীয়। মাতঙ্গি— দ্ব্যর্থক (১) ডোমনী (২) সহজ-প্রমত্তাঙ্গী। পুথিতে 'মাতঙ্গি' বানান আছে, টীকার 'প্রমত্তাঙ্গী' শব্দ দেখে বাগচী 'মাতঙ্গী' বানান নির্দেশ করেছেন। কিন্তু এই বানানশুদ্ধির প্রয়োজন আছে কি না তা বিবেচনার বিষয়। কারণ প্রাচীন বাংলায় স্ত্রী-প্রত্যয়ের চিহ্ন হিসাবে ই ও ঈ দুটি বর্ণই ব্যবহৃত হত, যেমন ঃ 'হরিণি' ও হরিণী' (চর্যা ৬)। শাস্ত্রী অবশ্য পুথির বানানই রক্ষা করেছেন। পোইআ— পোতিকা > পোইআ, অর্থ— কন্যা। বাগচী ও সেন টীকার 'যোগীন্দ্র' পদ দেখে 'জোইআ/যোইআ' পাঠ নির্দেশ করেছিলেন, কিন্তু এই পাঠান্তর অপ্রয়োজনীয়। কারণ টীকায় ব্যবহৃত বিভক্তিহীন 'যোগীন্দ্র' পদটি গানে উল্লিখিত কোন পদের সংস্কৃত অনুবাদ নয়, এটি ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে টীকাকার কর্তৃক ব্যবহৃত। 'পোইআ' পদটি ব্যুৎপত্তির দিক থেকে স্ত্রীলিঙ্গ পদ। সুতরাং পুংলিঙ্গ 'যোগীন্দ্র' পদের সঙ্গে এর সম্পর্ক থাকা সম্ভব নয়। এটি আসলে 'মাতঙ্গি-পোইআ (= চণ্ডালী-মেয়ে) এই সমাসবদ্ধ (কর্মধারয় সমাস) পদের উত্তরপদ। তিব্বতী অনুবাদের gdol pa'i bu mo (= নিম্নবর্ণীয় ব্যক্তির কন্যা) আমাদের সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করে। বাগচীর বইতেও 'পরে 'জোইআর' বদলে 'পোইআ' পাঠ গৃহীত হয়েছে। লীলে— লীলা > লীল + এ (করণ-বিভক্তি)। উছারা— উৎসার > উচ্ছার > উছার, উছারা, অর্থ 'অধিক বেলা' বা 'পড়ন্তবেলা', তুলনীয় 'উছর হয়েছে বেলা' (ধর্মমঙ্গল— মাণিকরাম)। পাঅপএঁ < পাদপ্রপদেন = চরণের আশ্রয়ে। পুথিতে স্পষ্টতই 'পাঅপএঁ' লেখা আছে, এবং এঁ বিভক্তি অর্থহীন নয়, সুতরাং শাস্ত্রীপাঠের চন্দ্রবিন্দুবর্জন অকারণ ও যুক্তিহীন। অন্যদিকে, তিব্বতী অনুবাদের shabs kyi drin gyis (= পাদপ্রসাদে) বাক্যাংশের অনুসরণে বাগচী ও শহীদুল্লাহ্ 'পাঅপসাএঁ' (< পাদপ্রসাদেন) পাঠ নির্দেশ করেছেন। টীকার 'সদ্‌গুরুসম্বোধেন' পদের তিব্বতী অনুবাদেও 'সদ্‌গুরুপ্রসাদে' (bla-ma dam pa'i shabs-kyi drin gyis)-র আভাস আছে। এইজন্য অর্থের দিক থেকে 'পাঅপসাএঁ' পাঠ স্পষ্টতর মনে হয় ; কিন্তু ছন্দের সৌষম্যের দিক থেকে পুথির 'পাঅপএঁ' পাঠটিকেও একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না। শাস্ত্রী অবশ্য পাঅপএ < পাদপদ্মে— এই রকম ব্যুৎপত্তির আভাস দিয়েছেন, কিন্তু পদ্মে/পদ্মেন > পএ/পএঁ— এই রকম ব্যুৎপত্তি কিছুটা কষ্টকল্পিত মনে হয়। সুতরাং প্রপদেন (= শরণ, পথ) > পঅএঁ > পএঁ —এই রকম ব্যুৎপত্তি অনুমান করা যেতে পারে। মোটের উপর, ছন্দের অনুরোধে মূল 'পাঅপএঁ', এবং অর্থবোধের স্পষ্টতার প্রয়োজনে বিকল্পে 'পাঅপসাএঁ' পাঠ গ্রহণযোগ্য। পুণু < পুনঃ। পাঞ্চ < পঞ্চ (আদ্যক্ষরে শ্বাসাঘাতহেতু দীর্ঘতা)। পড়ন্তেঁ— পত্ + শতৃ > পড়ন্ত্ + এঁ (তৃতীয়া এনজাত) = পড়ন্তেঁ। পিঠত— পিঠ (= চাল roof+)ত। বাগচীর 'পিঠত' বা শহী-র 'পীঠত' পাঠ অকারণ, কারণ পুথির স্পষ্টলিখিত 'পিঠত' পাঠ নিরর্থক নয়। দুখোলেঁ— দুই খোলার সেচপাত্র বা সেঁউতির দ্বারা। সান্ধী < সন্ধি, অর্থ সন্ধিস্থলে, 'নৌকার জোড়ে'। চকা < চক্র। সিঠি < সৃষ্টি, দ্ব্যর্থবোধক শব্দ : (১) সৃষ্টি, (২) মেলে-দেওয়া। সংহার— দ্ব্যর্থবোধক : (১) বিনাশ, (২) গুটিয়ে ফেলা। পুলিন্দা < পুলিন্দ,

অর্থ মাস্তুল। রেবই —√ রেব্ = লাফিয়ে চলা (ধাতুপাঠ ১০.১৪ ; ১৪.৩৯ দ্রষ্টব্য A Sanskrit English Dictionary– Monier Monier-Williams)। ন রেবই < ন রেব্যতে (ভাববাচ্যে-) = ছুটে ছুটে যেয়ো না। পুথিতে স্পষ্টাক্ষরে 'রেবই' লেখা থাকলেও তিব্বতী অনুবাদ ও টীকার 'অনুপশ্যন্তীতি' পদের আধারে বাগচী ও শহীদুল্লাহ 'চেবই' (= দেখা যায়) পাঠ নির্দেশ করেছেন। কিন্তু এই পাঠ কয়েকটি কারণে সংশয় উদ্রেক করে : (১) বাগচী যে দর্শনবাচক √ চি ধাতু থেকে 'চেবই' পদের উদ্ভব নির্দেশ করেছেন, ধ্বনিপরিবর্তনের সূত্রানুসারে তা সমর্থন করা কঠিন ; (২) টীকার উক্ত অংশের অন্বয় ও অর্থ সুস্পষ্ট নয়, কাজেই 'অনুপশ্যন্তীতি'র আধারে 'চেবই' পাঠান্তর-নির্দেশ স্বচ্ছন্দ মনে হয় না, (৩) চর্যার এই ৮ম পঙ্‌ক্তিটি দুটি সরল বাক্যের সংযোগে গঠিত (বাম... চেবই + বাহতু ছন্দা) একটি যৌগিক বাক্য ; এই বাক্যের প্রথম খণ্ডবাক্যের সঙ্গে দ্বিতীয় খণ্ডবাক্যের যে কার্যকারণগত সংগতি আছে তা 'রেবই' পাঠে রক্ষিত হয়, 'চেবই' পাঠে হয় না। 'চেবই' পাঠে বাক্যটির অর্থ : বাম-ডান দুই মার্গ দেখা যায় না, স্বচ্ছন্দে যাও—এখানে বাক্যের দুই অংশে কোন কার্যকারণগত সম্পর্ক নেই ; পক্ষান্তরে 'রেবই' পাঠে বাক্যের অর্থ : বাম-ডান দুই মার্গে ছুটোছুটি ক'রো না, স্বচ্ছন্দে অর্থাৎ ধীরে সুস্থে যাও— এখানে দুই অংশের মধ্যে কার্যকারণগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত। কাজেই 'রেবই' পাঠ প্রশস্ততর। শাস্ত্রী এই পাঠ রক্ষা করেছেন। ছন্দা— অর্থ 'স্বচ্ছন্দে'। কবড়ী— কপর্দিকা > কবড্ডিআ > কবড়ী, 'কড়ি'। বোড়ী— কৌড্রিক > বোড্ডিঅ > বোড়ী, অর্থ 'বুড়ি'— মুদ্রাবিশেষ ! ণ জাই—পুথিতে 'ণি'-র ই-কারের বাঁকা আঁকড়িতে ছোট দাগ আছে, এতে হয়ত 'ণি'র ই-কার বর্জনের ইঙ্গিত আছে। অন্যদিকে 'জাই' পদের 'জ' এবং ই-এর মাঝে একটি অক্ষর লিখে কেটে দেওয়া আছে, অক্ষরটি সম্ভবত 'ব'। এইজন্য 'ব' কে বর্জন না করে সেন পাঠ নিয়েছেন 'জাবাই', কিন্তু এই পাঠ যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ 'ব' রক্ষা করলেও পাঠ দাঁড়ায় 'জবাই', 'জাবাই' নয় ; 'জবাই' অর্থহীন। তাছাড়া 'ব' থাকা যদি লিপিকরের অভিপ্রেত হত, তবে তিনি তা কেটে দিতেন না। কাটা অক্ষরটি কোনক্রমেই 'ন'-এর সাদৃশ্য বহন করে না, কাজেই 'জানই' পাঠও কল্পনা করা অসংগত। প্রকৃতপক্ষে 'জাই' পাঠে অর্থবোধে অসুবিধা হয় না : 'চড়িলা' ক্রিয়াপদ নয়, 'জো' পদের কৃদন্ত বিশেষণ ; সুতরাং সমগ্র বাক্যটির অর্থ হচ্ছে : যে (শুধু) রথে চড়ে থাকে, নৌকা বাইতে যায় না, (সে) কূল থেকে কূলে ঘুরে বেড়ায় (কদাপি পার হতে পারে না)। কাজেই 'জাই'-এর অতিরিক্ত পাঠান্তরের প্রয়োজন নেই।

বুড়ই— √ ব্রুড্ (ধাতুপাঠ ২৮.৯৯) = মূল অর্থ 'ডুবে 'যাওয়া', অর্থসংক্রমের ফলে 'নষ্ট হওয়া', 'বিপথগামী হওয়া' প্রভৃতি ভাব প্রকাশ পায়। বিপথগামী অর্থে রাজতরঙ্গিণী-তে 'ব্রুড়িত' পদ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানেও তত্ত্বানুসারে রথারূঢ় ব্যক্তি যে সহজপথভ্রষ্ট তা-ই বলা হয়েছে। কাজেই : বুড়ই < ব্রুডতি। তবে পুথিতে স্পষ্টাক্ষরে 'বুড়ই' লেখা থাকলেও টীকার 'ভ্রমন্তি' পদের আধারে শহীদুল্লাহ 'বুলই' পাঠ নির্দেশ করেছেন এবং বাগচী ও সেন বিকল্প হিসাবে ঐ পাঠ অনুমোদন করেছেন। কিন্তু 'বুড়ই' পাঠেই পথভ্রষ্ট হবার অভিপ্রেত ভাবটি যথার্থভাবে প্রকাশ পেয়েছে বলে 'বুলই' পাঠের কল্পনা

নিষ্প্রয়োজন। তাছাড়া, 'ভ্রমন্তি' পদ ব্যবহার করে টীকাকার 'বিচরণ' করার সঙ্গে 'ভুল করা'-র অর্থাভাসও দিতে পারেন। কাজেই 'বুড়ই' পাঠই গ্রাহ্য।

বাচ্যার্থ ॥ ১—২. গঙ্গা-যমুনার মাঝে, ওরে, এক নৌকা বাহিত হয়। তাতে চড়ে ডোমনী মেয়ে লীলায় (= অবলীলাক্রমে) পার করে। ৩—৪. বাও, তুমি ডোম্বী [পাদ], বাও ওলো ডোম্বী [পাদ], পথে অনেক বেলা হয়ে গেল। সদ্‌গুরুপাদ-প্রসাদে পুনরায় জিনপুর যেতে হবে। ৫—৬. পাঁচখানা দাঁড় পথে পড়বার (=চালাবার) সময় [নৌকার] চালে কাছি বেঁধে রাখা হয়েছে। গগনসেউঁতিতে জল সেঁচো, [যেন] ফাঁক দিয়ে [জল] না ঢোকে। ৭—৮. চন্দ্র ও সূর্য পুলিন্দার (= মাস্তুলের) সৃষ্টি (= পাল মেলবার) ও সংহারের (= পাল সংহরণের বা গুটাবার) দুটি চাকা। বাম-দক্ষিণের দুই মার্গে, তুমি স্বচ্ছন্দে (বা ইচ্ছা মত) বাও। ৯—১০. কড়ি নেয় না, বুড়ি নেয় না। স্বচ্ছন্দে পার করে দেয়। যে [শুধু] রথে চড়ে, নৌকা বাইতে যায় না, সে কুলে কূলে [বৃথা] ঘুরে মরে ॥

গূঢ়ার্থব্যাখ্যা ॥ আলোচ্য চর্যায় সহজানন্দরূপিণী নৈরাত্মাকে মাতঙ্গকন্যা খেয়া-পাটনী রূপে কল্পনা করা হয়েছে। এই কন্যা গঙ্গাযমুনার দুইধারার মাঝখানে খেয়াপারাপার করেন। গঙ্গাযমুনা— অর্থাৎ দুইদিকে গ্রাহ্যত্ব-গ্রাহকত্বের প্রবল ধারা, এই দুই ধারার সামরস্য মাঝখানের নৌকা-রূপিণী অবধূতী মার্গে। ঐ মধ্যস্থিত মার্গে অধিষ্ঠিত হয়ে সহজযানপ্রমত্তাঙ্গী নৈরাত্মা-ডোমনী যোগীদের ভবনদী পার করে দেন। অর্থাৎ বামগা-দক্ষিণগা নাড়ীর চন্দ্রসূর্যাভাসকে মধ্যগা নাড়ীতে অদ্বয় জ্ঞানের সামরস্যে অধিষ্ঠিত করলেই সহজানন্দের উপলব্ধি ঘটে। তাই কবি নিজের উদ্দেশে বলছেন যে তাঁর ঐ মধ্যস্থিত মার্গে শীঘ্র অগ্রসর হওয়া দরকার, পথে বিলম্ব করলে চলবে না অর্থাৎ গ্রাহ্যত্ব বা গ্রাহকত্ব নিয়ে ব্যাপৃত থাকলে চলবে না, কেন না তাঁকে গুরুর পাদপ্রসাদে পুনরায় মহাসুখপুরে যেতে হবে। এই নৌকাচালনা তথা অবধূতী মার্গে অগ্রসর হবার প্রণালী সম্পর্কে কবি বলছেন যে পঞ্চক্রম এবং পঞ্চতথাগতশরণরূপ পাঁচ দাঁড় ফেলে এবং পীঠ বা মণিমূলে বোধিচিত্তকে দৃঢ়রূপে ধারণ করে শূন্যতারূপ সেচনীর দ্বারা বিষয়রূপ তরঙ্গ সেচন করতে হবে, যাতে বিষয়াভাস যোগিদেহে প্রবেশ করতে না পারে। এই নৌকার মাস্তুলে দুটি চাকা আছে। এই চাকাদুটির একটি প্রজ্ঞা (শূন্যতা), চন্দ্রাভাস বা সংহার অর্থাৎ অনস্তিত্বের প্রতীক, অপরটি উপায় (করুণা), সূর্যাভাস বা সৃষ্টি অর্থাৎ অস্তিত্বের প্রতীক—প্রথমটি বামগা ও স্ত্রীলিঙ্গ, দ্বিতীয়টি দক্ষিণগা ও পুংলিঙ্গ, মাস্তুল বা পুলিন্দা পূর্বোক্ত দ্বৈতাভাস বা দ্বৈতজ্ঞানের অতীত অদ্বয়জ্ঞান— এই মাস্তুলরূপী অদ্বয়জ্ঞান চক্ররূপী দ্বৈতজ্ঞানের মাঝখানে সামরস্যরূপে বিরাজমান, তাই এই লিঙ্গ পুং বা স্ত্রী কোনটিই নয়— নপুংসক। এই অদ্বয়জ্ঞানই সাধকের অন্বিষ্ট, তাই বাম-দক্ষিণের দ্বৈতজ্ঞান পরিহার করে পরিশোধিত বোধিচিত্তকে সহজ পথে চালিত করতে হবে। গ্রাহ্যগ্রাহক দুই ধারার মাঝখানে যে নৈরাত্মা নৌ-চালনা করে সে কড়িবুড়ি কিছু নেয় না অর্থাৎ দ্বৈতজ্ঞানের মাঝখানের বিরমানন্দমার্গে যে অদ্বয়জ্ঞান সাধকের অন্বিষ্ট তার জন্য যোগীকে কৃচ্ছতা বা পাণ্ডিত্যরূপ বহুমূল্য দিতে হয় না, এই পথ 'সহজে'র পথ।

এই পথের পরিচয় জানা থাকলে সহজেই ভবসমুদ্র পার হওয়া যায়, কিন্তু যে বহিঃশাস্ত্রাভিমানী এই পথের পরিচয় জানেন না, তিনি অবিদ্যামোহিত অবস্থায় কূল অর্থাৎ রূপজগতের মধ্যেই বিচরণ করে পরিণামে বিনষ্ট হন।

১৫

[পুথিপৃষ্ঠা ২৩ক]

॥রাগ রামক্রী-শান্তিপাদানাম্ ॥

সঅসম্বেঅণ[১] সরুঅ[১] বিআরেঁতে[২] অলক্খ লক্খণ ন[২] জাই।
জে জে উজুবাটে গেলা অনাবাটা ভইলা [৩]সোঈ[৩] ॥ ধ্রু ॥
কুলেঁ কূল মা হোই রে মূঢ়া উজুবাট সংসারা।
বাল [৪]তিল[৪] একু[৫] বাঙ্ক[৫] ণ ভুলহ রাজপথ কন্ঢারা ॥ ধ্রু ॥
মাআমোহাসমুদা রে অস্ত ন বুঝসি থাহা।
[৬]অগে[৬] নাব ন ভেলা[৭] দীসঅ[৭] ভন্তি ন পুচ্ছসি নাহা ॥ ধ্রু ॥
[৮]সুনা[৮] পান্তর উহ ন দিসই ভান্তি ন বাসসি[৯] জাংতে[৯]।
[১০]এষা[১০] [১১]অঠ[১১] মহাসিদ্ধি [১২]সিঝঅ[১২] উজুবাট জাঅন্তে ॥ ধ্রু ॥
বাম দাহিণ দোবাটা চ্ছাড়ী সান্তি বুলথেউ সংকেলিউ।
ঘাট ন গুমা খড়তড়ি নো হোই আখি বুজিঅ বাট জাইউ ॥ ধ্রু ॥

পাঠান্তর ॥
১—১ সঅসংবেইণ (টীকা)। ২—২ অলক্খ লক্খ ণ (বাগচী)।৩—৩ সোই (বাগচী, শহী)
৪—৪ ভিণ (শাস্ত্রী)। ৫—৫ বাকু (শাস্ত্রী, বাগচী)। ৬—৬ আগে (বাগচী)
৭—৭ দীসই (বাগচী, শহী)। ৮—৮ শূন্য (টীকা)।
৯—৯ জান্তে (শাস্ত্রী, বাগচী) ১০—১০ এখ (বাগচী), এথা (সেন)।
১১—১১ অট (শাস্ত্রী, বাগচী, সেন) আঠ (শহী)

পাঠবিচার ও শাব্দিক টীকা ॥ সঅসম্বেঅণ < স্বসংবেদন। টীকার 'সংবেইণ' য়-শ্রুতির আভাস বহন করে। এই য়-শ্রুতির আভাস থেকে বোঝা যায় 'সম্বেঅণ' 'সম্বেয়ণ'-রূপে উচ্চারিত হত। এই য়-শ্রুতিবিশিষ্ট উচ্চারণ অবশ্যই পরবর্তী কালের ; সুতরাং 'সম্বেঅণ' পাঠ প্রাচীনতর ও সম্ভবত আদি পাঠ এবং তার তুলনায় টীকার পাঠটি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন। সরুঅ < স্বরূপ। বিআরেঁতে—বিচারেণ > বিআরেঁ + তে (লক্ষণীয় : করণ-অধিকরণে এতে বিভক্তির ব্যবহার আধুনিক রাঢ়ীউপভাষার বৈশিষ্ট্য)। বাগচী 'বিআরেঁ' এবং রাহুল 'বিআরে' পাঠ নিয়েছেন ; কিন্তু ছন্দের মাত্রাসাম্যের দিক থেকে পুথিতে লেখা 'বিআরেঁতে' পাঠই প্রশস্ত। অনাবাটা < অনাবর্তক। উজুবাট < ঋজুবর্ত্ম।

সংসারা < সংসারক। 'সংসার' (সম্— √সৃ) = অবাধ চলাচলের উপযোগী প্রশস্ত

পথ বা রাজপথ (তু. সরণি) ; সুতরাং 'সংসারা' = রাজপথ। তিল < তিলম্ (= তিলমাত্র)। শাস্ত্রী 'ভিণ' পাঠ নিয়েছেন, কিন্তু এই পাঠগ্রহণে অসুবিধা আছে। চর্যাপুথির 'ভ' ও 'ত' অক্ষর অনেকটা এক রকম হলেও 'ভ' এর মধ্যস্থল স্থূল এবং তার তুলনায় 'ত' -এর মধ্যভাগ কৃশ। এখানে পুথির কৃশ অক্ষর 'ত'-এর সম্ভাবনাই উজ্জ্বল করে। তবে অসুবিধা পরের অক্ষরটিকে নিয়ে। পরের অক্ষরটিকে শাস্ত্রী 'ণ' বলে বর্ণনা করলেও একে কোনক্রমে মূর্ধন্য ণ বলা যায় না, কারণ পুথির অন্য জায়গার মূর্ধন্য ণ-এর সঙ্গে এর কোন সারূপ্য নেই। পুথিতে এই বর্ণটিকে 'দন্ত্য' ন বলেই মনে হয়, সেক্ষেত্রে পাঠ দাঁড়ায় 'তিন' ; কিন্তু 'তিন' পাঠে অর্থ স্পষ্ট হয় না এবং সেই জায়গায় তিব্বতী অনুবাদের Skra rtse ti-la 'bru cig ma yo = 'তিলবীজমেকং নাস্তি' (বাগচী) অনুসারে একে 'তিল' বলে গ্রহণ করলে অর্থ অনেকটা পরিষ্কার হয় : (রাজপথে) তিলেক মাত্র বাঁক নেই, রাজপথকে ভুলো না (স্মরণীয় : দুটি পদ বা বাক্যাংশের মাঝে একটি মাত্র নঞর্থক অব্যয় বসিয়ে নঞর্থক বাক্যরচনা চর্যাভাষার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ; যেমন, কাজ ন কারণ, উহ ন দীসই, ঘাট ন গুমা ইত্যাদি। এক্ষেত্রেও 'তিল একু বাঙ্ক' এবং 'ভুলহ' এই দুটি বাক্যাংশের মাঝে মাত্র একটি নঞর্থক অব্যয় 'ণ' ব্যবহৃত হয়েছে)। একু— এক > এক্ক > একু। বাঙ্ক— বক্র > বঙ্ক > বাঙ্ক। পুথির 'বাঙ্গ' পাঠ সম্ভবত লিপিভ্রম, তবে 'ঙ্ক' -কে 'কু' ধরে 'বাকু' পাঠ নেওয়া ঠিক নয়, কারণ পুথিতে 'কু' ও 'ঙ্ক' হরফের ছাঁদ স্পষ্টতই কিছুটা পৃথক। ভুলহ— *হ্বল্ (ধাতু) > ভুল + হ (অনুজ্ঞা-বিভক্তি)।

কন্ঢারা— এই পদটির ব্যুৎপত্তি ও অর্থ সম্পর্কে কিছু সংশয়ের অবকাশ আছে। টীকার 'কনকপথধারয়া' এবং তিব্বতী অনুবাদের 'gser la' = 'সোনায়' অর্থাৎ 'কনকে' পদ দেখে মনে হয় পদটির মূলে স্বর্ণবাচক 'কনক' শব্দ থাকা অসম্ভব নয়। সেদিক থেকে সম্ভাব্য ব্যুৎপত্তি : কনকধারা > কন্ঢারা। কিন্তু এই ব্যুৎপত্তি থেকে কোন স্পষ্ট অর্থ পাওয়া যায় না। সেদিক থেকে স্কন্ধাবার > কণ্ঢারা [স্কন্ধাবার > তাঁবু, রাজধানী] —এই ব্যুৎপত্তি কিছুটা অর্থপূর্ণ মনে হয় : রাজপথ কন্ঢারা = রাজপথই রাজধানী অর্থাৎ রাজার নিবাসস্থল [তু. মধ্য বাংলা 'কাণ্ডার'— 'কূপতটে কাপড়ে কাণ্ডার করি রায়' —ঘনরাম]। পুথিতে স্পষ্টই 'কন্ঢারা' লেখা আছে, কাজেই 'কন্ধারা' পাঠান্তর অপ্রয়োজনীয়। সমুদা—সমুদ্রস্য > সমুদ্দস্স > (সমুদাস >) সমুদাহ > সমুদা। থাহা— *স্থাঘ > থাহ + আ (স্বার্থিক) = থাহা। নাহা < নাথ। উহ— উহ্যতে > উহিঅই > উঁহ, অর্থ 'অনুমিত হয়'। জান্তে— যা + শতৃ > জান্ত্ + এ (অধিকরণ বিভক্তি), অর্থ 'যাবার কালে'। সিঝএ— সিধ্যতে > সিজ্ঝই > সীঝই > সিঝএ, পাঠান্তর নিষ্প্রয়োজন। বুলথেউ— অপভ্রংশ ধাতু বুল্ল + ইঅ (-ক্তজাত) = বুলিঅ + থিউ (< স্থিত, অস্ত্যর্থক সহায়ক ক্রিয়া) = বুলিথিউ, বুলথিউ, বুলথেউ। সংকেলিউ < সংকেলিত। বুলথেউ সংকেলিউ— তিব্বতীতে এই অংশের অনুবাদে আছে ñed sdud gsal-bar smras = স্পষ্ট করে বলে [ñed sdud gsal bar = স্পষ্ট করে, smras = বলে], অনুবাদের সূত্র ধরে শহীদুল্লাহ মনে করেন 'the Tib. translator had বোলথি in his text meaning

'(he) says', but বুলথি '(he) wanders' gives a better sense. The Tib. translator understands by সংকেলিউ 'making clear' (ñed sduń gsal bar). This is supported by the com. স্ফুটমিতিকৃত্বা'। এই দিক থেকে শহীদুল্লাহ-র পাঠ 'বুলথি সংকেলিউ' ; তবে শহীদুল্লাহ্ তিব্বতী অনুবাদের অর্থ গ্রহণ করেন নি, তাঁর মতে এর অর্থ 'বেড়ান খেলা করিয়া'। কিন্তু তিব্বতী অনুবাদের অর্থ একেবারে অগ্রাহ্য নয়, কারণ 'সংকেলিউ' পদটি যেমন সম্√কেল্ (= খেলা) + ক্ত থেকে ব্যুৎপন্ন হতে পারে, তেমনি সম্ √কিল্ (= to be or become white, দ্রঃ SED) + ণিচ্ + ক্ত থেকেও নিষ্পন্ন হতে পারে। টীকার স্ফুটমিতিকৃত্বা' শেষোক্ত ব্যুৎপত্তিকে সমর্থন করে। বিশেষত 'বুলথেউ' পদটি 'ব্রু' ধাতু-নিষ্পন্ন 'কথন'-বাচক ক্রিয়াপদ হওয়াই সংগততর, কারণ এটি গানের অন্তিম পদে ভণিতার অংশ হিসাবে কবিনামের সঙ্গে যুক্ত। তুলনীয় 'বোলথি সান্তি' (২৬নং চর্যা)। হয়ত আদি পাঠ ছিল 'বোলথি সংকেলিউ', পরে পথ চলার ('বাট জাইউ') অনুষঙ্গে ভ্রমণবাচক 'বুল্' ধাতুর সন্নিকর্ষ ঘটেছে। তবে √বুল্ ধাতু 'বলা' অর্থেও মধ্য বাংলায় ব্যবহৃত হয়েছে। ঘাট— শুল্ক আদায়ের ঘাঁটি। গুমা < গুল্ম = প্রহরী। খড় তড়ি = খড় ও তৃণ, মতান্তরে খাদ ও তড়ি (ডাঙ্গা ?) বা ডাঙ্গাডহর। 'তড়' (< তট) ডাঙ্গা-অর্থে রামেশ্বরের সত্যনারায়ণে ব্যবহৃত। বুজিঅ—মুদ্ > বুজ্ + ইঅ (ক্তজাত) = বুজিঅ। জাইউ—*যাতু (=যায়তাম) > জাঅউ > জাইউ। ৩২ সংখ্যক চর্যার টীকায় এই চর্যার শেষ পংক্তির একটি পাঠান্তর পাওয়া যায় 'ঘটমন গুম্মা খড়দতি বোহঅ। অক্ষি বুঝিআ মাগ চালী।'

বাচ্যার্থ ॥ ১—২. স্ব-সংবেদনের স্বরূপবিচার দ্বারা অলক্ষ্যকে লক্ষ্য করা যায় না। যে যে সোজা পথে গেল সে-ই আর ফিরল না। ৩—৪. রে মূঢ়, কূলে কূলে বিচরণ কোরো না। সোজা পথই প্রশস্ত পথ। হে বাল [-যোগী,] [এই পথে] তিলমাত্র বাঁক নেই, ভুলো না। ['সহজ' পথরূপ] রাজপথই [সহজানন্দরূপ] রাজার নিবাসস্থল। ৫—৬. ওরে, [তুই] মায়ামোহসমুদ্রের না বুঝিস অন্ত, [না বুঝিস] থই। আগে (=সামনে) না নৌকা না ভেলা দেখা যায়। ভুলে (=ভুল হলে) নাথ (=গুরু)কে জিজ্ঞাসা করিস না [কেন] ? ৭—৮. শূন্যপ্রান্তর, অনুমানেও কিছু দেখা যায় না। যেতে যেতে ভুল কোরো না। এই সোজাপথে গেলে অষ্টমহাসিদ্ধি সিদ্ধ হয়। ৯—১০. বাম ডান দুই পথ ছেড়ে শান্তিপাদ কেলি করতে করতে চলেছেন (বা স্পষ্টভাবে বলেন)। [এই সোজা পথে] ঘাট নেই, গুল্ম, খড়, তৃণ নেই (অথবা 'শুল্ক আদায়ের ঘাঁটি নেই, ঘাটরক্ষক প্রহরী নেই, খাদ-তড় বা ডাঙ্গা-ডহর নেই')। চোখ বুজে [এই] পথ চলা যায়।

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা ॥আলোচ্য চর্যায় সহজমার্গে সহজ সাধনার কথা বর্ণিত হয়েছে। সহজানন্দের অনুভূতি স্বসংবেদ্য এবং অলক্ষ্য বা অনির্দেশ্য, তাই লক্ষণাদির দ্বারা ভাষায় এর স্বরূপ ব্যাখ্যা করা যায় না। যে সব যোগীন্দ্র বিরমানন্দরূপ সহজ মার্গে আরূঢ় হয়ে মহাসুখধামে উপনীত হয়েছেন, তাঁরা আর সংসারে প্রত্যাবর্তন করেন না, অর্থাৎ বাহ্যজগতের অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁদের আর কোনো চেতনা থাকে না। তাই কবি বলছেন যে, বিরমানন্দাবধূতীরূপ সহজ মার্গ ত্যাগ করে কূলে অর্থাৎ প্রত্যেক-শরীর-

রূপ তথা বস্তুজগতের জ্ঞানরূপ কুমার্গে লীন [কুল—কুমার্গ) + ল (য়)] হয়ো না, কেন না মূর্খেরাই সংসারকে পরম সিদ্ধির সহজ পথ বলে মনে করে বিভ্রান্ত হয়। তাই বালযোগীর উদ্দেশে কবির উপদেশ, বস্তুজ্ঞান বা মায়ামোহবশত তিনি যেন ভব ও নির্বাণ—অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বকে পৃথক বিকল্প মনে করে বিভ্রান্ত না হন। রাজচক্রবর্তী যেমন কনকমণ্ডিত রাজপথে ক্রীড়োদ্যান বা রাজধানীতে প্রবেশ করেন, তিনিও যেন তেমনি সাধনার সুবর্ণমার্গ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পথ অবধূতীমার্গে মহাসুখচক্র-কমলোদ্যানে প্রবেশ করেন। মায়ামোহরূপী সমুদ্রের অন্ত ও গভীরতা যদি বোঝা না যায় এবং এই মায়াসমুদ্র উত্তীর্ণ হবার জন্য সম্মুখে নৌকা বা ভেলা দেখা না যায় অর্থাৎ মায়ামোচনের পথ যদি জানা না থাকে তবে সেই বিভ্রান্তিকর অবস্থায় নাথ বা সদ্‌গুরুকে পারের উপায় জিজ্ঞাসা করা উচিত, কেননা সদ্‌গুরুর উপদেশই মায়ামোহরূপ সমুদ্রের উত্তরণের একমাত্র নির্ভরযোগ্য উপায়। শূন্যতারূপ প্রান্তর সাধনার প্রথম পর্যায়ে দেখা যায় না বা অনুমানও করা যায় না, তবে এই সহজমার্গে অভ্রান্তভাবে আরোহণ করলে অষ্টমহাসিদ্ধি লাভ হয় অর্থাৎ অবিদ্যাচিত্ত পরিশোধিত হয়ে প্রকৃতি-প্রভাস্বর-রূপ স্বাধিষ্ঠানচিত্তে পরিণত হয়। চর্যাকার শান্তিপাদ বাম-ডাহিনের আভাসদ্বয় ত্যাগ করে এই বিরমানন্দরূপ সহজমার্গে আনন্দে বিচরণ করছেন। এই সহজমার্গে তৃণ-কণ্টক-গুল্ম বা উচ্চাবচতার অন্তরায় নেই, তাই চোখ বুঁজে এই পথে চলা যায় অর্থাৎ বিরমানন্দ মার্গে আরোহণ করলে যোগীকে আর কোন বাধার সম্মুখীন হতে হয় না, স্তব্ধোন্মীলিতলোচনে যুগনদ্ধকে প্রত্যক্ষ করতে করতে তিনি তখন সহজানন্দের স্বরূপ উপলব্ধি করেন।

১৬

[পুথিপৃষ্ঠা ২৫ ।ক.খ]

॥রাগ ভৈরবী—মহীধরপাদানাম্ ॥

[১]তিণিএঁ[১] পাটেঁ লাগেলি রে[২] অণহ[২] কসণ ঘণ গাজই।
তা সুনি মার ভয়ঙ্কর রে[৩] বিসঅ[৩] মণ্ডল[৪] সএল[৪] ভাজই ॥ ধু ॥
মাতেল চীঅ[৫] গঅন্দা[৫] [৬]ধাবই[৬]।
ণিরন্তর গঅণন্ত তুসেঁ ঘোলই ॥ ধু ॥
পাপপুণ্য বেণি[৭] তোড়িঅ[৭] সিকল মোড়িঅ খম্ভাঠাণা।
গঅণটাকলী লাগি রে[৮] চিত্তা[৮] পইঠ ণিবাণা ॥ ধু ॥
মহারসপানে মাতেল রে তিহুঅণ [৯]সএল[৯] উএখী।
পঙ্খ[১০] বিষঅরে[১০] নায়ক রে বিপখ কোবী ন দেখী ॥ ধু ॥
খররবিকিরণ[১১] সন্তাপে[১১] রে[১২] গঅণাঙ্গণ[১২] গই পইঠা।
ভণন্তি[১৩] মহিত্তা[১৩] মই এথু বুড়ন্তে কিম্পি ন [১৪]দিঠা[১৪] ॥ ধু ॥

পাঠান্তর ॥

১—১ তীণিএঁ (শহী), ২—২ অণহা (শহী)
৩—৩ সঅ (পুথি) ৪—৪ সঅল (বাগচী, শহী)
৫—৫ গএন্দা (বাগচী), গয়েন্দা (শহী)। ৬—৬ পুথিতে পঙ্‌ক্তিসমাপ্তিসূচক দাঁড়ি চিহ্ন নেই।
৭—৭ তিড়িঅ (পুথি, শাস্ত্রী), ৮—৮ চিত্ত(বাগচী)
৯—৯ পুথিতে 'সঅএল' লিখে 'অ' উপর বর্জনচিহ্ন আছে।
১০—১০ বিসঅ (বাগচী)
১১—১১ পুথিতে 'প' এর মাথায় তৈতন দিয়ে এ-কার বোঝানো হয়েছে, এটি চর্যালিপিতে বিরল।
১২—১২ গঅনগঙ্গা (শহী) ১৩—১৩ মহিআ (বাগচী), তিব্বতী লিপ্যন্তরে ম-হে-ন্দ্র (?)
১৪—১৪ দীঠা (শহী)

পাঠবিচার ও টীকা ॥ তিণিএঁ—ত্রীণি > তিণ্নি > তীণি, তিণি + এঁ (<এন) = তিণিএঁ। লাগেলি—লগ্ন > লগ্‌গ > লাগ + এল + ই (স্ত্রী প্রত্যয়, উহ্য স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ 'নাড়ীর' সঙ্গে সম্পৃক্ত)। অণহ < অনাহত। কসণ < কষণ = ভয়ানক। ঘণ < ঘন ; ক্রিয়াবিশেষণ। শহীদুল্লাহ্ এখানে তিব্বতী অনুবাদ থেকে (glan = গজ >) 'গঅ' পাঠান্তর অনুমান করেছেন। গাজই—গর্জতি > গজ্জই> গাজই। সুনি—*শৃণিত (=শ্রুত) > সুণিঅ > সুনি। মার—বৌদ্ধসাহিত্যে বর্ণিত দুর্বুদ্ধি, দুষ্কর্ম, প্রলোভন প্রভৃতি দুষ্প্রবৃত্তির অপদেবতা। ভাজই—ভজ্যতে > ভজ্জই > ভাজই। মাতেল—মত্ত > মাত + এল (ইল) = মাতেল। চীঅ-গঅন্দা < চিত্ত-গজেন্দ্র। গঅণন্ত< গগনান্ত। তুসেঁ—তৃষ্ণা > তুস্‌সা > (তুসা >) তুস + এঁ (করণ-বিভক্তি)। ঘোলই—ঘূর্ণতি > ঘুল্লই > ঘোলই, অর্থ 'ঘোরে', 'ঘুরে বেড়ায়।' বেণি—*দ্বীণি > বেণ্নি > বেণি। তোড়িঅ < ত্রোটিত। 'তিড়িঅ' সম্ভবত লিপিভ্রম। সিকল—শৃঙ্খল > সিক্‌খল > সিকল। মোড়িঅ < মর্দিত। খম্ভাঠানা—স্কম্ভাস্থানক > খম্ভাঠাণঅ > খম্ভাঠানা। স্কম্ভ = বন্ধন, কম্ভাস্থানক = (হাতি) বাঁধবার জায়গা, হস্তিশালা বা পিলখানা। গঅণটাকলী < গগন-টাকলী—টীকা অনুসারে পাঠান্তর 'গঅণটকা লাগে রে' এই পাঠান্তর অনুসারে 'টকা' বা 'টাকলী'র অর্থ হস্তিচালনাকালে মাহুতদের উচ্চারিত একপ্রকার অব্যক্ত 'টক্ 'টক্' শব্দ,সেদিক থেকে 'টাকলী' বা 'টকা' ধ্বন্যাত্মক শব্দ, এবং গগনটাকলীর অর্থ গগনশব্দ বা অনাহত শব্দ। তু. অসমীয়া 'টকালি' = 'a sharp clicking noise of the tongue as used by drivers of a cart or an animal' (শহীদুল্লাহ্)।

তিহুঅন < ত্রিভুবন। সএল—সকল > সঅল > সএল। উএখী—উপেক্ষিতৃ > উবেক্‌খিঅ > উএখিঅ > উএখী। কোবী < কোঽপি। দেখী—*দৃক্ষিত (=দৃষ্ট) > দেক্‌খিঅ > দেখী। গই—*গমিত(=গত) > গইঅ > গই। ভণন্তি—গৌরবে বহুবচন। মহিত্তা—পাঠান্তরে মহিণ্ডা, মহিআ এবং টীকায় মহীধর পাওয়া যায়। মই—ময়া > মএ > মই। এথু—অত্র > এথু। বুড়ন্তে—অপভ্রংশ ধাতু বুড্ড + অন্ত্ (শতৃজাত) = বুড়ন্ত্ + এ (করণ-অধিকরণ বিভক্তি)। কিম্পি < কিমপি (মধ্যস্বরলোপ)।

বাচ্যার্থ ॥ ১-২. [বামগা দক্ষিণগা ও মধ্যগা এই] তিনটি [নাড়ী] পাটে লাগল।

ওরে, অনাহত [শব্দ শুনে] ভয়ানক [হস্তী] ঘন (=ঘোর) গর্জন করে। ওরে, তা শুনে ভয়ঙ্কর মার [রূপ] বিষয়মণ্ডলসকল ভগ্ন [বা বিচলিত] হল। ৩—৪. মাতাল চিত্তগজেন্দ্র ধায়। তৃষ্ণায় [মহাসরোবররূপ] গগনান্তে নিরন্তর ঘুরে বেড়ায়। ৫-৬. পাপপুণ্যরূপ দুই শিকল ছিঁড়ে, বন্ধনস্তম্ভ ভেঙ্গে [চুরমার করে], গগনটাকলি লেগে (=গগনশব্দে অনুপ্রেরিত হয়ে) ওরে, চিত্ত [গজেন্দ্র] নির্বাণে (নির্বাণরূপে সরোবরে) প্রবেশ করল। ৭-৮, ওরে, ত্রিভুবন-সকল উপেক্ষা করে মহারসপানে মত্ত। [চিত্তগজেন্দ্রই] পঞ্চবিষয়ের নায়ক (=অধীশ্বর), ওরে, বিপক্ষে কাউকে দেখা যায় না। ৯-১০, খর রবিকিরণসন্তাপে, ওরে, [চিত্তগজেন্দ্র] গগনাঙ্গনে (টীকা অনুসারে 'গগনগঙ্গায়') গিয়ে প্রবিষ্ট হল। মহিন্তা বলেন, এখানে ডুবলে আমি [আর] কিছুই দেখি না।

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা ॥ সাংবৃতিক অবস্থায় চিত্ত যখন অবিদ্যাবিক্ষুব্ধ থাকে তখনই ভবজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। এই ভবজ্ঞান তথা অবিদ্যাবিক্ষোভ দূর করার জন্য কায় বাক্ চিত্ত—এই এই তিনকে পাট বা সহজানন্দরূপ পীঠে যুক্ত করা হল (অন্য অর্থে বামগা দক্ষিণগা নাড়ীকে মধ্যগা নাড়ীতে সংযুক্ত করা হল)। এই অবস্থায় চিত্ত পরিশুদ্ধ হয়ে সহজানন্দে প্রবেশ করে। সহজানন্দে প্রবিষ্ট এই পরিশোধিত চিত্ত মত্ত গজেন্দ্রের সঙ্গে তুলনীয়। মত্ত অবস্থায় গজরাজ যেমন ঘোর গর্জন করে, সহজমগ্ন প্রভাস্বর চিত্তও তেমনি শূন্যতা শব্দের অনাহত ধ্বনি উৎপাদন করে। এই অনাহত ধ্বনি শুনে সংসারে মার বা দুষ্প্রবৃত্তিজনিত দুঃখের কারণস্বরূপ স্কন্ধ-ধাতু-আয়তনাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলসমূহ সমরসীভাব প্রাপ্ত হয়ে ভগ্ন বা ধ্বংস হয়। তখন চন্দ্রসূর্য দিবারাত্রিরূপ সমস্ত বিকল্প ধ্বংস করে চিত্তরূপ গজেন্দ্র বিরমানন্দ-মার্গে আরূঢ় হয়ে মহাসুখ-সরোবর-রূপ শূন্যতার দিকে নিরন্তর ধাবিত হয়। এই মহাসুখরূপ সর্বশূন্যই পরম সত্য, পরম বিজ্ঞান, এবং এই সর্বশূন্য অস্তি-নাস্তি পাপ-পুণ্য সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে, তাই সর্বশূন্যে অধিষ্ঠিত হলে চিত্ত মত্ত গজেন্দ্রর মত পাপপুণ্যরূপ শৃঙ্খল ছিন্ন করে এবং অবিদ্যারূপ বন্ধনস্তম্ভ মর্দন করে নির্বাণরূপ সরোবরে প্রবেশ করে। নির্বাণসরোবরে মহারসপানে মত্ত চিত্ত ত্রিভুবনের ভাব ও অভাব—গ্রাহ্য ও গ্রাহকাদি সমস্ত বিকল্প উপেক্ষা করে এবং রূপবেদনাদি পঞ্চস্কন্ধাত্মক পঞ্চবিষয়ের নায়ক হয়ে উক্ত বিষয়সমূহের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। এই অবস্থায় মহাসুখ ছাড়া অন্য কিছুর অনুভব ঘটে না। প্রখর সূর্য-কিরণে উত্তাপিত গজরাজ যেমন জলাশয়ে আশ্রয় নেয়, চর্যাকার মহীধরের মহসুখ-রাগরূপ অনলে সন্তাপিত চিত্তও তেমনি গগনরূপ গঙ্গা বা মহাসুখচক্ররূপ সরোবরে প্রবেশ করেছে। এই নির্বিকল্প অবস্থায় তাঁর সমস্ত অনুভূতি লুপ্ত হয়েছে, তাই সেই মহাসুখে নিমগ্ন থেকেও তিনি তার স্বরূপ অনুভব করতে পারছেন না।

১৭
[পুথিপৃষ্ঠা ২৬।খ]
॥ রাগ পটমঞ্জরী—বীণাপাদানাম্ ॥

[১]সুজ[১] লাউ সসি লাগেলি তান্তী।
[২]অণাহা[২] দাণ্ডী [৩]বাকি[৩] [৪]কিঅ[৪] অবধূতী ॥ ধ্রু ॥
বাজই [৫]অলো[৫] সহি হেরুঅ বীণা।
[৬]সুণ[৬] তান্তিধনি বিলসই রুণা ॥ ধ্রু ॥
আলিকালি বেণি সারি [৭]মুণিআ[৭]।
গঅবর সমরস সান্ধি গুণিআ ॥ ধ্রু ॥
জবে করহা করহকলে [৮]পিচিউ[৮]।[৯]
বত্তিস তান্তিধনি [১০]সএল[১০] [১১] ব্যাপিউ[১১] ॥ ধ্রু ॥
নাচন্তি [১২]বাজিল[১২] গান্তি দেবী।
বুদ্ধনাটক বিসমা হোই ॥ ধ্রু ॥

পাঠান্তর ॥

১—১ সূজ (শহী)। ২—২ অণহা (শাস্ত্রী, শহী, সেন) অনহা (বাগচী)।
৩—৩ চাকী (শহী, সেন) একি (বাগচী)।
৪—৪ কিঅত (পুথি, শাস্ত্রী, বাগচী, সেন), কিঅউ (শহী)।
৫—৫ আলো (শহী)। ৬—৬ সুন (শাস্ত্রী, বাগচী, সেন), সূন (শহী)।
৭—৭ সুনিআ (বাগচী) সুনেআ (শাস্ত্রী)।
৮—৮ চাপিউ (বাগচী, শাস্ত্রী), করহক লেপি চিউ (শাস্ত্রী)।
৯—৯ পুথিতে দাঁড়িচিহ্নটি উ-তে রূপান্তরিত হয়েছে। বোধ হয় প্রথমে লিপিকর 'পিচিউ'-র 'উ' না লিখেই পংক্তি-সমাপক দাঁড়ি দিয়েছিলেন, কিন্তু পরে ভ্রমসংশোধনের জন্য দাঁড়িকেই উ-তে পরিণত করেন। ফলে পুথিতে প্রত্যাশিত দাঁড়িটি নেই।
১০—১০ সঅল (শহী, বাগচী)। ১১—১১ বিআপিউ (শাস্ত্রী, বাগচী, শহী)।
১২—১২ রাজিল (তিব্বতী পাঠ)

পাঠবিচার ও শাব্দিক টীকা ॥ লাগেলি—লগ্ন > লগ্‌গ > লাগ + এল = লাগেল + ই (ঈ)—স্ত্রীপ্রত্যয়, স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ 'তান্তী'র বিশেষণ। তান্তী < তন্ত্রী। অণাহা < অনাহত। পুথিতে 'ণ'-এর পর আ-কার আছে ; তাছাড়া 'অনাহত' থেকে 'অণহা'র চেয়ে 'অণাহা' হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবলতর। কাজেই 'অণাহা' পাঠই গ্রহণযোগ্য। দাণ্ডী < দণ্ডিকা, অর্থ 'ডাঁট'। বাকি—বক্র > বক্ক > বাক + ই (স্ত্রী প্রত্যয়), স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ 'দাণ্ডী'র বিশেষণ—[দাণ্ডী বাকি = বাঁকা দণ্ড ; এখানে বীণার কাষ্ঠদণ্ডের শেষে যে বাঁকানো ককুভ থাকে, সেই ককুভবিশিষ্ট বাঁকা বীণাদণ্ডকে বোঝাচ্ছে]। পুথির 'বাকি' পাঠকে অর্থহীন মনে করে অনেকে টীকার 'বিষয়চক্রী' অনুসারে 'চাকি' পাঠ নিয়েছেন। কিন্তু তাতে অর্থের

স্বাচ্ছন্দ্য আসে না। কিঅ < কৃত। পুথির 'কিঅত' পাঠের অন্ত্য 'ত' সম্ভবত অনবধানপ্রসূত সংযোজন। ছন্দসৌষম্যের দিক থেকেও 'কিঅ' পাঠ 'কিঅত' পাঠের চেয়ে প্রশস্ততর। বাগচী টীকার 'একীকৃত্য' পদের আধারে 'বাকি কিঅত'-র বদলে যে 'একি কিঅত' পাঠকল্পনা করেছেন তা অর্থবহ হলেও ভাষাতত্ত্বসম্মত নয়, কারণ 'একীকৃত্য' (বা 'একীক্রিয়তে') পদ ধ্বনি-পরিবর্তনের ফলে 'এককিঅত' রূপ পায় না। বাজই < বাদ্যতে। হেরুঅবীণা < হেরুকবীণা ; হেরুক—*ভরুক=ভৈরব—এই ভীষণমূর্তি দেবতাই বজ্রযানীদের প্রাধান্য উপাস্য। বীণা—এই 'বীণা' শব্দটিকে অবলম্বন করেই টীকাকার বর্তমান চর্যাটির রচয়িতাকে 'বীণাপাদ' বলে নির্দেশ করেছেন, কিন্তু এই অনুমানের পশ্চাতে কোন নির্ভরযোগ্য যুক্তি বা তথ্য নেই, কেননা চর্যাটিতে অন্যান্য চর্যার মত কোনো ভণিতা নেই। বিলসই< বিলসতি। রুণা—এটি সম্ভবত ধ্বন্যাত্মক শব্দ—বীণার 'রুন-রুন' ধ্বনির আধারে কল্পিত। তিব্বতী অনুবাদক অবশ্য পদটি 'করুণ' (= sñin rjes) অর্থেই নিয়েছেন। (শব্দটি 'করুণা' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপও হতে পারে)। আলিকালি—মূল অর্থ 'অ-কারাদি স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণমালা,' পারিভাষিক অর্থ 'প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাস'। সারি < শারিকা। 'শারিকা' শব্দের অর্থ বীণা বাজাবার ছাড়ি। এটি দেখতে অনেকটা ধনুকের মত। মুণিআ < মুনিত। পুথিতে 'মুণেআ' লিখে এ-কারকে ই-কার করার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। অনেকে 'মু'-কে 'সু' মনে করে 'সুনিআ' পাঠ নিয়েছেন। কিন্তু ১৩ সংখ্যক গানের 'মুনিআ' পদের 'মু'-এর স্থলে এই পদের আদ্যক্ষরের সারূপ্য থেকে বোঝা যায় পদটি 'সুনিআ' নয়, 'মুনিআ'। তাছাড়া,অর্থের দিক থেকেও 'সুনিআ'-র চেয়ে 'মুনিআ'-ই সংগততর। তিব্বতী অনুবাদের Šes = Known মুণিআ পাঠের সমর্থক। করহা < করভক, কনিষ্ঠা থেকে মণিবন্ধ পর্যন্ত হাতের পার্শ্ববর্তী অংশ। তবে এখানে সম্ভবত ভিন্নতর অর্থের আভাস আছে। সঙ্গীতশাস্ত্রে যে ২৫ রকম নিন্দিত গায়কের বর্ণনা আছে 'করভ' তাদের অন্যতম। সঙ্গীতশাস্ত্রী শার্ঙ্গদেব বলেছেন, যে গায়ক গাইবার সময় (করভ বা উটের মত) কাঁধ উঁচু করে গায় তাকে বলে 'করভ'(দ্রষ্টব্য প্রকীর্ণকাধ্যায় ; সংগীত রত্নাকর)। কাজেই, করভ = গায়ক। করহকলে—করহকল + এ (করণবিভক্তি)। করহকল—করহ = হাতের অংশবিশেষ, কল = জোড় বা সন্ধি ; করহকলে = কনিষ্ঠা থেকে মণিবন্ধ পর্যন্ত হাতের জোড় (joint) দিয়ে। পিচিউ—√পিচ্চ + ক্ত = পিচ্চিত > পিচ্চিঅ > পিচ্চিউ (√পিচ্চ = জোরে চেপে ধরা, ধাতুপাঠ ৩২.৪০), তুলনীয় √ চিপা (বর্ণবিপর্যয়) ছোলঙ্গ চিপিআঁ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)। কেউ কেউ পিচিউ পদটিকে নিরর্থক মনে করে টীকার 'চাপিতং' পদের আধারে পাঠ সংশোধন করেছেন 'চাপিউ', কিন্তু এই পাঠশুদ্ধি অনাবশক, কারণ 'পিচিউ' নিরর্থক বা ব্যাকরণদুষ্ট নয়। ব্যাপিউ < ব্যাপিত। 'ব্যাপিত'-র 'ব্যা' অপরিবর্তিত থাকা একটু বিস্ময়কর, কারণ মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার স্তরেই এটির হয় 'বা' অথবা 'বিআ' হয়ে যাবার কথা। সেজন্য কেউ কেউ 'বিআপিউ' পাঠ কল্পনা করেছেন। তবে 'ব্যাপিউ'কে অর্ধতৎসম বলে ধরলে সমস্যা থাকে না। নাচন্তি < নৃত্যন্তি, গৌরবে বহুবচন। বাজিল—বজ্রধর। তিব্বতী অনুবাদক যে পুথি থেকে অনুবাদ করেছিলেন সম্ভবত তার 'ব'-কে র বলে

পড়ায় অনুবাদক 'বাজিল'-এর জায়গায় 'রাজিল' (rgyal po = king) পাঠ নিয়েছিলেন। গান্তি < গায়ন্তি। বিসমা < বিষম, অর্থ 'বিপরীত' (বুদ্ধনাটককে বিষম বা বিপরীত বলার কারণ, সেকালে নাট-গীতের অনুষ্ঠানে সাধারণত পুরুষেরা গাইত আর মেয়েরা নাচত, কিন্তু এক্ষেত্রে পুরুষ 'বাজিল' নাচছেন এবং স্ত্রী দেবতা নৈরাত্মা গান করছেন)।

ব্যাচ্যার্থ ॥ ১—২. সূর্য [হল] লাউ, চন্দ্র [তাতে] তন্ত্রী [হয়ে] লাগল। অবধূতীকে করা হল অনাহত বক্রদণ্ড। ৩—৪ ওলো সই, হেরুকবীণা বাজে। শূন্য তন্ত্রীর ধ্বনি করুণসুরে বিলসিত (= মুর্চ্ছিত) হচ্ছে। [টীকাকারের মতে এই দুই ছত্রের অর্থ : বীণাপাদ বীণাদ্বারা 'শ্রীহেরুক'—এই চারটি অক্ষর অনাহতভাবে বাজাচ্ছেন। শূন্যতাধ্বনি করুণায় বিলসিত বা ব্যাপ্ত হচ্ছে।] ৫—৬. আলি-কালিকে দুই শারিকা (= বীণাবাজাবার ছড়ি) মনে করা হল। গজবরের সমরস-সন্ধি (= সুরের সমতা-রক্ষক সন্ধি বা ঘাটসমূহ) গোনা হল। ৭—৮. যখন গায়ক করহকলে (= হাতের অংশবিশেষ) চাপ দিল, [তখন] বত্রিশ তন্ত্রীর ধ্বনি সকল [দিক] ব্যাপ্ত করল। ৯—১০, নাচেন বাজিল (=বজ্রধর), গান করেন দেবী। বুদ্ধনাটক হয় বিষম (=বিপরীত)।

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা ॥ আলোচ্য চর্যায় বীণাবাদন ও নৃত্যগীতের রূপকে সহজ সাধন তত্ত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে। বীণাযন্ত্রে লাউয়ের অংশবিশেষ, তন্ত্রী ও একটি দণ্ড থাকে। বর্তমান গানে সূর্য সেই লাউ, চন্দ্র সেই তন্ত্রী ও অবধূতী সেই দণ্ডরূপে কল্পিত হয়েছে। লাউয়ের অংশবিশেষ ও তন্ত্রীকে দণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করলে বীণা যেমন বাজাবার উপযুক্ত হয়, তেমনি সূর্যচন্দ্ররূপ দ্বৈতাভাসকে অবধূতীরূপ অদ্বয়জ্ঞানে মিলিত করলেই হেরুকবীণা প্রস্তুত হয় অর্থাৎ সহজানন্দ লাভের উপায় হয়। চর্যাকার বীণাপাদ এই হেরুকবীণায় 'শ্রীহেরুক' এই চারটি অক্ষর বাজাচ্ছেন, তন্ত্রীর শূন্যতাধ্বনি করুণায় মূর্চ্ছিত হচ্ছে অর্থাৎ বীণাপাদের চিত্ত অবধূতীমার্গে আরূঢ় হওয়ায় চন্দ্রসূর্যরূপ অবিদ্যাবিকল্প নিরাকৃত হয়েছে এবং শূন্যতার সঙ্গে করুণা অভেদে মিলিত হয়েছে এবং চিত্ত প্রকৃতিপ্রভাস্বর সর্বশূন্য রূপ লাভ করেছে। এরপর বীণাপাদ কিভাবে এই সর্বশূন্যকে লাভ করলেন বীণাবাদন প্রক্রিয়ার রূপকে তিনি তা ব্যাখ্যা করছেন। বীণা বাজাবার সময় ছড় দিয়ে বীণার সন্ধি বা ঘাটগুলি গুনে সুরের সমতা রক্ষা করা হয়, তারপর হাত দিয়ে চেপে যখন বাজানো হয় তখন তন্ত্রীসমূহের মধুর ধ্বনি চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয়। আলোচ্য গানে আলি-কালিরূপ আভাসদ্বয়ই বীণার ছড় এবং অবিদ্যাচিত্তের দোষসমূহই বীণার সন্ধিরূপে কল্পিত হয়েছে। এই বর্ণনা অনুযায়ী, প্রথমে বাদনদণ্ড বা আভাসদ্বয়কে আয়ত্ত করে পরে প্রকৃতিদোষসমূহকে দূর করে চিত্তকে গ্রাহ্যত্ব-গ্রাহকত্বরহিত পরিশুদ্ধ সামরস্যে অধিষ্ঠান করা হয়েছে। এই অবস্থায় চিত্তের তাপ (=দোষসমূহ) প্রভাস্বরশূন্যতার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে শেষে দূরীভূত হওয়ায় সমস্তই শূন্যতাধ্বনিতে পরিব্যাপ্ত হয়েছে অর্থাৎ সাধকচিত্ত চতুর্থশূন্যে অধিষ্ঠিত হয়েছে। তাই সহজানন্দে আপ্লুত হয়ে বজ্রধর বীণাপাদ নৃত্য করছেন এবং তাঁর সহচরী নৈরাত্মাদেবী যেন গান করছেন। এই ভাবে বন্ধুত্বলাভ করে যিনি সহজানন্দে নৃত্য করেন তিনি বিশেষ সমতা লাভ করেন বা নির্বাণ প্রাপ্ত হন।

১৮
[পুথিপৃষ্ঠা ২৮ ।ক]

॥ রাগ গউড়া—কৃষ্ণবজ্রপাদানাম্ ॥

তিণি ভুঅণ মই বাহিঅ হেলেঁ।
হাঁউ সুতেলি মহাসুহ [১]লীড়েঁ[১] ॥ধু ॥
কইসণি হালো ডোম্বী তোহোরি ভাভরিআলী।
অন্তে কুলিণজন মাঝেঁ কাবালী ॥ ধু ॥
তঁই লো ডোম্বী সঅল [২]বি টলিউ[২]।
[৩]কাজ ণ কারণ[৩] সসহর টালিউ ॥ ধু ॥
[৪]কেহো[৪] কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই।
বিদুজণলোঅ তোরেঁ কণ্ঠ[৫] ণ মেলঈ[৫] ॥ ধু ॥
[৬]কাহ্নে[৬] গাইতু কামচণ্ডালী।
[৭]ডোংবিত[৭] আগলি ণাহি ছিণালী ॥ ধু ॥

পাঠান্তর ॥

১—১ লীলেঁ (টীকা, বাগচী, শহী)। ২—২ বি টালিউ (বাগচী), বিটালিউ (শহী)।
৩—৩ কাজণ কারণ (শাস্ত্রী), কাজ ণ কার ণ (বাগচী)। ৪—৪ কেহে (পুথি)।
৫—৫ ন মেলই (বাগচী, শহী)। ৬—৬ কাহ্ন (বাগচী)।
৭—৭ ডোম্বি ত (শাস্ত্রী), ডোম্বীত (বাগচী), ডোম্বি তো (শহী)।

পাঠবিচার ও শাব্দিক টীকা ॥ মই—ময়া > মএ > মই। বাহিঅ—বাহ্যতে > বাহিঅই > বাহিঅ। টীকা অনুসারে ব্যুৎপত্তি : বাধিত > বাহিঅ। হেলেঁ—হেলা > হেল + এঁ (এন জাত)। হাঁউ—অহকং (=অহং) > হকং > হউঁ > হাঁউ। সুতেলি—সুপ্ত > সুত্ত > সুত (=সূত) + ইল = সুতেল + ই (উত্তমপুরুষ বিভক্তি)। লীড়েঁ—*লীত (=লীন) > লীড (মূর্ধন্যীভবন) > লীড় + এঁ (করণ-অধিকরণ বিভক্তি।) টীকায় 'লীলে' আছে, এবং তিব্বতী অনুবাদের 'rol' (= লীলা বা ক্রীড়া) থেকেও 'লীলেঁ' পাঠ সমর্থিত হয়। তথাপি পুথির 'লীড়ে' পাঠকে বর্জনীয় বলে মনে হয় না, কারণ context -এরসঙ্গে এর সংগতি সুনিবিড়। context-এ আছে 'সুতেলি' = ঘুমিয়ে আছি। ঘুমোবার প্রসঙ্গে লীলা অর্থাৎ চাঞ্চল্যের বদলে লীনতা অর্থাৎ নিশ্চলতার প্রসঙ্গই বেশি করে খাটে। মনে হয় গানের এই অংশের 'লীড়ে' ও 'লীলেঁ'—এই দুইরকম পাঠই প্রচলিত ছিল। কইসণি—*কদশন > কইসণ + ই (স্ত্রী প্রত্যয়)—স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ 'ভাভরিআলী'র বিশেষণ। তোহোরি—তুভ্যং > তুব্ভং > তুহুঁ, তোহ-(তির্যক কারকের প্রাতিপদিক) + র (সম্বন্ধ বিভক্তি) = তোহর + ই (স্ত্রীপ্রত্যয়—স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ ভাভরিআলীর সঙ্গে সম্বন্ধ)। ভাভরিআলী—শব্দটি 'বর্বরিক' শব্দের ব্যাপক অর্থসংক্রম থেকে উৎপন্ন। উণাদি কোষে 'বর্বরিক' শব্দের অর্থ 'কুটিলকুন্তল' (তুলনীয় 'বাবরি')। কুটিল কুন্তলবিশিষ্ট ব্যক্তি চতুর

হয়—এই লৌকিক বিশ্বাস থেকে 'বাবরিআল' (< বর্বরিকপাল) শব্দের অর্থ দাঁড়ায় 'চতুরাল', 'বাবরিআলের ভাব' এই অর্থে ভাববাচক-'ই' প্রত্যয়। সুতরাং ভাভরিআলী-র সম্ভাব্য ব্যুৎপত্তি—বর্বরিক + পাল > বাবরিআল + ই (-ঈ) = বাবরিআলী (-লী) > ভাভরিআলী (মহাপ্রাণতা) অর্থ 'চতুরালি' বা 'নাগরালি'। কুলিন—দ্ব্যর্থশব্দ (১) কুলীন অর্থাৎ অভিজাত (২) কু (=শরীর)-লীন। তঁই—*ত্বয়েন (=ত্বয়া) > তএঁ > তইঁ > তঁই। বি < অপি। টলিউ < টলিত। পুথিতে স্পষ্টাক্ষরে লেখা 'টলিউ' যখন অর্থহীন বা ব্যাকরণদুষ্ট নয় তখন পাঠান্তর নিষ্প্রয়োজন। বিরুআ < বিরূপ অর্থ 'মন্দ'। বিদুজন < বিদ্বজ্জন। লোঅ < লোক। এটি বহুবচনসূচক পদ। মেলঈ—অপভ্রংশ ধাতু মেল্ল > মেলঈ + (ই) = মেলঈ (৬ষ্ঠ চর্যার শাব্দিক টীকা দ্রষ্টব্য)। কাহ্নে < কৃষ্ণেণ। ব্যাকরণের দিক থেকে 'কাহ্ন'-র চেয়ে 'কাহ্নে' পাঠ প্রশস্ততর। কারণ বাক্যটি এখানে কর্মবাচ্যে গঠিত এবং 'কাহ্নে' অনুক্ত কর্তৃপদ। গাই—গাথিত > গাহিঅ > গাহি > গাই। তু—নিশ্চয়ার্থক অব্যয়। কামচণ্ডালী—কর্মচণ্ডালিকা, সেকালে প্রচলিত একপ্রকার আদিরসাত্মক লোকসঙ্গীত (তুলনীয় = 'ডোম্বচণ্ডালী'—'কিসক পাতহ রাধা ডোম্বচণ্ডালী'—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধাবিরহের অন্তর্গত একটি পরিত্যক্ত পাঠ। অশ্লীল গান, ছাড়া ও কথাকাটাকাটি অর্থে 'ডোমচাঁড়ালী' শব্দ পশ্চিমবঙ্গের অঞ্চল বিশেষে এখনো প্রচলিত আছে। ডোম্বচণ্ডালী ও কর্মচণ্ডালীর মধ্যে কোনপ্রকার সম্পর্ক থাকা অসম্ভব নয়। দ্র. সুকুমার সেন-বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড পূর্বার্ধ পৃ. ১৩৭)। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, তিব্বতী অনুবাদের মাধ্যমে আচার্য বিরূপের নামে যেসব রচনার সন্ধান পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে একটির নাম 'কর্মচণ্ডালিকা দোহাকোষগীতি নাম' এবং তিব্বতী ঐতিহ্য অনুসারে বিরুআ (বিরূপ) আচার্য কাহ্নেরই নামান্তর। হয়ত আলোচ্য চর্যাটি বিরূপকাহ্নরচিত পূর্বোক্ত 'কর্মচণ্ডালিকা' নামধেয় 'দোহাকোষগীতি'র অন্তর্গত কামচণ্ডালী জাতীয় গানের নমুনাবিশেষ। ডোংবিত—ডোংবি (=ডোম্বি) + ত। এর পর একটি অনুসর্গ আছে—'আগলি'। এই অনুসর্গের জন্য তার আগে বসা মূল শব্দের সঙ্গে বিভক্তি থাকা প্রয়োজন। সেদিক থেকে 'ডোম্বিত' পাঠ শুদ্ধ। পাঠান্তর নিষ্প্রয়োজন।

বাচ্যার্থ ॥ ১—২. তিন ভুবন আমার দ্বারা হেলায় বাহিত হল। আমি শুয়ে আছি মহাসুখলীনতায়। ৩—৪. ওলো ডোমনী, কিরকম তোর চতুরালি। একপাশে কুলীনজন, মাঝখানে কাপালিক। ৫—৬. ডোমনী লো, তোর দ্বারা সব [কিছু] ই নষ্ট হল। কাজ নেই, কারণও নেই, শশধর টলানো হল। ৭—৮. কেউ কেউ তোকে মন্দ বলে। [অথচ] বিদ্বজ্জনেরা তোকে কণ্ঠ থেকে ছাড়ে না। ৯—১০. কাহ্নের দ্বারা-ই [এই] কামচাঁড়ালী [গান] গাওয়া হল। ডোমনীর বাড়া ছিনাল নেই।

গূঢ়ার্থ-ব্যাখ্যা ॥ আলোচ্য চর্যায় এক দ্বিচারিণী ডোমরমণীর রহস্যময় আচরণের রূপকে পরম সত্যের স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। সত্যের দুই রূপ—সাংবৃতিক ও পারমার্থিক। এদের মধ্যে পারমার্থিক সত্যই সাধকের অন্বিষ্ট, সাধারণ মানুষ সাংবৃতিক সত্য নিয়ে ব্যাপৃত থাকে। সত্যের এই দুইরূপ সহজপন্থী বৌদ্ধ সাধকের পরিভাষায় অপরিশুদ্ধাবধূতী ও পরিশুদ্ধাবধূতী, নৈরাত্ম্যরূপে বর্ণিত। চর্যাকার এই বিচিত্ররূপা অবধূতীকে বহুচারিণী

ডোমরমণীর রূপকে বর্ণনা করেছেন। চর্যাকার কাহ্ন সহজসাধনায় সিদ্ধিলাভ করে কায়বাক-চিত্তরূপ তিনভুবন অর্থাৎ যাবতীয় ভববিকল্প অনায়াসে অতিক্রম করেছেন এবং মহাসুখলীনতায় নিযুক্ত রয়েছেন। সিদ্ধিলাভের পর তাঁর কাছে চিত্তের স্বরূপ যথার্থভাবে ধরা পড়েছে। তিনি বুঝতে পেরেছেন যে অসতী ডোমরমণীর মত চিত্তের ব্যবহারও বিচিত্র। চিত্তে যখন অবিদ্যার বিক্ষোভ থাকে তখন তা অপরিশুদ্ধাবধূতীরূপে বহির্জগতে রূপাদি বিষয়সমূহ নিয়ে ক্রীড়া করে। আবার চিত্তের প্রকৃতিদোষ দূরীভূত হলে তা পরিশুদ্ধাবধূতীরূপে কাপালিকদের মধ্যে বা অন্তরে বাস করে। ভ্রষ্ট স্ত্রীলোকের মত বদ্ধ ও মুক্ত উভয়প্রকার ব্যক্তির সঙ্গেই তার লীলা। এই অপরিশুদ্ধাবধূতী তথা অবিদ্যাক্ষুব্ধ চিত্তের প্রভাবেই দেবাসুরমনুষ্যাদি সকলেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়, এমন কি অন্যসম্প্রদায়ের যোগীরাও জগৎকে কার্যকারণের ফল বিবেচনা করে ভ্রান্তজ্ঞান-বশত বিনাশপ্রাপ্ত হয়। যারা অবিদ্যাচিত্তের প্রভাবে জগৎকে সত্য জ্ঞান করে দুঃখে পতিত হয় তারা চিত্তের প্রকৃত প্রভাবস্বরূপ না জানায় সহজানন্দ সম্পর্কে নানা কটূক্তি বা সংশয়োক্তি উচ্চারণ করে, কিন্তু যিনি সহজতত্ত্ব অবগত আছেন তিনি কণ্ঠস্থিত সম্ভোগচক্রে পরিশুদ্ধাবধূতীকে রক্ষা করে বিরমানন্দ অনুভব করেন। অবধূতী-ডোম্বীর এই দ্বিবিধ-রূপ লক্ষ্য করে কাহ্ন বলছেন যে, এই অবধূতীই সকল সাধন-কর্মের উপায় স্বরূপ, কিন্তু এর চতুরালির তুলনা নেই, কেন না ভ্রষ্টা নারী যেমন বিভিন্নরূপে পুরুষের সঙ্গে লীলা করে এই অবধূতীও তেমনি সত্ত্বভেদ প্রাপ্ত হয়ে বিভিন্নরূপে বিভিন্ন কাজ করে।

১৯

[পুথিপৃষ্ঠা ২৯। ক—খ]

॥ রাগ ভৈরবী—কৃষ্ণপাদানাম্ ॥

ভব[১]নির্ব্বাণে[২] পড়হমাদলা।
মণপবণ বেণি করণ্ড[২] কসালা[২] ॥ ধ্রু ॥
জঅ জঅ দুংদুহি[৩] সাদ[৩] [৪]উছলিআঁ[৪]।
কাহ্ন ডোম্বি বিবাহে[৫] চলিআ[৫] ॥ ধ্রু ॥
ডোম্বি বিবাহিআ অহারিউ জাম।
জউতুকে কিঅ[৬] আণুতু[৬] ধাম ॥ ধ্রু ॥
[৭]অহিণিসি[৭] সুরঅ পসংগে জাঅ
জোইণিজালে[৮]রএণি[৮] পোহাঅ ॥ ধ্রু ॥
ডোম্বীএর সঙ্গে জো জোই রত্তো ॥
[৯]খণহ[৯]ণ[১০]ছাড়অ[১০] সহজ উন্মত্তো ॥ ধ্রু ॥

পাঠান্তর ॥

১—১ নির্ব্বাণে (শহী, সেন)। ২—২ কশালা (শাস্ত্রী, শহী)।
৩—৩ পুথিতে 'দ'-এর নীচে কাকপদ দেখা যায়।
৪—৪ উছলিলা (বাগচী) ৫—৫ চলিলা (সেন, বাগচী)
৬—৬ পুথিতে 'আনুণুতু' লিখে 'নু' তে বর্জনচিহ্ন দেওয়া আছে।
৭—৭ অহণিসি (টীকা, বাগচী : শহী) ৮—৮ রঅণি (বাগচী, শহী)
৯—৯ খণই (বাগচী)। ১০—১০ ছাড়ই (শহী)।

পাঠবিচার ও শাব্দিক টীকা। নির্ব্বাণে—পুথিতে স্পষ্টই 'নির্ব্বাণে' লেখা আছে, সুতরাং পাঠান্তর নিষ্প্রয়োজন। পড়হ < পটহ। করঙ—বাদ্যবিশেষ (সম্ভবত ঢোল)। কসালা—কাংস্য তালা > কংসালা > কসালা, কাঁসি বা করতাল। সাদ < শব্দ, পুথিতে 'দ'-এর নীচে একটি কাকপদ দেখা যায়। তা লিপিভ্রম কিনা বিবেচ্য। উচ্ছলিআঁ—উচ্ছলিত > উচ্ছলিঅ > উছলিআ > উছলিআঁ (স্বতোনাসিক্যীভবন)। পুথির পাঠ অর্থহীন বা ব্যাকরণভ্রষ্ট নয়, কাজেই পাঠ-সংশোধন নিষ্প্রয়োজন। চলিআ < চলিত। পুথিতে 'আ' হরফে কালি বেশি পড়ায় সেটিকে 'ল' বলে ভ্রম হয়, তবে ভালো করে দেখলে ভ্রম নিরসন হয়। অহারিউ—আহারিত > আহারিঅ > অ(া) হারিউ। জাম < জন্ম। আণুতু< অনুত্তর। ধাম < ধর্ম। অহিণিশি—অহর্নিশ > অহন্নিস > অহণিস > অহিণিসি (স্বরসংগতি)। টীকা-র 'অহণিসি' পাঠ থেকে মনে হয় 'অহণিসি' পাঠও প্রচলিত ছিল। রএনি—রজনী > রঅণি > রএণি (স্বরসংগতি)। পাঠান্তর নিষ্প্রয়োজন। পোহাঅ < প্রভাত। রত্তো < রক্ত, অর্থ 'অনুরক্ত'। খনহ < ক্ষণস্য।

বাচ্যার্থ ॥ ১—২. ভব [ও] নির্বাণ [যেন] ঢাক (=পটহ) [ও] মাদল। মন [ও] পবন [যেন] দুটি কাড়া (=ঢোল) [ও] কাঁসি। ৩—৪. দুন্দুভিতে জয় জয় সাড়া ছড়িয়ে পড়ল। কাহ্ন ডোমনীকে বিয়ে করতে চলল। ৫—৬. ডোমনীকে বিয়ে করে জাত গেল (=খাওয়া হল)। অনুত্তর (=শ্রেষ্ঠ) ধর্মকে যৌতুক করা হল (=অনুত্তর ধর্ম যৌতুক রূপে পাওয়া গেল)। ৭—৮. দিন রাত্রি কাটে সুরত প্রসঙ্গে। যোগিনীজালে রজনী পোহায়। ৯—১০. ডোমনীর প্রতি যে যোগী অনুরক্ত হয় [সেই] সহজ-উন্মত্ত [তাকে] ক্ষণেকের জন্যও ছাড়ে না।

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা ॥ বর্তমান চর্যায় বিবাহ ও বরযাত্রার বাদ্যভাণ্ডারের রূপকে পরমার্থতত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সাধক কাহ্ন এখানে বর এবং অপরিশুদ্ধাবধূতী বা অবিদ্যারূপিণী ডোম্বী বধূ। অবিদ্যাবধূকে বিবাহ করলে অর্থাৎ এ অবিদ্যার প্রবাহ ভঙ্গ করলেই পুনর্জন্মহীন নির্বাণলাভ হয়—বর্তমান চর্যায় এই তত্ত্বই বর্ণিত হয়েছে। চর্যাকার বলেছেন যে, তিনি ভবনির্বাণকে পটহ-মাদলের মত বিকল্পাত্মক বা পরস্পর-সম্পৃক্ত জ্ঞান করেছেন এবং মন-পবন এই দুইকে সংহত করায় তাঁর দেহে শূন্যতা-করুণার অভেদ মিলন ঘটেছে। এই অবস্থায় কাহ্ন অবিদ্যারূপিণী ডোম্বীকে বিবাহ করেছেন অর্থাৎ চিত্তে অবিদ্যার প্রবাহ নষ্ট করেছেন, ফলে অনাহত দুন্দুভিনিনাদ বা শূন্যতাশব্দ উত্থিত হচ্ছে। অবিদ্যারূপিণী ডোম্বীকে বিবাহ করলে অর্থাৎ অবিদ্যার বিক্ষোভ দূর করলে নির্বাণ লাভ

হয় এবং পুনর্জন্ম ঘটে না। তখন যৌতুক বা পরম প্রাপ্তিহিসাবে অনুত্তর ধর্ম বা নির্বাণ লাভ করা যায়। এই সময় নৈরাত্মা যোগিনী পরিশুদ্ধাবধূতীর সাহচর্যে কাল অতিবাহিত হয় এবং পরিশুদ্ধচিত্তে অবিদ্যার অন্ধকার দূর হয়ে প্রকৃতিপ্রভাস্বর জ্যোতি উদ্ভাসিত হয়। এই শুদ্ধাবধূতীরূপিণী ডোমনীকে যে যোগী একবার লাভ করেন তিনি কখনো তাকে ত্যাগ করেন না অর্থাৎ তিনি নিত্য সহজানন্দে মগ্ন হন।

২০

[পুথিপৃষ্ঠা ৩০। খ]

॥ রাগ পটমঞ্জরী—কুক্কুরীপাদানাম্ ॥

[১]হাঁউ[১] নিরাসী খমণ[২] ভতারি[২]।
মোহোর বিগোআ কহণ ন জাই ॥ ধু ॥
[৩]ফেটলিউ[৩] গো[৪] মাএ[৪] অন্তউড়ি চাহি।
জা এথু[৫] বাহাম[৫] সো এথু নাহি ॥ ধু ॥
[৬]পহিল[৬] বিআণ মোর[৭] বাসনয়ূড়া[৭]।
নাড়ি বিআরন্তে সেব[৮] বায়ূড়া[৮] ॥ ধু ॥
[৯]জা ণ জৌবণ[৯] মোর ভইলেসি পূরা।
মূল[১০] ম খলি[১০] বাপ সংঘারা ॥ ধু ॥
ভণথি[১১] কুক্কুরিপা এ [১১] ভব থিরা।
জো এথু[১২] বুঝএ[১২] সো এথু বীরা ॥ ধু ॥

পাঠান্তর ॥

১—১ হউঁ (শহী)। ২—২ ভতারী (শহী), ভতারে (শাস্ত্রী, বাগচী)।
৩—৩ ফিটলেসু (টীকা) ফিটলেসি (বাগচী), ফিটিলিউ (শহী)।
৪—৪ মাই (শহী)। ৫—৫ চাহাম (বাগচী), চাহম (শহী)।
৬—৬ পহিলে (টীকা, শহী)। ৭—৭ বাসনপুড় (শাস্ত্রী), বাসনপুড়া (বাগচী, শহী)।
৮—৮ বাপুড়া (শাস্ত্রী)। ৯—৯ নবযৌবণ (টীকা), জান (অ) জৌবন (বাগচী)।
১০—১০ মাঅ নিখলি (শহী), নিখণি (বাগচী), মূলন খলি (রাহুল)।
১১—১১ কুক্কুরীপাএ (শহী)। ১২—১২ বুঝএঁ (শাস্ত্রী), বুঝই (বাগচী, শহী)।

পাঠবিচার ও শাব্দিক টীকা ॥ হাঁউ—অহকং > হকং > হউঁ > হাঁউ। পুথির পাঠ ব্যাকরণভ্রষ্ট নয়, টীকাতেও 'হাঁউ' পাঠ আছে : কাজেই পাঠান্তর নিষ্প্রয়োজন। নিরাসী < নিরাশীঃ, অর্থ আসক্তিহীন [তিব্বতী অনুবাদে আশিস্-এর অর্থ কাম, তৃষ্ণা, আসক্তি] তু 'নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ'—গীতা ৩।৩০।

ভতারি< ভর্তৃক। পুথিতে র-এর ই-কারই আছে, তবে মাথার উপরকার চৈতনটি

লেখা নেই বলে অনেকে এটিকে এ-কার মনে করেছেন, কিন্তু এ-কারের সঙ্গে এর পার্থক্য স্পষ্ট। টীকার 'ধমণেতি সর্ব্বশূন্যং মনঃ স্বামী' অনুসারে 'খমণসাঈ' পাঠান্তর কল্পিত হয়। এতে অন্ত্যানুপ্রাসও বজায় থাকে। টীকাকার হয়ত এই রকম পাঠ পেয়েছিলেন। মোহোর—মহ্যং > মোহ-(তির্যক্‌কারকেরপ্রাতিপদিক) + র (সম্বন্ধবিভক্তি)। বিগোআ—বিকোপ > বিগোব > বিগোআ = অনুভব। তিব্বতী অনুবাদের ñams-myoń এই অর্থের ইঙ্গিত দেয়। অনুভববরূপ 'তুরীয়ানন্দ'। ফেটলিউ—স্ফেটিত > ফেটিঅ + ইল > ফেটল (= ফেটিল) + ইউ (-ক্ত জাত) = ফেটলিউ, অর্থ '(গর্ভ) মোচন হল' ; পাঠান্তর 'ফিটলেসু' (টীকা)—ফিটল (= ফেটিল) + এসু (উত্তম পুরুষ বিভক্তি) = ফিটলেসু, অর্থ (গর্ভভার-) মুক্ত হলাম'। অন্তউড়ি < অন্তঃকুটী, অর্থ 'আঁতুড় ঘর'। চাহি —* চক্ষিত > চাহিঅ > চাহি। বাহাম < বাহয়ামি। অর্থ '(গর্ভভার) বহন করি'। টীকার 'পশ্যামি' পদ দেখে কেউ কেউ 'চাহাম' বা 'চাহম' পাঠ নির্দেশ করেছেন। কিন্তু পুথিতে স্পষ্ট 'বাহাম' আছে। বিআণ < বিতান (বেদনা ?) অর্থ 'প্রসব'। বাসনয়ূড়া < বাসনপুট, অর্থ 'অনেক বাসনার বিষয়'। শাস্ত্রী 'য়ূ'-কে 'পূ' ধরেছেন, বাগচী ও শহীদুল্লাহও শাস্ত্রীর অনুসরণ করেছেন। কিন্তু পুথির ঐ লাইনেরই একেবারে শেষে 'ভইলেসি পূরা' বাক্যাংশে যে 'পূ' হরফ আছে, তার সঙ্গে আলোচ্য 'য়ূ'-র ছাঁদ স্পষ্টত-ই আলাদা ; কাজেই এটিকে 'পূ' বলে মনে করার কোন কারণ নেই। এটি আসলে 'য়ূ'। সম্ভবত 'ড়া'-র আ-কার দেবার পর পঙ্‌ক্তি-সমাপক একক দাঁড়ি দিতে লিপিকর ভুলে গিয়েছেন। বিআরন্তে—বিচার (বিদার ?) > বিআর + অন্তে (শতৃজাত অসমাপিকা), অর্থ 'বিচার করতে করতে' (বি-দৃ ধাতু ধরলে— 'কাটতে কাটতে')। বায়ূড়া— বায়ুবৃত্তক > বাউউট্টঅ > বায়ুড়া, বায়ূড়া। অর্থ 'বায়ুবৎ অদৃশ্য হল, হাওয়া হল'। শাস্ত্রী এখানেও 'য়ূ' -কে 'পূ' পড়েছেন, কিন্তু পূর্বোক্ত কারণে এখানেও 'য়ূ'-কে 'পূ' বলে মনে করা যায় না। জা < যাবৎ। ণ < নব। টীকায় 'জানজৌবন'-এর বদলে 'নবযৌবণ' পাঠ আছে, তদনুসারে পাঠান্তর 'জা ন (অ) জৌবণ। ভইলেসি —* ভবিত (= ভূত) > ভইঅ + ইল > ভইল + এসি (প্রথম পুরুষ বিভক্তি)। ম < ময়া। খলি < স্খলিতঃ। পুথিতে 'ন' নেই, 'ম' আছে ; কাজেই শুদ্ধ পাঠ 'ম খলি' = আমার দ্বারা স্খলিত হল। টীকা ও তিব্বতী অনুবাদে এই পাঠের সমর্থন আছে। তিব্বতীতে ltuń ba = fallen down (বাগচী) = পতিত হল, স্খলিত হল। টীকা অনুসরণ করলে—[মূলং সংবৃতিবোধিচিত্তং =] মূল + [ময়া নৈরাত্মভাবকেন কুক্কুরিপাদেন' =] ম + [নিকৃত্তিঃ কৃতা =] খলি = মূল ম খলি। এই পাঠ টীকার সঙ্গে সংগতিশীল। কাজেই পাঠান্তর নিষ্প্রয়োজন। বাপ < বপ্র, অর্থ 'চাষের জমি'। সংঘারা < সংহার।

বাচ্যার্থ ॥ ১—২. আমি নিরাশী, [আমার] ভর্তা ক্ষপণক। আমার অনুদ্ভব বর্ণনা করা যায় না। ৩—৪. মা গো, আঁতুড় দেখে [আমি] প্রসব করলাম, যাকে এখানে বিয়োই তা এখানে নেই। ৫—৬. প্রথম প্রসব আমার— বাসনার পুঁটুলি। নাড়ী টিপতে টিপতে সেও [হল] হাওয়া। ৭—৮. যখন আমার নবযৌবন পূর্ণ হল [তখন] আমার দ্বারা মূল স্খলিত হল, বপনক্ষেত্র নষ্ট হল। ৯—১০. কুক্কুরীপাদ বলেন, এ সংসার স্থির। যে এখানে [এই কথাটি] বোঝে সে এখানে বীর।

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা ॥ চর্যাকার কুক্কুরীপাদ নিজে সাধনার দ্বারা নৈরাত্মাযোগিনীর সাহচর্য লাভ করেছেন, তাঁর মধ্যে নৈরাত্মাযোগিনীর অধিষ্ঠান হয়েছে এবং তিনি ও নৈরাত্মা একীভূত হয়েছেন। তাই নৈরাত্মাযোগিনীর নিজে উক্তি হিসাবেই কবি নিজের আধ্যাত্মিক উপলব্ধি প্রকাশ করছেন। তিনি নিরাশী অর্থাৎ সর্বপ্রকার বিষয়লিপ্সাহীন। খ-মন অর্থাৎ সর্ব শূন্যরূপ অধিষ্ঠিত পরিশুদ্ধ মনই তাঁর স্বামী-স্বরূপ। এই প্রকৃতিপ্রভাস্বর চিত্তের সঙ্গলাভ করে "তিনি যে আনন্দ পান তা কথায় প্রকাশ করা যায় না, কেন না এই তুরীয়ানন্দ 'বাকপথাতীত'। এই অবস্থায় মহাসুখচক্ররূপ অন্তঃপুরের দিকে তাকালে অর্থাৎ মহাসুখ সম্পর্কে অনুভূতি জাগলে বিষয়মোহ থাকে না। তিনি কিভাবে এই তুরীয়ানন্দ লাভ করলেন তা ব্যাখ্যা করে বলছেন যে, প্রথম যখন তাঁর জ্ঞানোদয় হয়েছিল তখন বহুবিধ বাসনায় পূর্ণ এই দেহটিকেই পরম কাম্য বলে মনে করেছিলেন, কিন্তু সদ্‌গুরুবচনে উপদিষ্ট হয়ে তিনি যখন এই দেহের বত্রিশ নাড়ীর বিচার করলেন তখন বুঝতে পারলেন যে বাসনা অবিদ্যাজাত ভ্রান্তি-বিশেষ এবং বাসনাপূর্ণ দেহও মূল্যহীন। অর্থাৎ প্রথম যে ভ্রান্ত ধারণা প্রসূত হয়েছিল সদ্‌গুরুর উপদেশে তা দূরীভূত হল। তারপর সহজজ্ঞান লাভ করে তিনি নবযৌবনসুলভ সুন্দর বজ্রশরীর ধারণ করায় মণিমূলস্থিত অশুদ্ধ সংবৃতিবোধিচিত্তের পতন ঘটিয়েছেন এবং সংবৃতিবোধিচিত্তের বিকাশক্ষেত্র বিষয়চেতনাকে সংহার করলেন। বাসনার বিক্ষোভেই মনে হয়, এ জগতে উৎপত্তি ও বিনাশের গতিচাঞ্চল্য বিদ্যমান; কিন্তু বাসনার মূল উচ্ছেদ করে যিনি সহজানন্দের তত্ত্ব উপলব্ধি করেন তিনি সংসারে আসাযাওয়া বা কোন চাঞ্চল্যই অনুভব করেন না। বিষয়রূপ শত্রু দমন করে তিনি বীরপদবী লাভ করেন।

২১

[পুথিপৃষ্ঠা ৩১। খ—৩২।ক]

॥রাগবরাড়ী— ভুসুকুপাদানাম্॥

[১]নিসি[১] [২]অন্ধারী[২] [৩]মুসার চারা[৩]।
অমিঅ [৪]ভখঅ[৪] মুসা [৫]করঅ[৫] [৬]আহারা[৬] ॥ ধ্রু ॥
মার রে জোইআ মুসা পবণা।
জেঁণ [৭]তুটঅ[৭] অবণাগবণা ॥ ধ্রু ॥
ভব [৮]বিন্দারঅ[৮] মুসা [৯]খণঅ গাতী[৯]।
চঞ্চল মুসা কলিআঁ [১০]নাশঅ[১০] [১১]থাতী[১১] ॥ ধ্রু ॥
[১২]কালা মুষা[১২] [১৩]উহ ণ[১৩] বাণ।
গঅণে উঠি [১৪]চরঅ অমণ ধাণ[১৪] ॥ ধ্রু ॥
[১৫]তাব[১৫] সে মুয়া উণ্ডল পাণ্ডল।
সদ্‌গুরু বোহে[১৬] করিহ[১৬] সো [১৭]নিচ্চল[১৭] ॥ ধ্রু ॥

জবে[১৮]মুসাএর চার তুটঅ[১৮]।
ভুসুকু[১৯] ভণঅ[১৯] তবেঁ বান্ধন [২০] ফিটঅ[২০] ॥ ধু ॥

পাঠান্তর ॥

১—১ নিসিঅ (পুথি, শাস্ত্রী, সেন) নিসিত (শহী)। ২—২ আন্ধীরী (টীকা)।
৩—৩ সুসার চারা (শাস্ত্রী) মুসা অচারা (বাগচী)। ৪—৪ ভখই (শহী)
৫—৫ করই (শহী) ৬—৬ অহারা (বাগচী), আহার (শহী)।
৭—৭ তুটই (শহী)। ৮—৮ বিন্দারই (শহী)।
৯—৯ খণই গাতো (শহী) গতি (টীকা)। ১০—১০ নাশক (শাস্ত্রী, সেন, বাগচী, শহী)
১১—১১ থা তো (শহী)। ১২—১২ কলা (পুথি, শাস্ত্রী, সেন) ; কাল (শহী)।
১৩—১৩ উহণ (শাস্ত্রী)। ১৪—১৪ করঅ অমিঅ পাণ (বাগচী)। চরই আমণ ধাণ (শহী)।
১৫—১৫ তব (পুথি, শাস্ত্রী, বাগচী, সেন)। ১৬—১৬ করহ (বাগচী)।
১৭—১৭ নিচ্চল (শাস্ত্রী, বাগচী, শহী, সেন)।
১৮—১৮ মুসা অচার তুটঅ (বাগচী), মুসা এর চারা তুটই (শহী)
১৯—১৯ ভণই (শহী) ২০—২০ ফিটই (শহী)

শাব্দিক টীকা ॥ নিসি— পুথিতে আছে 'নিসিঅ অন্ধারী' সম্ভবত এখানে 'অ' এর লিপিদ্বিত্ব (dittography) ঘটেছে ; টীকার 'নিসি' পাঠই সম্ভবত শুদ্ধ পাঠ। শহীদুল্লাহ্-এর পাঠান্তর অমূলক ও অপ্রয়োজনীয়। নিসি < নিশা (স্বরসংগতি)। অন্ধারী— অন্ধকার > অন্ধার + ঈ (স্ত্রীপ্রত্যয়— স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ 'নিসি'-র বিশেষণ)। টীকা দেখে মনে হয় এই পদের পাঠান্তর ছিল 'আন্ধীরী'। মুসা < মূষক। পুথিতে স্পষ্টই 'মুসার' লেখা আছে, কাজেই পাঠান্তর নিষ্প্রয়োজন। চারা < চারক ('চার' = চলাফেরা, ইতস্তত ঘোরাফেরা, দ্র. SED)। বাগচী তিব্বতী অনুবাদের byi ba rgyu byed ciṅ = (the mouse moves about) বাক্য থেকে পাঠ নিয়েছেন 'মুসা অচারা,' কিন্তু 'চারা' বা 'অচারা' কোনটিই ক্রিয়াপদ নয়, বিশেষ্যপদ ; কাজেই অর্থবোধের জন্য এখানে 'মুসা'-র সঙ্গে সম্বন্ধ বিভক্তি যুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তিব্বতী অনুবাদক হয়ত এই অংশের আক্ষরিক অনুবাদ না করে কিছুটা স্বাধীনতা নিয়েছিলেন, তাই অনুবাদের বাক্যবিন্যাসে কিছুটা প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। পুথির পাঠ যখন বাংলা বাক্যরীতির সম্পূর্ণ অনুগামী তখন সেটি বর্জন করে তিব্বতী অনুবাদের অনুসরণ করার কোনো হেতু নেই। ভখঅ— ভক্ষতি > ভক্খই ভখই, ভখঅ। ভক্ষ্ ধাতুর অন্যতম অর্থ নষ্ট করা, অপচয় করা (দ্রষ্টব্য SED)। আহারা < আহার। পুথিতে স্পষ্ট 'আ' থাকায় এবং পুথির পাঠে অর্থবোধ ঘটায় পাঠান্তর নিষ্প্রয়োজন। জোইআ < যোগিক। তুটঅ— ত্রুট্যতে > তুট্টই > তুটই, তুটঅ। অবণাগবণা >* অয়নক গমনক, অর্থ 'আনাগোনা'। বিন্দারঅ <* বিন্ধকারক, অর্থ 'বিদারক' বা 'যে বেঁধে'। খণঅ— খনতি > খণঅ (= খণই)। গাতী < গাত্রিকা (গাত্র + ইকা), 'গাত্রিকা' শব্দের একটি অর্থ 'মাটি' (দ্র. SED) = 'ভিত' বা 'দেওয়াল'। টীকার 'গতীতি' থেকে মনে হয় এখানে 'গতি' পাঠান্তর প্রচলিত ছিল। কলিআঁ— কবলিত > কঅলিঅ >

কলিআঁ (স্বতোনাসিক্যীভবন), অর্থ 'খেয়ে', 'গ্রাস করে'। নাশঅ—নাশয়তি > নাসঅই > নাস(শ)অ। পুথিতে এই অংশে কালি ক্ষীণ হলেও ভালো করে পরীক্ষা করলে দেখা যায় এখানে 'ক'-এর বদলে 'অ'-ই লেখা আছে, অর্থাৎ পুথির প্রকৃত পাঠ 'নাশঅ', 'নাশক' নয়। তিব্বতী অনুবাদের 'joms (= নাশ করে) পদ থেকেও 'নাশঅ' পাঠের সমর্থন মেলে। শাস্ত্রীপ্রমুখ আলোচকদের 'নাশক' পাঠ পাঠভ্রম ছাড়া আর কিছু নয়। থাতী <* স্থাতি (= স্থিতি)। হিন্দীতে সঞ্চয় বা জমা অর্থে 'থাতী' শব্দের প্রচলন আছে। এছাড়া, বঙ্গালী উপভাষায় অনুরূপ অর্থে 'থাতী'-র অপিনিহিত রূপ 'থাইত' প্রচলিত আছে (দ্র. আঞ্চলিক ভাষার অভিধান)। কালা < কাল + ক (স্বার্থে)। পুথিতে সম্ভবত 'ক' -এরপর আ-কারটি ছাড়া পড়ে গিয়েছে। টীকায় 'কালেত্যাদি' পদে এই পাঠের সমর্থন আছে। উহ— উহ্যতে > উহিঅই > উহই > উই, অর্থ 'অনুমিত হয়'। বাণ < বর্ণ। চরঅ অমণ ধাণ : অমণ ধাণ— বাহ্য অর্থ 'আমন ধান', গূঢ় অর্থ 'অমনস্ক ধ্যান' ; টীকার 'মধুপানাস্বাদং করোতি' থেকে বাগচী 'করঅ অমিঅ পাণ' পাঠ নিয়েছেন, কিন্তু এতখানি ব্যাপক সংশোধন যুক্তিযুক্ত কিনা বিবেচ্য, কারণ তিব্বতী অনুবাদেও পুথির পাঠের আংশিক সমর্থন আছে 'gro shiṅ-yid kyi chos (='চরতি মনোধর্ম')। তাব < তাবৎ। সম্ভবত আ-কার ছাড় পড়ায় পুথিতে 'তব' লেখা পড়েছে। উঞ্চল-পাঞ্চল— উচ্চল (উৎ—চল্ + অচ্— 'অত্যন্ত চলনশীল', দ্রষ্টব্য 'বঙ্গীয় শব্দকোষ') > উঞ্চল (নাসিক্যীভবন— সম্ভবত 'চঞ্চল' শব্দের অর্থপ্রতিভাসে) + পাঞ্চল (সহগামী শব্দ বা tag word), তুলনীয় আধুনিক বাংলা 'হাঁচোড়-পাঁচোড়'। তু উযল-পাযল্ [খুলনা জেলায় প্রচলিত] ; ক্রিয়া বিশেষণ— "উপর নীচু", পুঁটি মাস্ পানিতে উযল্ পাযল্ করে" (পূর্বপাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান, ১ম খণ্ড, পৃ ১৩৭)। ণিচ্চল < নিশ্চল (সমীভবন)। জবে— যদ্বৎ > জব্ব > জবেঁ (= জবে)। মুসাএর চার তুটঅ— পুথিতে 'চা' এরপর 'র' টি ছাড় পড়েছে, সেটি ধরে নিলেই পাঠ সম্পূর্ণ ও অর্থবহ হয়, কাজেই ভিন্নতর পাঠান্তরের প্রয়োজন নেই। তবেঁ— তদ্বৎ > তব্ব > তবেঁ (= তবে)। ফিটঅ— অপভ্রংশ-ধাতু ফিট্ট (< সং স্ফট্) + ই = ফিটই, ফিটঅ।

বাচ্যার্থ ॥ ১—২. রাত্রি অন্ধকার, মুষিকের চলাফেরা। মূষিক অমৃত আহার করে নষ্ট করে। ৩—৪. ওরে যোগী, মূষিক পবনকে মারো। যাতে [তার] আনাগোনা বন্ধ হয়। ৫—৬. ভববিদারক মূষিক ভিত খুঁড়ছে। চঞ্চল মূষিক সঞ্চয় খেয়ে নাশ করে। ৭—৮. কালো মূষিক, [তার] রঙ বোঝা যায় না। গগনে উঠে আমন ধানের ক্ষেতে বিচরণ করে (পাঠান্তর ধরলে 'গগনে উঠে অমৃত পান করে')। ৯—১০. ততক্ষণ সেই মূষিকে হুটোপুটি [করে], [যতক্ষণ না] তাকে সদ্‌গুরুর উপদেশে নিশ্চল করা হয়। ১১—১২. যখন মূষিকের চলাফেরা থামে, ভুসুক বলে, তখনই বাঁধন খুলে যায়।

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা ॥ আলোচ্য চর্যায় চঞ্চল-মূষিকের রূপকে কবি অবিদ্যাবিরুদ্ধ চিত্তের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে ভববন্ধন দূর করার উপায় ব্যাখ্যা করেছেন। চিত্ত যতক্ষণ অবিদ্যাতিমিরে আচ্ছন্ন থাকে ততক্ষণ প্রকৃতিদোষক্ষুব্ধ সংবৃতি বোধিচিত্ত নিত্য চরণশীল চঞ্চলমূষিকের মতই রূপাদি বিষয়সমূহে বিচরণ করে বোধিচিত্তজ মহাসুখামৃত আহার

তথা বিনষ্ট করে। তাই যোগীর প্রতি চর্যাকারের উপদেশ— পবনের ন্যায় এই চঞ্চল চিত্তমূষিককে হত্যা তথা নিঃস্বভাবীকৃত করে তার আনাগোনা অর্থাৎ রূপাদিবিষয়গ্রহ দূর করতে হবে। মূষিক যেমন গৃহের ভিত্তি খুঁড়ে ফাটল ধরায় এবং গৃহের পতন ঘটায়, এই অবিদ্যাক্ষুব্ধ চঞ্চলচিত্তও তেমনি ভবজ্ঞানরূপ মিথ্যা মায়া সৃষ্টি করে বোধিচিত্তের পতন ঘটায়। তাই চিত্তমূষিকের প্রকৃতিদোষসমূহ বিনষ্ট করা প্রয়োজন। চঞ্চলচিত্ত অবিদ্যাবশত বোধিচিত্তকে বিনষ্ট করে বলে তা নিজেরই কালস্বরূপ। চিত্তের ভবজ্ঞান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে চঞ্চল চিত্ত যে-রূপাদি বিষয়ের সৃষ্টি করে তার প্রকৃত কোন অস্তিত্ব নেই, তা প্রকৃত পক্ষে বর্ণহীন। এই চাঞ্চল্য দূর হলে চিত্ত যখন গগনরূপ সর্বশূন্যে অধিষ্ঠিত হয় তখন তা মহাসুখরূপ অমৃত আস্বাদ করে। এই চিত্ত যতক্ষণ অবিদ্যাক্ষুব্ধ থাকে ততক্ষণই চাঞ্চল্য প্রকাশ করে, তাই সদ্‌গুরুর উপদেশ অনুসরণ করে চিত্তের এই চাঞ্চল্য দূর করা দরকার। ভুসুকু বলছেন যে, এই চিত্ত-মূষিকের অবিদ্যাচাঞ্চল্য দূর হলেই ভববন্ধন লুপ্ত হয়।

২২

[পুথিপৃষ্ঠা ৩৩।খ]

॥ রাগ গুঞ্জরী— সরহপাদানাম্ ॥

অপণে রচি রচি ভব[১] নির্বাণা[১]।
মিছেঁ লোঅ [২]বন্ধাবএ অপণা[২] ॥ ধ্রু ॥
[৩]অন্তে[৩] ন জাণহুঁ অচিন্ত জোই।
জাম মরণ ভব কইসণ হোই ॥ ধ্রু ॥
[৪]জইসো[৪] জাম মরণ বি তইসো।
জীবন্তে[৫] মঅলেঁ[৫] ণাহি বিশেসো ॥ধ্রু ॥
[৬]জা এথু[৬] জাম [৭]মরণে বি সঙ্কা[৭]।
সো করউ রস রসাণেরে[৮] কংখা[৮] ॥ ধ্রু ॥
জে সচরাচর তিঅস ভমন্তি।
তে অজরামর কিম্পি ন হোন্তি ॥ ধ্রু ॥
জামে কাম কি কামে জাম।
সরহ[৯] ভণতি[৯] অচিন্ত সো ধাম ॥ ধ্রু ॥

পাঠান্তর ॥

১—১ নিব্বাণা (শহী) ২—২ বন্ধাবই আপণা (শহী)
৩—৩ আম্হে (শহী), অক্কে (টীকা)
৪—৪ জইসা (সেন) ৫—৫ মইলেঁ (বাগচী, শহী)

৬—৬ জাএথু (শান্ত্রী) ৭—৭ মরণে বিসঙ্কা (শান্ত্রী, বাগচী), মরণেরি সঙ্কা (শহী) ৮—৮ কথা (শান্ত্রী)। ৯—৯ ভণন্তি (শহী)।

পাঠবিচার ও শাব্দিক টীকা ॥ অপণে— *আত্মনেন (= আত্মনা) > অপ্পণেং > অপণে (= আপণে) অর্থ 'নিজে নিজে' বা 'আপনাআপনি'। মিছে— মিথ্যা > মিচ্ছা > মিছা, মিছ + এঁ (-এন জাত করণবিভক্তি)। বন্ধাবএ— *বন্ধাপয়তি > বন্ধাবঅই > বন্ধাবএ (= বন্ধাবই)। অপণা— আত্মনঃ > অপ্পণস্স > অপ্ পণাহ > অপণা (কর্মে সম্বন্ধ বিভক্তি)। অম্হে— অস্মাভিঃ > অম্হাহি > অম্হে, অম্হে, অম্হে। জাণহুঁ—জাণ ধাতু (< সং জ্ঞা) + হুঁ (< ধ্বম্ উত্তম পুরুষ বর্তমান বিভক্তি—বহুবচন)। জাম— জন্ম > জম্ম > জাম। কইসণ < *কদৃশন। জইসো < যাদৃশ। পুথিতে স-এর সঙ্গে প্রচলিত বাংলা ও-কার (ে া)-এর বদলে নাগরী হরফের ও-কার আছে। নাগরী ও-কারের ছত্রাকৃতি আঁকটি স্পষ্ট নয় বলেই হয়ত সেন 'জইসা' পাঠ নিয়েছেন। কিংবা নাগরী হরফের ছত্রাকৃতি আঁকটি পরবর্তী কালের সংযোজন তথা প্রক্ষেপ বলে বিবেচনা করে এই আঁকটি উপেক্ষা করেছেন। বি < অপি। তইসো < তাদৃশ। জীবন্তে— জীব + অন্ত্ (-শতৃজাত) = জীবন্ত্ + এ (অধিকরণবিভক্তি) = জীবন্তে। মঅলেঁ— মৃত > মঅ + ইল (অতীত বাচক-ইল জাত) = মঅল + এঁ (অধিকরণ বিভক্তি) = মঅলেঁ, পাঠান্তর 'মইলেঁ'— মঅ + ইলেঁ = 'মইলে' (অসমাপিকা)। জা— যস্য > জস্স > জাস > জাস > জাহ > জা, অর্থ 'যার'। এথু— *এত্র (= অত্র) > এথ্থ > এথু। করউ > করোতু। রসরসাণেরে— রসরসায়ন > রসরসাণ + এরে (গৌণকর্ম-বিভক্তি), প্রাচীন ভারতে 'রসায়নবাদী' রূপে পরিচিত একটি যোগীসম্প্রদায় ছিল। এই সম্প্রদায়ের সাধকেরা যোগবলে দেহের বায়ুরোধ করতেন এবং দেহে সাধনসম্মত উপায়ে বিবিধ রাসায়নিক দ্রব্য (প্রধানত পারদ) প্রয়োগ করে 'জীবনমুক্তি' তথা অমরত্ব লাভের চেষ্টা করতেন। নাথ সিদ্ধাদের মধ্যেও এই পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। (হিন্দুরসায়নী বিদ্যা— আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, পৃ. ১৬-৩৫)। কংখা < কাঙ্ক্ষা। সচরাচর— যা চর অর্থাৎ জঙ্গম ও অচর অর্থাৎ স্থাবরের সহিত বর্তমান, অর্থাৎ এই পৃথিবী। তিঅস < ত্রিদশ। কিম্পি < কিমপি (মধ্যস্বরলোপ)। জামে— জন্ম > জন্ম > জাম + এ (অপাদানে অধিকরণ- বিভক্তি)। ভণতি— টীকার সম্মানসূচক বহুবচনান্ত 'বদন্তি' পদ দেখে শহী 'ভণন্তি' পাঠ নিয়েছেন। কিন্তু টীকার 'বদন্তি' টীকাকারের প্রয়োগ, তিনি পদকর্তার প্রতি সম্মান দেখিয়ে বহুবচন প্রয়োগ করেছেন, কিন্তু গানে তো বক্তা কবি স্বয়ং, তিনি নিশ্চয়ই আত্মগৌরব ঘোষণা করবেন না। কাজেই পাঠান্তর নিষ্প্রয়োজন। ধাম < ধর্ম।

বাচ্যার্থ ॥ ১—২. ভব ও নির্বাণ [-রূপ-দুই বিকল্প জ্ঞান] নিজে নিজেই রচনা করে লোকে মিথ্যাই আপনাকে বন্ধন করে। ৩-৪. আমরা অচিন্ত্যযোগী, জানি না, জন্ম মরণ [-রূপ] ভব [-বন্ধন] কি রকম হয়। ৫-৬. [আমাদের কাছে] জন্মও যেমন, মরণও তেমনি। জীবিত ও মৃতে কোন বিশেষ (= পার্থক্য) নেই। ৭-৮. এখানে জন্ম-মরণে যার আশঙ্কা আছে, সে-ই রসায়নের আকাঙ্ক্ষা করুক। ৯-১০. যারা [মন্ত্রশক্তি ও ঔষধশক্তির সাহায্যে] পৃথিবী [থেকে] ত্রিদশে (= স্বর্গে) বিচরণ করে, তারা কোনমতেই

অজরামর হয় না। ১১-১২. জন্ম থেকে কর্ম, কি কর্ম থেকে জন্ম— সরহ বলে, সে [কথা] [এই] ধর্মে অচিন্ত্য [= এই ধর্মচিন্তার বহির্ভূত]।

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা ॥ আলোচ্য চর্যার মুখ্য বিষয় অদ্বয়তত্ত্ব। চর্যাকার সরহ অদ্বয়জ্ঞানের নিত্যতা প্রচার করে ভব-নির্বাণ, জন্মমরণ, কার্যকারণ প্রভৃতি বিকল্পাত্মক দ্বৈতজ্ঞানের অসারতা প্রতিপন্ন করেছেন। লোকে অবিদ্যাবাসনাদোষের প্রভাবেই ভব ও নির্বাণকে পৃথক করে দেখে এবং এই ভ্রান্তদৃষ্টির বশেই বন্ধনদশাগ্রস্ত হয়। কিন্তু আসলে ভব নির্বাণ সম্পর্কে এই দ্বৈতজ্ঞান বা পার্থক্যচেতনা সম্পূর্ণই ভ্রান্ত। কেননা, ভবের স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হলেই চিত্ত নির্বাণে অধিষ্ঠিত হয়। তাছাড়া চিত্ত যে ভবের অস্তিত্ব বোধ করে তার প্রকৃত কোন সত্তা নেই, তা অবিদ্যা-বিক্ষুব্ধ চিত্তেরই মায়াসৃষ্টি মাত্র। তা কখনো উৎপন্ন হয় না এবং কখনো উৎপন্ন নয় বলেই কখনো বিনষ্টও হয় না। সুতরাং ভব ও নির্বাণ, সৃষ্টি ও বিনাশ, জন্ম ও মৃত্যু সমস্তই দৃষ্টির বিভ্রম মাত্র। এই কারণে যাঁরা অচিন্ত্যযোগী অর্থাৎ নিগূঢ় ধর্মতত্ত্বজ্ঞ তাঁদের কাছে জন্মও যা মৃত্যুও তা-ই। জন্ম ও মৃত্যুতে তাঁরা কোন পার্থক্য দেখতে পান না, জন্মমৃত্যুর বন্ধনও তাঁদের কাছে তাই অজ্ঞাত। এ জগতে যারা জন্ম-মৃত্যুর মধ্যে প্রভেদ উপলব্ধি করে আতঙ্কিত হয়, রস-রসায়ন বা বিবিধ ঔষধ প্রয়োগে মৃত্যু প্রতিরোধের চেষ্টা তাদেরই সাজে। কিন্তু যে অচিন্ত্যযোগীর কাছে জন্মমৃত্যু দুই-ই সমান, তাঁর এই ধরনের রসরসায়নাদি কল্প প্রয়োগের কোনো প্রয়োজন নেই। যারা মন্ত্রশক্তি ও ঔষধশক্তির বলে মর্ত্য থেকে স্বর্গে গমন করে তারা সাময়িকভাবে স্বর্গবাসী হয় বটে, কিন্তু পরিণামে অজর বা অমর হতে পারে না, কেননা এক্ষেত্রে স্বর্গভোগের অবসানে পুনর্জন্ম অবশ্যম্ভাবী। অমরত্ব লাভের উপায় মন্ত্রশক্তি বা ঔষধশক্তি নয়, গুরুনির্দেশিত অদ্বয় তত্ত্বজ্ঞান। এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করলেই জন্ম থেকে কর্ম কি কর্ম থেকে জন্ম এই ধরনের কার্যকারণ সম্বন্ধ বিচারের প্রয়োজন হয় না। কেননা, এই অদ্বয় তত্ত্বজ্ঞানে কার্যকারণ সম্পর্ক-রূপ বিকল্পাত্মক দ্বৈতজ্ঞানের কোন স্থান নেই।

২৩

[পুথিপৃষ্ঠা ৩৪।খ]

॥ রাগ বড়াড়ী—ভুসুকুপাদানাম্ ॥

জই তুম্হে ভুসুকু[১] অহেরি[১] জাইবেঁ[২] মারিহসি[২] পঞ্চজণা।
[৩]নলণীবন পইসন্তে হোহিসি একুমণা ॥ ধ্রু ॥
জীবন্তে[৪] ভেলা[৪] [৫]বিহণি[৫] [৬]মএল[৬] [৭]রঅণি[৭]
[৮]হাণ বিণু[৮] মাঁসে ভুসুকু [৯]পা ঘর ণ[৯] [১০]পইস হিণি[১০] ॥ ধ্রু ॥
মাআজাল[১১] পসরিউ রে[১১] [১২]বাধেলি[১২] মাআহরিণী।
সদ্‌গুরু বোহেঁ বুঝি রে কাসু[১৩] কহি ণ[১৩]

পাঠান্তর ॥

১—১ অহেই (শাস্ত্রী) ২—২ মারিহ সে (সেন)
৩—৩ নলিণীবন (বাগচী, শহী) ৪—৪ ভইলা (শহী)
৫—৫ বিহাণি (শহী), বিহাণ (বাগচী)
৬—৬ মইল (শহী) ৭—৭ ণঅণি (শাস্ত্রী, সেন),
৮—৮ বিণু (শহী), হণ বিনু (শাস্ত্রী) ৯—৯ পম্মরণ (শাস্ত্রী, বাগচী)
১০—১০ পইসহিলি (বাগচী), পইসহিনি (শাস্ত্রী, সেন)
১১—১১ পসরি উরে (শাস্ত্রী) ১২—১২ বাঁধেলি (বাগচী)
১৩—১৩ কদিনি (শাস্ত্রী, সেন), কহিনি (বাগচী)। কহানী (শহী)।

[পুথিতে ২৩ সংখ্যক চর্যার উপরিধৃত অংশের পরই চারটি পাতা নেই। '৩৪ পাতার পর একেবারে ৩৯ পাতা' (শাস্ত্রী)। তাই এই চর্যার শেষাংশ ও তার টীকার পুরো অংশ, ২৪ সংখ্যক চর্যাটি ও তার টীকার পুরো অংশ এবং ২৫ সংখ্যক চর্যাটি ও তার টীকার প্রথমাংশ (প্রথম থেকে তৃতীয় পদ অর্থাৎ গানের প্রথম ছয় পঙ্‌ক্তির টীকা) পাওয়া যায় নি। ২৩ সংখ্যক চর্যাটি তাই অসম্পূর্ণ। পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য]

পাঠবিচার ও শাব্দিক টীকা ॥ জই < যদি।পইসন্তে—প্র-বিশ্ > পইস + অন্তে (শতৃজাত) = পইসন্তে (অসমাপিকা)। হোহিসি < ভবিষ্যসি। জীবন্তে...পইসহিণি—পুথির এই অংশের লিপি অত্যন্ত অস্পষ্ট হওয়ায় তৃতীয় ও চতুর্থ ছত্রের পাঠ ও অর্থ সম্পর্কে বিশেষ সংশয় থেকে যায়। তিব্বতী অনুবাদে 'জীবন্তে ভেলা বিহণি'-অংশের অর্থ আছে "gson po gsod par ma byed 'জীবন্তং মা জহি' এবং 'মএল রঅণি' = śi ba'i ro ni ma-blaṅ-cig মৃতস্য শবং মা গৃহাণ", কিন্তু পুথির পাঠ দেখে এই অর্থ মূলের সঙ্গে সঙ্গতিশীল বলে মনে হয় না। শহীদুল্লাহ্ পাঠ অনুমান করেছেন 'জীবন্তে ভইলা বিহাণি মইল রঅণি', প্রবোধচন্দ্র সম্ভবত এই পাঠেরই অনুসরণে এই ছত্রের সংস্কৃত অনুবাদ করেছেন 'জীবতি জাতঃ প্রভাতো মৃতে রজনিঃ।' ভেলা—*ভবিত (=ভূত) > ভইঅ + ইল = ভইল > (!)। বিহণি—বিভান+ ইকা (স্বার্থিক) > বিহাণিআ > বিহাণি। 'বিহণি' সম্ভবত 'বিহাণি'র লিপিভ্রম। রঅণি < রজনী, পাঠান্তর 'ণঅণি' (শাস্ত্রী)। পুথির অস্পষ্ট অক্ষর 'ণ'-ও হতে পারে, আবার 'র'-ও হতে পারে, তবে 'র' ধরলে পাঠ অর্থবহ হয়। হাণ বিণু মাঁসে...পইস হিণি—পুথির এই অংশের লিপি অত্যন্ত অস্পষ্ট। যেটুকু পড়া যায় তা হল : [১] ণবিণুমাংসে [৬] ণপইস [১] ণি (অস্পষ্ট অক্ষরের সংখ্যা বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হল)। এই অস্পষ্টতার জন্য এই ছত্রের পাঠ ও অর্থের যথার্থতা নিয়ে অনুমান ও সংশয়ের মাত্রাও সর্বাধিক। পুথির লিপি অস্পষ্ট বলে কেউ কেউ শাস্ত্রীর পাঠই গ্রহণ করেছেন, তবে পাঠান্তরের সম্ভাবনাও উপেক্ষা করা যায় না। কারণ শাস্ত্রীর পাঠ থেকে অর্থোদ্ধার করা কঠিন। তাই সঠিক পাঠ ও অর্থ উদ্ধারের জন্য বাগচী ও শহীদুল্লাহ্ তিব্বতী অনুবাদের উপর নির্ভর করেছেন। তিব্বতীতে এই ছত্রের অনুবাদ : Śa ni med-par bhu su ku pa khyim-du 'jug ma-byed 'মাংসেন বিনা ভুসুকুপাদ গৃহং মা প্রবিশ' [বাগচীকৃতঅনুবাদ] =

মাংস বিনা ভুসুকুপাদ ঘরে প্রবেশ কোরো না। তিব্বতীতে 'হান' পদের অনুবাদ নেই, সম্ভবত তিব্বতী অনুবাদক চর্যার যে পাঠের অনুবাদ করেছিলেন, তাতে 'হাণ' পদটি ছিল না। বোধ হয় এই অনুবাদসূত্র অবলম্বন করেই ক্লার্নে ও শহীদুল্লাহ্ এই ছত্রের পাঠ নেন 'বিণু মাঁসে ভুসুকু পা ঘর ণ পইসহিণি 'Bhusuku does not enter into the house without (obtaining) flesh' (শহীদুল্লাহ)। কিন্তু এই পাঠেও সমস্যা আছে, কারণ পুথির লিপি অস্পষ্ট হলেও যেটুকু পড়া যায় তাতে বোঝা যায় যে 'বিণু মাংসে'র আগে আরো দুটি অক্ষর আছে এবং তার দ্বিতীয় অক্ষরটি হচ্ছে 'ণ'। সেইজন্য বাগচী পাঠ নিয়েছেন '।গ। হণবিণু মাঁসে ভুসুকু পদ্মবন পইসহিলি' = গ্রহণং বিনা মাং সস্য ভুসুকু ঃ পদ্মবনং প্রবিষ্ট ঃ (বাগচী) = মাংস না নিয়ে ভুসুকু পদ্মবনে প্রবিষ্ট হল। কিন্তু বাগচীর পাঠের যাথার্থ্য সম্পর্কেও সংশয় আছে, কারণ তিনি তিব্বতী অনুবাদের অর্থ অক্ষুণ্ণ রাখেন নি : (১) তিব্বতীতে 'ভুসুকু (পাদ') সম্বোধন পদ, বাগচী সেটিকে করেছেন কর্তৃপদ, (২) তিব্বতীতে ক্রিয়াপদ নঞর্থক ও অনুজ্ঞাবাচক, বাগচীর পাঠে ক্রিয়াপদ অস্ত্যর্থক ও অতীতবাচক কৃদন্ত পদের দ্বারা সূচিত। অন্যদিকে এই অংশের টীকার সঙ্গেও বাগচীর পাঠের অনৈক্য আছে। এই অংশের টীকার বাগচীকৃত সংস্কৃতানুবাদ : 'মাংসমিতি সন্ধ্যাভাষয়া বিরমানন্দং স্বাধিষ্ঠানস্বভাবং চতুর্থানন্দেন ন ত্যক্ত্বা ভুসুকুপাদ মহাসুখগৃহং ন প্রবেষ্টব্যম্,' অর্থাৎ টীকার আধারে মূল পাঠের যে আভাস পাওয়া যায় তা হল 'মাংস না ছেড়ে ভুসুকুপাদ মহাসুখগৃহে প্রবেশ কোরো না', এখানে লক্ষণীয় যে, (১) ভুসুকুপাদ কর্তৃপদ নয়, সম্বোধন পদ ; (২) ক্রিয়া অস্ত্যর্থক ও অতীতবোধক নয়, নঞর্থক ও অনুজ্ঞাবাচক। অন্যদিকে এই ছত্রের অনুবাদলব্ধ মূলের সঙ্গে টীকালব্ধ পাঠের আভাসের পার্থক্যও লক্ষণীয় :

(১) মাংস ছেড়ে (= বিনা) ভুসুকুপাদ ঘরে প্রবেশ কোরো না (মূল),

(২) মাংস না ছেড়ে ভুসুকুপাদ (মহাসুখ) গৃহে প্রবেশ কোরো না (টীকা)। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে মূল, টীকা, বাগচী ও শহীদুল্লাহ্—কোনো পাঠের মধ্যেই ঐক্য বা সংগতি নেই। ড. সুকুমার সেন শাস্ত্রীর পাঠ অক্ষুণ্ণ রেখে তার অর্থ করেছেন : 'হানা (অর্থাৎ হত্যা) বিনা মাংসের জন্য (আমি) ভুসুকু পদ্মবনে প্রবেশ করিলাম' (চর্যাগীতি পদাবলী, ৩য় সং, পৃ ১৭৭)। কিন্তু এ অর্থও কষ্টকল্পিত বলে মনে হয়, কারণ 'পইসহিণি' পদটির ব্যাকরণগত পরিচয় অনির্ণীত ; সেন শব্দকোষে 'পইসহিণি' '= পইসহিলি' (?)= 'প্রবেশ হইলি (?)' বলে উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ পদটির অর্থ ও ব্যাকরণ সম্পর্কে তিনিও প্রশ্নাতীত নন। এক্ষেত্রে নূতনতর পাঠসন্ধানের অবকাশ থেকেই যায়। পুথির অস্পষ্ট লিপি ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যায় অস্পষ্ট 'হ' ও স্পষ্ট 'ণ'-এর মাঝে বেশ একটু ফাঁক আছে, সম্ভবত সেখানে একটি স্বরচিহ্ন আছে, এবং সেই স্বরচিহ্নটি সম্ভবত আ-কার (া) ; তাহলে পাঠ 'হাণবিণু মাংসে' = মাংসের হান (= ত্যাগ) বিনা (=ছাড়া) ; হান—√হা + অনট্ (দ্র. SED)। এই পাঠে টীকার সঙ্গে অর্থসংগতি থাকে। সম্ভবত 'পইসহিণি' একটি পদ নয়, দুটিপদ—পইস + হিণি। হিণি—*হিনিত (=হিত) > হিণিঅ > = হিণিঅ >=হিণি (= দ্রুত, ব্যস্তভাবে)। পসরিউ—প্রসরিত> পসরিঅ > পসরিউ।

বাধেলি—বদ্ধ > বাধ + এল + ই(স্ত্রীপ্রত্যয়— স্ত্রীলিঙ্গ, 'মাআহরিণী'র বিশেষণ)। পুথির পাঠ অর্থবহ ও ব্যাকরণসম্মত, কাজেই পাঠান্তর নিষ্প্রয়োজন। বুঝি—*বুদ্ধিত (=বুদ্ধ) > বুজ্‌ঝিঅ > বুঝি। কাসু < কস্য + খলু। কহি ণ—পুথির এই পৃষ্ঠার লেখা এখানেই শেষ হয়েছে, কিন্তু লেখার শেষে পঙ্‌ক্তিসমাপক যতিচিহ্ন নেই, অথচ এই ছত্রটি চরণযুগ্মকের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি, কাজেই এখানে যতিচিহ্ন অনিবার্য। মনেহয়, পুথির পৃষ্ঠা এখানে শেষ হলেও পঙ্‌ক্তির text এখানে শেষ হয় নি, শেষ হয়েছে লুপ্ত ৩৫।ক সংখ্যক পৃষ্ঠার গোড়ায়। কাজেই এই পদটিকেই চরণযুগ্মকের শেষ পদ বলে ধরে নেওয়া বিবেচনাসাপেক্ষ। তাছাড়া এখানকার পাঠ সম্পর্কেও সংশয়ের অবকাশ আছে ; যাকে কেউ কেউ 'কদিনি' ধরেছেন, তার দ্বিতীয় অক্ষরটিকে 'হ' বলেও পড়া চলতে পারে, এবং 'নি' বলে নির্ণীত হরফটি পুথির অন্যান্য 'নি' হরফেরচেহারার অনুরূপ নয়,একে 'ণ' বলেও সনাক্ত করা চলে। কাজেই এখানেও পাঠভেদের অবকাশ রয়ে গেল। তথাপি তিব্বতী অনুবাদের "gtam' (= কথা) পদটির সূত্র ধরে পাঠগ্রহণে সংশয় রেখে অর্থবোধে 'কাহিনী' পদটি আপাতত গ্রহণ করা হল।

বাচ্যার্থ ॥ ১—২. যদি ভুসুক তুই শিকারে যাস, তবে পাঁচজনকে মারিস। নলিনীবনে প্রবেশ করতে একমনা হবি। ৩—৪. জীবন্তে প্রভাত হল, মরণে হল রাত্রি। ভুসুকু, মাংসত্যাগ না করে [তুই] তাড়াতাড়ি ঘরে প্রবেশ করিস না। ৫—৬. মায়াজাল ছাড়ানো হল। ওরে, মায়াহরিণী বাঁধা পড়ল। ওরে, সদ্‌গুরুপ্রদত্ত জ্ঞানে বোঝা গেল [এ] কার কাহিনী।

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা ॥ বর্তমান চর্যায় শিকারের রূপকে অবিদ্যাহনন ও সহজসুখ লাভের কথা আভাসিত হয়েছে। অবিদ্যা দূর করে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করতে হলে রূপাদি পঞ্চস্কন্ধাত্মক পঞ্চবিষয়জ্ঞান নাশ করতে হবে। কেন না মহাসুখচক্ররূপ কমলবনে প্রবেশ করতে হলে চিত্তকে বিরমানন্দমার্গে একমুখী করতে হয়, কিন্তু চিত্তে অবিদ্যার প্রভাবে পঞ্চবিষয়ের ভ্রান্ত জ্ঞান জড়িত থাকলে চিত্তের একাগ্রতাও বিনষ্ট হয়। চিত্ত যখন অবিদ্যার প্রভাবমুক্ত হয় তখন তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে প্রভাত হয়, কিন্তু অবিদ্যার প্রভাব বিদ্যমান থাকলে চিত্ত রাত্রির মত তিমিরাচ্ছন্ন থাকে। তাই মহাসুখগৃহে প্রবেশ করতে হলে প্রথমেই অবিদ্যাজাত পঞ্চবিষয়জ্ঞান ধ্বংস করতে হয়। অবিদ্যার প্রভাবেই চিত্ত মিথ্যা মায়াজাল সৃষ্টি করে, তাই এই মায়াজাল অপসারিত করলেই মায়ারূপ হরিণীকে ধ্বংস করা যায়। গুরুর বচনে এই তত্ত্বকথা সহজে বোঝা যায়।

২৫

[পুঁথিতে ২৩ সংখ্যক চর্যার খণ্ডিত অংশের পরই পুথির ৩৯ সংখ্যক পাতার সূচনায় চার পঙ্‌ক্তির যে টীকা পাওয়া যায় তাতে উক্ত পঙ্‌ক্তি চতুষ্টয় কী কী পদ বা শব্দ দিয়ে শুরু হয়েছিল তার একটা আভাস পাওয়া যায়। এছাড়া শেষ পঙ্‌ক্তির সূচনা পদ ও টীকাকারের ব্যাখ্যা থেকে বোঝা যায় যে এই চর্যার রচয়িতার নাম ছিল তংত্রী বা তন্ত্রীপাদ। প্রারম্ভিক পদগুলির ইঙ্গিত গ্রহণ করলে ২৫ সংখ্যক চর্যার শেষ চার পঙ্‌ক্তির আনুমানিক রূপ দাঁড়ায় নিম্ন প্রকার :]

অণহা বেমকট বণা..... ।
বেণ বি..... ॥
বইঠামণি..... ।
তংত্রী..... ॥

২৬

[পুথিপৃষ্ঠা ৩৯ ক-খ]

॥ রাগ[১] শীবরী[১]—শান্তিপাদানাম্ ॥

তুলা ধুণি ধুণি আঁসু রে আঁসু ।
আঁসু ধুণি ধুণি[২] ণিরবর[২] সেসু ॥ ধ্রু ॥
[৩]তউষে[৩] হেরুঅ ণ পাবিঅই ।
সান্তি ভণই কিণ[৪] স ভাবিঅই[৪] ॥ ধ্রু ॥
তুলা ধুণি ধুণি [৫]সুনে[৫] অহারিউ ।
[৬]পুণ[৬] [৭]লইআঁ[৭] অপণা চটারিউ ॥ ধ্রু ॥
[৮]বহল বট[৮]দুই [৯]মার[৯] ন দিশঅ ।
শান্তি ভণই বালাগ ন পইসঅ ॥ ধ্রু ॥
কাজ ন কারণ জ এহু [১০]জুঅতি[১০] ।
[১১]সঁএঁসংবেঅণ[১১] বোলথি সান্তি ॥ ধ্রু ॥

পাঠান্তর ॥

১—১ শাবরী (তিব্বতী অনুবাদ) ২—২ নিরবব (শহী)
৩—৩ তউ সে (শহী, বাগচী) ৪—৪ সভাবি অই (শাস্ত্রী) সো ভাবিঅই (শহী)।
৫—৫ সুণে (বাগচী)
৬—৬ 'পু' তে over-writing আছে, টীকা অনুসারে 'সুণ'-ও হতে পারে।
৭—৭ 'সইআঁ' (পুথি) ৮—৮ বহণ বাট (শহী)
৯—৯ আর (শহী) ১০—১০জঅতি (শাস্ত্রী), জুগতি (বাগচী)।
১১—১১ সঁএঁ সঁবেঅণ (শাস্ত্রী, শহী), সঅসঁবেঅণ (বাগচী)।

পাঠবিচার ও শাব্দিক টীকা ॥ ধুণি—*ধুনিত (=ধূত) > ধুণিঅ > ধুণি। আঁসু < অংশুক। তউষে—তাদৃশেন > তাঊসেণ > তাউসেঁ > তউসে, তউষে। হেরুঅ—হেতুরূপ > হেউরুঅ > হেরুঅ (মধ্যস্বরলোপ)। পাবিঅই < প্রাপ্যতে। কিণ < কেন (অবহট্‌ঠপদ)। ভাবিঅই < ভাব্যতে। সুনে < শূন্যে। তবে Kvàcrne মন্তব্য করেছেন *sune* not only < śūnya, but also < sūnā "basket" (p. 175)। সেদিক থেকে সুনে = ঝুড়িতে।

অহারিউ < আহৃতঃ। পুণ < পুনঃ। তিব্বতী অনুবাদের slār-yaṅ = again 'পুন' পাঠসমর্থন করে, তবে টীকার 'শূন্যেতি' বাক্যাংশ 'সুণ' পাঠের আভাস দেয়। চটারিউ >* চটারিত, অর্থ 'বাধিত', 'নিঃশেষিত (?) ইত্যাদি। বহল = শ্রেষ্ঠ। বট < বর্ত্ম। 'দুই মার'—মার < মার্গ। দিশঅ < দৃশ্যতে। বালাগ < বালাগ্র। জ < যৎ, অর্থ 'যাহা'। এহু < এষঃ। জুঅতি—যুক্তি > জুকতি (স্বরভক্তি) > জুঅতি ; পুথির 'জুঅতি' স্পষ্ট ও অর্থবহ, পাঠান্তর নিষ্প্রয়োজন। সএঁসঁবেঅণ < স্বসংবেদন।

বাচ্যার্থ ॥ ১—২. ওরে, তুলো ধুনে ধুনে আঁশ আঁশ [করা হল] আঁশ ধুনে ধুনে শেষে [সেগুলি] নিরবয়ব [করা হল]। ৩—৪. ঐভাবে [নিরবয়ব হওয়ায় তাদের পুনরভ্যুদয়ের] হেতুরূপ [দেখতে] পাওয়া যাচ্ছে না। শান্তি বলে, [হেতুরূপ যখন দেখা যাচ্ছে না, তখন আর] তাকে ভাবা কেন ? ৫—৬. তুলো ধুনে ধুনে শূন্যকে আহরণ করা হলো। পুনরায় (পাঠান্তরে 'শূন্যকে') নিয়ে নিজেকে শেষ করা হল। ৭—৮. শ্রেষ্ঠ পথ, দ্বিতীয় পথ দেখা যায় না। শান্তি বলে, [পথ এত সঙ্কীর্ণ যে সেখানে] চুলের অগ্রভাগও প্রবেশ করে না ('বালাগ' অর্থে বাল + অজ্ঞ ধরলে অর্থ দাঁড়ায় : মূর্খ ও অজ্ঞ ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারে না)। ৯—১০. কার্যও নেই কারণও নেই—এই যে যুক্তি, স্বসংবেদন [ব্যাখায়] শান্তি [এই কথা] বলেন।

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা ॥ আলোচ্য চর্যায় চর্যাকারদের মায়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশিত হয়েছে। তাঁদের মতে এই দৃশ্যমান জগৎ আসলে অলীক মায়া মাত্র, অবিদ্যাচ্ছন্ন চিত্তই এ মায়া রচনা করে। বর্তমান ক্ষেত্রে তুলো ধোনার রূপকে মায়াবয়নশীল চিত্তকে নিষ্ক্রিয় করার কথা আলোচিত হয়েছে। তুলো যেমন আঁশের সমষ্টি, মায়াসৃষ্টিকারী অবিদ্যাচিত্তও তেমনি কায়-বাক্-চিত্তের সমষ্টি। তুলো ধুনলে যেমন আঁশ পাওয়া যায় এবং আঁশকে ধুনলে যেমন শেষ পর্যন্ত কিছুই পাওয়া যায় না, ঠিক তেমনি চিত্তকে ক্রমাগত বিশ্লেষণ করলে শেষ পর্যন্ত শূন্য ছাড়া আর কিছুই থাকে না। চিত্ত তখন অচিত্ততায় লীন হওয়ায় তার সক্রিয় হবার মতো আর কোন হেতু থাকে না। চিত্তের এই অবস্থায় আর কিছু ভাববার অবকাশ নেই, কেননা এইটিই হচ্ছে পরম অভিপ্রেত নির্বাণাবস্থা। কায়বাক্চিত্ত-সমষ্টিতে গঠিত চিত্ততূলা ধুনতে ধুনতে যখন তা প্রভাস্বরশূন্যতায় বিলীন হয় তখন সেই প্রকৃতি-প্রভাস্বর সর্বশূন্যকে অবলম্বন করায় সাধকের গ্রাহ্যগ্রাহকভাবরূপ নিজের অস্তিত্ববোধও লুপ্ত হয়। সহজানন্দের এই অদ্বয় পথ অত্যন্ত দীর্ঘ, এখানে দ্বৈত জ্ঞানও তিরোহিত। তাই যে সব নির্বোধ ও অজ্ঞ ব্যক্তি অদ্বয়জ্ঞানবর্জিত, এই পথে তাদের প্রবেশাধিকার নেই। চিত্তের এই প্রকৃতিপ্রভাস্বর অবস্থায় কার্যকারণাত্মক কোন বিকল্পজ্ঞান থাকে না। স্বসংবেদনরূপ সেই সহজানন্দ সম্পর্কে শান্তিপাদের ব্যাখ্যা এই প্রকার।

২৭

[পুথিপৃষ্ঠা ৪০।খ]

॥ রাগ কামোদ—ভুসুকুপাদানাম্ ॥

[১]অধরাতি[১] ভর কমল [২]বিকসউ[২]।
বতিস[৩] যোইণী[৩] তসু অঙ্গ [৪]উহ্লসিউ[৪] ॥ ধ্রু ॥
[৫]চালিউঅ[৫] ষষহর মাগে অবধূই।
রঅণহু ষহজে কহেই ॥ ধ্রু ॥
চালিঅ ষষহর গউ [৬]ণিবাণেঁ[৬]।
কমলিনি কমল বহই পণালেঁ ॥
বিরমানন্দ বিলক্ষণ সুধ।
জো এথু বুঝই সো এথু বুধ ॥ ধ্রু ॥
ভুসুকু ভণই মই বুঝিঅ [৭]মেলেঁ[৭]।
সহজানন্দ মহাসুহ [৮]লীলেঁ[৮] ॥ ধ্রু ॥

পাঠান্তর ॥

১—১ আধরাতি (শহী) ২—২ বিকসিউ (বাগচী), বিকাসউ (শহী)
৩—৩ জোইণী (শাস্ত্রী, শহী), জোইনী (বাগচী)
৪—৪ উহসিউ (শাস্ত্রী), উল্লসিউ (শহী)।
৫—৫ চালিঅউ (বাগচী), চালিঅ (টীকা, শহী)।
৬—৬ ণিবাণে (বাগচী) নীবাণেঁ (শহী)
৭—৭ মেলেং (পুথি) ৮—৮ লোলেঁ (সেন)

পাঠবিচার ও শাব্দিক টীকা ॥ বতিস—দ্বাত্রিংশৎ > বত্তিস > বতিস্। উহ্লসিউ—উল্লসিত > উল্লসিঅ > উল্লসিউ (অপভ্রংশ), (লিপিবৈচিত্র্যে) উহ্লসিউ। চালিউঅ < চাল্যতু (=চাল্যতাম্ > চালিঅউ > চালিউঅ (বিপর্যাস)। টীকার 'চালিঅ' পাঠও গ্রহণযোগ্য। রঅণহু—রত্ন > রঅণ + হু (অপভ্রংশ অপাদান বিভক্তি)। পুথিতে 'হু' যেভাবে লেখা আছে তাতে 'ফু'-র সঙ্গে তার সাদৃশ্য লক্ষণীয়, কিন্তু 'হু'-কে 'ফু' বলে ভুল করা সংগত নয়। কারণ চর্যালিপিতে 'হু' ও 'ফু' প্রায় সদৃশ। কহেই < কথয়তি। গউ < গত। পণালে < প্রণালেন (=মৃণাল)। সুধ < শুদ্ধ। লীলেঁ—লীলা + এঁ। পুথিতে 'লীলে'-র আগে একটা এ-কার বসে গেছে, তাই দেখে সেন পাঠ নিয়েছেন 'লোলেঁ'; কিন্তু পুথির অন্য জায়গায় 'লো'-থেকে এখানকার 'লী' ভিন্ন রকমের। এটি আসলে লিপিপ্রমাদযুক্ত 'লী', কাজেই শুদ্ধ পাঠ 'লীলেঁ'।

বাচ্যার্থ ॥ ১—২. অর্ধরাত্রি ধরে কমল বিকশিত হল। বত্রিশ যোগিনী সেখানে অঙ্গ উল্লসিত করল। ৩—৪. শশধর অবধূতী মার্গে চালিত হয়ে [সদ্‌গুরুবচনরূপ] রত্ন

[প্রভাবে] সহজের [কথা] বলতে লাগল্। ৫—৬. চালিত [হয়ে] শশধর নির্বাণে গেল। কমলিনীর কমল [রস] মৃণালে বইতে লাগল। ৭—৮. বিরমানন্দ বিলক্ষণ শুদ্ধ—এখানে [এ কথা] যে বোঝে সে এখানে বুদ্ধ বা জ্ঞানী। ৯—১০. ভুসুকু বলে, আমি [প্রজ্ঞোপায়ের] মিলনের দ্বারা সহজানন্দ [রূপ] মহাসুখ অবলীলাক্রমে বুঝেছি।

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা ॥ আলোচ্য চর্যায় চর্যাগীতির সাধারণ রীতি অনুযায়ী কতকগুলি সন্ধ্যাশব্দ ব্যবহৃত হয়েছে : অর্ধরাত্রি = সহজানন্দে বিলীন হবার পূর্বক্ষণ, বত্রিশ যোগিনী = ললনা রসনাবধূতী প্রভৃতি বোধিচিত্তবাহিনী বত্রিশ নাড়ী, শশধর = বোধিচিত্ত, কমল = মস্তকস্থ মহাসুখচক্র, কমলিনী = নৈরাত্মা, কমলরস = মহাসুখরস, কমলমৃণাল = অবধূতীমার্গ। এই সন্ধ্যার্থ অনুসারে বোঝা যায় যে এই চর্যায় সহজানন্দলাভের চিত্তাবস্থাই বর্ণিত হয়েছে। যখন বোধিচিত্ত বিরমানন্দমার্গে আরূঢ়হয়ে সহজানন্দে বিলীন হবার উপক্রম করে সেই পরমক্ষণরূপ অর্ধ রাত্রিতে বজ্র বা শূন্যতারূপ সূর্যরশ্মিতে সাধকের মহাসুখরূপ কমল বিকশিত হয়। এই সময় ললনা-রসনা-অবধূতী প্রভৃতি বত্রিশটি বোধিচিত্তবহা নাড়ীও শূন্যতা-সূর্যের উষ্ণতায় উত্তপ্ত হয় এবং তাদের অঙ্গ থেকে আনন্দস্বেদ ক্ষরিত হয়। এই অবস্থায় সাধকের পরিশুদ্ধ চিত্তরূপ শশধর অবধূতী মার্গে চালিত হয়ে সাধককে সহজানন্দের আস্বাদ দেয়। এই আনন্দ লাভের উপায় সদ্‌গুরুর বচনরূপ রত্ন অর্জন করা। সদ্‌গুরুর বচন অনুসরণ করায় তাঁর চিত্তশশধর অবধূতী মার্গে চালিত হয়ে নির্বাণাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং এই সময় মহাসুখরূপ কমলরসবাহিনী নৈরাত্মা বা বিশুদ্ধ বোধিচিত্ত প্রণাল তথা প্রকৃষ্ট মৃণাল অর্থাৎ অবধূতী মার্গে মহাসুখকমলের দিকে বাহিত হয়। চিত্তের এই যে অবস্থা তা-ই হচ্ছে লক্ষণহীন অনির্বাচ্য বিশুদ্ধ বিরমানন্দ ; এই বিরমানন্দ যিনি অনুভব করেন তিনিই বুদ্ধত্ব লাভের অধিকারী হন। ভুসুকু বলেছেন যে, প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলনে অর্থাৎ দ্বৈতজ্ঞানকে অদ্বয়জ্ঞানে মিলিত করে তিনি সহজানন্দরূপ মহাসুখ অবলীলাক্রমে লাভ করেছেন ॥

২৮

[পুথিপৃষ্ঠা ৪১।খ-৪২।ক]

॥ রাগ[১] বলাড়ি[১]—শবরপাদানাম্ ॥

[২]উঁচা উঁচা[২] পাবত [৩]তঁহি [৩]বসই সবরী বালী।
[৪]মোরঙ্গি[৪] পীচ্ছ[৫]পরহিণ[৫] সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী ॥ ধ্রু ॥
উমত সবরো পাগল শবরো মা কর গুলী [৬]গুহাড়া[৬] [৭]তোহৌরী[৭]।
নিঅ[৮] ঘরিণী[৮] ণামে সহজ সুন্দরী ॥ ধ্রু ॥
ণাণা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলি ডালী।
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণ কুণ্ডলবজ্রধারী ॥ ধ্রু ॥

তিঅধাউ খাট পড়িলা সবরো[৯] মহাসুহে[৯] সেজি ছাইলী।
সবরো ভূজঙ্গ[১০] ণইরামণি[১০] দারী পেক্ষ রাতি পোহাইলী ॥ ধ্রু ॥
হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই।
সুন[১১] নিরামণি[১১] কণ্ঠে লইআ মহাসুহে রাতি[১২] পোহাই[১২] ॥ ধ্রু ॥
গুরুবাক[১৩] পুঞ্চআ[১৩] বিন্ধ ণিঅ মণে বাণেঁ।
একে সরসন্ধাণেঁ বিন্ধহ বিন্ধহ পরম নিবাণেঁ ॥ ধ্রু ॥
উমত সবরো গরুআ [১৪]রোষে[১৪]।
গিরিবরসিহর সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসেঁ। ধ্রু ॥

পাঠান্তর ॥

১—১ বরাটি (তিব্বতী) ২—২ উঁচা উঁচা (শান্ত্রী, বাগচী), উচা (টীকা)
৩—৩ তহি (বাগচী) তহিঁ (শহী) ৪—৪ মোরাঙ্গ (শহী)
৫—৫ পরিহাণ (শহী) ৬—৬ গুহারী (শহী)
৭—৭ তোহোরি (বাগচী), শহী-তে পদটি পরের পঙ্‌ক্তির গোড়ায় আছে। পুথিতে এই পদের পর যতিচিহ্ন নেই।
৮—৮ ঘরণী (সেন)। ৯—৯ মহাসুখে (বাগচী)।
১০—১০ নৈরামণি (বাগচী)
১১—১১ পুথিতে 'রি'-র উপরে 'নি'-র Over-writing আছে। নৈরামণি (বাগচী, শহী)।
১২—১২ পোহাম (পুথি)। ১৩—১৩ পুচ্ছিআ (বাগচী), ধনুআ (শহী)।
১৪—১৪ পুথিতে 'সরোষে' লিখে, 'স' কাটা হয়েছে। গরু আস রোষে (সেন)। রোসেঁ (শহী)।

পাঠবিচার ও শাব্দিক টীকা ॥ উণ্ড—উচ্চ > উণ্ড (বিষমীভবন) + আ (স্বার্থে)। পাবত < পর্বত। তঁহি < তস্মিন্। মোরঙ্গি < ময়ূরাঙ্গিক। পীচ্ছ < পিচ্ছ, পুচ্ছ। পরহিণ—পরিহিত > পরিহিণ (ছিন্ন-ছিন্ন > ছিণ-ভিণ ইত্যাদির সাদৃশ্যে) > পরহিণ। গিবত—গ্রীবা > গিব + ত (অধিকরণ)। গুলী—*ঘূর্ণ > ঘুল্ল > গুল্ল > গুল + ঈ = গুলী, অর্থ 'গোল, 'বিশৃঙ্খলা'। গুহাড়া < গোহার, 'গোহার' শব্দের মূল অর্থ গোরুহরণ, তার থেকে অর্থসংশ্লেষ : গোহরণকালে সাহায্যের জন্য চীৎকার > গোহার + ই = গোহারি—কাতর নিবেদন বা সনির্বন্ধ অনুনয়। মৌলিল—মুকুলিত > মউলিঅ + ইল = মউলিল > মৌলিল। হিণ্ডই <* হিণ্ডতি, অর্থ 'ঘুরে বেড়ায়'। তিঅ ধাউ < ত্রিকধাতু। সেজি < শয্যিকা। ছাইলী—ছাদিত < ছাইঅ + ইল = ছাইল + ঈ (স্ত্রী প্রত্যয়—'সেজি'র সঙ্গে সম্বন্ধ)। দারী < দারিকা, অর্থ 'নাগরী'। পেক্ষ—প্রেম > *পেম্ম (শ্বাসাঘাত হেতু দ্বিত্ব) > পেক্ষ (=পেম্হ—মহাপ্রাণিত)। কাপুর < কর্পূর। তু 'কাফুর [কুমিল্লা ও নোয়াখালি জেলায় অদ্যাবধি প্রচলিত]—কর্পূর ॥ 'উকুন কাফুর রে ডরায়' (আ ভা অ, ২য় খণ্ড পৃ ৫১)। পুণ্ডআ—পুচ্ছক > পুণ্ডআ (পুণ্ডঅ), অর্থ 'বাণের পুচ্ছ'। এখানে 'পুঙ্খআ' পাঠান্তর থাকা অসম্ভব নয়, তবে 'ধনুআ' পাঠের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা যায় না। গরুআ < গুরুক। তু. মাঘ মাসেত কৈন্যা গোরুআ লাগে শীত (চণ্ডীমঙ্গল : দ্বিজ মাধব)।

পইসন্তে—প্র-বিশ্-> পইস্ + অন্তে (শতৃজাত অসমাপিকা) = পইসন্তে। লোড়িব—তব্যজাত ভবিষ্যতের পদ, অর্থ—খোঁজা হবে।

বাচ্যার্থ ॥ ১—২. উঁচু উঁচু পাহাড়। সেখানে শবরী বালিকা বাস করে। পরিধানে ময়ূরের পুচ্ছ, গলায় গুঞ্জা [ফুলের] মালা। ৩—৪. উন্মত্ত শবর, পাগল শবর, ভুল কোরো না, দোহাই তোমার। [ও তোমার] নিজেরই ঘরণী, নাম সহজসুন্দরী। ৫—৬. নানা তরুবর মুকুলিত হল। ওরে [তাদের] ডাল গগনে [গিয়ে] লাগল। কানে কুণ্ডল [ও কণ্ঠে] বজ্র ধারণ করে শবরী এই বনে একাকিনী বিহার করে। ৭—৮. তিন ধাতুর খাট পাতা হল, শবর, মহাসুখের শয্যা বিছানো হল। শবর প্রেমিক, নৈরামণি প্রেমিকা—প্রেম [ক্রীড়ায়] রাত্রি পোহাল। ৯—১০. হৃদয়-তাম্বূল কর্পূর [সহিত] মহাসুখে খায়। শূন্য নৈরামনিকে কণ্ঠে নিয়ে মহাসুখে রাত কাটায়। ১১—১২. গুরুবাক্য পুচ্ছবিশিষ্ট বাণ, [সেই] বাণে নিজের মনকে বিদ্ধ কর। এক শরসন্ধানে পরম নির্বাণকে বিদ্ধ কর, বিদ্ধ কর। ১৩—১৪. গুরুতর রোষে শবর উন্মত্ত। গিরিবরের শিখরসন্ধিতে প্রবেশ করলে শবরকে কিভাবে খোঁজা যাবে?

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা ॥ আলোচ্য চর্যায় শবরদম্পতির প্রেম ও মিলনের রূপকে সহজসাধকের মহাসুখলাভের তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। সাধকের দেহ ও মহাসুখের আশ্রয় মস্তক এখানে যথাক্রমে পর্বত ও পর্বতশৃঙ্গের সঙ্গে উপমিত হয়েছে। এই দেহরূপ পর্বতে অবিদ্যারূপ তরু নানাপ্রকার বিষয়ানন্দে মুকুলিত হয়ে রয়েছে এবং রূপবেদনাদি পঞ্চস্কন্ধরূপ নানা শাখা গগন অর্থাৎ প্রভাস্বর শূন্যকে আচ্ছন্ন করেছে। অন্যদিকে দেহরূপ পর্বতের মস্তক তথা মহাসুখচক্ররূপশিখরে সাধকের গৃহিণীস্বরূপ যে নৈরাত্মাদেবী বাস করেন তিনিও নানাবিধ ভাববিকল্পরূপ ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা নিজের স্বরূপ অলঙ্কৃত করে রেখেছেন এবং গ্রীবাদেশে গুহ্যমন্ত্ররূপ গুঞ্জামালা ধারণ করেছেন। সহজসুন্দরী নৈরাত্মার এই অলঙ্কৃত রূপ দেখে বিষয়-বিহ্বল সাধক তাঁকে তাঁরই পরমা প্রেয়সী বলে চিনতে পারেন নি। এইজন্য সাধকের প্রতি নৈরাত্মার মিনতি এই যে, বিষয়ানন্দে মত্ত হয়ে তিনি যেন তাঁর নিজের প্রাপণীয়া সহজসুন্দরীকে চিনতে ভুল না করেন, কেন না এই অলঙ্কৃত সহজরূপিণী শবরী তাঁর নিজেরই ঘরণী, ইনিই জ্ঞানমুদ্রাদিরূপ কুণ্ডল কর্ণে ধারণ করে বজ্র ও উপায়জ্ঞান অবলম্বনে যুগনদ্ধরূপে সর্বসঙ্গবিরহিত অবস্থায় এই কায়পর্বতবনে বিহার করেন। এই নির্দেশ লাভ করে সাধক নৈরাত্মার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য কায়-বাক্-চিত্তরূপ ত্রিধাতুনির্মিত বোধিচিত্তকে খাট করে অর্থাৎ প্রভাস্বর শূন্যতায় বিলীন করে মহাসুখলাভের শয্যা প্রস্তুত করলেন এবং সেই শয্যায় ভুজঙ্গধারী অর্থাৎ বজ্রশক্তিধর সাধক শবর ক্লেশবিদারিণী নৈরাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে অবিদ্যারূপ তিমির রাত্রি অতিক্রম করলেন। এই প্রেমলীলায় তাঁরা হৃদয়কে তাম্বূল করে অর্থাৎ সর্বপ্রকার ভোগসম্বন্ধ থেকে মুক্ত করে, এবং মহাসুখকে ফলহেতুসম্বন্ধ থেকে মুক্ত করে কর্পূর রূপে ভক্ষণ করলেন। এই মিলনলীলায় সাধক নৈরাত্মাকে কণ্ঠে অর্থাৎ সম্ভোগচক্রে ধারণ করে রাত্রি যাপন করলেন অর্থাৎ মহাসুখরূপ জ্ঞানরশ্মি দ্বারা স্বকায়ক্লেশরূপ অবিদ্যাতিমির নাশ করলেন। সাধক যদি উক্ত অবস্থায় উপনীত হতে চান তবে তাঁকে গুরুবচনরূপ

ধনুকে নিজের মনোবোধিচিত্তরূপ বাণ সংযোজিত করে পরম নির্বাণরূপ লক্ষ্যস্থলকে বিদ্ধ করতে হবে। চর্যাকার শবরপাদও অনুরূপভাবে গুরুবচনের দ্বারা বোধিচিত্তকে লক্ষ্যাভিমুখী করেছেন। তাই তিনি বলছেন যে, এই অবস্থায় তাঁর বোধিচিত্ত জ্ঞানানন্দগন্ধে চালিত হয়ে সহজানন্দপানরূপ গুরুতর আবেগে উন্মত্ত অবস্থায় মহাসুখচক্ররূপ গিরিশিখরে প্রবেশ করে এমন লীন হয়ে গেছে যে তাকে অন্বেষণ করা সম্ভব নয়। বোধিচিত্তের এই অবস্থাই হচ্ছে চতুর্থানন্দ-বা সহজানন্দমগ্নতা।

২৯

[পুথিপৃষ্ঠা ৪৩।খ—৪৪ক]

॥ রাগ পটমঞ্জরী—লূইপাদানাম্ ॥

ভাব ন হোই অভাব ণ জাই[১]।[১]
[২]আইস[২] সংবোহেঁ কো পতিআই ॥ ধ্রু ॥
লূই ভণই [৩]বঢ়[৩] দুলক্খ বিণাণা।
তিঅ ধাএ বিলসই উহ [৪]ণা ঠাণা[৪] ॥
জাহের [৫]বান[৫] চিহ্নরূব ণ জাণী।
সো কইসে আগমবেএঁ বখাণী ॥ ধ্রু ॥
কাহেরে [৬]কিষ[৬] ভণি মই দিবি পিরিচ্ছা।
উদকচান্দ জিম সাচ ন মিচ্ছা ॥ ধ্রু ॥
লূই ভণই মই [৭]ভাইব[৭] [৮]কীষ[৮]।
জা লই [৯]অচ্ছম তাহের[৯] উহ ণ দিস ॥ ধ্রু ॥

পাঠান্তর ॥

১—১ পুথিতে এই খানে প্রচলিত এক দাঁড়ির বদলে খণ্ড ৎ সদৃশ নেওয়ারী যতিচিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে।

২—২ অইস (বাগচী, শহী)। ৩—৩ বট (শাস্ত্রী, সেন)

৪—৪ লাগেণা (শাস্ত্রী, বাগচী, শহী)

৫—৫ বাণ (বাগচী, শহী) ৬—৬ কিস (বাগচী, শহী)।

৭—৭ ভাবই (বাগচী) ৮—৮ কিস (বাগচী, শহী)।

৯—৯ অচ্ছমতা হের (শাস্ত্রী)।

পাঠবিচার ও শাব্দিক টীকা ॥ আইস—*অবাদৃশ > আইস, পাঠান্তর নিষ্প্রয়োজন। পতিআই—প্রতীয়তে > পতিঅই, পতিআই। বঢ় = বোকা, মূর্খ (দ্র. হেমচন্দ্র), 'বট' পাঠ নিরর্থক ও অপ্রয়োজনীয়। দুলক্খ < দুর্লক্ষ্য। বিণাণা < বিজ্ঞান। তিঅধাএ—

ত্রিক + ধাতু > তিঅ + ধাউ > তিঅধা (তির্যক্ কারকের প্রাতিপদিক) + এ (করণ-অধিকরণবিভক্তি) + তিঅধাএ। উহ—উহ্যতে > উহিঅই > উহই > উহ, অর্থ 'অনুমান করা যায়'। ণা ঠাণা < ন স্থানম্। উহ ণা ঠাণা = স্থান জানা যায় না। জাহের—যস্য > জস্স > জাস > জাহ-(প্রাতিপদিক) + এর (সম্বন্ধবিভক্তি) = জাহের। বাণচিহ্নরূব < বর্ণচিহ্নরূপ। জাণী—*জানিতঃ (=জ্ঞাত) > জাণিঅ > জাণী। কইসে—*কদৃশেন > কইসেণ > কইসেঁ, কইসে। বেএঁ < বেদেন। বখাণী—ব্যাখ্যানিত (=ব্যাখ্যাত) > বক্খাণিঅ > বখাণী। কাহেরেঁ—কস্য > কস্স > কাস > কাহ (প্রাতিপদিক) + এরে (কর্ম বিভক্তি) = কাহেরে। কিষ < কিস < কীদৃশ। ভণি—ভণিত > ভণিঅ > ভণি। মই—ময়া > মএ >মই। দিবি—*দিতব্য(=দাতব্য) > দিঅব্ব > দিব + ই (স্ত্রীপ্রত্যয়—স্ত্রীলিঙ্গ পদ 'পিরিচ্ছা'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট)। পিরিচ্ছা—পৃচ্ছা > পিরিচ্ছা (স্বরভক্তি—অর্ধতৎসম শব্দ) অর্থ 'প্রশ্ন' বা 'প্রশ্নের সমাধান'। জিম—যেমন্ত, *যিমন্ত > জেম, জিম (অপভ্রংশপদ)। সাচ < সত্য। ভাইব—ভাবিতব্য > ভাইঅব্ব > ভাইব। লই—*লভিত (=লব্ধ) > লহিঅ > লই। অচ্ছম—অচ্ছ (অস্ধাতুজাত) + ম (উত্তমপুরুষ বর্তমান বিভক্তি)। তাহের—তস্য > তাহ –+ এর = তাহের।

বাচ্যার্থ ॥ ১—২. ভাব হয় না, অভাব যায় না। এমন সংবোধে (=উপদেশ) কে প্রত্যয় করে ? ৩—৪. লুই বলে, মূর্খ, বিজ্ঞান দুর্লক্ষ্য। ত্রিধাতুতে বিলাস করে, [কিন্তু তার] স্থান (উদ্দেশ) বোঝা যায় না। ৫—৬. যার বর্ণ-চিহ্ন-রূপ জানা যায় না, সে কিভাবে আগম-বেদে ব্যাখ্যাত হয় ? ৭—৮. কাকে কী বলে আমি উত্তর দেব ? জলে [প্রতিবিম্বিত] চাঁদ যেমন সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়। ৯—১০. লুই বলে, আমার ভাবনা কিসের ? যা নিয়ে আছি তার উদ্দেশ দেখা যায় না।

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা ॥ আলোচ্য চর্যায় পরম সত্য সম্পর্কে লুইপাদের বিজ্ঞানবাদী দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশিত হয়েছে। ভাব এবং অভাব, অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্ব—এর কোনটিই সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়। কেননা, যাকে ভাব বা অস্তিত্ব বলে মনে করা হয় তত্ত্ব-বিশ্লেষণে দেখা যায় যে তা মূলত বিকল্পাত্মক এবং সেই কারণে অস্তিত্বহীন। অন্যদিকে ভাবই যদিই অস্তিত্বহীন হয় তবে অভাব তথা নাস্তিত্বেরই বা অস্তিত্ব কোথায় এবং ভাব ও অভাব—অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বের মধ্যেও পার্থক্য কোথায় ? সুতরাং ভাব ও অভাব—এদের কোনটিকেই পরম সত্য বলে গ্রহণ করা যায় না, পরম সত্য আসলে দুর্লক্ষ্য বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান কায়বাক্চিত্তরূপ ত্রিধাতু তথা সমস্ত অস্তিত্বপ্রবাহের মধ্যেই অলক্ষিতভাবে বিলাস করছে, কিন্তু তা অভূতপরিকল্প বলে ত্রিধাতুর সঙ্গে লগ্ন হয় না বা তার সন্ধান পাওয়া যায় না। যে বিজ্ঞানের বর্ণ-চিহ্ন-রূপ কিছুই জানা যায় না, আগমবেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থে তার ব্যাখ্যা কিভাবে সম্ভব ? প্রকৃতপক্ষে এই বিজ্ঞান বা সহজতত্ত্ব বুদ্ধির আগম্য বলে ভাষায় ব্যাখ্যা করেও এর স্বরূপ কাউকে বোঝানো যায় না। জলে চাঁদের যে প্রতিবিম্ব পড়ে তা বুদ্ধির কাছে অসত্য হলেও অনুভূতি বা প্রতীতির কাছে যেমন সত্য, ঠিক তেমনি এই বিজ্ঞান বা সহজতত্ত্ব বুদ্ধির অগম্য হলেও অনুভূতিতে সত্যরূপে প্রতীয়মান। লুই বলেছেন যে, তিনি ভাব্য-ভাবক-ভাব এই তিন

অবস্থার ঊর্ধ্বে উঠেছেন, তাই তাঁর কোন ভাবনা নেই। এই তিনের অতীত যে চতুর্থানন্দ তাতেই তিনি নিমগ্ন হয়েছেন। এই অবস্থায় গ্রাহ্য অর্থাৎ সহজানন্দ ও গ্রাহক অর্থাৎ সাধকচিত্ত—এই দুয়ের মধ্যে সমস্ত পার্থক্য লুপ্ত হওয়ায় সহজানন্দকে পৃথক করে দেখার ক্ষমতা তাঁর লুপ্ত হয়েছে ॥

৩০

[পুথিপৃষ্ঠা ৪৫ ।ক]

॥ রাগ মল্লারী—ভুসুকুপাদানাম্ ॥

[১]করুণ[১] মেহ নিরন্তর ফরিআ।
ভাবাভাব[২] দ্বন্দল[২] দলিআ ॥ ধ্রু ॥
[৩]উইত্তা[৩] গঅণমাঝেঁ অদভুআ।
পেখরে ভুসুকু স[৪]জ[৪] সরুআ[৪] ॥ ধ্রু ॥
জাসু[৫] মুণন্তে[৫] তুট্টই ইন্দিআল।
[৬]নিহুরে [৬]ণিঅমন দে উলাস ॥ ধ্রু ॥
বিসঅ[৭] বিশুদ্ধি[৭] মই বুজ্ঝিঅ আনন্দে।
গঅণহ জিম উজোলি চান্দে ॥ ধ্রু ॥
এ তৈলোএ এতবি[৮]যারা[৮]।
জোই ভুসুকু [৯]হেড্ডই[৯] অন্ধকারা ॥ ধ্রু ॥

পাঠান্তর ॥

১—১ করুণা (বাগচী, শহী) ২—২ দুংদুল (শহী), দ্বন্দল (বাগচী)
৩—৩ উইএ (টীকা)
৪—৪ পুথিতে 'রু আ' লিখে পরে 'রু'র আগে মাথায় ছোট করে 'স' লেখা আছে।
৫—৫ সুনন্তে(বাগচী), সুণন্তে (শাস্ত্রী), গুণন্তে (সেন)
৬—৬ নিহু এ (বাগচী, শহী) ৭—৭ বিশুদ্ধেঁ (বাগচী)
৮—৮ সারা (বাগচী, শহী)। ৯—৯ হেভ্ভই (শাস্ত্রী), ফেডই (বাগচী), ফেটই (শহী), ফেড্ডই (সেন)।

পাঠবিচার ও শাব্দিক টীকা ॥ মেহ < মেঘ। ফরিআ < স্ফুরিত। দ্বন্দল—এই পদটিকে 'দুন্দুল' রূপেও পড়া যায়, কেননা, 'পু', 'দু', 'সু' 'মু' লিখতে চর্যার লিপিকর যে 'উ' ব্যবহার করেছেন তার আকার আধুনিক বাংলার 'ব'-ফলার মতো" (তারাপদ মুখোপাধ্যায়, চর্যাগীতি, পৃ. ৭৫)। দ্বন্দল পাঠ ধরলে সম্ভাব্য ব্যুৎপত্তি—দ্বন্দ্ব + ল, এবং দুন্দোল—দুদোল > দুন্দোল (সমীভবন ও স্বতোনাসিক্যীভবন) > দুন্দুল (স্বরসঙ্গতি)।

উইত্তা—উদিত > উইত্ত (শ্বাসাঘাতহেতু দ্বিত্ব), পাঠান্তর 'উইএ'—উদিত > উইঅ > উইএ। অদভুআ—অদ্ভুত > অদভুআ (স্বরভক্তি), অর্ধতৎসম পদ। পেখ < প্রেক্ষস্ব। সহজসরুআ < সহজস্বরূপ। মুণন্তে—মন্ + অন্তে (শতৃজাত অসমাপিকা প্রত্যয়) = মণন্তে > মুণন্তে। তুট্টই < ত্রুট্যতে। ইন্দিআল—ইন্দ্রিয়জাল > ইন্দিঅআল > ইন্দিআল (মধ্যস্বরলোপ)। নিহুরে—নিভৃত + রে, নিভৃত > নিহুঅ > নিহু ; পাঠান্তর 'নিহুএ'—নিভৃতেন > নিহুএঁ > নিহুএ, টীকায় "নিহএ"। দে—দদাতি > দেই > দে। উলাস < উল্লাস। বুজ্ঝিঅ <*বুদ্ধিতঃ (=বুদ্ধ)। গঅণহ < গগনস্য। উজোলি—*উজ্জ্বলিত (উজ্জ্বল) > উজলিঅ > উজলি, উজোলি (স্বরসঙ্গতি)। তৈলোএ < ত্রৈলোক্যে। এতবি—এত + বি, এতৎতক > এত্তঅ > এত + অপি > বি = এতবি, অর্থ 'এতই'। জোই < যোগী। হেড্ডই' < হীডই [√হীড্ = টেনে ছিঁড়ে ফেলা, দ্র. SED]। পুথিতে স্পষ্ট 'হেড্ডই' আছে এবং তা অর্থবহ হওয়ায় পাঠান্তর নিষ্প্রয়োজন।

বাচ্যার্থ ॥ ১—২. করুণামেঘ নিরন্তর স্ফুরিত। ভাব-অভাবের দ্বন্দ্ব (বা সমস্যা) দলিত। ৩—৪ গগনমাঝে অদ্ভুত উদিত হল। ওরে ভুসুকু, সহজস্বরূপকে দেখ। ৫—৬. যাকে জানতে জানতে ইন্দ্রিয়জাল টুটে যায়। নিভৃতে নিজ মন উল্লাস দেয়। ৭—৮. বিষয়বিশুদ্ধির দ্বারা আমি আনন্দকে বুঝলাম, যেমনভাবে চন্দ্রের দ্বারা গগনের উজ্জ্বলতা [ঘটে]। ৯—১০. এ ত্রৈলোক্যে এটাই সার [যার দ্বারা] যোগী ভুসুকু অন্ধকার দূর করে।

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা ॥ বর্তমান চর্যায় চন্দ্রোদয়ের রূপকে সহজানন্দলাভের তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। সহজানন্দ লাভ করে ভুসুকুপাদের মনে হয়েছে যে করুণারূপ মেঘ অবিরত স্ফুরিত বা বিকশিত হয়েছে। এই অবস্থায় ভাবাভাব বা গ্রাহ্যগ্রাহকাদি বিকল্পাত্মক দ্বৈতজ্ঞানকে দলিত করে গগনরূপ শূন্যতার মধ্যে সহজস্বরূপ আশ্চর্যরূপে বিরাজমান। এই সহজানন্দের উপলব্ধি হলে সমস্ত ইন্দ্রিয়বন্ধন ছিন্ন হয় এবং নিজের মন তথা বোধিচিত্ত নির্বিকল্পাকারে উল্লসিত হয়। এই সময় বিষয়বিশুদ্ধি দ্বারা যে আনন্দোপলব্ধি হয় তা গগনে চন্দ্রোদয়ের সঙ্গে তুলনীয়। গগনে চন্দ্রোদয় হলে যেমন সমস্ত অন্ধকার দূর হয়, তেমনি বিষয়জ্ঞান যে মিথ্যা—এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করায় ভুসুকু সহজানন্দ লাভ করেছেন। এই সহজানন্দের জ্যোতি ত্রিলোকবিস্তৃত, এই আনন্দ লাভ করায় যোগী ভুসুকুর মোহান্ধকার তিরোহিত হয়েছে ॥

৩১
[পুথিপৃষ্ঠা ৪৬।ক]

॥রাগ পটমঞ্জরী— আর্যদেবপাদানাম্ ॥

[১]জহি[১] মণ ইন্দি [২]অবণ[২] হো ণঠা।
ণ জাণমি অপা [৩]কঁহি[৩] গই পইঠা ॥ ধ্রু ॥
অকট [৪]করুণা[৪] ডমরুলি [৫]বাজঅ[৫]।
আজদেব[৬] নিরালে[৬] [৭]রাজই[৭] ॥ ধ্রু ॥

চান্দরে চান্দকান্তি জিম[৮] পড়িভাসঅ[৮]।
[৯]চিঅ বিকরণে[৯] তহি টলি পইসই ॥ ধু ॥
[১০]ছাড়িঅ [১০]ভঅ ঘিণ লোআচার।
চাহন্তে চাহন্তে [১১]সুণ [১১]বিআর ॥ ধু ॥
আজদেবেঁ সঅল[১২] বিহরিউ[১২]।
ভয় ঘিণ দুর নিবারিউ ॥ ধু ॥

পাঠান্তর ॥

১—১ জহিঁ (শহী) ২—২ পবন (শান্ত্রী, বাগচী, শহী)
৩—৩ কহিঁ (বাগচী), কহি (শহী) ৪—৪ করুণ (বাগচী)
৫—৫ বাজই (শহী) ৬—৬ নিরাসে (বাগচী) নিরাসে (শহী)
৭—৭ রাজঅ (বাগচী) ৮—৮ পড়িহাসই (শহী) পতিভাসঅ (শান্ত্রী)
৯—৯ চিঅবি করণে (শহী) ১০—১০ ছাড়িল (টীকা)
১১—১১ সূণ (শহী)
১২—১২ পুথিতে দ্বিতীয় বর্ণে Over-writing আছে। বিআরিউ (বাগচী)। বিহলিউ (শহী)।

পাঠবিচার ও শাব্দিক টীকা ॥ জহি - যস্মিন্ > জহিং > জহিঁ > জহি। ইন্দিঅবণ— ইন্দ্রিয়-পবন > ইন্দিঅঅবণ > ইন্দিঅবণ। ছন্দের দিক থেকে 'ইন্দিঅপবণ' পাঠ প্রশস্ততর। অপা— আত্মা > অপ্পা > অপা। অকট— 'বিস্ময়কর' বা 'বিস্ময়করভাবে'। ডমরুলি— ডমরু + লি (লী-ক্ষুদ্রার্থে), অর্থ 'ছোট ডমরু'। নিরালে < নিরালয়ে। পাঠান্তর তিব্বতী অনুবাদ ও টীকার দিক থেকে অসংগত। সেকোদ্দেশটীকায় এই চর্যার ৩-৪ ছত্র উদ্ধৃত আছে : 'অকঢ় করুণা ডমরুলি বাজঅ/আজ্জদেব নিরালে রাজঅ ॥' কাজেই 'নিরালে' পাঠই প্রচলনসম্মত। রাজই < রাজতে। চান্দরে— চান্দ + রে = চান্দরে, টীকা অনুসারে পাঠান্তর 'চান্দেরি' < চান্দ + এর (সম্বন্ধবিভক্তি) + ই (স্ত্রীপ্রত্যয়— স্ত্রীলিঙ্গ পদ 'চান্দকান্তি'-র সঙ্গে সম্বদ্ধ), টীকার পাঠই অর্থের দিক থেকে অধিকতর সঙ্গত মনে হয়। চান্দকান্তি < চন্দ্রকান্তি, অর্থাৎ 'জ্যোৎস্না'। টলি < টলিত। লোআচার < লোকাচার। চাহন্তে— চাহ্ (< চক্ষ্) + অন্তে (শতৃজাত অসমাপিকা) = চাহন্তে। বিআর < বিচার। বিহরিউ < বিহরিত, অর্থ 'বিফলীকৃত'।

বাচ্যার্থ ॥ ১-২. যেখানে মন ইন্দ্রিয় পবন নষ্ট হয়, [সেখানে] জানি না আত্মা (= চিত্ত) কোথায় গিয়ে প্রবেশ করল। ৩-৪. করুণাডমরুটি আশ্চর্যভাবে বাজছে। আর্যদেব শূন্যে ('নিরালম্বে') বিরাজ করছে। ৫-৬. চাঁদে যেমন জ্যোৎস্না (= চন্দ্রকান্তি) প্রতিভাসিত হয় [অথবা টীকা অনুসারে 'চাঁদের জ্যোৎস্না যেমন (চাঁদের সঙ্গেই) প্রতিভাত হয়]' [এবং চাঁদ না থাকলে যেমন জ্যোৎস্নাও থাকে না], [তেমনি] চিত্ত বিকরণ (বিকরণ = করণহীন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যহীন) হলে [তার বিকল্পাবলীও] সেখানে টলে পড়ে (অর্থাৎ থাকে না)। ৭-৮. ভয়, ঘৃণা [ও] লোকাচার ছাড়া হল। দেখতে দেখতে শূন্য বিচার। ৯-১০. আর্যদেবের দ্বারা সকল [সংসারদোষ] বিনষ্ট হল। ভয় ঘৃণা দূরে নিবারিত হল।

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা ॥ আলোচ্য চর্যায় সাংবৃতিক বোধিচিত্ত প্রকৃতিদোষমুক্ত হয়ে কিভাবে প্রকৃতি প্রভাস্বর পারমার্থিক অবস্থায় উপনীত হয় তারই তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। প্রভাস্বর শূন্যতায় মন, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যের কারণস্বরূপ চিত্তপবন বিনষ্ট হয় অর্থাৎ যে সব উপায়ে বিষয়ের উপলব্ধি ঘটে সেই সব মননেন্দ্রিয়াদির কার্য লুপ্ত হয়। এই অবস্থায় বোধিচিত্ত কোথায় প্রবেশ করে তাও সঠিক নির্দেশ করা সম্ভব নয়, কেন না চিত্তের এই অবস্থা বুদ্ধি বা বচনের অধিগম্য নয়। বোধিচিত্ত এই পারমার্থিক অবস্থায় লীন হলে করুণারূপ ডমরু থেকে এক আশ্চর্য অনাহত ধ্বনি উত্থিত হয় এবং চর্যাকার আর্যদেব তখন সর্বধর্মের উপলব্ধিহীন হয়ে নিরালম্বভাবে বিরাজ করেন। বোধিচিত্তের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আর্যদেব বলছেন যে, চাঁদের জ্যোৎস্না যেমন বিশেষভাবে চন্দ্রোদয়ের উপরই নির্ভরশীল এবং চাঁদ অস্ত গেলে যেমন জ্যোৎস্নারও অবসান হয় ঠিক তেমনি চিত্ত যতক্ষণ ইন্দ্রিয়ের প্রভাবে চঞ্চল থাকে ততক্ষণই বিষয়াদির অস্তিত্বসংক্রান্ত চিত্তবিকল্প বজায় থাকে, কিন্তু চিত্ত যখনই ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য থেকে মুক্ত হয়ে প্রভাস্বর-শূন্যতায় প্রবেশ করে চিত্তের বিকল্পজালও তখনই বিলুপ্ত হয়। এইজন্য চর্যাকার আর্যদেব ভয়, ঘৃণা প্রভৃতি লোকাচার ত্যাগ করে গুরুনির্দিষ্ট পথে দৃষ্টি রেখেছেন এবং এই পথ অনুসরণ করতে করতে শেষ পর্যন্ত সব কিছুই যে শূন্যময় এই ধারণায় উপনীত হয়েছেন। সব কিছুকেই শূন্যময় বলে মনে করায় তিনি যাবতীয় সংসার-দোষ বিনষ্ট করেছেন এবং ভয়ঘৃণাদি দূর করে শূন্যতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন ॥

৩২

[পুথিপৃষ্ঠা ৪৭ ।ক]

॥রাগ[১] দেশাখ[১]— সরহপাদানাম্ ॥

নাদ ন বিন্দু ন রবি ন সসিমণ্ডল[২] ।[২]
চিঅরাঅ সহাবে মুকল ॥ ধ্রু ॥
[৩]উজুরে[৩] [৪]উজু[৪] ছাড়ি মা লেহুরে [৫]বঙ্ক[৫] ।
[৬]নিঅহি[৬] বোহি মা জাহুরে লাঙ্ক ॥ ধ্রু ॥
হাথেরে [৭]কাঙ্কাণ[৭] মা[৮] লোউ দাপণ ।
অপণে অপা বুঝ তু নিঅমণ ॥ ধ্রু ॥
পার উআরেঁ সোই গজিই ।
দুজ্জন সাঙ্গে[৯] অবস মরি[৯] জাই ॥ ধ্রু ॥
বাম দাহিণ জো খাল [১০]বিখলা[১০] ।
সরহ ভণই বপা[১১] উজুবাট[১২] ভাইলা[১২] ॥ ধ্রু ॥

পাঠান্তর ॥

১—১ দেশাখ (বাগচী. শহী) ২—২ পুথিতে যতিচিহ্ন নেই।
৩—৩ দুদ্দুরে (সেন) উজুরে (বাগচী. শহী)।
৪—৪ উজু (বাগচী. শহী) ৫—৫ বাঙ্ক (বাগচী, শহী)
৬—৬ নিঅড়ি (বাগচী, শহী) ৭—৭ কাঙ্কণ (বাগচী, শহী)
৮—৮ লেউ (বাগচী) ৯—৯ অবসরি (পুথি, সেন)
১০—১০ বিখালা (শহী) ১১—১১ বাপা (বাগচী)
১২—১২ ভইলা (বাগচী)

পাঠবিচার ও শাব্দিক টীকা। নাদ-বিন্দু, রবি-শশী— বৌদ্ধতন্ত্রে এই দুটি যুগ্মক দক্ষিণগা-বামগা নাড়ী তথা দ্বৈতাভাসের প্রতীক। চিঅরাঅ < চিত্তরাজ। মুকল— মুক্ত > মুক্ক + অল (অতীত বাচক) = মুকল। উজ্জু < ঋজু। 'উজু' এখনো রাজসাহী ও বগুড়া জেলায় প্রচলিত। দ্র. আ ভাঅ, ১ম খণ্ড, পৃ ১৩৭। বঙ্ক < বক্র। নিঅহি— নিকট > নিঅ > নিঅ + হি = নিঅহি = নিকটে। পাঠান্তর নিষ্প্রয়োজন। লাঙ্ক < লঙ্কা, দূরদেশ অর্থে। উআরে— অবতারেণ > উআরেং > উআরেঁ, অর্থ '(পারে) অবতরণ করলে, টীকা অনুসারে পাঠান্তর 'পারোআরে'। গজিই—গম্যতে > গমিজ্জই > গইজ্জই > গজিই। তিব্বতী অনুবাদের gro-ba = go, move গজিই পাঠ সমর্থন করে। বাগচী টীকার 'মজ্জন্তি' পদের সূত্র ধরে 'মজিই' পাঠ নির্দেশ করেছেন। শহীদুল্লাহ্‌র পাঠ সিঝই < সিধ্যতে। মজিই— *মজ্যতে > মজিঅই > মজিই। পুথির পাঠ অর্থহীন নয়, কাজেই পাঠান্তর কল্পনা বৃথা। অবসরি < অপসারিত। শহীদুল্লাহ্ তিব্বতী অনুবাদের 'chi-bar' gyur = 'মৃত্যুং যাতি' = মরে যায়— এই বাক্যাংশ অনুসরণ করে 'অবস মরি জাই' পাঠান্তর কল্পনা করেছেন। 'অবসরি' পাঠের অর্থকৃচ্ছ্রতা লক্ষ্য করে শহীদুল্লাহ-এর পাঠ সংগততর মনে হয়। বিশেষত পুথিতে যখন 'স' ও রি-র মাঝে কিছু লেখার আবছা আভাস পাওয়া যায়। ভাইলা— ভাত > ভাঅ + ইলা (ইল্ল অতীত বাচক) = ভাইলা। পুথির পাঠ অর্থবহ, কাজেই পাঠান্তর নিষ্প্রয়োজন।

বাচ্যার্থ। ১-২. নাদ নাই, বিন্দু নাই, শশিমণ্ডল নাই। চিত্তরাজ স্বভাবতই মুক্ত। ৩-৪. ওরে [এই পথ বড়] সোজা, সোজাকে ছেড়ে বাঁকাকে নিস না। নিকটেই বোধি, লঙ্কায় যাস না। ৫-৬. ওরে, হাতে কঙ্কণ, দর্পণ নিস না। আপনা আপনি তুই নিজের মনকে বোঝ। ৭-৮. পারে অবতরণ করলে সে-ই অগ্রসর হয়। [কিন্তু] দুর্জন সঙ্গে [থাকলে] অবশ্যই মারা যায়। ৯-১০. বামে ডানে যা [তা হল] খাল [আর] ডোবা। সরহ বলে— বাপু, সোজাপথ [সামনেই] দেখা যাচ্ছে।

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা। আলোচ্য চর্যায় মূলত সহজমার্গের স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। নাদ বিন্দু, রবিশশী ইত্যাদি বিকল্পাত্মক দ্বৈতজ্ঞানের প্রভাবেই চিত্ত বদ্ধদশা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যিনি গুরুর প্রসাদে পরমতত্ত্ব উপলব্ধি করেছেন তাঁর চিত্তে এই বিকল্পজ্ঞানের অস্তিত্ব নেই, তাঁর বোধিচিত্ত বিশুদ্ধ হয়ে প্রকৃতি প্রভাস্বর শূন্যস্বরূপে বিরাজ করে। এই প্রভাস্বর শূন্যতাকে লাভ করার একমাত্র উপায় সহজমার্গ, এছাড়া অপর যে কোন পথই বক্র

বা বাধাযুক্ত। বোধি বা মহাসুখচক্র নিকটেই বর্তমান, তার অন্বেষণে লঙ্কার মত দূরদেশে যাবার প্রয়োজন নেই। দেহের মধ্যেই এই মহাসুখচক্রের অধিষ্ঠান এবং যৌগিক উপায়ে দেহের অবধূতী নাড়ীতে বোধিচিত্তকে ঊর্ধ্বগামী করলেই তা শেষ পর্যন্ত মহাসুখচক্রে উপনীত হয়। সাধ্য ও সাধন উভয়ই যখন সাধকের নিজদেহের মধ্যেই বিদ্যমান তখন সিদ্ধির জন্য জপতপস্যা ও শাস্ত্রালোচনার মত বাহ্য সাধনার প্রয়োজন নেই। হাতের কাঁকন দেখতে যেমন দর্পণের দরকার হয় না, ঠিক তেমনি যে সহজানন্দ দেহের মধ্যেই প্রাপ্য, তার জন্য তপশ্চর্যা, শাস্ত্রচর্চাদি দেহ-বাহ্য সাধনার কোন প্রয়োজনই নেই। নিজের মনেই নিজের বোধিচিত্তের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করলে সিদ্ধিলাভ ঘটে। যিনি এইভাবে সহজমার্গ অনুসরণ করেন তিনি ভবসমুদ্রের পরপারে উত্তীর্ণ হন, কিন্তু এই সময়ে যদি মোহাদিদুর্জনের সংসর্গ ঘটে, তবে সহজমার্গ থেকে বিচ্যুত হয়ে মৃত্যুতুল্য সংসার-সমুদ্রে পতিত হতে হয়। সরহ তাই উপদেশচ্ছলে বলছেন যে, মহাসুখপুরগমনের সহজমার্গের দুই ধারে পথ বলে যা রয়েছে তা আসলে সংসাররূপ-দুই গর্ত। মোহাভিভূত মানুষ ভ্রান্তি বশে এই গর্তে পতিত হয়, কিন্তু মহাসুখপুর-গমনের পক্ষে এই দুই গর্তের মধ্যবর্তী সহজমার্গই অতীব সুগম।

৩৩
[পুথিপৃষ্ঠা ৪৮ ।ক]
॥রাগ পটমঞ্জরী—[১]টেণ্টণ[১] পাদানাম্ ॥

টালত মোর ঘর নাহি [২]পড়বেষী[২]।
[৩]হাড়ীত[৩] ভাত [৪]নাঁহি[৪] নিতি আবেশী ॥ ধ্রু ॥
[৫]বেঙ্গসঁ সাপ[৫] [৬]বড়হিল জাঅ[৬]।
দুহিল দুধু কি বেণ্টে [৭]ষামাঅ[৭] ॥ ধ্রু ॥
[৮]বলদ[৮] বিআএল গবিআ [৯]বাঝেঁ[৯]।
পিটা দুহিএ এ তিনা [১০]সাঁঝে[১০] ॥ ধ্রু ॥
জো সো [১১]বুধী[১১] [১২]সৌ নিবুধী[১২]।
জো যো [১৩]চৌর[১৩] [১৪]সৌ দুষাধী[১৪] ॥ ধ্রু ॥
[১৫]নিতে নিতে[১৫] ষিআলা ষিহে যম জুঝঅ।
টেণ্টণ পাএর গীত [১৬]বিরলেঁ[১৬] বুঝঅ ॥ ধ্রু ॥

পাঠান্তর।

১—১ ঢেণ্ঢণ (শাস্ত্রী, বাগচী, শহী, সেন)
২—২ পড়বেশী (বাগচী) পড়বেসী (শহী)
৩—৩ হণ্ডী (টীকা)
৪—৪ নাহি (বাগচী, শহী)
৫—৫ বেঙ্গ সংসার (শাস্ত্রী) বেগ সংসার (সেন) বেঙ্গস সাপ (বাগচী)
৬—৬ চঢ়িল জাই (শহী)
৭—৭ সামাই (শহী)
৮—৮ বলদা (টীকা)
৯—৯ বাঁঝে (বাগচী, শহী)

১০—১০ সাঁঝে (পুথি) ১১—১১ বুদ্ধি (টীকা)
১২—১২ সোহি নিবুধী (শহী) ১৩—১৩ চোর (বাগচী, শহী)
১৪—১৪ সোই সাধী (বাগচী) সোহি সাধী (শহী)
১৫—১৫ নিতি নিতি (টীকা, বাগচী, শহী) ১৬—১৬ বিচিরলেঁ (পুথি)

পাঠবিচার ও শাব্দিক টীকা ॥ টেণ্টণ < টেংটজন ; টেংটা = জুয়ার আড্ডা (দেশীনামমালা), টেণ্টণ = (১) জুয়াড়ি, (২ ধূর্ত, চতুর। এখানে সম্ভবত দ্বিতীয় অর্থটি গ্রাহ্য, কারণ গানটির মধ্যে বেশ চাতুর্যের পরিচয় আছে। 'টেণ্টণপাদ' হয়ত কবির স্বনাম নয়, ছদ্মনাম। কবি হয়ত এই ধরনের চতুর প্রহেলিকাপূর্ণ পদ রচনায় অভ্যস্ত ছিলেন বলেই তিনি এই ছদ্মনাম নিয়েছিলেন। চর্যাপুথিতে 'ট' ও 'ঢ'-এর লিপি দেখতে একরকম। সেইজন্য শাস্ত্রী-প্রমুখ 'ঢেণ্ঢণপাদ' পাঠ নিয়েছেন। 'ঢেণ্ঢণ' পাঠটি গ্রহণযোগ্য হত, যদি তার কোন অর্থ থাকত ; কিন্তু পদটি অর্থহীন। পক্ষান্তরে 'টেণ্টণ' কথাটি জুয়াড়ি ও ধূর্ত অর্থে রাজশেখরের কর্পূরমঞ্জরী, দেশীনামমালা, বর্ণরত্নাকর, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি রচনায় ব্যবহৃত হয়েছে। আধুনিক কথ্য বাংলায় 'চতুর' অর্থে টেঁটন ও 'টেঁটিয়া' পদের প্রচলন আছে। প্রকৃতপক্ষে 'টেণ্টণ' কথাটির মূল অর্থ জুয়াড়ি, তার সম্প্রসারিত অর্থ ধূর্ত, কারণ জুয়াড়িরাই তো ধূর্ত হয়। কাজেই 'ঢেণ্ঢণ'-এর বদলে 'টেণ্টণ' পাঠই গ্রহণযোগ্য। টালত— টাল + ত (অন্তঃজাত অধিকরণবিভক্তি)। 'টাল'-এর অর্থ উঁচু জায়গা, অর্থ প্রসারে নগর, জনপদ। তিব্বতীতে groṅ khyer = নগর। উত্তরবঙ্গে এখনো টাড়(ড়ি) + পাড়া, পল্লী (দ্র. বাংলা ভাষার অভিধান-জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস)। আবেশী < আবেশিক, অর্থ 'অতিথি'। বেঙ্গ-ইত্যাদি তৃতীয় ছত্রটির পাঠ ও অর্থের শুদ্ধতা নিয়ে সংশয় আছে। পুথিতে আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় 'বেগ সংসার বড় হিল জাঅ'—সেন এই পাঠের অর্থ করেছেন 'বেগে সংসার বর্ধিত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে' ; কিন্তু এই অর্থ তিব্বতী অনুবাদ ও টীকার ভাবার্থের সঙ্গে খাপ খায় না। তিব্বতী অনুবাদে এই ছত্রের রূপান্তর sbal payis ni sbrul ñid 'ded pa nid-du byed = সাপও ব্যাঙের দ্বারা আক্রান্ত হয় ; টীকায় আছে 'বেঙ্গেত্যাদি ...তেন ব্যঙ্গেন প্রভাস্বরেণ বিজ্ঞানপরশ্চোদিতঃ' = সেই প্রভাস্বর ব্যঙ্গের দ্বারা বিজ্ঞানপর চোদিত (তাড়িত) হয়। তিব্বতী অনুবাদ ও টীকা থেকে বোঝা যায়, ছত্রটির বাক্য কর্মবাচ্যে গঠিত, ছত্রের প্রথম পদটির শুদ্ধ পাঠ 'বেগ' নয়, 'বেঙ্গ' (পুথিতে সম্ভবত নাসিক্যধ্বনির চিহ্ন ছাড় পড়েছে) এবং 'বেঙ্গ' পদে অনুক্ত কর্তার বিভক্তি যুক্ত থাকার কথা। সাধারণভাবে এক্ষেত্রে 'এঁ' বিভক্তি যুক্ত হওয়াই রীতি, কিন্তু এক্ষেত্রে তা হয় নি, এখানে যে বিভক্তি ব্যবহৃত হয়েছে তা হল সঁ < সম। 'সঁ' বিভক্তি মধ্য বাংলায় ব্যবহৃত না হলেও আদি মধ্য মৈথিলী ও পূর্বী হিন্দীতে ব্যবহৃত হবার নজির আছে। অন্যদিকে, 'সঁসার' পদটির 'র' হরফটি অন্য জায়গার 'র'-এর থেকে ঈষৎ পৃথক দেখায়, এটি সম্ভবত 'র' নয়, 'প' ; কাজেই পুথির 'বেগ সংসার' পদ দুটির সঠিক পাঠ 'বেঙ্গসঁ সাপ' = বেঙের দ্বারা সাপ। বড়হিল— বর্ধিত > বড়হিঅ + ইল (অতীতবাচক) = বড় হিল। 'বর্ধ্' ধাতুর অর্থ কাটা, ছেঁড়া, খণ্ড করা (দ্র. SED)।

বড়হিল-তে অর্থোদ্ধার হওয়ায় 'চঢ়িল' পাঠ নিষ্প্রয়োজন। দুহিল— *দুহিত (= দুগ্ধঃ) > দুহিঅ + ইল (অতীত বাচক) = দুহিল (বিশেষণ)। দুধ— দুগ্ধ > দুদ্ধ > দুধ (= দূধ) > দুধু (স্বরসঙ্গতি)। বেণ্টে < বৃন্তে। যামাঅ—সমায়াতি > সমাআই > *সমাই > সামাই (স্বরসঙ্গতি) > সামাঅ (= যামাঅ, লিপিবৈচিত্র্যে, মূর্ধন্য য)। বিআএল— বিজাত > বিআঅ + (ই)ল (অতীতবাচক) = বিআঅল, বিআএল। বাঁঝে < বন্ধ্যা। দুহিএ-দুহ্যতে > দুহিঅই > দুহিএ। তিনা— ত্রীণি > তিণ্নি > তিনি, তিনা। বুধী < বুদ্ধি। সৌ— স খলু > স + উ > সউ > সৌ। নিবুধী < নির্বুদ্ধি। পুথির পাঠ 'সৌ ধনি বুধী'। ধনি < ধন্য অর্থাৎ পুথির পাঠে 'সেই বুদ্ধির' প্রশস্ততা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু টীকায় 'সেই বুদ্ধি'র নিকৃষ্টতা কথিত হয়েছে। মনে হয় টীকাকার 'সৌ নিবুধী' পাঠ পেয়েছিলেন। তিব্বতী অনুবাদের blo-med-pa (= নির্বুদ্ধি) এই পাঠান্তরের সম্ভাবনা দৃঢ়তর করে। দুষাধী < দৌঃসাধিক। তিব্বতী অনুবাদে আছে mkhar srun̄s = guardian of the fortress (Kvaerne) কোটাল। ষিআলা < শৃগাল। ষিহে— সিংহেন > সিহেঁ = ষিহে। যম = সম (অনুসর্গ)। জুঝঅ < যুধ্যতে। বিরলেঁ— পুথির 'বিচিরলেঁ' সম্ভবত লিপিভ্রম।

বাচ্যার্থ ॥ ১—২. লোকালয়ে আমার ঘর, [অথচ] প্রতিবেশী নেই। হাঁড়ীতে ভাত নেই, [অথচ] নিত্যই অতিথির আগমন। ৩—৪ ব্যাঙের দ্বারা সাপ কাটা পড়ে। দোয়া দুধ, কি [আশ্চর্য], [পুনরায়] বাঁটে ঢোকে। ৫—৬. বলদ প্রসূতি, গাই বন্ধ্যা। পাত্রে দোহন করা হয় এই তিন সন্ধ্যা। ৭—৮. যা সেই বুদ্ধি, তা-ই নিকৃষ্ট বুদ্ধি। যে সে চোর,সে-ই কোটাল। ৯—১০. নিতি নিতি শিয়াল সিংহের সঙ্গে জোঝে। টেণ্টণপা-এর গীত কদাচিৎ বোঝা যায়।

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা ॥ সন্ধ্যাবচনের গূঢ়তায় ও বিরোধাভাসের প্রচ্ছন্নতায় আলোচ্য চর্যাটি একটি পূর্ণাঙ্গ প্রহেলিকায় পরিণত হয়েছে। সন্ধ্যার্থ অনুযায়ী বিভিন্নপদের আভিপ্রায়িক অর্থ : টাল=মহাসুখচক্র, পড়বেষী = চন্দ্রসূর্যরূপ দ্বৈতাভাস ও পার্শ্বস্থ দুই নাড়ী, হাঁড়ী = দেহভাণ্ড, ভাত = সংবৃতিবোধিচিত্ত, বেঙ্গ = ব্যঙ্গ বা বিগতাঙ্গ প্রভাস্বর শূন্যতা, দুহিল দুধ = বোধিচিত্ত, বেণ্ট = মহাসুখচক্র পথ, বলদ = অবিদ্যাচিত্ত, গবিআ = নৈরাত্মা, পীঠ = প্রকৃতিদোষ, দোহন = নিঃস্বভাবীকরণ, বুধী = মননেন্দ্রিয়-প্রধান বালযোগীদের সবিকল্পজ্ঞান। চোর = প্রকৃতিদোষহরণকারী, সিয়াল = অপরিশুদ্ধ চিত্ত, সিংহ = প্রকৃতিপ্রভাস্বর বিশুদ্ধ চিত্ত।

এই প্রহেলিকার অন্তরালে আসলে চর্যাকারের মহাসুখলাভের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। টাল অর্থাৎ কায়বাক্‌চিত্তের একশো ষাট্‌টি প্রকৃতি দোষ যেখানে লয় প্রাপ্ত হয় (ট = অসদ্‌রূপ প্রকৃতিদোষসমূহ + আল = লয় প্রাপ্ত) সেই মহাসুখচক্রই সাধকের গৃহ। প্রকৃতিদোষ লুপ্ত হলে চন্দ্রসূর্যরূপ দ্বৈতাভাস লুপ্ত হয়, সেই কারণে গ্রাহ্যগ্রাহকভাবরূপ প্রতিবেশী সেখানে অনুপস্থিত। প্রকৃতিদোষ নিরাকৃত হওয়ায় দেহভাণ্ডে আর বোধিচিত্তের অবিদ্যা-বিক্ষুব্ধ সাংবৃতিক রূপটি নেই, পরম বিশুদ্ধ হয়ে তা পারমার্থিকরূপে প্রকৃতি প্রভাস্বর শূন্যতায় প্রবিষ্ট। সংবৃতি বোধিচিত্তের যে ভববিকল্প তা-ই তারস্বকায় বা অঙ্গ, কিন্তু সাংবৃতিক

অবস্থা দূর হলে এই অঙ্গেরও বিলোপ ঘটে, তখন শূন্যতার চিত্তে যে বিগতাঙ্গ শূন্যতা দেখা দেয় সেই প্রভাস্বর শূন্যতাই বোধিচিত্তকে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের দিকে চালিত করে। এই অবস্থায় বোধিচিত্ত বিস্ময়করভাবে বজ্রাগার থেকে মহাসুখচক্রে প্রবেশ করে।

সাংবৃতিক ও পারমার্থিক—চিত্তের এই দুই অবস্থা বোঝাতে প্রসূতি বলদ ও বন্ধ্যা গাভীর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। সাংবৃতিক বোধিচিত্তই অবিদ্যার প্রভাবে এই রূপ-জগৎ প্রসব করে (বল = রূপ + দ = দদাতি) এবং চিত্তে যখন প্রকৃতিদোষ দূরীভূত হয় তখন তার জগৎ সৃষ্টি করার ক্ষমতাও লুপ্ত হয় এবং বোধিচিত্ত তখন পারমার্থিকরূপ লাভ করে প্রভাস্বর শূন্যতায় অধিষ্ঠিত হয়। এই কারণেই যোগী অহোরাত্র প্রকৃতিদোষসমূহ দূর করে চিত্তকে নিঃস্বভাবীকৃত করেন। পরমার্থতত্ত্ববিদ্ যোগীরা এই অবস্থায় নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন থাকেন বলে তাঁরা বালযোগীদের সবিকল্প জ্ঞান উপলব্ধি করেন না। সবিকল্প জ্ঞান তাঁদের কাছে নিকৃষ্ট জ্ঞান বলে প্রতিভাত হয়। বালযোগীদের চিত্ত সবিকল্পজ্ঞানের দ্বারা বিষয়সুখ হরণ করে বলে তা চোরের সঙ্গে তুলনীয়, কিন্তু ঐ একই চিত্ত যদি পরমার্থরূপ নির্বিকল্প জ্ঞানলাভ করে তবে তা দুঃসাধ্য পরমার্থতত্ত্ব লাভ করে। মরণাদি ভয়ে অবিদ্যাচিত্ত সর্বদা শৃগালবৎ সন্ত্রস্ত, কিন্তু যখন তা বিশুদ্ধি অর্জন করে তখন সহজানন্দরূপ সিংহের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয় অর্থাৎ তাকে আয়ত্ত করতে উৎসুক হয়।

টেণ্টণপাদের এই গান তত্ত্বের গূঢ়তায় ও ভাষার প্রচ্ছন্নতায় সাধারণ মানুষের কাছে দুর্বোধ্য। যাঁরা পরমার্থতত্ত্ব অবগত আছেন, তাঁরাই কেবল এর অর্থ উপলব্ধি করতে সক্ষম ॥

৩৪

[পুথিপৃষ্ঠা ৪৯। খ—৫০। ক]

॥ রাগ বরাড়ী—দারিকপাদানাম্ ॥

[১]সুনকরুণরি[১] [২]অভিনচারেঁ[২] [৩]কাঅবাক্‌চিঅ[৩]।
[৪]বিলসই[৪] দারিক গঅণত পারিমকুলেঁ ॥ ধ্রু ॥
[৫]অলক্ষ[৫] লখচিত্তা মহাসুহেঁ।
বিলসই দারিক গঅণত পারিমকুলেঁ। ধ্রু ॥
[৬]কিন্তো মন্তে[৬] কিন্তো তন্তে কিন্তো রে ঝাণবখানে।
অপইঠান [৭]মহাসুহলীলে [৮]দুলখ পরম নিবাণেঁ ॥ ধ্রু ॥
দুঃখেঁ সুখেঁ একু করিআ ভুঞ্জই[৯] ইন্দী জানী[৯]।
স্বপরাপর ন চেবই দারিক সঅলানুত্তর মাণী ॥ ধ্রু ॥
রাআ রাআ রাআ রে অবর রাঅ[১০] মোহে রেঁ[১০] বাধা।
লুইপাঅ[১১] পএ[১১] দারিক দ্বাদশভুঅণেঁ [১২]লবা[১২] ॥ ধ্রু ॥

পাঠান্তর ॥

১—১. সুণকরুণ রে (বাগচী)। সূণ করুণরে (শহী)। সুন করুরি (পুথি), পুথিতে ঠিক পরের লাইনে সমান্তরাল জায়গায় একটি অস্পষ্ট অক্ষর আছে, সেটি কি 'ণ' ?

২—২ অভিনবারেঁ (পুথি, শাস্ত্রী)

৩—৩ পুথিতে ক্ + চ্ যুক্তাক্ষর, পরে দাঁড়ি নেই। কাঅবাক্‌চিএঁ (বাগচী, শহী)

৪—৪. পুথিতে বিলসঅই লিখে 'অ' কাটা হয়েছে।

৫—৫ অলখ (টীকা, শহী) অলক্‌খ (বাগচী)

৬—৬ কিন্তো। কমন্তে (পুথি) ৭—৭ মহাসুহলীণেঁ (টীকা)

৮—৮ ইন্দী জালী(শহী) ৯—৯ মোহেরা (পুথি)

১০—১০ পসাএঁ (টীকার 'প্রসাদেন' অনুসারে শহী)

১১—১১ লাধা (বাগচী, শহী)

পাঠবিচার ও শাব্দিক টীকা ॥ করুণরি—করুণ (।) + র + ই (স্ত্রী প্রত্যয়) = করুণরি, কিন্তু এক্ষেত্রে স্ত্রীপ্রত্যয় যুক্ত হবার কোন ব্যাকরণসম্মত কারণ নেই, কেননা এই পদের সঙ্গে সম্বন্ধ পদ 'অভিনচার' স্ত্রীলিঙ্গ নয়। এদিক থেকে 'সুণকরুণার'পাঠই সঙ্গত। পারিম—পার + ডিম = পারিম, অর্থ 'অন্তিম'। কিন্তো—কিং + তো। মন্তে < মন্ত্রেণ। তন্তে < তন্ত্রেণ। ঝাণ < ধ্যান। বখানে< ব্যাখ্যানেন। অপইঠান < অপ্রতিষ্ঠান, অর্থ 'প্রতিষ্ঠাহীন'। মহাসুহলীলেঁ—পাঠান্তর 'মহাসুহলীণেঁ (টীকা)। দুলখ < দুর্লক্ষ্য। একু—এক > এক্ক > একু। ভুঞ্জই—*ভুঞ্জতি (= ভুঙ্‌ক্তে > ভুঞ্জই। ইন্দী—ইন্দ্রিয় > ইন্দিঅ > ইন্দী। জানী—*জানিত (=জ্ঞাত) > জাণিঅ > জানী। চেবই—চেতয়তি > চেঅঅই > চেঅই > চেবই (ব-শ্রুতি)। সঅলানুত্তর > সকল + অনুত্তর। মাণী < মানিত। রাআ < রাজা। অবর < অপর। বাধা < বন্ধক। লধা < লব্ধ।

বাচ্যার্থ ॥ ১—২, শূন্য-করুণার অভিন্নাচারে কায়-বাক-চিত্ত [নিয়ে] দারিক গগনে [র] অন্তিম কূলে বিলাস করে। ৩—৪, চিত্তের [উৎপাদন ক্ষমতারূপ] লক্ষণ অলক্ষ্য হওয়ায় দারিক মহাসুখে গগনের অন্তিম কূলে বিলাস করে। ৫—৬, কি [হবে] তোর মন্ত্রে, কি তোর তন্ত্রে, কি, ওরে, তোর ধ্যানে-ব্যাখ্যানে, [যখন]মহাসুখলীলায় প্রতিষ্ঠা না হলে পরম নির্বাণ দুর্লক্ষ্য [থাকে]। ৭—৮, দুঃখ-সুখকে এক [মনে] করে জ্ঞানী ইন্দ্রিয় ভোগ করে। সকল [-ই] অনুত্তর [এই কথা] মেনে দারিক আত্ম-পর [ভেদ] বোধ করে না। ৯—১০.রাজা, রাজা, রাজা—ওরে, আর [সব] রাজাই মোহে বদ্ধ। [কিন্তু] লুইপাদের প্রসাদে দারিক দ্বাদশভুবনে লব্ধ [বা দ্বাদশ ভুবনের রাজা]।

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা ॥ আলোচ্য চর্যায় সর্বশূন্যে চিত্তের লয়প্রাপ্তি ও মহাসুখলাভে ধ্যান-শাস্ত্রব্যাখ্যার অনুপযোগিতার কথা বিবৃত হয়েছে। এই অবস্থায় চিত্তের যে সাধারণ লক্ষণ উৎপাদন-ক্ষমতা তা অলক্ষ্য অর্থাৎ বিনষ্ট হয়ে দারিকপাদের চিত্ত শূন্যতার যে সর্বশেষ চতুর্থ স্তর সেই প্রকৃতিপ্রভাস্বর সর্বশূন্যে অধিষ্ঠিত হয়েছে। এই অবস্থায় উপনীত হয়ে দারিকপাদ প্রভাস্বরশূন্যতার পরমপারে মহাসুখে বিলাস করছেন। সর্বশূন্যরূপ এই

যে পরম নির্বাণ তা মহাসুখে অধিষ্ঠিত না হলে লাভ করা যায় না, সেই কারণে মন্ত্র, তন্ত্র, ধ্যান বা শাস্ত্র-ব্যাখ্যা কোন কিছুরই সার্থকতা নেই। কেন না মন্ত্রতন্ত্রাদির লক্ষ্য বাহ্য প্রাপ্তি, কিন্তু মহাসুখের সাধনা অন্তর্মুখী। তত্ত্বজ্ঞানী গুরুর উপদেশ অনুসারে দুঃখকে মহাসুখে পরিণত করে ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ ভোগ করেন। দারিকও এই উপায়ে চরম সিদ্ধি লাভ করে আত্মপরভেদরহিত হয়েছেন। কায়-বাক্-চিত্তের ঐশ্বর্যসম্পন্ন যে সব ব্যক্তি ও দেবতাকে রাজা বলা হয়ে থাকে তাঁরা রাজা হলেও তাঁদের আধিপত্য বিষয়মোহের সীমায় আবদ্ধ, কিন্তু দারিকপাদ গুরু লুইপাদের অনুগ্রহে যে নির্বাণ লাভ করেছেন তাতে তিনি দ্বাদশভুবনের অধীশ্বর হয়েছেন অর্থাৎ সমস্ত পার্থিব মোহের ঊর্ধ্বে তাঁর প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

৩৫

[পুথিপৃষ্ঠা ৫১। ক-খ]

॥ রাগ মল্লারী—ভাদেপাদানাম্ ॥

এতকাল[১] হাঁউঁ[১] [২]অচ্ছিলেঁসু মোহেঁ।[২]
এবেঁ মই বুঝিল সদ্‌গুরু বোহেঁ ॥ ধ্রু ॥
এবেঁ চিঅরাঅ মকুঁ ণঠা।
[৩]গঅণ[৩] সমুদেঁ টলিআঁ পইঠা ॥ ধ্রু ॥
পেখমি দহদিহ সব্বই শূন।
চিঅ বিহুন্নে পাপ ন পুন্ন ॥ ধ্রু ॥
[৪]রাবুলেঁ[৪] দিল [৫]মোহকখুঁ[৫] ভণিআ।
মই অহাবিল গঅণত পণিআঁ ॥ ধ্রু ॥
[৬]ভাদে[৬]ভণই অভাগে লইআ।
চিঅরাঅ মঁই অহার কএলা ॥ ধ্রু ॥

পাঠান্তর ॥

১—১ পুথিতে 'অহাউঁ লিখে কাটা হয়েছে। হঁউ (বাগচী, শহী)।
২—২ অচ্ছিলেঁ স্বমোহে (শাস্ত্রী), অচ্ছিল স্বমোহে (বাগচী), অচ্ছিলোঁ স্বমোহেঁ (শহী)
৩—৩ গণ (পুথি) ৪—৪ বাজুলে (টীকা, বাগচী, শহী)
৫—৫ মো লক্‌খু (বাগচী), মো লক্‌খ (শহী)
৬—৬ ভাবে (পুথি)

পাঠবিচার ও শাব্দিক টীকা ॥ হাঁউ—অহকং > হকং > হউঁ > হঁউ, হাঁউ। অচ্ছিলেঁসু—অচ্ছ (অস্ ধাতু জাত) + ইল (অতীতবাচক) + এসু (উত্তম পুরুষ বিভক্তি) = অচ্ছিলেঁসু : টীকায় শুধু 'মোহমিতি' আছে, কাজেই পাঠান্তর নিষ্প্রয়োজন। এবেঁ—এতদ্বৎ > এঅব্ব > এবে, এবেঁ। মই—ময়া > মএ > মই। বুঝিল—*বুদ্ধিত্ব (=বুদ্ধ) > বুজ্‌ঝিঅ + ইল > বুঝিল। বোহেঁ < বোধেন। চিঅরাঅ < চিত্তরাজ। মকুঁ—ময়া > মই, ম-

(প্রাতিপদিক) + কৃত > কুঅ > কু = মকু (মকুঁ), অর্থ 'আমার'। ণঠা < নষ্ট। পইঠা < প্রবিষ্ট। পেখমি—পেখ < প্রেক্ষ্ + মি (< স্মি) = পেখমি। দহদিহ < দশদিশ। বিহুন্নে—*বিধুন, বিভুন > বিহুন, বিহুন্ন + এ (করণ-অধিকরণ বিভক্তি) = বিহুনে, বিহুন্নে। রাবুলেঁ—রাজকুলেন > রাঅউলেং > রাউলেঁ > রাবুলেঁ (ব-শ্রুতি), রাবুল = রাজপুরুষ, গুরু। পাঠান্তরও গ্রাহ্য। বাজুলে > বজ্রকুলেন। মোহ < মহ্যং। কখু < কক্ষ, মোহ কখু = আমার কাছে। তিব্বতী অনুবাদে bda- la mtshan-ma (=আমাকে লক্ষ্য) ও টীকাতেও 'লক্ষ্যমিতি...মহ্যং' দেখে মনে হয় পাঠান্তর প্রচলিত ছিল। অহারিল—আহৃত > অহারিঅ (বর্ণবিপর্যয় + ইল (অতীতবাচক) = অহারিল। পণিআ < পানীয়। ভাদে—কবিনাম ; পুথিতে মূল গানে 'ভাবে' আছে, কিন্তু গানের মাথায় 'ভাদে' ও টীকায় 'ভদ্রপাদ' আছে। কএলা—কৃত > কঅ + ইলা (অতীতবাচক) = কএলা।

বাচ্যার্থ ॥ ১—২. এতকাল আমি ছিলাম মোহে। এখন সদ্‌গুরুর উপদেশে [চিত্তের স্বরূপ] আমার বোঝা হল। ৩—৪. এখন আমার চিত্তরাজ নষ্ট হয়েছে। গগনসমুদ্রে টলে প্রবেশ করেছে। ৫—৬. দশদিক সবই শূন্য দেখছি। চিত্ত বিহনে পাপও নাই পুণ্যও নাই। ৭—৮. সম্ভ্রান্ত গুরু আমার কাছে বলে দিলেন। (পাঠান্তর ধরলে 'বজ্রগুরু আমার লক্ষ্য বলে দিলেন'।) আমার দ্বারা গগনে জল আহৃত হল। ৯-১০. ভাদে বলে, ভাগহীন (=অবিভাজ্য অদ্বয় সত্য)-কে নিয়ে আমি চিত্তরাজকে আহার করলাম।

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা ॥ সহজপন্থী বৌদ্ধ সাধকেরা অবিদ্যাবিক্ষুব্ধ চিত্তকেই এই জগৎপ্রপঞ্চের সৃষ্টিকর্তা বলে মনে করতেন। এই প্রপঞ্চস্রষ্টা অবিদ্যাচিত্তের বিনাশই ছিল তাঁদের সাধনার প্রধান লক্ষ্য। আলোচ্য চর্যায় এই চিত্ত-বিনাশের প্রসঙ্গই উত্থাপিত হয়েছে। চর্যাকার ভাদে বলছেন যে তিনি সদ্‌গুরুর উপদেশ লাভের পূর্ব পর্যন্ত মোহাবিষ্ট ছিলেন, কিন্তু গুরুর প্রসাদে বর্তমানে অবিদ্যাপ্রভাবিত চিত্তের স্বরূপ অবগত হয়েছেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, এই জগৎ মিথ্যা এবং অবিদ্যাচিত্তই এই মিথ্যা জগতের সৃষ্টিকারক। এই অবিদ্যাচিত্তকে লীন করলেই মিথ্যা জগৎপ্রপঞ্চের অবসান হয়। গুরুর কাছে এই পরমার্থজ্ঞান লাভ করে তিনি অবিদ্যাচিত্তকে বিনষ্ট করেছেন। তাঁর চিত্ত নিঃস্বভাবীকৃত হয়ে গগনসমুদ্রে অর্থাৎ শূন্যতার চতুর্থস্তর সর্বশূন্যে প্রবেশ করেছে। এই অবস্থায় চিত্তের গ্রাহ্যগ্রাহকভাব লুপ্ত হওয়ায় সর্বশূন্য ছাড়া তিনি আর কিছুই লক্ষ্য করেন না এবং চিত্ত নিঃস্বভাবীকৃত হওয়ায় পাপপুণ্যাদি সংস্কাররূপ বন্ধনাদি বুঝতে না পেরে তিনি সম্পূর্ণ মোহমুক্ত হয়েছেন। বজ্রকুল বা বজ্রগুরুই তাঁকে এই সর্বশূন্যরূপ চতুর্থানন্দ লাভের উপায় নির্দেশ করেছেন, এই নির্দেশ অনুযায়ী তিনি গগনে প্রবেশ করেছেন অর্থাৎ সর্বশূন্যতায় লীন হয়েছেন। চর্যাকার ভাদে আরও বলেছেন যে, জগৎ যে আদৌ উৎপন্ন নয় এবং অবিদ্যাচিত্তই যে এই মিথ্যা জগৎসৃষ্টির কারণ—এই অদ্বয়তত্ত্ব লাভ করে তিনি চিত্তকে নিঃস্বভাবীকৃত করেছেন অর্থাৎ সর্বশূন্যে বিলীন করেছেন।

৩৬

[পুথিপৃষ্ঠা ৫২ ।ক]

॥ রাগ পটমঞ্জরী—কৃষ্ণাচার্যপাদা ঃ ॥

[১]সুণ[১] বাহ তথতা পহারী।
মোহভণ্ডার[২] 'লই'[২] [৩]সঅলা অহারী[৩] ॥ ধ্রু ॥
ঘুমই ণ চেবই সপরবিভাগা।
সহজ[৪]নিদালু[৪] কাহ্নিলা লাঙ্গা। ধ্রু ॥
চেঅণ ণ [৫]বেঅণ[৫] ভব নিদ গেলা।
সঅ[৬] সুফল[৬] করি সুহে সুতেলা। ধ্রু ॥
[৭]স্বপণে[৭] মই দেখিল তিহুবণ সুন।
ঘোরিঅ [৮]অবণাগমণ[৮] [৯]বিহুন[৯] ॥ ধ্রু ॥
[১০]শাখি [১০]করিব জালন্ধরি পাএ।
[১১]পাখি [১১]ণ[১২] রাহঅ[১২] [১৩]মোরি[১৩] পাণ্ডিআ[১৪]চাএ[১৪]। ধ্রু ॥

পাঠান্তর ॥

১—১ সুশ (পুথি) সুন (টীকা) ২—২ লুই (শাস্ত্রী, সেন)
৩—৩ সঅল আহারী (শহী) ৪—৪ নিংদালু (শহী)
৫—৫ পুথিতে অন্য কোন অক্ষরের উপর ণ-এর Over-writing আছে।
৬—৬ মুকল (বাগচী, শহী) ৭—৭ স্বপনে (টীকা)
৮—৮ অবণাগবন (টীকা, শহী) ৯—৯ বিহল (শাস্ত্রী) বিহুণ (বাগচী)। বিহূণ (শহী)
১০—১০ সাখি (টীকা)।
১১—১১ পুথিতে 'র' এর উপর 'খ'-এর Over-writing আছে, পারি (সেন)
১২—১২ চাহই (বাগচী, শহী) ১৩—১৩ মোরে (শহী)
১৪—১৪ চাদে (পুথি)।

পাঠবিচার ও শাব্দিক টীকা ॥ বাহ < বাস। ডঃ সুকুমার সেন টীকার 'বাসনাগার' পদটি অনুসরণ করে 'বাহর' < বাসর < বাসঘর < বাসগৃহ পাঠান্তর অনুমান করেছেন, এই পাঠান্তর ধরলে অবশ্য ছন্দও ঠিক থাকে। পহারী < প্রহারিত। ঘুমই—ঘূর্ণ > ঘুম্ম > ঘুম (নামধাতু) + ই (< তি) = ঘুমই [ঘূর্ণ > ঘুম্ম, তুলনীয় 'বৎসে ঘুম্মাউলম্হি। তা...সুবিস্সম্'—বিদগ্ধমাধব]। কাহ্নিলা—কাহ্ন + ইল (।) (তুচ্ছার্থে), অর্থ বেচারি কাহ্ন। চেঅণ < চেতন। বেঅণ < বেদন, অর্থ 'সংবেদন' বা 'সংজ্ঞা'। সুফল—তিব্বতী অনুবাদে আছে grol-bar = মুক্ত > (অপভ্রংশ, প্রাচীন বাংলা) মুকল। সম্ভবত 'মুকল' পাঠান্তরও প্রচলিত ছিল। টীকার 'সকলমিতি ত্রৈলোক্যং পরিশোধ্য' এই পাঠান্তরের সম্ভাবনা সমর্থন করে। সুতেলা—সুত (সুপ্ত-জাত) + এলা (ইল্ল জাত) = সুতেলা। ঘোরিঅ <* ঘুরিত (=ঘূর্ণ), টীকার পাঠান্তর 'ঘানিক' = ঘানী। শাখি < সাক্ষী। পাখি < পক্ষ + ই (স্ত্রী প্রত্যয়)—পক্ষি, অর্থ 'পক্ষ'। রাহঅ—রহ্ (<রঘ + ই) (< তি) = রহই, রহঅ >

রাহঅ। টীকা (পশ্যন্তি) ও তিব্বতী অনুবাদ (lta byed) অনুসারে পাঠান্তর 'চাহঅ = চাহই' <চাহ্ (< চক্ষ্) + ই। মোরি—মম > মঞো > মো-(প্রাতিপদিক) + র (সম্বন্ধ বিভক্তি) + ই (স্ত্রী প্রত্যয়-স্ত্রীলিঙ্গ পদ 'পাখি'-র সঙ্গে সম্বন্ধ)। পাণ্ডিআচাএ < পণ্ডিতাচার্য। 'চাদে' সম্ভবত লিপিভ্রম।

বাচ্যার্থ ॥ ১—২ শূন্যরূপ বাসনাগার তথতার দ্বারা প্রহৃত হল। মোহভাণ্ডার থেকে সকল (-ই) সংগৃহীত হল (বা ভক্ষিত হল)। ৩—৪, ঘুমায়, [তাই] স্ব-পরভেদ চেতনা নেই। বেচারি নাঙ্গা কাহ্ন সহজনিদ্রায় [এমনই] আকুল। ৫—৬, চেতনা নেই, বেদনা (=সংজ্ঞা) নেই। বিভোর নিদ্রায় মগ্ন। সকল সুফল করে (পাঠান্তরে 'সব কিছু খুলে') সুখে সুপ্ত। ৭—৮. স্বপ্নে আমি দেখলাম, ত্রিভুবন শূন্য। [এবং] আনাগোনা বিহনেই (= ব্যতিরেকেই) ঘোরে (পাঠান্তরে 'ঘানির পাক')। ৯—১০. জালন্ধরি পা-কে সাক্ষী করা হবে। পণ্ডিতাচার্য আমার পক্ষে থাকে না। (পাঠান্তরে 'আমার দিকে তাকায় না'।)

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা ॥ আলোচ্য চর্যায় মহাসুখমগ্ন চিত্তাবস্থা বর্ণিত হয়েছে। চর্যাকার কাহ্ন বলছেন যে প্রকৃতিদোষরূপ মোহের ভাণ্ডার-স্বরূপ প্রথম তিনশূন্যকে চতুর্থ শূন্যরূপ তথতা দ্বারা আঘাত করায় সমস্ত প্রকৃতিদোষই বিনষ্ট হয়েছে এবং তাঁর বাসনাগার চিত্ত শূন্যতায় পূর্ণ হয়েছে। এই অবস্থায় নগ্ন অর্থাৎ সর্বপ্রকার বন্ধনমুক্ত হয়ে কাহ্ন সহজানন্দরূপ যোগনিদ্রায় মগ্ন হয়েছেন। এই যোগনিদ্রায় তাঁর চেতনাও নেই, বেদনাও নেই, সর্বপ্রকার বিকল্পবোধ দূরীভূত হওয়ায় তাঁর আত্মপর ভেদজ্ঞান বিলুপ্ত হয়েছে। সর্বপ্রকার দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে নিদ্রাগত হলে নিদ্রা যেমন খুব গভীর হয়, ঠিক তেমনি সর্বপ্রকার বিকল্পাত্মক জ্ঞান বর্জন করে সহজনিদ্রায় মগ্ন হওয়ায় তাঁর যোগনিদ্রাও খুব গাঢ় হয়েছে। এই অবস্থায় উপনীত হয়ে ত্রিভুবনকে তাঁর স্বপ্নের অভিজ্ঞতার মত শূন্য মনে হয়েছে। স্বপ্ন দেখা অনেক সত্যবৎ ব্যাপারই যেমন আসলে অসম্ভব ও অলীক, ঠিক তেমনি এই জগতের জন্মমৃত্যুর ঘুরপাকও আপাতদৃষ্টিতে সত্য মনে হলেও আসলে মিথ্যা। এই ত্রিভুবনে শূন্যই সত্য, আর সকলই স্বপ্নবৎ মিথ্যা—এই তত্ত্ব যে ভ্রান্ত নয় তার সাক্ষী হিসাবে তিনি স্বীয় গুরু জালন্ধরিপাদের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর গুরু ছাড়া আর কেউ এই তত্ত্বদর্শনের ব্যাপারে তাঁর পক্ষাবলম্বনের যোগ্য নয়, কেননা এই তত্ত্ব শাস্ত্রগত নয় এবং সেই কারণে যেসব ধর্মাচার্য শাস্ত্রগত পাণ্ডিত্যের অধিকারী তাঁরা এই তত্ত্বে অবহিত নন।

৩৭
[পুথিপৃষ্ঠা ৫৩। ক-খ]

॥ রাগ কামোদ—তাড়কপাদানাম্ ॥

অপণে নাহিঁ [১]মো[১] কাহেরি [২]সঙ্কা[২]।
তা [৩]মহামুদেরি[৩] টুটি গেলি কংখা ॥ ধ্রু ॥

অনুভব সহুজ মা ভোল রে জোঈ।
[৪]চৌকোড়্হি[৪] বিমুকা জইসো তইসো হোই॥ ধ্রু॥
[৫]জইসনে[৫] [৬]অছিলেস[৬] [৭]তইসনে অচ্ছঁ[৭]।
সহজ [৮]পিথক[৮] জোই ভান্তি[৯]মাহো[৯] বাস॥ ধ্রু॥
[১০]বাণ্ড[১০] [১১]কুরুণ্ড[১১] সন্তারে জাণী।
বাক্‌পথাতীত [১২]কাহি[১২] বখাণী॥ ধ্রু॥
ভণই তাড়ক [১৩]এযু[১৩] নাহিঁ অবকাস।
জো বুঝই তা গলেঁ গলপাস॥ ধ্রু॥

পাঠান্তর ॥

১—১ সো (শাস্ত্রী, বাগচী) ২—২ শঙ্কা (শাস্ত্রী, বাগচী)
৩—৩ মহামুদেরী (শাস্ত্রী, শহী, সেন) মহা মুদেরী (বাগচী)
৪—৪ চৌকোট্টি (শাস্ত্রী, বাগচী), চউকোড়ি (শহী), চৌকোড্ডি (সেন)
৫—৫ জইসনি (টীকা) ৬—৬ ইছিলেসি (বাগচী, শহী)
৭—৭ তইসন আছ (বাগচী, শহী)
৮—৮ পথক (বাগচী, শহী) ৯—৯ নাহি (বাগচী), মা (শহী)
১০—১০ বণ্ট (টীকা) ১১—১১ কুরু (পুথি)
১২—১২ কাঁহি (শাস্ত্রী, বাগচী, সেন), ১৩—১৩ এথু (শাস্ত্রী, বাগচী, শহী, সেন)

পাঠবিচার ও শাব্দিক টীকা ॥ অপণে—*আত্মনেন (= আত্মনা) > অপণে। মো < মম। পাঠান্তর নিষ্প্রয়োজন। তা < তাবৎ। মহামুদেরি—মহামুদ্‌ (< মহামুদ্রা) + এর (< কেরক—সম্বন্ধবিভক্তি) + ই (স্ত্রী প্রত্যয়—স্ত্রীলিঙ্গ পদ 'কংখা'-র সঙ্গে সম্বন্ধ)। 'মহামুদ্রা' যোগাচারের চতুর্মুদ্রার অন্যতম মুদ্রা। টুটি < ত্রুটিতঃ। গেলি—গঅ (< গত) + ইল্ল > গইল্ল > গেল + ই (স্ত্রী প্রত্যয়—স্ত্রীলিঙ্গ 'কংখা'-র ক্রিয়াপদ)। চৌকোড়্হিবিমুকা < চতুস্কোটিবিমুক্ত, পুথিতে ড্‌ + হ্‌ মিলে যুক্তবর্ণ আছে। জইসো < যাদৃশ। জইসনে—*যাদৃশনেন > জইসনে। টীকার 'জইসনি' সম্ভবত লিপিভ্রম। কারণ 'জইসনি'-র ই-কার ব্যাকরণসংগত নয়। অছিলেস—অছ (চ্ছ) (<অস্‌ ধাতু) + ইল (অতীতবাচক) + এস (এসি—মধ্যমপুরুষ অতীত বিভক্তি)। তিব্বতী অনুবাদের 'dod-pa = 'ইচ্ছসি' অনুসারে 'ইছিলেসি' পাঠান্তর কল্পিত হয়েছে, তবে টীকায় 'অছিলে' পাঠই সমর্থিত। তইসনে—তাদৃশনেন > তইসনে। অছ—অছ্‌ (< অস্‌)+ অ (=ত) = অছ। পিথক <পৃথক্‌, পাঠান্তর 'পথক' = পথের। তিব্বতী অনুবাদের lam (= পথ) পদ থেকে 'পথক' পাঠান্তর কল্পিত। কিন্তু টীকায় 'পিথক' পাঠ সমর্থিত। ভান্তি < ভ্রান্তি। মাহোঁ—পদটি অত্যন্ত নিষেধবাচক অব্যয়, এর সম্ভাব্য ব্যুৎপত্তি = মা (নিষেধার্থক তৎসম অব্যয়) + হো (< ভূ)। বাস < বাসয়। বাণ্ড < বণ্ড (শ্বাসাঘাতে আদ্যস্বর দীর্ঘ); বণ্ড = (ছিন্নত্বক) পুরুষাঙ্গ, নপুংসক (দ্রঃ বঙ্গীয় শব্দকোষ)। কুরুণ্ড < কুরণ্ড, অর্থ মুষ্কবৃদ্ধি বা বর্ধিত অণ্ডকোষ (hydrocele), তুলনীয় 'গোদা কুঁজো কুরুণ্ডে' (ভারতচন্দ্র)।

পুথিতে সম্ভবত 'কুরুঙ' পদের 'ঙ' ছাড় পড়েছে (Lipography)। জাণী <* জানিতঃ (=জ্ঞাতঃ)। কাহি—কৃধি > কহি > কাহি। পুথিতে 'কাহি' লেখা আছে এবং এই পাঠ অর্থবহ, কাজেই পাঠান্তর নিষ্প্রয়োজন। বখাণী <* ব্যাখ্যানিতঃ (= ব্যাখ্যাতঃ)। তাড়ক—চর্যাকারের নাম। তবে তাড়ক কথার মূল অর্থ 'ফাঁসুড়ে' ও শেষ ছত্রের 'গলেঁ গলপাস'-এর মধ্যে অর্থসঙ্গতি দেখে মনে হয় 'তাড়ক' কবির প্রকৃত নাম নয়, ছদ্মনাম। এষু—এতদ্ > এ + ষু (অধিকরণ বিভক্তি)। তা—তস্য > তস্স > তাস > তাহ > তা।

বাচ্যার্থ ॥ ১—২. আপনিই নেই, আমার কিসের ভয় ? তাই মহামুদ্রার আকাঙ্ক্ষা টুটে গেল। ৩—৪. সহজ অনুভব, ওরে যোগী, ভুলো না। চতুষ্কোটিবিমুক্ত [হলে] যেমন তেমনই থাকতে হয়। ৫—৬. যেভাবে ছিলে সেই ভাবেই আছ। সহজ পৃথক্—যোগী, এ ভ্রান্তি পোষণ কোরো না। ৭—৮. [পারগামী ব্যক্তি] নপুংসক কি বর্ধিতমুষ্ক [তা] খেয়াপারের সময়ে জানা যায়। [কিন্তু] বাক্‌পথের অতীত [সহজকে] কি করে ব্যাখ্যা করা যায় ? ৯—১০. তাড়ক বলে, এখানে [বিভ্রান্তির] অবকাশ নেই। যে [বলে যে সে সহজকে] বোঝে তার গলায় ফাঁস।

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা ॥ আলোচ্য চর্যায় সহজানন্দের অনির্বচনীয়তার তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। চর্যাকার তাড়ক গুরুর অনুগ্রহে বুঝতে পেরেছেন যে জগতে সব কিছুই অনিত্য এবং অনাত্ম। এই পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করায় জন্ম-মৃত্যুক্লেশাদির ভয় আর তাঁর নেই। সেই সঙ্গে মহামুদ্রারূপ সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষাও বিনষ্ট হয়েছে, কেন না জন্মমরণাদি বিকল্পের মত মহামুদ্রাও একটি বিকল্পাত্মক ভাব। এই সমস্ত বিকল্প ভাবের অতীতে সহজই একমাত্র সত্য, তবে এই সত্য বুদ্ধিগম্য নয়, অনুভবগম্য। বুদ্ধি-সহযোগে এর স্বরূপ ব্যাখ্যা চলে না। এই সহজ চতুষ্কোটিবিনির্মুক্ত, অর্থাৎ এই সহজ আছে তা-ও বলা যায় না, নেই তা-ও বলা যায় না, আছেও বটে নেই-ও বটে তা-ও বলা যায় না, এবং আছে ও নেই-এর কোনটাই সত্য নয় তা-ও বলা যায় না। সহজ স্বরূপের অবস্থা সম্পর্কে এই ধরনের কোনো স্পষ্ট ইতিবাচক বা নেতিবাচক কথা বলা যায় না বলেই সহজের স্বরূপাবস্থা সব সময়েই একপ্রকার। সহজের স্বরূপ সম্পর্কে এই জ্ঞান জন্মালে সাধক বুঝতে পারেন যে তাঁর অস্তিত্বও সহজের মতই চতুষ্কোটি-বিনির্মুক্ত। তিনি সহজের মতই বিকল্পমুক্ত এবং তথতাবিলীন, তাই সহজকে কোন পৃথক অনুভব বলে মনে করবার হেতু নেই। এই সহজ বা সহজানন্দ সাধকের আত্মস্বরূপের সঙ্গে একাকার। এই কারণে সহজানন্দের প্রকৃতি অত্যন্ত গূঢ় ও গুহ্য। কিন্তু এই গুহ্যতা লৌকিক গুহ্যতার সঙ্গে তুলনীয় নয়। যেমন পারার্থীর শরীরে অণ্ডকোষাদি যেসব গুহ্য অঙ্গ আছে সেগুলি সাধারণ ভাবে দেখা যায় না বটে, কিন্তু পাটনী যখন পারানির খোঁজে পারার্থীর দেহ তল্লাশি করে তখন সেগুলির অস্তিত্ব সহজেই প্রকাশ পায়। কিন্তু সহজস্বরূপের গুহ্যতা ঠিক এই ধরনের বাহ্য গোপনীয়তার অনুরূপ নয়। এর প্রকৃতিই নিগূঢ়। যে বুদ্ধিপ্রণোদিত ব্যাখ্যার সাহায্যে সাধারণত অগোচর বা অস্ফুট বিষয়কে পরিস্ফুট করা হয়, এই সহজানন্দ সেই ব্যাখ্যাবচনের সম্পূর্ণ ঊর্ধ্বে থাকায় বুদ্ধির সাহায্যে এর স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব নয়। তাই চর্যাকার

তাড়ক বলছেন যে, পরমার্থজ্ঞান ব্যতিরেকে এই সহজানন্দ লাভের অবকাশ নেই। যারা সহজানন্দকে বুদ্ধি দিয়ে বুঝেছে বলে ভাণ করে, তাদের গলায় সংসাররূপ গলপাশ বাঁধা আছে অর্থাৎ তারাও মুক্ত নয়॥

৩৮

[পুথিপৃষ্ঠা ৫৪।খ—৫৫।ক]

॥ রাগ ভৈরবী—সরহপাদানাম্॥

কাঅ [১]ণাবড়্হি[১] [২]খাণ্টি[২] মণ কেডুআল।
সদ্‌গুরুবঅণে ধর পতবাল॥ ধ্রু॥
চীঅ থির করি [৩]ধরহু[৩] রে [৪]নাহী[৪]।
অন [৫]উপায়েঁ[৫] পার ণ জাই॥ ধ্রু॥
[৬]নৌবাহী[৬] নৌকা [৭]টাণঅ[৭] গুণে।
মেলি মেল সহজে [৮]জাউ[৮]ণ আণেঁ। ধ্রু॥
[৯]বাট অভঅ[৯] [১০]খাণ্টাবি[১০] বলআ।
ভব উলোলেঁ [১১]ষঅ[১১] বি বোলিআ॥ ধ্রু॥
কুল লই খরে সোন্তে উজাঅ।
সরহ ভণই [১২]গঅণেঁ[১২] [১৩]পমাএঁ[১৩]॥ ধ্রু॥

পাঠান্তর॥

১—১ ণাবড়ি (শাস্ত্রী, বাগচী, শহী) ২—২ খণ্ডী (টীকা), খাণ্ঠি (সেন)
৩—৩ ধহু (পুথি) ৪—৪ নাই (বাগচী), নাঈ (শহী)
৫—৫ উপায়ে (বাগচী, সেন) উপাএঁ (শহী)
৬—৬ নোবাঅ (টীকা) ৭—৭ টাগুঅ (পুথি, শাস্ত্রী, সেন)
৮—৮ জাই (শহী) ৯—৯ বাটত (টীকা) বাটত ভঅ (বাগচী, শহী)
১০—১০ খণ্ট (টীকা)
১১—১১ সব (বাগচী), সব্ব (শহী) ১২—১২ গণেঁ (পুথি)
১৩—১৩ সমাঅ (বাগচী), সমাই (শহী)

পাঠবিচার ও শাব্দিক টীকা॥ ণাবড়্হি-খাণ্টি <* নাবাটিকা-খণ্ডিকা, অর্থ ছোট নৌকাখানি, খাণ্টি = খানি। পতবাল—পত্রবাল, অর্থ হাল। ধরহু—ধর (< ধৃ) + হু (< থস্—মধ্যমপুরুষ অনুজ্ঞা বিভক্তি)। পুথিতে সম্ভবত 'র' ছাড় পড়েছে। নাহী < নাভিক = চাকার মাঝখানকার গর্ত। পাঠান্তরে নাই (ঈ) < নাবী। অন < অন্য (অর্ধতৎসম শব্দ) : পাঠান্তর 'আন' (শহী) < অন্য। টাণঅ (= টাণই)—টাণ (< √তন্-প্রসারণে) + ই (-তি) = টাণই, টাণঅ। সেন তঙ্গতি-> টাগুঅ পাঠ রেখেছেন। তঙ্গতি = কাঁপে,

টলমল করে ; তবে এই অর্থ প্রশস্ত নয়, টীকার 'আকর্ষয়তি' দেখে 'টাণঅ' পাঠই প্রশস্ত বলে মনে হয়। মেলি মেল—তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে প্রবোধচন্দ্রের পাঠান্তর 'মেলি মিলি'। অভঅ < অভ্যতীত ; টীকার 'সাধকো যদা মার্গভ্রষ্টো ভবতি' থেকে 'অভঅ' পাঠ সমর্থিত। তবে তিব্বতী অনুবাদের lam ni 'gog-pa'i 'jigs pa (= পথে রোধক ভয়) এবং টীকার 'বাটত' পাঠ থেকে 'বাটত ভঅ' পাঠ কল্পিত। সম্ভবত এই পাঠান্তরও প্রচলিত ছিল। খাণ্ট < খণ্ডক, অর্থ দস্যু, ঠক, ডাকাত, তুলনীয় 'চোর খণ্ড হৈতে মাতা নাহি কর ভয়'—কবিকঙ্কণ চণ্ডী। বোলিআ—অপভ্রংশ √বুড্ড > বুড়, বোড় > বোল + ক্ত>) ইআ) = বোলিআ। লই <* লভিতঃ (=লব্ধঃ)। সোন্তে-স্রবন্ত্ (শত্রন্ত ক্রিয়াপদ বিশেষ্যে পরিণত) > সোন্ত + এ (অধিকরণ-বিভক্তি) = সোন্তে, তুলনীয় আধুনিক বাংলার 'ঐ দেখা যায় মরা নদীর সোঁতা'—রবীন্দ্রনাথ। উজাঅ < উদ্‌যাতি। গঅণেঁ < গগন + এঁ (অধিকরণ বিভক্তি)। পুথিতে সম্ভবত মধ্যবর্তী 'অ' ছাড় পড়েছে ; টীকার 'গগনেতি' পদে 'গঅণেঁ' পাঠ সমর্থিত। পমাএঁ—এটি সম্ভবত লিপিপ্রমাদ, শুদ্ধ পাঠ হয়ত 'পমাঅ' বা 'পমাএ' < প্রমাপ্যতে [প্র-মাপ্ = ধ্বংস করা, শেষ করা] > আমূল পাঠান্তর প্রয়োজনীয় বলে হয় না।

বাচ্যার্থ ॥ ১-২. কায়া—রূপ। ছোট নৌকাখানি। মন দাঁড়। সদ্‌গুরুবচনে হাল ধর। ৩-৪. চিত্ত স্থির করে, ওরে, নাও ধর (=রক্ষা কর)। অন্য উপায়ে পারে যাওয়া যায় না। ৫-৬. নাবিক গুণ দিয়ে নৌকা টানে। সহজের সঙ্গে মিলে মিলে যেতে হবে, অন্য ভাবে নয়। ৭-৮. পথ ভুল হয়েছে (পাঠান্তরে 'পথে ভয়'), দস্যুও বলবান। ভব-উল্লোলে (=তরঙ্গোচ্ছ্বাসে) সকলই নিমজ্জিত হয়। ৯-১০ কূল থেকে খরস্রোতে উজানে যায়। সরহ বলে, গগনে অন্তর্হিত হয়।

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা ॥ আলোচ্য চর্যায় নৌযাত্রার-রূপকে সহজ সাধনার কথা বলা হয়েছে। এই সাধনায় পাটনীরূপ সাধক সদ্‌গুরুর উপদেশে কায়কে নৌকা ও মনকে দাঁড় রূপে গ্রহণ করেছেন। নিজেকে সম্বোধন করে সাধক সরহপাদ বলছেন যে, চিত্তকে প্রকৃতিদোষ থেকে মুক্ত করে স্থির ভাবে কায়-নৌকা রক্ষা করতে হবে। কেন না এই নৌকা ছাড়া ভবনদী পার হবার অন্য উপায় নেই। লৌকিক জগতে নাবিকেরা গুণের সাহায্যে নৌকাকে টানে, কিন্তু এই নৌকায় তা হবার উপায় নেই। এখানে রূপাদি বিষয়সমূহের বাহ্য আকর্ষণ দূর করে সহজানন্দের সঙ্গে মিলিত হয়েই অগ্রসর হতে হয়। এই কায়-নৌযাত্রার পথও দুর্গম, পথে বিষয়াসক্তিরূপ ভয় বিদ্যমান। বিষয়াসক্তিরূপ ভয়ে ভীত হয়ে সাধক যদি পথভ্রষ্ট হন তবে সাধনমার্গে গ্রাহ্য-গ্রাহক-ভাবরূপ বলবান দস্যুর উপদ্রব দেখা দেয়। তখন ভাববিকল্পবশত বিষয়তরঙ্গ এমন প্রবল হয়ে ওঠে যে তাতে কায়-নৌকা নিমজ্জিত হয় অর্থাৎ সাধকের সাধনধর্ম সর্বপ্রকারে বিনষ্ট হয়। তাই সাধনমার্গে সিদ্ধি লাভের উপায় নির্দেশ করে সরহ বলছেন যে, কূল ধরে খরস্রোতে উজানে গেলেই গগনে প্রবেশ করা যায় অর্থাৎ অবধূতীমার্গ [কূল = কূল—কু (চন্দ্রাদি কুমার্গ) + ল (লয় পায় যেখানে) সেই অবধূতী] অবলম্বন করে মহাসুখ স্রোতের পথে বোধিচিত্তকে ঊর্ধ্বগামী করলেই গগনরূপ শূন্যতায় উপনীত হওয়া যায়॥

৩৯
[পুথিপৃষ্ঠা ৫৫/খ—৫৬/ক]
॥ রাগ মালশী—সরহপাদানাম্ ॥

[১]সুইণা[১] [২]হথ বিদারম[২] [৩]রে।[৩]
ণিঅমণ তোহোরেঁ [৪]দোসেঁ[৪] ॥
গুরুবঅণ বিহারেঁ রে[৫] ।[৫]
থাকিব তই ঘুণ্ড কইসেঁ ॥ ধ্রু ॥
[৬]অকট[৬] [৭]হুঁ ভবই গঅণা[৭] ।
বঙ্গে জায়া ণিলেসি [৮]পরে [৮]ভাগেল তোহোর বিণাণা ॥ ধ্রু ॥
[৯]অদঅভুঅ[৯] ভবমোহা রে[১০] দিসই পর অপ্যণা ।
এ জগ জল [১১]বিম্ব[১১] কারে সহজেঁ সুণ অপণা ॥ ধ্রু ॥
অমিআ [১২]আচ্ছন্তেঁ[১২] বিস গিলেসি রে [১৩]চিঅ [১৪]পর[১৪]বস অপা ।
[১৫]ঘারেঁ পারেঁ [১৫]কা বুঝিলে [১৬]ম রে[১৬]খাইব মই দুঠ [১৭]কুণ্ডুবা[১৭] ॥ ধ্রু ॥
সরহ ভণন্তি বর সুণ ে..হালী কি মো দুঠ্ঠা বলন্দেং।
একেঁলে জগ নাসিঅ রে [১৮]বি[১৮]রহুঁ [১৯]চ্ছন্দেঁ[১৯] ॥ ধ্রু ॥

পাঠান্তর ॥

১—১ সুইণে (টীকা), সুইণেঁ (বাগচী, শহী)
২—২ হ অবিদার অরে (শাস্ত্রী, শহী) হা[খ]অ বিদারঅ রে (বাগচী),
৩—৩ একক দাঁড়ি (।) ; শাস্ত্রী, সেন, বাগচী, শহী তে নেই।
৪—৪ দোসে (শাস্ত্রী, বাগচী, শহী)। পুথিতে 'দোহ সেঁ'। পদের পর জোড়া দাঁড়ি (॥)
৫—৫ শাস্ত্রী, বাগচী, শহী, সেন এই একক দাঁড়ি (।) অগ্রাহ্য করেছেন। কিন্তু এটি নতুন ধরনের স্তবক-বিন্যাস হতে পারে।
৬—৬ পুথিতে 'থ' কেটে তার মাথার উপর 'ট' লেখা হয়েছে।
৭—৭ হুঁ-ভব-গঅণা (বাগচী, সেন), হুঁ-ভবহি গঅণা (শহী)। হুঁ ভবই অণা (পুথি)।
৮—৮ পারে (বাগচী, শহী)।
৯—৯ অদভুঅ (বাগচী, শহী, সেন) ১০—১০ পুথিতে একটি দাঁড়ি আছে।
১১—১১ বিম্বা (বাগচী, শহী) ১২—১২ অচ্ছন্তেঁ (বাগচী)
১৩—১৩ পুথিতে দাঁড়ি আছে। ১৪—১৪ পসর (পুথি)।
১৫—১৫ ঘরেঁ পরেঁ (বাগচী, শহী)।
১৬—১৬ মারি (বাগচী)। ১৭—১৭ কুণ্ডবাঁ (শাস্ত্রী, বাগচী) কুণ্ডংবা (শহী)
১৮—১৮ বিরহুঁ (পুথি)
১৯—১৯ হীচ্ছন্দেঁ (পুথি) ঈচ্ছন্দ্রে (শাস্ত্রী) সুচ্ছন্দে (বাগচী) স্বচ্ছন্দে (শহী)

পাঠবিচার ও শাব্দিক টীকা ॥ সুইণা...রে—সুইনা—স্বপ্ন > সুপিণ > সুইণ-পাঠান্তর—(১) অবিদার অরে (শাস্ত্রী) (২) সুইণেঁ-হ[থ]অ বিদারঅ রে (বাগচী—তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে)। পুথির পাঠ স্পষ্ট ও অর্থবহ হওয়ায় পাঠান্তর প্রয়োজনীয় নয়। তোহোরেঁ—তুভ্যম্ > তুব্ভং > তুহুঁ, তোহ (তির্যক্ কারকের প্রাতিপদিক) + র = তোহর > তোহোর (স্বরসঙ্গতি) + এঁ (তৃতীয়ার-এন জাত) = তোহোরেঁ সম্ভবত করণকারকের পদ 'দোসে'র সঙ্গে সম্বন্ধ থাকায় 'তোহোর' পদে করণবিভক্তির 'এঁ' যুক্ত হয়েছে, এই বৈশিষ্ট্য আধুনিক বাংলায় তো বটেই, প্রাচীন বাংলাতেও বিরল), থাকিব—থাক্ (< স্থা +–) +– ইব (—তব্য জাত, কৃদন্ত ভবিষ্যৎ)। তই-ত্বয়া > তএ > তই। ঘুঙ—ঘূর্ণ > ঘূণ্ণ > ঘুঙ। হুঁভবই গঅণা—হূঁ(হুঁ) তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্যদের বীজমন্ত্র, এই হুঁ থেকেই গগন বা বজ্রসত্ত্বের উদ্ভব। 'গঅণা'-র 'গ' সম্ভবত ছাড় পড়েছে। নিলেসি-নিঅ (<নীত) + ইল= নিলেসি—নিঅ (<নীত) + ইল = নিল +–এসি (অতীত মধ্যম পুরুষ বিভক্তি) = নিলেসি। পরে—পর (<পরম্) + এ (অধিকরণ বিভক্তি) = পরে। ভাগেল—ভগ্ন > ভগ্গ < ভাগ (নামধাতু) + এল (ইল) = ভাগেল। বিণাণা < বিজ্ঞান। তিব্বতী অনুবাদের kyog por 'gro ba bslad gyis la থেকে শহীদুল্লাহ পাঠান্তর কল্পনা করেছেন 'বঙ্কে জাই মইলেসি' = বাঁকা (পথে) গিয়ে মরলে। অদঅভুঅ < অদ্ভুত (স্বরভক্তি, অর্ধতৎসম)। দিসই < দৃশ্যতে। অপ্পণা < *আত্মানকঃ। অমিআ < অমৃত। আচ্ছন্তেঁ—অচ্ছ (< অস্) + অন্ত (শতৃজাত অসমাপিকা) + এঁ (-এন জাত) = আচ্ছন্তেঁ। গিলেসি—গিল্ (< গৃ) + (এ) সি (<সি=গিলেসি। অপা < আত্মা। ঘারেঁ পারেঁ = ঘরেঁ পরেঁ। কা < কস্য। ম < মম, পাঠান্তর নিষ্প্রয়োজন। কুণ্ডবাঁ—কুণ্ডকা > কুণ্ডআ > কুণ্ডুবা> কুণ্ডুবাঁ (স্বতোনাসিক্যীভবন ও স্বরসংগতি)। কুণ্ডকা = সধবার উপপতিজাত কন্য, অর্থাৎ অসতী-কন্যা = অস্পৃশ্য—নৈরাত্মার উপমান (টীকা দ্রষ্টব্য)। বর < বরং। গোহালী < গোশালিকা। দুঠ্ঠ = দুঠ < দুষ্ট। বলদ্দেঁ—বলীবর্দ > বলদ্দ (তুলনীয় মৃচ্ছকটিক) > বলন্দ (স্বতোনাসিক্যীভবন) + এঁ (-এন জাত। একেঁলে = একেলেঁ—এক + ল = একল > একেল (স্বরসঙ্গতি) + এঁ (করণ বিভক্তি)। বিহরহুঁ < বি—হৃ + ধ্বম্। পুথিতে 'হ' ছাড় পড়েছে।

বাচ্যার্থ ॥ ১—২. ওরে নিজমন, তোর দোষে স্বপ্নের হাত ভাঙি। (বাগচীর পাঠান্তর ধরলে 'স্বপ্নরূপ শূন্যতা-হস্ত দিয়ে, ওরে নিজমন, তোর দোষসমূহ বিদারণ কর')। [অবিরত] ঘুরতে থাকলে তুই গুরুবচন-বিহারে থাকবি কী ভাবে? ৩—৪ আশ্চর্য, হুঁ হয় গগন (=চিত্তরাজ), বঙ্গে জায়া নিলি (বঙ্গদেশোদ্ভবা রমণীকে জায়া করলি), পর [ক্ষণেই] তোর বিজ্ঞান ভাগল (=ভাঙ্গল)। ৫—৬. ওরে, ভবমোহ অদ্ভুত, [তাই] পরকে আপন দেখায়। জলবিম্বাকার এ জগতে সহজে [প্রতিষ্ঠিত] শূন্যই [শুধু] আপন। ৭—৮. ওরে চিত্ত, আত্মা [তোর] পরবশ, [তাই] অমৃত থাকতে বিষ গিলিস। ওরে, আমি ঘরে পরে কাকে (=কে ঘর কে পর একথা) বুঝলে আমার দুষ্ট অসতীকে খাওয়া হয়। ৯-১০. সরহ বলেন, বরং শূন্য গোয়াল [ভাল], কি [হবে] আমার দুষ্ট বলদে? ওরে, একলাই জগৎকে বিনাশ করে স্বচ্ছন্দে বিহার করি।

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা ॥ জগৎসংসারের অসারতা ও শূন্যস্বরূপের সারবত্তাই এই চর্যার আলোচ্য বিষয়। চর্যাকার সরহপাদ নিজেকেই সম্বোধন করে বলছেন যে, বিবিধ প্রকৃতিদোষের প্রভাবেই চিত্ত অবিদ্যাবিক্ষুব্ধ থাকে এবং এই অবস্থায় জগৎ আসলে স্বপ্নের মত অবাস্তব হলেও সত্য বলে মনে হয়। অবিদ্যার প্রভাবেই এই বিভ্রান্তি, তাই এই ভ্রান্তির ঘোর ত্যাগ করে সদগুরুর বচনে সাধনমার্গে বিচরণ করা উচিত। গুরুর প্রসাদে তিনি এক আশ্চর্য তত্ত্ব অবগত হয়েছেন। এর ফলে হুঙ্কার-বীজ-সমুৎপন্ন তাঁর বিশুদ্ধ চিত্ত গগনরূপ প্রভাস্বর শূন্যতায় প্রবেশ করেছে। এই অবস্থায় বঙ্গে অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞানে তাঁর নৈরাত্মা-গৃহিণীকে সমাহিত করায় তাঁর বিষয়-বিজ্ঞান দূরীভূত হয়েছে। ভবের মোহ বড়ই অদ্ভুত। এই মোহবলেই আত্মপর ভেদ-জ্ঞান জন্মে। কিন্তু তত্ত্বদর্শীরা এই মোহ থেকে বিমুক্ত, তাই জগৎকে তাঁরা জলবিম্বের মতই অসার জ্ঞান করে সহজরূপ শূন্যকেই কেবল আপন মনে করেন। যে চিত্ত পরবশ অর্থাৎ অবিদ্যাপ্রভাবিত, সেই চিত্তই মহাসুখরূপ অমৃত পরিত্যাগ করে বিষয়রূপ বিষপানে ব্যাপৃত হয়! তাই ঘরে অর্থাৎ স্বকায়ে পরকে অর্থাৎ পরমতত্ত্বকে উপলব্ধি করে চিত্তের রাগদ্বেষাদি প্রকৃতিদোষের কুণ্ড অর্থাৎ উৎসকে ধ্বংস করতে তিনি বদ্ধপরিকর। পরমার্থ সাধনায় বিষয়মোহের চেয়ে প্রভাস্বর শূন্যতাই শ্রেয়ঃ, তাই যে চিত্ত অবিদ্যার প্রভাবে দুষ্ট বিষয়ে বলদান করে এই জগৎপ্রপঞ্চের প্রতিভাস রচনা করে, সাধকের পক্ষে সেই অবিদ্যাচিত্তের কোন প্রয়োজন নেই। তিনি সদ্‌গুরুর উপদেশে অবিদ্যাচিত্তকে প্রভাস্বর শূন্যে বিলীন করেন এবং এই অবস্থায় জগৎ প্রপঞ্চকে ধ্বংস করে স্বচ্ছন্দে বিহার করেন ॥

৪০

[পুথিপৃষ্ঠা ৫৭।খ]

॥ রাগমালসী [১]গবুড়া[১]—কাহ্নপাদানাম্ ॥

জো মণগোএর আলাজালা।
আগম[২] পোথা[২] [৩]টণ্টা[৩] মালা ॥ ধু ॥
ভণ কইসেঁ সহজ বোলবা জাঅ।
কাঅ বাক চিঅ জসু ণ সমাঅ ॥ ধু ॥
[৪]আলে[৪] গুরু উএসই সীস।
বাকপথাতীত [৫]কাহিব[৫] কীস ॥ ধু ॥
[৬]জেতই[৬] [৭]বোলী[৭] [৮]তেতবি [৮]টাল ॥
গুরু [৯]বোব[৯] সে [১০]সীস[১০] কাল ॥ ধু ॥
ভণই কাহ্ন জিণরঅণ বি [১১]কইসা[১১]।
কালেঁ বোব সংবোহিঅ জইসা ॥ ধু ॥

পাঠান্তর ॥

১—১ গোড়া (তিব্বতী)

২—২ পোথী (শাস্ত্রী, বাগচী, শহী, সেন)।

৩—৩ ইটা (শাস্ত্রী, বাগচী), ইটঠা (শহী)

৪—৪ অলে (টীকা) অলেঁ (শহী) ৫—৫ কহিব (শহী)

৬—৬ জেত ই (বাগচী)। জে তই (সেন)

৭—৭ বোলো (সেন)। পুথিতে 'লী'-র আগে একটি একার আছে। এটা সম্ভবত লিপিভ্রম।

৮—৮ তে তবি (সেন) ৯—৯ বোধ (পুথি)

১০—১০ সীসা (শাস্ত্রী, বাগচী)।

১১—১১ 'কসইসা'লিখে 'স'তে বর্জনচিহ্ন।

পাঠবিচার ও শাব্দিক টীকা ॥ জো < যঃ। মণগোএর = মণগোঅর < মন-গোচর। আলাজালা—√অল্ (+বারণ করা : মিথ্যা প্রমাণ করা)+ ঘঞ্= আল (=বারণ, মিথ্যা, অমূলক) + জাল (সমূহ বা বিস্তার) = আলজাল > আলাজালা (স্বরসঙ্গতি), তু আলাযালা (ময়মনসিংহ জেলায় প্রচলিত) = কুস্বপ্ন (বিশেষ্য) 'রাইতে বর আলাযালা দেহি' (আ ভা অ, ১ম, পৃ ১০৫)। পোথা—পুস্তক > পোত্থঅ > পোথা। টণ্টামালা—তিব্বতী অনুবাদে brjun-gyi phreṅ -ba = মিথ্যামালা। টণ্টা = মিথ্যা, চালাকি ; মালা = সমূহ। 'টণ্টা' দেশী শব্দ (?), তুলনীয় মধ্যবাংলা 'ঠাট' = কপটতা। আধুনিক কথ্য বাংলা 'তোর সাওয়াটা বেজায় টন্টো' (বগুড়া) = তোর ছেলেটা খুব চালাক (আ ভা অ)। পাঠান্তর নিষ্প্রয়োজন মনে হয়।কইসেঁ—*কদৃশেন > কইসেণ > কইসেঁ। বোলবা—বোল্ (<√ব্রু) + অব(া) (<তব্য) = বোলবা, কৃদন্ত অসমাপিকা। জাঅ < জাতি। জসু—যস্য > জস্স > জসু (অবহট্‌ঠ পদ)। সমাঅ < সমায়াতি। আলে—আলেন > আলেঁ > আলে (অল্ + ঘঞ্+ আল, অর্থ বৃথা, মিথ্যা)। উএসই—উপদিশতি > উঅইসই > উএসই। সীস < শিষ্য। কাহিব—কথয়িতব্য < কহইঅব্ব < কহিব < কাহিব (আদ্যক্ষরে শ্বাসাঘাত হেতু স্বরের দীর্ঘতা)। কীস < কীদৃশ। জেতই—যৎ-তক (পরিমাণে) > জত্তঅ, জেত্তঅ < জত, জেত + ই < হি। বোলী—বোল্ (<√ ব্রু) + ইঅ (-ক্ত জাত) = বোলিঅ < বোলী। তেতবি—তৎ +- তক > তেত্তঅ > তেত + বি < অপি = তেতবি। টাল—√টল + ঘঞ্ = টাল (= ভুল বা ভ্রান্তি)। কাল < কল্প। জিণরঅন—জিনরত্ন > জিণরদণ (স্বরভক্তি ও ঘোষীভবন) > জিণরঅণ। কালে—কাল + এঁ (-এন জাত)। সংবোহিঅ < সংবোধিত। জইসা—যাদৃশ > জইস (া)। কালেঁ...জইস'—এখানে 'কাল বোবেঁ সংবোহিঅ জইসা' পাঠ হলে ৮ম পঙক্তির সঙ্গে অর্থসঙ্গতি বজায় থাকে। তিব্বতী অনুবাদে এই ধরনের একটি পাঠের আভাস আছে 'lkugs pas loṅ-par মূকেন অন্ধঃ' = বোবেঁ কান। তিব্বতী অনুবাদক সম্ভবত তাঁর আদর্শ পুথির 'ল'-কে 'ন' পড়ে কান = কানা (loṅ par) পাঠ নিয়েছিলেন। কিন্তু শুদ্ধ পাঠ 'কাল'।

বাচ্যার্থ ॥ ১-২. যা মনগোচর [তা-ই] বৃথা আড়ম্বর,—আগমপুথি মিথ্যার মালা। ৩-৪. বল কিসে সহজকে বলা যায়, কায়বাকচিত্ত যাতে প্রবেশ করে না। ৫-৬. গুরু

শিষ্যকে বৃথা উপদেশ দেয়। [যা] বাক্যপথের অতীত [তা] কীভাবে কওয়া যাবে? ৭-৮. যতই বলা যায় ততই ভুল [হয়]। [কেননা] গুরু বোবা, শিষ্য সে কালা। ৯-১০. কাহ্ন বলে, জিনরত্ন কেমন? কালার বোবাকে বোঝানো যেমন।

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা ॥ আলোচ্য চর্যায় সহজস্বরূপের অনির্বাচ্য প্রকৃতির কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে। যাকিছু মনের গোচর তা-ই বিকল্পাত্মক মিথ্যা মাত্র। প্রচলিত আগমশাস্ত্রাদিও এই পর্যায়ভুক্ত। কেননা এগুলিও মনের সৃষ্টি এবং মনেরই অধিগম্য। কিন্তু সহজানন্দ মননেন্দ্রিয়ের অতীতে বিদ্যমান। তাই ভাষায় এর স্বরূপ ব্যাখ্যা করা যায় না। তাছাড়া কায়-বাক্-চিত্তও যখন এই সহজানন্দের স্তরে উপনীত হয় না, তখন বাক্যাদির দ্বারা এর স্বরূপ-ব্যাখ্যা কিভাবে সম্ভব? যদি কেউ চেষ্টা করে তবে সে চেষ্টা ব্যর্থ ও ভ্রান্ত হতে বাধ্য। এই জন্যই গুরু মাত্র পথ প্রদর্শন করতে পারেন, কিন্তু বাক্যের দ্বারা সেই সহজানুভব ব্যাখ্যা করতে পারেন না। এই অনুভব প্রত্যেকটি সাধকের আত্মস্বরূপের সঙ্গে জড়িত, তাই কোন গুরুই কোন শিষ্যকে এর স্বরূপ বোঝাতে পারেন না। এই কারণে সহজানুভবের ব্যাপারে গুরু মূকের মতই নির্বাক এবং শিষ্য বধিরের মতই বাহ্য সংবেদনরহিত। সিদ্ধাচার্য কাহ্ন তাই বলেছেন যে, জিনরত্ন বা সহজানন্দের প্রকৃতি কালা-বোবার পারস্পরিক বোঝাপড়ার মতই দুর্বোধ্য।

৪১

[পুথিপৃষ্ঠা ৫৮/খ]

॥ রাগ কহ্নগুঞ্জরী—ভুসুকুপাদানাম্ ॥

আইএ অণুঅনা এ জগরে ভাংতিএ সো [১]পড়িহাই[১] ॥
রাজসাপ[২]দেখি[২] জো চমকিই[৩]ষারে[৩] [৪]কিং তং[৪] বোড়ো খাই। ধ্রু ॥
অকট জোইআ রে মা কর হথা লোহ্না।
আইস[৫] সহাবেঁ[৫] জই জগ বুঝষি তুট বাযণা তোরা ॥ ধ্রু ॥
মরুমরীচি[৬] গন্ধ নইরী[৬] [৭]দাপণ[৭] বিম্ব জইসা।
বাতাবত্তেঁ সো[৮] দিঢ়[৮] ভইআ অপেঁ পাথর[৯] জইসা[৯] ॥ ধ্রু ॥
[১০]বাংদ্ধি [১০]সুআ জিম কেলি করই খেলই বহুবিহ[১১] খেড়া[১১]।
বালুআতেলেঁ সসরসিংগে[১২] আকাশে[১২] ফুলিলা ॥ ধ্রু ॥
রাউতু ভণই কট ভুসুকু ভণই কট সঅলা অইস সহাব।
জই তো মূঢ়া অচ্ছসি ভান্তী পুচ্ছতু সদ্‌গুরু পাব ॥ ধ্রু ॥

পাঠান্তর ॥

১—১ পড়িহাই (পুথি)। ২—২ পুথিতে 'দেখিতে' লিখে 'তে' কাটা হয়েছে।
৩—৩ সাচে (বাগচী, শহী)

৪—৪ কি তঁ (বাগচী), কি তা (শহী), কিং কং (পুথি)।
৫—৫ সহাবেঁ (শাস্ত্রী, বাগচী)
৬—৬ গন্ধবনঅরী (বাগচী), গন্ধব নইরী (সেন), গন্ধব্বনঅরী (শহী)।
৭—৭ দাপতি (পুথি)। দাপনপড়ি (বাগচী, শহী)
৮—৮ দিট (শাস্ত্রী)। ৯—৯ জইষ (পুথি)।
১০—১০ বাঁদ্ধি (শাস্ত্রী), বান্ধি (টীকা, বাগচী) বান্ধি (শহী), বাংধি (সেন)।
১১—১১ খেলা (বাগচী)
১২—১২ আকাশ (শাস্ত্রী), আকাস (শহী)। পুথিতে প্রচলিত এ-কারের বদলে নাগরী এ-কার ব্যবহৃত হয়েছে।

পাঠবিচার ও শাব্দিক টীকা ॥ আইএ—আদি < আই + এ (অধিকরণবিভক্তি)। অণুঅনা—অনুৎপন্ন > অণুপ্পন্ন > অণুঅনা। ভাংতিএ—ভ্রান্তি > ভাংতি + এ (করণ-অধিকরণ বিভক্তি) = ভাংতিএ। পড়িহাই < প্রতিভাতি। রাজসাপ < রজ্জুসর্প। দেখি—*দৃক্ষিতঃ (দৃষ্টঃ) > দেক্খিঅ > দেখি। চমকিই—চমৎকৃত > চমক্কিঅ > চমকিঅ > চমকিই (স্বরসঙ্গতি)। যারে = সারে < সারেন ; টীকার 'সত্যেন' অনুসারে পাঠান্তর 'সাচে'। কিং তং-পুথির 'কং' বোধ হয় লিপিভ্রম। বোড়ো < বোড্ড। হথা < হস্ত। লোহা—অর্থদ্বৈধ অনুসারে ব্যুৎপত্তিও দ্বিবিধ ঃ (১) লোনা—লবণ +-অক > লোণ + আ = লোণা > লোহা (মহাপ্রাণিত) ; (২) লোহিত—লোহ + অন + আ। আইস—অবাদশ > আইস। সহাবেঁ < স্বভাবেন। জই < যদি। তুট—ত্রুট্যতি > তুট্টই > তুটই > তুট (আদ্যশ্বাসাঘাত হেতু অন্ত্যস্বর লোপ)। গন্ধ—গন্ধর্ব > গন্ধঅ > গন্ধ। নইরী—নগরী > নঅরী > নইরী (স্বরসঙ্গতি)। দাপণবিম্ব < দর্পণবিম্ব। পুথিতে সম্ভবত দাপণ লিখতে ভুল করে দাপতি লেখা হয়েছে। বাতাবত্তেঁ < বাতাবর্তেন। অপেঁ <* অপেন (=অস্তিঃ)। বাংদ্ধিসুআ < বন্ধ্যিকাসুত। জিম <* যিমন্ত্। খেড়া—খেলা + ক্রীড়া (জোড়কলম শব্দ—তুলনীয় "ক্রীড়ায়াং খেড্ড"—হেমচন্দ্র)। বালুআ-তেলে < বালুকাতৈলেন। ফুলিলা—*ফুল্লিতঃ > ফুল্লিঅ > ফুলিঅ + ইল > (ল) > ফুলিলা। রাউতু—রাজপুত্র > রাঅউত্ত > রাউত > রাউতু (স্বরসঙ্গতি), অর্থ 'অশ্বারোহী যোদ্ধা', এখানে চর্যাকার ভুসুকুর পদবীবিশেষ। কট < কৃতং, অর্থ 'নিশ্চিতভাবে'। সঅলা < সকল। তো < তব। অচ্ছসি—অচ্ছ (—অস্) + সি (< -সি মধ্যমপুরুষ বর্তমান বিভক্তি)। পুচ্ছতু—পুচ্ছ + তু।

বাচ্যার্থ ॥ ১-২. ওরে, আদিতে অনুৎপন্ন এ জগৎ, ভ্রান্তিতে সে প্রতিভাত হয়। রজ্জুসর্প দেখে যে চমকায় সত্যই কি তাকে বোড়া [সাপে] খায় ? ৩-৪. ওরে মূর্খ যোগী, হাত লোনা (অর্থান্তরে 'রাঙা') কোরো না। জগৎকে যদি এইরকম স্বভাবে বুঝিস [তবেই] তোর বাসনা টোটে। ৫—৬। মরুমরীচিকা গন্ধর্বনগরী দর্পণ-প্রতিবিম্ব যেমন, বাতাবর্তে দৃঢ় হওয়া সেই জলের পাথর যেমন, ৭—৮. বন্ধ্যাপুত্র যেমন কেলি করে, খেলা করে বহুবিধ খেলা—বালুকার তেলে, শশকের শৃঙ্গে, পুষ্পিত আকাশে (=আকাশকুসুমে)। ৯-১০. রাউত বলে নিশ্চিতভাবে, ভুসুকু বলে নিশ্চিতভাবে—সকলের স্বভাব [-ই] এই

রকম। যদি মূঢ় তুই ভ্রান্তিতে থাকিস তবে তুই সদ্‌গুরুর চরণে জিজ্ঞাসা কর।

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা ॥ আলোচ্য চর্যায় জগৎ সংসারের প্রতীয়মান অস্তিত্বকে অনাদি অবিদ্যাজাত এক ভ্রমাত্মক চিত্তবিকল্প বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গী মূলত শূন্যবাদী দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত। এই শূন্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করে সিদ্ধাচার্য ভুসুকু বলেছেন যে, যে জগৎকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অবগত হওয়া যায় তা আদৌ সৃষ্টি হয় নি, জগৎসংক্রান্ত আমাদের এই যে অনুভব তা রজ্জুতে সর্পদর্শনের মতই ভ্রান্তি-প্রণোদিত। রজ্জুকে সর্প বলে মনে করে কেউ যদি চমকে ওঠে, তবু রজ্জু যেমন তাকে সর্পবৎ দংশন করে না, ঠিক তেমনই জগৎ সম্পর্কে কোন জ্ঞানের প্রতীতি হলেও সেই জ্ঞানের প্রকৃত কোনো উৎস বা ক্রিয়া নেই। তাই বালযোগীর প্রতি সিদ্ধাচার্যের উপদেশ যে তিনি যেন হাত লোনা না করেন অর্থাৎ সংসারে আসক্ত না হন। সংসারের স্বভাবকে যদি পূর্বোক্তরূপ ভ্রান্তিময় বলে সাধক বুঝতে পারেন, তবে তাঁর অবিদ্যাজাত সর্ববিধ বাসনাদোষ দূরীভূত হয়। প্রকৃতপক্ষে মরুভূমির মরীচিকা, গন্ধর্বনগরী এবং দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের যেমন কোন প্রকৃত অস্তিত্ব নেই, জগৎও তেমনই অস্তিত্বহীন। ঘূর্ণাবর্তে উত্থিত জলস্তম্ভাদিকে যেমন সুদৃঢ় প্রস্তর-স্তম্ভ বলে ভ্রান্তি জাগে, জগতের অস্তিত্ব-দর্শনও ঠিক তেমন ভ্রান্তিসঞ্জাত। বন্ধ্যাপুত্রের ক্রীড়া, বালুকানিঃসৃত তৈল, শশকের শৃঙ্গ এবং আকাশের পুষ্প যেমন অলীক কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়, জগৎ-সংসারের অস্তিত্বও তেমনি মিথ্যা মায়া মাত্র। সিদ্ধাচার্য ভুসুকু তাই নিশ্চয় করে বলছেন যে, জগতে সকল জিনিসেরই স্বভাব এইরূপ মিথ্যাপূর্ণ। কেউ যদি ভ্রান্তিবশত এই সত্য বুঝতে না পারে তবে সদ্‌গুরুকে জিজ্ঞাসা করলেই সব ভ্রান্তি দূর হবে ॥

৪২

[পুথিপৃষ্ঠা ৬০।ক]

॥রাগ কামোদ—কাহ্নপাদানাম্ ॥

চিঅ [১]সহজে[১] শূণ সংপুন্না।
[২]কান্ধবিয়োএ[২] মা হোহি বিসন্না ॥ ধু ॥
[৩]ভণ কইসে[৩] কাহ্নু নাহি।
ফরই [৪]অনুদিনং[৪] তৈলোএ পমা ই ॥ ধু ॥
[৫]মূঢ়া[৫] দিঠ নাঠ দেখি কাঅর।
ভাগ তরঙ্গ কি সোষই [৬]সাঅর[৬]। ধু।
মূঢ়া [৭]অচ্ছন্তে[৭] লোঅ ণ পেখই।
দুধ মাঝেঁ লড [৮]ণচ্ছন্তেঁ[৮] দেখই ॥ ধু ॥
ভব জাই ণ আবই [৯]এসু[৯] কোই।
[১০]আইস[১০] ভাবে বিলসই কাহ্নিল জোই ॥ ধু ॥

পাঠান্তর ॥

১—১ সহজ (শহী)। ২—২ কান্ধবিয়োএঁ (বাগচী)। পুথিতে এর পর একটি দাঁড়ি আছে।
৩—৩ ভণই কসে (পুথি), ৪—৪ অনুদিনঁ (বাগচী, সেন), অনুদিন (শহী)।
৫—৫ মূঢা (শাস্ত্রী)। ৬—৬ সারঅর (পুথি)
৭—৭ আছন্তে (শহী) ৮—৮ ণ অছন্তেঁ (শহী)
৯—৯ এথু (বাগচী) ১০—১০ অইস (বাগচী, শহী)

পাঠবিচার ও শাব্দিক টীকা ॥ সংপুন্না < সম্পূর্ণ। কান্ধবিয়োএঁ < স্কন্ধবিয়োগেন। হোহি—হো (<ভূ) + হি (মধ্যমপুরুষ অনুজ্ঞাবিভক্তি)। বিসন্না < বিষণ্ণ, (অর্ধতৎসম)। ফরই— < স্ফুরতি। তৈলোএ < ত্রৈলোক্যে। পমাই— প্রমাপিতঃ > পমাইঅ > পমাই। দিঠ < দৃষ্ট। নাঠ—নষ্ট > ণট্ঠ > নাঠ। দেখি— *দৃক্ষিতঃ > দেক্খিঅ > দেখি। কাঅর < কাতর। ভাগ (তরঙ্গ)— ভগ্ন > ভগ্গ > ভাগ (তরঙ্গ)। সোষই = সোসই— শুষ্যতি > সুস্সই > সোসই। সাঅর < সাগর। মূঢা অচ্ছন্তে... দেখই— টীকায় এই পঙ্‌ক্তিদ্বয়ের টীকা নেই এবং পরবর্তী ভব জাই.... জোই এই চরণ দুটিকে তৃতীয় পদ বলা হয়েছে। অথচ Kvaerne উল্লেখ করেছেন : মুনিদত্তের টীকার তিব্বতী অনুবাদে এই অংশের অনুবাদ আছে (p.240)। মনে হয় লিপিকর টীকার যে পুথি থেকে টীকা অংশের নকল করেছিলেন, সেখানে এই অংশের টীকা বাদ পড়ে গিয়েছিল। অচ্ছন্তে— অচ্ছ (< অস্) + অন্ত (শতৃ জাত) + এঁ = অচ্ছন্তেঁ (শতৃজাত অসমাপিকা)। পেখই < প্রেক্ষতে। ণচ্ছন্তেঁ— এখানে সম্ভবত বর্ণবিপর্যয় ঘটেছে, শুদ্ধ পাঠ বোধ হয় 'চ্ছন্তেঁ ণ। আবই— আয়াতি > আঅই > আবই (ব-শ্রুতি)। এসু— এতদ্ > এ + সু (অধিকরণ বিভক্তি)। কোই < কোঽপি। আইস < অবাদৃশ। কাহ্নিল = কাহ্ন (< কৃষ্ণ) + ইল (সম্ভ্রমে)।

বাচ্যার্থ ॥ ১—২. সহজাবস্থায় চিত্ত সম্পূর্ণ শূন্য। স্কন্ধবিয়োগে বিষণ্ণ হোয়ো না। ৩—৪. বল, কিসে কাহ্ন নেই ? ত্রিলোক ব্যাপ্ত করে [সে] অনুদিন প্রকাশিত। ৫—৬. মূঢ় দৃষ্টকে নষ্ট দেখে কাতর [হয়]। [কিন্তু] তরঙ্গভঙ্গ কি সাগরকে শোষণ করে ? ৭—৮. মূঢ় লোক থাকতেও দেখে না, [যেমন] দুধের মধ্যে ননী থাকলেও [তা] দেখা যায় না। ৯—১০. এ ভবে কেউই যায় না, আসে[-ও] না। এই ভাবে বিলাস করে যোগিবর কাহ্ন।

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা ॥ আলোচ্য চর্যায় সহজবিলীন চিত্তাবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে। চর্যাকার কাহ্ন বলছেন যে, তাঁর চিত্ত সহজে মগ্ন হওয়ায় প্রভাস্বরশূন্যতার দ্বারা পূর্ণ হয়ে আছে। তাই যদি এই দেহের বিনাশ ঘটে তবে বিষণ্ণ হবার কোনো কারণ নেই। দেহের বিনাশেই যে তাঁর সত্তা বিলুপ্ত হবে একথা বলা চলে না। জলবিন্দু যেমন মহাসমুদ্রে বিলীন হয়ে সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি এই পঞ্চস্কন্ধাত্মক দেহ যখন বিলীন হবে তখন তিনি ক্ষুদ্র সত্তা পরিত্যাগ করে ত্রিভুবনব্যাপী এক বিশ্বসত্তায় প্রবেশ করে সর্বদা প্রকাশিত হবেন। যারা তত্ত্বজ্ঞানহীন মূঢ়, তারাই কেবল দৃষ্ট বস্তুর বিনাশ দেখে কাতর হয়। সমুদ্রে উত্থিত তরঙ্গ ভেঙে পড়লেই যেমন সাগর জলহীন হয় না, ঠিক তেমনি যে-অস্তিত্ব দৃশ্যমান তার বিনাশ হলেই পারমার্থিক সত্তার বিনাশ ঘটে না। যেমন দুধের

মধ্যে স্নেহপদার্থ থাকলেও তা দেখা যায় না, ঠিক তেমনই পঞ্চস্কন্ধাত্মক স্থূল দেহের অবসানের পরও যে পারমার্থিক সত্তা বিদ্যমান থাকে তত্ত্বজ্ঞানহীন মূঢ়ের চোখে তা ধরা পড়ে না। আসলে এই ভবরূপ স্থূল অস্তিত্বের যাওয়া ও আসা কোনটাই সত্য নয়, জন্মমৃত্যুরূপ এই আসা-যাওয়ার জ্ঞান বিশেষভাবে বিকল্পাত্মক। ভবের এই প্রকৃত স্বভাব অবগত হয়ে সিদ্ধাচার্য কাহ্ন সহজানন্দে বিলাস করছেন।

৪৩

[পুথিপৃষ্ঠা ৬০/খ—৬১/ক]

॥রাগ বঙ্গাল— ভুসুকুপাদানাম্ ॥

সহজ মহাতরু[১] ফরিঅ[১] এ [২]তৈলোএ[২]।
খসমসভাবে রে[৩] বা ণ মুকা[৩] কোএ ॥ ধ্রু ॥
জিম জলে পাণিআ টলিআ [৪]ভেউ[৪] না জাঅ।
তিম [৫]মণরঅণা[৫] রে সমরসে গঅণ সমাঅ ॥ ধ্রু ॥
[৬]জাসু[৬] ণাহি [৭]অপ্‌পা তাসু পরেলা[৭] কাহি।
আই অনুঅনা রে জাম মরণ ভব ণাহি ॥ ধ্রু ॥
ভুসুকু ভণই কট রাউতু ভণই কট সঅলা এহ সহাব।
জাই ণ আবয়ি রে ণ তঁহি ভাবাভাব। ধ্রু ॥

পাঠান্তর ॥

১—১ পুথিতে 'ফফরিঅ' আছে, সম্ভবত প্রথম 'ফ' টির লেখা ভালো না হওয়ায় পরে আবার 'ফ' লেখা হয়েছে।

২—২ তেলোএ (বাগচী, শহী)

৩—৩ বাণতকা (পুথি), বাণত কা (শাস্ত্রী), বাণত মুকা (বাগচী) বান্ধণত মুকা (শহী)।

৪—৪ ভেড় (শাস্ত্রী), ভেডন (সেন) ৫—৫ মরণঅঅণা (পুথি, সেন)

৬—৬ জাপু (পুথি), জৎপু (শাস্ত্রী)

৭—৭ অধ্যাতা স্বপরেলা। পুথিতে 'ধ্যার' উপরে মার্জিনে প্প ও 'রে' র উপরে মাথায় 'লা' লেখা আছে।

পাঠবিচার ও শাব্দিক টীকা ॥ ফরিঅ = ফুরিঅ < *স্ফুরিত। তৈলোএ < ত্রৈলোক্যে। বা ণ মুকা— শাস্ত্রী এই পদগুচ্ছের পাঠ ধরেছিলেন 'বাণত কা', পরে অন্যান্য চর্যাবিশেষজ্ঞগণ বিবিধ পাঠান্তর অনুমান করেছেন : (১) তিব্বতী bcins-nas grol-ba gan (= বন্ধনাৎ মুক্তঃ কঃ) অনুসারে বাণত মুকা (বাগচী) (২) বান্ধণত মুকা (শহীদুল্লাহ) (৩) বাণমুকা (সুকুমার সেন) = বাণমুক্ত বা বন্ধনমুক্ত। টীকায় অবশ্য 'ন

কো বিদ্বান্ মুক্তো বেতি' আছে, এই ইঙ্গিত ধরে 'বা ণ'-কে দুটি পৃথক অব্যয় পদ (বা + ণ) ধরলে অর্থের কোন ব্যত্যয় হয় না। তবে 'বাণ'-র 'ণ' প্রচলিত 'ণ'র মতো নয় অনেকটা 'শ' মত। পাঠ 'পাশ' = বন্ধন, নয় তো ? বা = পা ? কোএ— কোঽপি > কোই > কোএ। পাণিআ < পানীয়। ভেউ < ভেদ, চর্যার লিপিতে 'ড়' ও 'উ' দেখতে একই রকম হওয়ায় শাস্ত্রী 'ভেড়' পাঠ ধরেছিলেন। মণরঅণা < মনোরত্ন। পুথিতে সম্ভবত লিপিভ্রম ঘটেছে। অপ্পা < আত্মা। শাস্ত্রীর পাঠ ভ্রান্ত। পরেল—পর + এলা = ইলা (< ইল্লিকা— বিশেষণবাচক প্রত্যয়) = পরেলা। তঁহি— তস্মিন্ > তস্সিং > তহিঁ > তঁহি।

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য** : বর্তমান চর্যাটির মোট চরণসংখ্যা ৮, কিন্তু গোড়ায় চরণসংখ্যা ১০ ছিল বলেই মনে হয়। কেননা টীকাকার প্রত্যেকটি চর্যার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যখন চর্যার পদগুলির প্রথম-দ্বিতীয়াদি ক্রমিক সংখ্যা দিয়েছেন তখন ধ্রুবপদ তথা গানের তৃতীয়-চতুর্থ চরণকে এই সংখ্যাগণনার বাইরে রেখেছেন। সেদিক থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় চরণ প্রথম পদ এবং প্রথম পদের পরই যে চরণদুটি তাঁর কাছে দ্বিতীয় পদ বলে গ্রাহ্য তা হল পঞ্চম ও ষষ্ঠ চরণ। আলোচ্য চর্যার টীকায় প্রথম দ্বিতীয় চরণের ব্যাখ্যার পরই আছে 'পদস্যোত্তরপদেন ধ্রুবপদং বোদ্ধব্যম্' অর্থাৎ প্রথম পদের পরের পদই ধ্রুবপদ। কিন্তু চর্যার প্রাপ্ত পাঠে প্রথম পদের পর যে 'জিম জলে' ইত্যাদি পদ আছে, সেটিই যে অসংখ্যাত ধ্রুবপদ নয় তার প্রমাণ টীকাকার 'জিমজলেত্যাদি' পদকে 'দ্বিতীয়পদ' অর্থাৎ পঞ্চম ও ষষ্ঠ চরণ বলে উল্লেখ করেছেন। মনে হয়, লিপিকর যে পুথি থেকে টীকা নকল করেছিলেন তাতে ধ্রুবপদের টীকা ছিল, কিন্তু যে পুঁথি থেকে গান নকল করেছিলেন তাতে ধ্রুবপদটি না থাকায় টীকার অনুলিপিতে ধ্রুবপদের টীকা বাদ দিয়েছেন। প্রবোধচন্দ্র বাগচীও অনুরূপ সিদ্ধান্ত করেছেন 'This indicates that dhruvapada has been lost both in Sanskrit as well as Tibetan'। 'কাব্যরূপ' দ্রষ্টব্য।]

বাচ্যার্থ ॥ ১—২. সহজ-মহাতরু এ ত্রিলোকে পরিব্যাপ্ত। শূন্যস্বভাবে কে-ই বা না মুক্ত ? ৩—৪ যেমন জলে জল পড়লে প্রভেদ করা যায় না, ওরে, তেমনি মনরত্ন সমরস হলে গগনে মিলিয়ে যায়। যার আপন (-ই) নেই তার পর কোথায় ? ৫—৬. ওরে আদৌ যা অনুৎপন্ন [তার] জন্মমরণস্থিতি নেই। ৭—৮. ভুসুকু বলে নিশ্চিত ভাবে, রাউত বলে নিশ্চিত ভাবে, সকলের এই স্বভাব। ওরে, যায় না, আসেও না। তাতে ভাবও নেই, অভাবও নেই।

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা ॥ আলোচ্য বর্যায় বনস্পতির রূপকে শূন্য স্বরূপের বর্ণনা করা হয়েছে। একটি বৃহৎ বনস্পতির মতই শূন্যতারূপ সহজ ত্রিলোক ব্যাপ্ত করে আছে। এই শূন্যস্বভাবে চিত্ত লীন হলে ভাববন্ধন থেকে সকলেই মুক্তি পায়। এই মুক্তাবস্থায় কোনপ্রকার ভেদজ্ঞান থাকে নয়। জলের সঙ্গে জল মিশলে যেমন কোন বিভেদ দেখা যায় না, ঠিক তেমনি মনোরত্নরূপ বোধিচিত্ত সমরসীভূত অর্থাৎ নিঃস্বভাব অবস্থায় গগন তথা প্রভাস্বর শূন্যতায় বিলীন হলে শূন্যতার সঙ্গে তার কোন পার্থক্য থাকে না। এই অবস্থায় গ্রাহ্যত্ব গ্রাহকত্ব রূপ সর্বসম্বন্ধ দূর হওয়ায় আত্মপরভেদ জ্ঞানও লুপ্ত হয় এবং সাধক উপলব্ধি করেন যে জগৎ আদৌ অনুৎপন্ন, সুতরাং তার জন্মমৃত্যুর

প্রতীতিও সত্য নয়। চর্যাকার ভুসুকু এই সিদ্ধাবস্থায় উপনীত হয়ে নিশ্চিত ভাবে বলছেন, সকল ভাবেরই স্বভাব এই প্রকার। তাই সিদ্ধ যোগীর কাছে দৃশ্যাদির গমনাগমনরূপ উৎপত্তি নেই, বিনাশও নেই, অস্তিত্ব (ভাবও) নেই, অনস্তিত্ব (অভাব)ও নেই।

৪৪

[পুথিপৃষ্ঠা ৬১/খ— ৬২/ক]

॥রাগ মল্লারী— [১]কঙ্কণ[১] পাদানাম্ ॥

সুনে সুন[২] মিলিত্তা[২] জবেঁ।
[৩]সঅল[৩] ধাম উইআ তবেঁ ॥ ধু ॥
[৪]আচ্ছহুঁ[৪] চউখণ সংবোহী।
মাঝ[৫] নিরোহেঁ[৫] [৬]অণু অর[৬] বোহী ॥ ধু ॥
[৭]বিন্দু ণাদ[৭] ণ হিঁএ পইঠা।
অণ চাহন্তে আণ বিণঠা ॥ ধু ॥
জথাঁ আইলেঁসি তথা [৮]জানী[৮]।
[৯]মাঝেঁ [৯]থাকী সঅল [১০]বি হণ[১০] ॥ ধু ॥
ভণই কঙ্কণ [১১]কলএল[১১] সাদেঁ।
[১২]সর্ব্ব বিচুরিল[১২] তথতা নাদেঁ। ধু ॥

পাঠান্তর ॥

১—১ কোঙ্কণ (পুথি, শাস্ত্রী), কৌঙ্কণ (সেন) ২—২ মিলিআ (শাস্ত্রী, বাগচী, শহী,)
৩—৩ সকল (সেন) ৪—৪ আচ্ছ হুঁ (শাস্ত্রী)
৫—৫ নিরোহ (শাস্ত্রী) ৬—৬ অণুতর (শহী)
৭—৭ বিদুণাদ (পুথি), বিঁদু নাদ (শহী), নাদ বিন্দু (টীকা অনুসারে)
৮—৮ জান (শাস্ত্রী, বাগচী) জাণ (শহী)
৯—৯ মাসঁ (শাস্ত্রী, সেন) মাঝ (বাগচী) মাঝে (শহী)
১০—১০ হাণ (বাগচী, শহী) ১১—১১ কলঅল (বাগচী)
১২—১২ সব্ববি চুরিল (শহী)।

পাঠবিচার ও শাব্দিক টীকা ॥ মিলিত্তা < মিলিত। উইআ < উদিত। চউখণ < চতুঃক্ষণ, বোধিচিত্ত যখন ঊর্ধ্বগা হয়ে ক্রমে চতুর্থ শূন্যের দিকে অগ্রসর হয় তখন প্রত্যেক স্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক একটি 'ক্ষণ' বা মানসিক অবস্থা কল্পনা করা হয়। এই চারটি ক্ষণ যথাক্রমে বিচিত্র, বিপাক, বিমর্দ ও বিলক্ষণ। সংবোহী < সংবোধিঃ। নিরোহেঁ < নিরোধেন। অণুঅর < অনুত্তর, পাঠান্তর নিষ্প্রয়োজন। আণ < অন্য। চাহন্তে— চাহ্ (< চক্ষ্) + অন্ত (শতৃজাত) + এ = চাহন্তে। বিণঠা < বিনষ্ট। জথাঁ = জথা < (১) যত্র, (২) যতঃ। আইলেঁসি = আইলেসি— আয়াত + ইল্ল > আইল + এসি (মধ্যমপুরুষবিভক্তি) = আইলেসি। জানী < জানীহি। মাঝে < মধ্যে। পুথিতে 'ঝ' ও

'স' দেখতে প্রায় একরকম, তাই 'মাসঁ' পাঠ, তবে ভাল করে দেখলে বোঝা যায় শুদ্ধ পাঠ 'মাঝঁ' = মাঝেঁ। থাকী— *স্থক্কিত (<স্থা) > থাকিঅ > থাকী। বি < অপি। হণ < হন্যতে। কলএল < কলকল। সাদেঁ < শব্দেন। বিচুরিল— বা *বিচুরিত (= বিচূর্ণ) > বিচুরিঅ + ইল (অতীতবাচক) বিচুরিল, পাঠান্তর (১) সর্ব বি চ্ছরিল, (বাগচী), (২) বিচ্ছরিল (শাস্ত্রী)। পুথির পাঠ স্পষ্ট ও অর্থবহ, কাজেই পাঠান্তর নিষ্প্রয়োজন। নাদেঁ < নাদেন।

বাচ্যার্থ ॥ ১—২. যখন শূন্যে শূন্য মিলিত হল, তখন সকল ধর্ম উদিত হল। ৩—৪. চতুঃক্ষণ সংবোধিত আছি। মধ্যমানিরোধে অনুত্তর বোধি [পাওয়া যায়]। ৫—৬. বিন্দুনাদ হৃদয়ে প্রবিষ্ট নয়। এক চাইতে অন্য বিনষ্ট। ৭—৮. যেখান থেকে এলে সেখানকে জানো। মাঝে থেকে সকলই নষ্ট হয়। ৯—১০. কঙ্কণ বলে কলকল শব্দে, সব বিচূর্ণ হল তথতানাদে।

গূঢ়ার্থব্যাখ্যা। আলোচ্য চর্যায় চতুর্থানন্দরূপ সর্বশূন্যের উপলব্ধির কথা বর্ণিত হয়েছে। শূন্যবাদী দর্শনে শূন্যের যে চার প্রকার স্তরভেদ করা হয়েছে, তার মধ্যে স্বাধিষ্ঠানশূন্যতা তৃতীয়-স্থানীয় এবং তূরীয় প্রভাস্বরশূন্যতা চতুর্থ স্থানীয়। এই উভয় প্রকার শূন্যতার মধ্যে যখন মিলন হয় তখন সকল ধর্ম অর্থাৎ যাবতীয় বস্তুজগতের অনিত্য স্বরূপ সম্পর্কে প্রকৃষ্ট জ্ঞানের উদয় হয় এবং ফলস্বরূপ সাধক সহজানন্দ লাভ করেন। তাই এই অবস্থায় উপনীত হওয়ার উদ্দেশ্যে সিদ্ধাচার্য কঙ্কণপাদ বিচিত্র বিপাক বিমর্দ ও বিলক্ষণরূপ চারটি ক্ষণ বা মানসিক অবস্থার মধ্য দিয়ে বাহিত করার জন্য বোধিচিত্তকে সম্বোধিত বা উদ্বুদ্ধ করেছেন, এবং মধ্যমানিরোধ করে অর্থাৎ চিত্তের যাবতীয় প্রকৃতিদোষরূপ সমাধিমল ধ্বংস করে তিনি অনুত্তর বোধি বা চরম তত্ত্বের সন্ধান পেয়েছেন। এই অবস্থায় নাদবিন্দু-রূপ গ্রাহ্যগ্রাহকভাবাদি বিকল্পাত্মক জ্ঞান চিত্তে প্রবেশ করে না। চিত্তের এই নির্বিকল্প অবস্থায় থাকতে থাকতে চিত্তের অন্য একটি অবস্থা অর্থাৎ যে অবস্থায় অবিদ্যার প্রভাবে চঞ্চল চিত্ত বস্তুজগতের মায়া সঞ্চার করে সেই জাগ্রদবস্থাটি বিনষ্ট হয়। আসলে চিত্তের এই মায়াসৃষ্টিকারী জাগ্রদবস্থাটি প্রকৃত সত্যের অনুকূল নয়। চিত্তের জাগ্রদবস্থায় যে ভবজ্ঞান জন্মে তা-ই সৃষ্টির কারণ নয়, আসল সত্য বিশুদ্ধ বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের পরিণামেই ত্রিজগতের উৎপত্তি। তাই সত্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হলে জাগ্রৎ চিত্তে যাকে সত্য বলে মনে হয়, তাকে বর্জন করে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানকেই সত্য বলে জানা উচিত। মধ্য তথা অবধূতী মার্গ অবলম্বন করলেই সর্বপ্রকার বিকল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং চিত্তে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানই সত্য রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই তূরীয় অবস্থার বর্ণনা দিয়ে সিদ্ধাচার্য কঙ্কণ আরও বলেছেন যে বালযোগিগণ প্রকৃত সত্যদৃষ্টির অভাবে সত্যকে সাকার-নিরাকার ইত্যাদি রূপে কল্পনা করে বৃথা কলধ্বনি উত্থাপন করে, কিন্তু তাদের চিত্তে যখন তথতানাদ তথা অদ্বয় সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় তখন এই সব কলধ্বনি বা বিবাদবিতর্ক দূরীভূত হয়।

[পুথিপৃষ্ঠা ৬২/খ— ৬৩/ক]

॥ রাগ মল্লারী— [১]কাহ্নুপাদানাম্[১] ॥

মণ তরু পাঞ্চ ইন্দি তসু সাহা।
আসা বহল[২] পাতহ বাহা[২] ॥ ধ্রু।
বরগুরু বঅণে কুঠারেঁ[৩] ছিজঅ[৩]।
কাহ্ন ভণই তরু পুণ ন[৪] উইজঅ[৪] ॥ ধ্রু ॥
বাঢ়ই সো তরু সুভাসুভ পাণী।
ছেবই বিদুজন গুরু পরিমাণী ॥ ধ্রু ॥
জো তরুছেব ভেবউ ন [৫]জাণই[৫]।
সড়ি পড়িআঁ রে মূঢ় তা ভব মাণই ॥ ধ্রু ॥
[৬]সুন তরুবর[৬] গঅণ কুঠার।
ছেবহ সো তরু মূল ন[৭]ডাল[৭] ॥ ধ্রু ॥

পাঠান্তর ॥

১—১ পুথিতে কবিনাম নেই। ২—২ পাত ফলাহা (শাস্ত্রী), পাত ফল বাহা (বাগচী, শহী)
৩—৩ ছীজই (শহী) ৪—৪ উঅজই (শহী) উইজগ (পুথি)
৫—৫ জাইণ (পুথি)। পুথিতে প্রত্যাশিত দাঁড়ি নেই।
৬—৬ সুতরু (পুথি) ৭—৭ ডার (বাগচী)।

পাঠবিচার ও শাব্দিক টীকা। পাঞ্চ < পঞ্চ (শ্বাসাঘাতহেতু আদ্যস্বর দীর্ঘ)। ইন্দি < ইন্দ্রিয় (অর্ধতৎসম শব্দ)। তসু < তস্য। সাহা < শাখা। পাতহ বাহা— বিশেষজ্ঞগণ এই বাক্যাংশের বিভিন্ন পাঠান্তর নির্দেশ করেছেন : (১) পাত ফলাহা (শাস্ত্রী), (২) তিব্বতী 'bras bab par byed, অনুসারে পাতফল (বাগচী, শহী), (৩) ডঃ সুকুমার সেন 'পত্রের উপশাখা অথবা বাহক' অর্থে পুথির 'পাতহ বাহা' পাঠই রক্ষা করেছেন। মনে হয় দুরকম পাঠই প্রচলিত ছিল। ছিজঅ— ছিদ্যতে > ছিজ্জই > ছিজই = ছিজঅ। উইজঅ— উৎপদ্যতে > উব্বজ্জই > উঅজ্জই > উইজই (স্বরসঙ্গতি) = উইজঅ। বাঢ়ই— বর্দ্ধতে > বড়ঢই > বাঢ়ই। পাণী < পানীয়, বিভক্তিহীন করণকারকের পদ (সম্ভবত ছন্দের অনুরোধেই বিভক্তি লুপ্ত)। ছেবই— ছেদয়তি > ছেঅঅই > ছেবই (ব-শ্রুতি)। পরিমাণী < পরিমাণিত, অর্থ 'আদিষ্ট'। ছেব— ছেদ > ছেঅ > ছেব (ব-শ্রুতি)। ভেবউ = ভেব + উ— ভেদ > ভেঅ + খলু > কখু > হু > উ (নিশ্চয়াত্মক অব্যয়), = ভেঅউ > ভেবউ (ব শ্রুতি), পাঠান্তর 'ভেউ' (বাগচী) < ভেদ। জাণই < জানাতি। 'জাইণ' বর্ণবিপর্যয়জনিত (anagrammatism) লিপিভ্রম। সড়ি— সড় (<√ শট্ বা √ শদ্ = পচা, গলা, বিকৃত, বিশীর্ণ বা ক্লিষ্ট হওয়া, দ্রষ্টব্য : বঙ্গীয় শব্দকোষ) + ইঅ (< ক্ত) = সড়িঅ > সড়ি (তুলনীয় 'দুই তিন দিন হৈলে ভাত সড়ি যায়'— চৈতন্য চরিতামৃত, ২৯৭)। টীকায়

সড়ি পড়িআঁর ব্যাখ্যায় 'ষটিতং পতন্তি' = 'ষড়্গতিচক্রে পতিত' আছে, কিন্তু এ অর্থ আক্ষরিক নয় বলেই 'সড়ি'-কে 'ষটিত' জাত বলা চলে না। পড়িআঁ < পতিত ; 'সড়ি পড়িআঁ' প্রাচীন বাংলার একটি ইডিয়মের উদাহরণ। মাণই—মানয়তি > মাণঅই > মাণই (মধ্যস্বরলোপ)। সুণ তরুবর— পুথিতে 'সুতরু' লেখা, টীকায় 'সুনতরুবর' ; তিব্বতীতে টীকাপাঠ সমর্থিত। তাছাড়া পুথির পাঠে ছন্দ মেলে না। তাই টীকার পাঠ গৃহীত হল। ছেবহ— *ছেদয়থ > ছেঅঅহ > ছেঅহ > ছেবহ (ব-শ্রুতি)

বাচ্যার্থ ॥ ১-২. মন তরু পাঁচ ইন্দ্রিয় তার শাখা। আশা ঘন (= বহুল) পাতার প্রশাখা (= বাহক) ['পাত ফলবাহা' পাঠ ধরলে 'আশা বহু পত্র ও ফলবাহক']। ৩-৪. শ্রেষ্ঠ গুরুর বচনকুঠারে [এই গাছ] কাটতে হয়। কাহ্ন বলে, [একবার কাটলে] তরু পুনরায় উৎপন্ন হয় না। ৫-৬. সেই তরু শুভ-অশুভ [-রূপ] জল [-সেচে] বাড়ে। [তত্ত্ব-] জ্ঞানিগণ গুরুর দিব্যি দিয়ে [সেই তরু] ছেদন করে। ৭-৮. যে তরুচ্ছেদ [কৌশল] জানে না, ওরে, সেই মূঢ় বিকারগ্রস্ত হয়ে জন্মগ্রহণ (= ভব) মেনে নেয়। ৯-১০. শূন্য তরুবর গগন কুঠার। কাটো সেই তরু [যাতে] না [থাকে] মূল, না [থাকে] ডাল।

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা ॥ আলোচ্য চর্যায় শাখাপত্রবহুল এক মহাতরুর রূপকে বাসনাজড়িত অবিদ্যাচিত্তকে যাবতীয় বিকল্পজ্ঞান ও আনুষঙ্গিক দুঃখবিপর্যয়ের কারণ হিসাবে নির্দেশ করে গুরুর বচনে কিভাবে সেই অবিদ্যা-বিক্ষোভ দূর করা যায় তার তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। অনাদি ভববাসনারূপ পল্লবসমূহের আশ্রয়স্থল বলে মনকে একটি তরুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। পঞ্চ ইন্দ্রিয় এই মনতরুর শাখা, এবং বিবিধ আশা ও কামনা এই তরুর ফল-পত্রস্বরূপ। এই ফল-পত্র-শাখা-বহুল বৃক্ষ প্রকৃতিদোষবহুল অবিদ্যাচিত্তের উপমান। চিত্তে অবিদ্যার প্রভাব বিদ্যমান থাকলে মিথ্যা ভবজ্ঞান জন্মে এবং সহজানন্দলাভে বিঘ্ন ঘটে। তাই কাহ্ন বলছেন যে শ্রেষ্ঠগুরুর উপদেশকে কুঠাররূপে গ্রহণ করে এই অবিদ্যাচিত্তরূপ-তরুকে এমন ভাবে ছিন্ন করা উচিত যাতে তা পুনরুৎপন্ন না হয়। এই মনতরু শুভ ও অশুভ কামনারূপ জলসেচের দ্বারাই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ মনে কামনা-বাসনা, সুখ-দুঃখ, বেদনা-হর্ষ, বিস্ময়-বিস্মৃতি, জড়িমা ইত্যাদি প্রকৃতিদোষ যত জড়িত হয় চিত্তে অবিদ্যার প্রকোপও তত বর্ধিত হয়। এই কারণে যে যোগিগণ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছেন তাঁরা গুরুকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করে তাঁর বচনানুভব দ্বারা সেই চিত্ততরুকে ছিন্ন করেন অর্থাৎ চিত্ত থেকে অবিদ্যার প্রভাব দূর করেন। যে সব বালযোগী তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে এই চিত্ততরুর ছেদনরহস্য জানে না অর্থাৎ চিত্তকে নিঃস্বভাবীকৃত করার পদ্ধতি জানে না, তারা সংসার-দুঃখজলধির ষড়্গতিতে পতিত হয়ে ভব অর্থাৎ জন্মগ্রহণকে স্বীকার করে নেয়, মোক্ষমার্গে যেতে পারে না। যে অবিদ্যাচিত্ত তরুর সঙ্গে উপমিত হয়েছে তা-ও শূন্যময়, কিন্তু এই শূন্য একেবারে বিশুদ্ধ বা প্রকৃতিপ্রভাস্বর নয়। শূন্য, অতিশূন্য ও মহাশূন্য রূপে শূন্যের যে তিনটি প্রাথমিক স্তর আছে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মোট একশো ষাটটি প্রকৃতিদোষের আশ্রয়েই শূন্যময় অবিদ্যাচিত্তের অবস্থান। এই প্রকৃতিদোষযুক্ত তিন শূন্যকে সর্বদোষরহিত চতুর্থ বা সর্বশূন্য দ্বারা আঘাত করলেই চতুর্থানন্দরূপ মহাসুখলাভ হয়। এই জন্যই কাহ্ন বলছেন যে শূন্যময় চিত্ততরুকে

গগন অর্থাৎ সর্বশূন্যরূপ কুঠার দ্বারা এমন ভাবে ছেদন করা প্রয়োজন যাতে তার শাখা ও মূল পর্যন্ত উচ্ছিন্ন হয় অর্থাৎ চিত্ত পুনরায় ইন্দ্রিয়াধীন না হয়।

৪৬

[পুথিপৃষ্ঠা ৬৩/খ-৬৪/ক]

॥রাগ শবরী— জয়নন্দীপাদানাম্ ॥

[১]পেখু[১] সুঅণে অদশ জইসা।
অন্তরালে [২]মোহ[২] তইসা ॥ ধু ॥
[৩]মোহ[৩] বিমুক্কা জই [৪]মণা[৪]।
তবেঁ তুটই অবণাগমণা ॥ ধু ॥
[৫]নৌ[৫] দাঢ়ই নৈ তিমই ন ছিজ্জই।
পেখ [৬]মোঅ[৬] মোহে বলি বলি বাঝই ॥ ধু ॥
ছাআ মাআ কাঅ সমাণা।
বেণি পাখেঁ [৭]সোই[৭] [৮]বিণা[৮] ॥ ধু ॥
চিঅ [৯]তথতা[৯] স্বভাবে [১০]ষোহিঅ[১০]।
ভণই জঅনন্দি [১১]ফুড় অণ[১১] ণ হোই ॥ ধু ॥

পাঠান্তর ॥

১—১ পেখই (টীকা) ২—২ সো হব (বাগচী, ভববি (শহী)
৩—৩ মোদ (পুথি) ৪—৪ মাণা (পুথি)
৫—৫ নো (টীকা), ণউ (বাগচী), নউ (শহী)
৬—৬ মোঘ (বাগচী), মাআ (শহী), লোঅ (সেন)
৭—৭ সোহই (শহী) ৮—৮ বি ণাণা (বাগচী), ণাণা (শহী)
৯—৯ তথাতা (পুথি) ১০—১০ সোহিঅই (শহী)
১১—১১ ফুডঅণ ণ (শাস্ত্রী)

পাঠবিচার ও শাব্দিক টীকা ॥ পেখু—প্রেক্ষস্ব > পেখহু > পেখু (মধ্যস্বর লোপ), পাঠান্তর 'পেখই' (টীকা)। সুঅণে < স্বপ্নে। অদশ < আদর্শ (অর্ধতৎসম শব্দ), অর্থ 'দর্পণ'। মোহ—তিব্বতী অনুবাদের srid-pa-ñid kyaṅ (= ভবও) অনুসারে শহী-র পাঠান্তর অযৌক্তিক নয়, তবে বাগচীর পাঠ কষ্টকল্পনা মনে হয়। মোহ—মূল পাঠ 'মোদ' (শাস্ত্রী)। 'মোদ' শব্দের আভিধানিক অর্থ থাকলেও টীকা ও তিব্বতী rmoṅs পদে 'মোহ' পাঠের প্রশস্ততাই সমর্থিত হয়। নৌ—ন+উ < ন খলু। দাঢ়ই—দাঢ় (নামধাতু < দগ্ধঃ) + ই (-তি জাত) = দাঢ়ই। তিমই—তিম্যতি > তিম্মই > তিমই। ছিজ্জই—ছিদ্যতে

> ছিজ্জই > ছিজই= চ্ছিজই (শ্বাসাঘাতহেতু আদ্যব্যঞ্জনের দ্বিত্ব)। মোঅ < মোঘং (= বৃথা)। তিব্বতীতে পাঠান্তরের আভাস আছে sgyu ma la = মায়া ; তদনুসারে মাআ (শহী)। বলি < বলীয়ঃ (?), দ্বিরুক্তি, ক্রিয়াবিশেষণ। বাঝই < বাধ্যতে। বেণি <* দ্বীনি। ষোহিঅ < শোধিতঃ। ফুড় < স্ফুটম্। অণ < অন্য (অর্ধতৎসম)।

বাচ্যার্থ ॥ ১—২. স্বপ্নে ও আরশিতে যেমন [দেখায়], অন্তরালে মোহকেও (পাঠান্তরে 'ভবকে') তেমনি দেখ [বা দেখায়] ৩—৪. মন যদি মোহবিমুক্ত হয়, তবে আনাগোনা ঘুচে যায়। ৫—৬. পোড়েও না, ভেজেও না, ছেঁড়ে [-ও] না। দেখ, [তবু] বারবার (অথবা 'দৃঢ়ভাবে') বৃথা মোহে আবদ্ধ হয়। ৭—৮. কায় ছায়া-মায়ার সমান। সেই [প্রভাস্বর চিত্ত] দুই পক্ষহীন। ৯—১০. চিত্ত তথতাস্বভাবে শোধিত হয়। জয়নন্দী স্পষ্ট বলে, অন্য কিছু হয় না।

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা ॥ আলোচ্য চর্যায় চিত্তের দুই রূপের কথা বলা হয়েছে। চিত্ত যখন অবিদ্যাপ্রভাবে অশুদ্ধ থাকে তখন নানাবিধ মোহমায়া সঞ্জাত হয়। কিন্তু স্বপ্নে বা দর্পণে দেখা দৃশ্য যেমন মূলত সত্য নয়, ঠিক তেমনি এই মোহ বা মায়াসঞ্জাত ভবজ্ঞানও প্রকৃতপক্ষে সত্য নয়। গুরুর উপদেশে চিত্ত যদি মোহবিমুক্ত হয় অর্থাৎ অবিদ্যার প্রভাব অতিক্রম করতে পারে তবে চিত্তে উৎপাদভঙ্গ-রূপ গমনাগমনের কোন বিকল্পজ্ঞান থাকে না। এই মোহমুক্ত প্রভাস্বর চিত্তকে অগ্নি দগ্ধ করতে পারে না, জল ক্লিন্ন করতে পারে না এবং অস্ত্রাদিও ছেদন করতে পারে না। এই বিশুদ্ধ চিত্ত বস্তুগত সত্তার অনেক ঊর্ধ্বে। কিন্তু তা সত্ত্বেও লোকে দৃঢ়ভাবে মোহে আবদ্ধ হয়, সত্যলাভের চেষ্টা করে না। কিন্তু পরমার্থজ্ঞানিগণ যখন মোহমুক্তি লাভ করেন তখন তাঁরা স্বকায়কেও ছায়া-মায়ার মতই সমান মিথ্যা বলে মনে করেন। কেননা চিত্তে যতক্ষণ দুই পক্ষ বা দ্বৈতবোধ থাকে ততক্ষণ ছায়া-মায়া-র উদ্ভব, কিন্তু চিত্ত যখন তথতাস্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে শোধিত হয় তখন তা-ই প্রকৃতি-প্রভাস্বর বিশুদ্ধ পরমার্থিক রূপ লাভ করে। তাই সিদ্ধাচার্য জয়নন্দী বলছেন যে, চিত্ত তথতাদ্বারা বিশোধিত হলে তা আর বিচলিত হয় না।

৪৭

[পুথিপৃষ্ঠা ৬৫/ক]

॥ [১]রাগ গুড্ডরী—ধামপাদানাম্[১] ॥

কমলকুলিশ মাঝেঁ [২]ভইঅ[২] [৩]মিঅলী[৩]।
সমতাজোএঁ [৪]জলিঅ[৪] চণ্ডালী ॥ ধ্রু ॥
ডাহ ডোম্বিঘরে লাগেলি [৫]আগি[৫]।
[৬]সসহর[৬] লই ষিণ্ডহুঁ পাণী ॥ ধ্রু ॥

ণউ খর জালা ধূম ণ দিশই।
মেরু শিখর লই গঅণ পইসই ॥ ধু ॥
[৭]দাঢ়ই[৭] হরিহর বাহ্ম [৮]ভাড়া।রা[৮]।
[৯]ফীটা[৯] হই ণবগুণ শাসন [১০]পড়া[১০] ॥ ধু ॥
ভণই ধাম ফুড় [১১]লেহু রে[১১] জাণী।
পঞ্চ নালেঁ [১২]উঠি[১২] গেল পাণী ॥ ধু ॥

পাঠান্তর ॥

১—১ গুড্ডরীপাদানাং (পুথি)। ২—২ ভইম (শাস্ত্রী), ভই ম (সেন), ভবই (বাগচী)
৩—৩ লেসী (বাগচী), মইলী (শহী)।
৪—৪ 'জলিঅ'-র 'লি'তে প্রচলিত ই-কার নেই, ল-এর ওপর ছত্রাকৃতি চৈতন আছে। জলিল (বাগচী)
৫—৫ পুথিতে দাঁড়ি নেই। আগি [নী] (বাগচী)।
৬—৬ সহষলি (পুথি)। ৭—৭ স্ফাটই (পুথি)
৮—৮ ভরা (পুথি) ভট্টা (শহী) ৯—৯ দাঢ়ই (বাগচী)
১০—১০ পাড়া (বাগচী), পট্টা (শহী) ১১—১১ লেঙ্গুরে (শাস্ত্রী) লেহরে (সেন)
১২—১২ উঠে (শাস্ত্রী, বাগচী, সেন)।

পাঠবিচার ও শাব্দিক টীকা ॥ গুড্ডরীপাদানাং—পুথি দেখে মনে হবে, কবির নাম বুঝি গুড্ডরীপাদ। কিন্তু তিব্বতী অনুবাদে রাগ ও কবির নাম পাওয়া যায়। রাগ গুর্জরী, কবি ধামপাদ। এই কবিনাম গানের ভণিতায় ও টীকায় সমর্থিত। ভইঅ মিঅলী—এই বাক্যাংশের পাঠ ও অর্থ সম্পর্কে সংশয় আছে, (১) ভইঅ মিঅলী = ভইঅ মিআলী, অর্থ 'মিতালি হল,' (২) ভই ম মিঅলী (সুকুমার সেন), অর্থ 'আমি ম্রিয়মাণ হলাম', মিঅলী—মৃত > মিঅ + লী (সাদৃশ্যবাচক প্রত্যয়) (৩) ভবই লেলী = ভব + ই লেলী (চণ্ডালী), অর্থ '(কমল কুলিশ মধ্যে চণ্ডালী) ভব (=বীজ)-ই গ্রহণ করল'। এখানে স্মরণযোগ্য, বৌদ্ধতন্ত্রে ও চর্যাগীতির অন্যত্র (৪ সংখ্যক গান) কমল ও কুলিশকে যথাক্রমে স্ত্রী ও পুং জননাঙ্গের যৌন প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। সমতাজোএঁ < সমতাযোগেন। ডাহ <দাহ (স্বতোমূর্ধন্যীভবন), অর্থ 'অগ্নিকাণ্ড'। লাগেলি-লগ্ন > লগ্‌গ > লাগ + এল (-ইল) + ই (স্ত্রীপ্রত্যয়—স্ত্রীলিঙ্গ পদ 'আগি'র সঙ্গে যোগ)। আগি < অগ্নিকা ; বাগচী অন্ত্যানুপ্রাসের জন্য 'আগিনী' পাঠ নিয়েছেন, কিন্তু পুথিপাঠে যে অন্ত্যানুপ্রাস হয় তা-ও বেনজির নয়। সসহর লই—পুথিতে আছে 'সহ যলিলই,' টীকায় আছে 'সসহরমিতি'। পুথিপাঠ সম্ভবত ভুল। জালা < জ্বালা। লই—* লভিত (=লব্ধ) > লইঅ > লই (অধিকরণের অর্থবাচক অনুসর্গ, অর্থ অনেকটা ইংরেজী along-এর মত)। দাঢ়ই—দগ্ধ > দাঢ় + ই (< তি) = দাঢ়ই, পাঠান্তর: পুথি স্ফাটই। টীকাপাঠই প্রশস্ততর। হরি—মূত্রনাড়ী। হর—শুক্রনাড়ী। বাহ্ম < ব্রহ্মা, মলনাড়ী। ভড়ারা < ভট্টারক, অর্থ 'দেববিগ্রহ'। ফীটা—ফিট্ট ধাতু জাত কৃদন্ত পদ, অর্থ সম্ভবত 'বিদীর্ণ' বা 'ফাটা,'

পাঠান্তর দাঢ়া (টীকা অনুসারে) < দগ্ধ। তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে 'দাঢ়ই'। শাসনপড়া < শাসনপট্ট, ধাতুনির্মিত ভূমিদানপত্র, 'নবগুণ শাসনপড়া' = 'নয়ফলক বিশিষ্ট' অথবা 'নয়খণ্ড' শাসনপট্ট ; সেকালে শাসনপত্রে উল্লিখিত ভূমির জন্য খাজনা লাগত না, কিন্তু কোন কারণে শাসনপট্ট অগ্নিদগ্ধ হলে করনির্ধারণযোগ্য হত। ফুড় < স্ফুটম্। জাণী <* জানিতঃ (জ্ঞাতঃ)। উঠি < উত্থিত, পুথিতে স্পষ্টই 'উঠি' আছে, পাঠান্তর নিষ্প্রয়োজন।

বাচ্যার্থ ॥ ১—২. কমল [ও] কুলিশের মধ্যে মিতালি হল। সমতাযোগে চণ্ডালী জ্বলল। ৩—৪. ডোম্বীর ঘরে দাহ, আগুন লেগেছে। শশধর নিয়ে জল সেঁচি। ৫—৬. [আগুনের] আঁচ (= জ্বালা) প্রখর নয়, ধোঁয়া [ও] দেখা যায় না। মেরু শিখর ধরে [আগুন] গগনে প্রবেশ করে। ৭—৮. পোড়ে হরি, হর, ব্রহ্মা ঠাকুর (= ভট্টারক)। পুড়ে গেল নয় ফলকের শাসনপট্ট। ৯-১০. ধাম বলে, ওরে স্পষ্ট [করে] জেনে নাও। পাঁচ [টি] নালে জল উঠে গেল।

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা ॥ আলোচ্য চর্যায় যৌগিক কায়সাধনার দ্বারা নির্মাণচক্রস্থিত শক্তিকে ঊর্ধ্বগামী করে যুগনদ্ধরূপ সহজানন্দলাভের কথা বর্ণিত হয়েছে। চর্যাকার ধামপাদ সিদ্ধাবস্থার বর্ণনায় বলছেন যে কমল ও কুলিশ অর্থাৎ প্রজ্ঞা ও উপায়ের মধ্যে অভেদ মিলন ঘটায় সমতাযোগ অর্থাৎ মহাসুখরাগরূপ বাতাসের স্পর্শে তাঁর নাভিস্থিত নির্মাণচক্রে চণ্ডালীরূপ সংবৃতি বোধিচিত্ত জ্বলে উঠল এবং ক্রমে এই মহাসুখরূপ অগ্নি ডোম্বীর গৃহে লগ্ন হয়ে ডোম্বীগৃহ দগ্ধ করল অর্থাৎ সেই মহাসুখরাগাগ্নির দ্বারা যাবতীয় প্রকৃতিদোষ দগ্ধ বা ধ্বংস হল। এই অবস্থায় সিদ্ধাচার্য শশধর অর্থাৎ পরিশোধিত বোধিচিত্তের দ্বারা সেই মহাসুখরাগাগ্নি নির্বাপিত করলেন অর্থাৎ মহাসুখের সঙ্গে বিলীন হওয়ায় তাঁর মহাসুখের পৃথক অনুভূতিও লুপ্ত হল। এই মহাসুখরাগাগ্নি ঠিক লৌকিক অগ্নির অনুরূপ নয়। কেননা লৌকিক অগ্নির জ্বালা প্রখর হয় এবং ধূম্রও দেখা যায়, কিন্তু এই অগ্নির তেমন কোন বাহ্য লক্ষণ নেই। বাহ্যলক্ষণরহিত অবস্থায় এই মহাসুখজ্ঞানবহ্নি ভাবাভাবরূপ বিকল্প দগ্ধ করে মেরুশিখরে গগনরূপ মহাসুখচক্রে প্রবেশ করে। তখন হরি-হর-ব্রহ্মা প্রভৃতি নাড়ীবাহিত আভাসদোষ, নবগুণ অর্থাৎ নয়প্রকার প্রাণবায়ু এবং শাসনপট্ট অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির বিষয়সমূহ দগ্ধ হয়। যেসব বালযোগী এই কুলিশকমলের মিলনজাত অগ্নিদাহ ও অগ্নি-নির্বাপণের রহস্য জানে না, তাদের উদ্দেশে সিদ্ধাচার্য ধামপাদ বলছেন, যে, সদগুরুর কাছ থেকে এই তত্ত্ব স্পষ্ট করে জেনে নেওয়া উচিত। এই তত্ত্ব অবগত হলে জল অর্থাৎ সংবৃতি বোধিচিত্ত মূত্রনাড়ী (হরি), শুক্রনাড়ী (হর), মলনাড়ী (ব্রহ্মা), চিত্তপবন (নবগুণ) ও শাসন (ইন্দ্রিয়বিষয়) থেকে মুক্ত হয়ে পরিশুদ্ধ অবস্থায় অবধূতীমার্গে মহাসুখচক্রের দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় ॥

৪৮

পুথিতে '৬৫ পাতের পর ৬৬-র পাত পাওয়া যায় নাই' (শাস্ত্রী)। তাই ৪৭ সংখ্যক গানের চতুর্থপদের টীকার শেষ অংশ, ৪৮ সংখ্যক চর্যাটির সম্পূর্ণ অংশ, এবং তার চতুর্থপদের টীকার শেষ অংশ ছাড়া বাকী সব অংশই লুপ্ত হয়েছে। পুথির ৬৫ সংখ্যক

পাতার গোড়ায় ৪৮ সংখ্যক চর্যার চতুর্থপদের টীকার যে শেষ অংশ রয়েছে তা থেকে ৪৮ সংখ্যক চর্যার রচয়িতাকে কুক্কুরীপাদ বলে জানা যায়। তিব্বতী অনুবাদ থেকে প্রবোধচন্দ্র বাগচী এই চর্যার যে সংস্কৃতানুবাদ করেছিলেন সেটি পরিশিষ্টে উদ্ধৃত হয়েছে।

৪৯
[পুথিপৃষ্ঠা ৬৭/ক]
॥ রাগ মল্লারী—ভুসুকুপাদানাম্ ॥

বাজণাব পাড়ী পঁউআ খালেঁ বাহিউ।
অদঅ [১]দঙ্গালে[১] [২]দেশ[২] লুড়িউ ॥ ধু ॥
[৩]আজি ভুসুকু[৩] বঙ্গালী ভইলী।
ণিঅ ঘরিণী [৪]চণ্ডালেঁ[৪] লেলী ॥ ধু ॥
[৫]ডহি[৫] জো পঞ্চ [৬]পাটণ[৬] ইন্দিবিসআ ণঠা।
ণ জাণমি চিঅ মোর কহিঁ গই পইঠা ॥ ধু ॥
[৭]সোণ[৭] রুঅ মোর কিম্পি ণ থাকিউ।
নিঅ পরিবারে [৮]মহানেহে[৮] থাকিউ ॥ ধু ॥
চউকোড়ি ভণ্ডার মোর লইআ সেস।
জীবন্তে মইলেঁ নাহি বিশেষ ॥ ধু ॥

পাঠান্তর ॥

১—১ বঙ্গালে (বাগচী), বঙ্গাল (শহী)
২—২ দ্রেশ (পুথি), ক্লেশ (শাস্ত্রী)
৩—৩ অজি ভুসু (পুথি)
৪—৪ চণ্ডালী (পুথি)
৫—৫ দহিঅ (টীকা)
৬—৬ ধাটণ (পুথি)
৭—৭ সোণত (পুথি) সোনরুঅ (টীকা)
৮—৮ মহাসুহে (শাস্ত্রী, বাগচী, শহী)

পাঠবিচার ও শাব্দিক টীকা ॥ বাজ < বজ্র, তিব্বতী rgyal po অনুসারে পাঠান্তর 'রাজ' (বাগচী)। ণাবপাড়ী <*নাব-পাটিকা, অর্থ নৌবহর। অদঅ—দ্ব্যর্থ শব্দ (১) অদ্বয়, (২) অদয় = দয়াহীন। দঙ্গালে—দঙ্গাল = দস্যু, ভবঘুরে, নিঃস্ব (তুলনীয় 'ডেঙ্গালিয়া বরে বাপা দিল বিভাইঞা'—বিষ্ণুপাল), পাঠান্তর 'বঙ্গালে' (টীকা অনুসারে)। দেশ—(১) পুথিতে 'দ্রেশ', (২) তিব্বতী অনুবাদে yul = দেশ, (৩) পাঠান্তর 'ক্লেশ' (শাস্ত্রী—টীকায় উদ্ধৃত শ্লোক অনুসারে)। লুড়িউ < লুণ্ঠিতঃ। বঙ্গালী—বঙ্গাল + ঈ (স্ত্রীপ্রত্যয়)। এটি একটি স্ত্রীলিঙ্গ পদ, অর্থ—ভ্রষ্ট, পতিত, নিঃস্ব, দুঃস্থ স্ত্রীলোক, টীকায় 'অপরিশুদ্ধা'। ভইলী =* ভবিত (= ভূত) > ভইঅ + ইল = ভইল + ঈ (স্ত্রীপ্রত্যয়)। চণ্ডালেঁ—<চণ্ডালেন। পুথির পাঠে অর্থ সুসংগত হয় না। লেলী—*লভিতঃ (=লব্ধঃ) > লইঅ+ ইল= লইল> লেল + ঈ (স্ত্রী প্রত্যয়—'ঘরিণী'-র সঙ্গে যুক্ত)। আজি ভুসুকু...লেলী—এই দুই চরণের গদ্য অন্বয় 'ভুসুকু আজি চণ্ডালেঁ লেলী ণিঅ ঘরিণী বঙ্গালী ভইলী'।

ডহি <* দহিত (=দগ্ধ), পাঠান্তর—ডহিঅ (বাগচী)। সোণ < স্বর্ণ, দ্যর্থ (১) সোনা, (২) শূন্যতা। রুঅ < রূপ, দ্যর্থ (১) রূপা(২) রূপাদি স্কন্ধ। কিম্পি < কিমপি (মধ্যস্বরলোপ)। থাকিউ (৮ম ছত্রের)—পাঠান্তর 'বুড়িউ' (বাগচী, সেন—টীকায় 'নিমগ্নঃ' পদের ইঙ্গিত অনুসারে)। চউকোড়ি < চতুষ্কোটি। ভণ্ডার < ভাণ্ডাগার। জীবন্তে—জীব্ + অন্ত (শতৃ) + এ, কৃদন্ত বিশেষ্য পদ, অর্থ 'বেঁচে থাকায়'। মইলেঁ—মৃত > মঅ + ইল (অতীতবাচক) = মইল (কৃদন্ত বিশেষ্য) + এঁ, অর্থ 'মরে যাওয়ায়'।

বাচ্যার্থ ॥ ১—২. বজ্র নৌবহর পদ্মাখালে বাওয়া হল। নির্দয় দঙ্গালে (পাঠান্তরে 'বাঙ্গালে') দেশ (পাঠান্তরে 'ক্লেশ)' লুঠ করল। ৩—৪. ভুসুকু, চণ্ডালে-নেওয়া নিজের ঘরণী আজ বাঙালি (=ভ্রষ্ট) হল (অর্থাৎ নিজের ঘরনীকে চণ্ডালে হরণ করায় সেই ঘরনী জাতিচ্যুতা বা কুলভ্রষ্টা হল)। ৫—৬, দগ্ধ হল পঞ্চপত্তন (=শহর), নষ্ট হল ইন্দ্রিয়ের বিষয় [-সম্পত্তি]। না জানি চিত্ত আমার কোথায় গিয়ে প্রবেশ করল। ৭—৮. সোনা-রূপা, আমার কিছুই থাকল না। নিজ পরিবারে মহাপ্রেমে (পাঠান্তর মহাসুখে) থাকলাম। ৯—১০, চতুষ্কোটি-ভাণ্ডার আমার নিঃশেষে লুণ্ঠিত। [এখন] বাঁচা-মরায় কোন প্রভেদ নেই।

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা ॥ আলোচ্য চর্যায় মহাসুখমগ্ন চিত্তাবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে। চর্যাকার ভুসুকুপাদ এই সিদ্ধাবস্থার বর্ণনায় বলছেন যে প্রজ্ঞারূপ পদ্মাখালে বজ্র বা শূন্যতারূপ নৌকা চালনা করা হল অর্থাৎ প্রজ্ঞা ও উপায়ের অভেদ মিলন সাধিত হল। এই প্রজ্ঞোপায়ের মিলনের ফলে তাঁর চিত্তে অদ্বয়জ্ঞানরূপ বঙ্গালের অধিকার বিস্তৃত হল এবং এই অদ্বয়বঙ্গালের দ্বারা তাঁর অবিদ্যাজাত যাবতীয় বিষয়ক্লেশ লুণ্ঠিত বা নিঃশেষিত হল। তাই নিজের সম্পর্কে তিনি বলছেন যে, তাঁর গৃহিণী অর্থাৎ আত্মপ্রকৃতিরূপা অপরিশুদ্ধাবধূতিকা চণ্ডাল অর্থাৎ প্রভাস্বরশূন্যতার দ্বারা গৃহীত হওয়ায় তাঁর বায়ুরূপা আত্মপ্রকৃতি বঙ্গালী অর্থাৎ প্রভাস্বরপ্রকৃতিতে রূপান্তরিত হয়েছে; সংক্ষেপে, তিনি অদ্বয়জ্ঞানারূঢ় হয়েছেন। এই অবস্থায় রূপবেদনাদি পঞ্চস্কন্ধ দগ্ধ অর্থাৎ ধ্বংস হয়েছে এবং ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহ বিনষ্ট হয়েছে। যাবতীয় বিকল্প পরিহার করায় চিত্ত যে কোথায় প্রবিষ্ট হয়েছে তা তিনি বুঝতে পারছেন না। ভব এবং নির্বাণ—অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব সম্পর্কে কোন বিকল্পই তাঁর আর অবশিষ্ট নেই। সর্বশূন্যরূপ নিজ পরিবারে লীন হয়ে তিনি মহাসুখে নিমগ্ন আছেন। এই অবস্থায় চতুষ্কোটি অর্থাৎ সৎ, অসৎ, তদুভয়, অনুভয়—এই চার প্রকার বিচারের ভাণ্ডার অদ্বয়জ্ঞানরূপ বঙ্গাল কর্তৃক নিঃশেষে গৃহীত হয়েছে। এই পরম নির্বিকল্প অবস্থায় জীবনমরণের বিকল্পজ্ঞানও লুপ্ত হয়েছে, তাই জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে তিনি কোন প্রভেদ দেখতে পান না।

৫০

[পুথিপৃষ্ঠা ৬৮/ক-খ]

॥ রাগ রামক্রী—শবরপাদানাম্ ॥

গঅণত গঅণত তইলা[১] বাড়হী[১] হেঞ্চে[২] কুরাহী[২] ।
[৩]কণ্ঠেঁ[৩] নৈরামণি বালি জাগন্তে উপাড়ী ॥ ধ্রু ॥
[৪]ছাড়ু ছাড়[৪] মাআ মোহা[৫] বিষমো[৫] [৬]দুন্দোলী[৬] ।
মহাসুহে বিলসন্তি শররো লইআ[৭] সুণ মেহেলী[৭] ॥ ধ্রু ॥
হেরি[৮] যে মেরি[৮] তইলা বাড়ী [৯]খসমে[৯] সমতুলা ।
[১০]ষুকড় এসে রে[১০] কপাসু [১১] ফুটিলা[১১] ॥ ধ্রু ॥
তইলা বাড়ির পাসেঁর জোহ্না বাড়ি [১২]ভাএলা[১২] ।
ফিটেলি অন্ধারী রে অকাশ[১৩] ফুলিআ[১৩] ॥ ধ্রু ॥
[১৪]কঙ্গুচিনা[১৪] পাকেলা রে শবরাশবরি মাতেলা ।
অণুদিণ সবরো কিম্পি ন চেবই মহাসুহেঁ ভেলা ॥ ধ্রু ॥
চারি বাসে [১৫]তাভলা[১৫] রেঁ দিআঁ চণ্ডালী ।
তঁহি তোলি শবরো [১৬]ডাহ[১৬] কএলা [১৭]কান্দ[১৭] সগুণশিআলী ॥ ধ্রু ॥
মারিল ভবমত্তা রে দহদিহে [১৮]দিধলি বলী[১৮] ।
হের সে শবরো [১৯]ণিরেবণ[১৯] ভঈলা ফিটিলি [২০]ষবরালী[২০] ॥ ধ্রু ॥

পাঠান্তর ॥

১—১ বাড়ী (বাগচী, শহী) ২—২ কুরাড়ী (শাস্ত্রী, বাগচী, শহী) । কুরাঢ়ী (সেন)
৩—৩ কণ্ঠে (শাস্ত্রী, বাগচী, শহী) ৪—৪ ছাড় ছাড় (টীকা, শহী) ছাডু ছাডু (বাগচী)
৫—৫ বিষমে (শাস্ত্রী), বিষম (বাগচী), বিসমে (শহী) বিষমী (সেন)।
৬—৬ দুন্দোলী (বাগচী, শহী) ৭—৭ সুণমে হেলী (শাস্ত্রী)
৮—৮ সো মোরি (শহী) ৯—৯ খঃসমে (পুথি, সেন)
১০—১০ ষুকড়এ সেরে (শাস্ত্রী), সুকড় এ সে রে (বাগচী) সুকল এ মোরে (শহী)।
১১—১১ পুথিতে 'ফুলিটিলা' লিখে 'লি' তে বর্জনচিহ্ন দেওয়া হয়েছে এবং 'ল'-এর দাঁড়িকেই ই-কারের দাঁড়ি হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।
১২—১২ উএলা (বাগচী, শহী)। তাএলা (শাস্ত্রী, সেন)। ১৩—১৩ ফুলিলা (শহী)
১৪—১৪ কঙ্গুরিনা (পুথি) কঙ্গুয়িনা (শাস্ত্রী, বাগচী)
১৫—১৫ ভাইলা (শাস্ত্রী, বাগচী), গড়িল (সেন), গড়িলা (শহী), মড়িল (টীকা)।
১৬—১৬ হ (পুথি) ১৭—১৭ কান্দশ (পুথি) কান্দই (বাগচী, শহী)
১৮—১৮ দিধ লিবলী (শাস্ত্রী) ১৯—১৯ নিব্বাণ (শহী)
২০—২০ সবরালী (বাগচী, শহী), অব সলী (সেন)।

পাঠবিচার ও শাব্দিক টীকা ॥ তইলা—তৃতীয় > তইঅ + লা > তইলা ('পয়লা'-র সাদৃশ্যে)। হেণ্ডে—টীকার 'হৃদয়েনেতি' ব্যাখ্যা অনুসরণে শহীদুল্লাহ 'হিএঁ' পাঠ গ্রহণ করেছেন এবং অনেকেই তা অনুমোদন করেছেন ; কিন্তু বাগচী 'হেণ্ডে' পাঠেরই পক্ষপাতী, তাঁর ব্যুৎপত্তি : হেণ্ডে—[প্রা]হিত্য > হিচ্চ, হেচ্চ > হেণ্ডে, অর্থ 'আঘাত করে'। কুরাহী—কুঠারিকা >কুহারিআ >কুহারী > কুরাহী > কুরাহী (বর্ণবিপর্যয়)। পুথিতে স্পষ্ট 'হী' আছে। কাজেই পাঠান্তরের অবকাশ নেই। বালি < বালিকা। জাগন্তে—জাগ (< জাগ্) + অন্ত (শতৃ-জাত) +-এ। উপাড়ী < উৎপাটিত। দুদ্দোলী < দুর্দোলিকা। মেহেলী = নারী ; মেহ (= প্রস্রাব, শুক্রস্রাব, রজঃস্রাব) + অল + ঈ (স্ত্রী-প্রত্যয়) = মেহলী > মেহেলী = (রজঃস্বলা) নারী। তুলনীয়, হিন্দী 'মেহরী' অর্থ "১. স্ত্রী, আওরৎ, ২. পত্নী, আওরৎ। মেহরিন্হ সেন্দুর মেলচন্দন খেবরা দেহ' জ্ঞায়সী ৪০-২০-৪০২১" হিন্দী শব্দসাগর (কাশী নাগরী প্রচারিণী সভা), ৮ম ভাগ। তুলনীয়, 'ত্রিশ বৎসরের যেন হইল মেহেরি' (গরিবুল্লাহ : জঙ্গনামা, পৃ. ১০/দ্র. Buddhist mystic songs–ডঃ শহীদুল্লাহ)। দ্রষ্টব্য ১৩ নং চর্যার শাব্দিক টীকা। সুণমে হেলী—শাস্ত্রীর এই পাঠ ভ্রান্ত বিশ্লেষণজাত, সুতরাং পরিত্যাজ্য। যুকড় = সুকর < শুক্র (= সাদা, দীপ্যমান, উজ্জ্বল)। কপাসু—দ্ব্যর্থশব্দ (১) কাপাস ফুল (২) 'ক' অর্থাৎ তৃতীয় শূন্যের পার্শ্ববর্তী চতুর্থশূন্য, 'ককারস্য পার্শ্ববর্তী খকারশ্চতুর্থশূন্যম্'—টীকা। পাসেঁর = পাসের—পার্শ্ব > পাস + এর (সম্বন্ধবিভক্তি)। জোহ্না < জ্যোৎস্না। ভাএলা—ভাত > ভাঅ + ইল (।) = ভাইলা > ভাএলা। শাস্ত্রী ও সেনের 'তাএলা' (<তদ্‌বেলা) পাঠ কষ্টকল্পিত। টীকা অনুসারে 'উএলা' (< উদিত + ইল) পাঠান্তর বিকল্পে গ্রহণযোগ্য। অন্ধারী < অন্ধকার + ইক : পুথিতে স্পষ্ট ঈ-কার আছে। ফুলিআ <* ফুল্লিত ঃ (=ফুল্ল ঃ)। কঙ্গুচিনা = কঙ্গু + চিনা। কঙ্গু = শস্যবিশেষ + চিনা = চীনদেশীয় (?) ; উত্তরবঙ্গে এই শস্য 'কাউন' নামে পরিচিত, পশ্চিমবঙ্গে 'কাংনি'। চর্যায় 'কঙ্গুচিনা' দ্ব্যর্থবোধক সন্ধ্যাশব্দ : (১) শস্যবিশেষ, (২) ক(=মহাসুখ) + অঙ্গচিন (=অঙ্গচিহ্ন)। পাকেলা—পক্ব > পাক (নামধাতু) + এলা (-ইল জাত) = পাকেলা। চেবই < চেতয়তি। ভেলা= ভোলা (টীকা) < বিহ্বল। তাভলা—স্তব্ধ (= স্থিরীকৃত, শক্ত করে রাখা হয়েছে এমন, fixed, propped)> তব্‌ভ (সমীভবন) > তাভ + অল (।)—তাভলা, অর্থ—ভালো করে রাখা হয়েছে, সাজানো হয়েছে। টীকার 'যোগীন্দ্রেন স্থিরীকৃতাঃ' এই অর্থেরই ইঙ্গিত দেয়। শাস্ত্রী ও বাগচীর 'ভাইলা' পাঠ ভিত্তিহীন ও কষ্টকল্পিত। টীকায় এই পদের একটি পাঠান্তর পাওয়া যায়, সেটিকে কেউ কেউ 'গড়িল' পড়েছেন এবং শহী ও সেন 'তাভলা'-র বদলে যথাক্রমে 'গড়িলা' ও 'গড়িল' পাঠ নিয়েছেন। কিন্তু টীকায় 'গড়িল' নেই, আছে 'মড়িল' ; মড়িল—মণ্ডিত (=সজ্জিত) > মড়িঅ + ইল = মড়িল। টীকার তিব্বতী অনুবাদের bskor nas = মণ্ডলীকৃত্য (বাগচী) এই পাঠ সমর্থন করে এবং অর্থের দিক থেকেও গানের 'তাভলা' ও টীকার 'মড়িল'-র মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। চঞ্চালী—দ্ব্যর্থশব্দ (১) চাঁচাড়ি বা বাখারি (২) চঞ্চল (বিষয়েন্দ্রিয়)। কএলা-কৃত > কঅ + ইল (।) = কএলা। কান্দ < ক্রন্দতি। পুথির 'কান্দশসগুণ' পাঠের 'শস' এক ধরনের দ্বিলিখন।

লিপিকর শ-বর্ণটি এক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয় নয় মনে করে পরে আবার 'স' লিখে বানান শুদ্ধ করেছেন। দিধলি—পুথি খণ্ডিত থাকায় এই চর্যার শেষ তিন পঙ্‌ক্তির টীকা পাওয়া যায় নি। তিব্বতী সংস্করণে এই অংশের যে অনুবাদ আছে তাতে 'দিধলি'র অর্থ 'দেয়' বা 'দিল'। দিহ্ (to accumulate. দ্র. SED) + ক্ত = দিগ্ধ > দিধ + অল + ই (স্ত্রী প্রত্যয়)। হের—অর্থ 'এই' 'নিকট'। নিরেবণ < নির্বিণ্ণ (স্বরভক্তি), পাঠান্তর নিষ্প্রয়োজন। যবরালী = শবরালী < শবর +-আলী (<-পালিক), অর্থ 'শবরবৃত্তি।' পুথিতে 'র'-এ over-writing থাকলেও 'যবরালী' স্পষ্ট বোঝা যায়, কাজেই পাঠান্তরের অবকাশ নেই।

বাচ্যার্থ ॥ ১—২. গগনে গগনে তৃতীয় বাড়ী, হৃদয়ে কুঠার (বাগচীর ব্যুৎপত্তি ধরলে 'কুঠার হেনে')। কণ্ঠে নৈরামনি-বালিকা [নিয়ে] জাগরণের কালে [কুঠার দিয়ে সেই বাড়ী] উৎপাটন করা হল। ৩—৪. ছাড় ছাড় মায়া-মোহ, বিষম সন্দেহ। শবর শূন্যনারীকে নিয়ে মহাসুখে বিলাস করছে। ৫—৬. এই সে আমার আকাশের সমতুল্য তৃতীয় বাড়ী। ওরে, এখন কী শুভ্র কাপাস [ফুল] ফুটেছে! ৭—৮. তৃতীয় বাড়ির পাশে জ্যোৎস্না-বাড়ি দেখা যায়। ওরে, আঁধার ঘুচল, আকাশে ফুল ফুটল। ৯—১০. কঙ্গুচিনা (=চীনা ধান) পাকল। ওরে শবর-শবরী মাতল। দিনের পর দিন শবরের কিছুই চেতনা থাকে না, মহাসুখে বিহ্বল। ১১—১২. ওরে, চাঁচাড়ি দিয়ে চার বাসে (=জায়গায়) সাজাল। সেখানে তুলে শবর দাহ করল। শকুন-শৃগাল কাঁদে। ১৩—১৪ ভবমত্তকে মারল, দশদিকে পিণ্ড (= বলী) জড়ো করা হল। এই সে শবর নির্বেদ হল, ঘুচল [তার] শবরপনা।

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা ॥ আলোচ্যচর্যায় শবর-শবরীর মিলনমত্ততার রূপকে শূন্যতার সর্বশেষ পরিশুদ্ধ স্তর সর্বশূন্যে উপনীত হয়ে চতুর্থানন্দরূপ মহাসুখলাভের কথা বর্ণিত হয়েছে। বৌদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্রে শূন্যতার যে চারটি স্তর পরিকল্পিত হয়েছে, বর্তমান চর্যায় তা বাড়ির সঙ্গে উপমিত হয়েছে। শূন্য ও অতি শূন্যের পরই তৃতীয় শূন্য মহাশূন্যের অবস্থান। এই তিন শূন্যেরই মোট একশো ষাটটি প্রকৃতিদোষ বিদ্যমান। প্রকৃতি প্রভাস্বর চতুর্থ শূন্য দ্বারা এই শূন্যত্রয়কে আঘাত করলেই সমস্ত প্রকৃতিদোষ খণ্ডিত হয়। তাই সিদ্ধ যোগী তাঁর পরিশোধিত হৃদয়কেই প্রভাস্বর সর্বশূন্যরূপ কুঠারে পরিণত করে পূর্বোক্ত শূন্যত্রয়ের প্রকৃতিদোষ ছেদন করেন এবং সেই অবস্থায় কণ্ঠস্থিত সম্ভোগচক্রে নৈরাত্মাকে ধারণ করলে কায়-বাক-চিত্তরূপ ত্রিলোক তাঁর আয়ত্তে আসে। তাই সিদ্ধাচার্য শবরপাদ বালযোগীদের উদ্দেশে বলছেন যে, তাদের তুচ্ছ মায়ামোহ ত্যাগ করা উচিত, কেননা এই মায়ামোহ বিষয়-বিঘ্ন উৎপাদন করে। মায়ামোহ ত্যাগ করায় শবর নৈরাত্মারূপিণী শূন্যতানারীকে কণ্ঠে সম্ভোগচক্রে ধারণ করে মহাসুখে বিলাস করছেন। এই অবস্থার বর্ণনায় শবরপাদ বলছেন যে, তাঁর তৃতীয় বাড়ি গগনের সমতুল্য হয়েছে এবং সেখানে সুন্দর কাপাস ফুটেছে। এই উক্তির অর্থ এই যে তাঁর চিত্তাধিষ্ঠিত তৃতীয় শূন্য ক-কারের পার্শ্ববর্তী ('কপাসু' = ক + পাসু < পার্শ্ববর্তী 'কপাসমিতি। ককারস্য পার্শ্ববর্তী খকারশ্চতুর্থশূন্যং'-টীকা) চতুর্থশূন্যে রূপান্তরিত হয়েছে এবং কাপাস-শুভ্র প্রভাস্বর

শূন্যতার উদয় হয়েছে। তৃতীয় বাড়ির পাশে অর্থাৎ তৃতীয় শূন্যের পার্শ্ববর্তী চতুর্থ শূন্যরূপ চন্দ্রের উদয়ে সমস্ত ক্লেশান্ধকার দূরীভূত হয়ে আকাশকুসুমের মত অলীক প্রতিপন্ন হয়েছে। এই অবস্থায় কঙ্গুচিনা শস্য পেকে উঠেছে অর্থাৎ মহাসুখ (ক = মহাসুখ = অঙ্গচিন—'কং সুখং সম্বৃত্তিবোধিচিত্তং তেন যস্য অঙ্গচিনমিতি'—টীকা) লাভ হয়েছে, শবর এবং নৈরাত্মারূপিণী শবরী মহাসুখে মত্ত হয়েছেন, এবং গ্রাহ্য-গ্রাহকাদি ভাব লুপ্ত হওয়ায় শবরের সমস্ত চেতনা লুপ্ত হয়েছে। ইতঃপূর্বেই শবর তৃতীয় শূন্যকে ধ্বংস করেছেন, তাই এখন তিনি চঞ্চল বিষয়েন্দ্রিয় সমূহের ক্রিয়া রুদ্ধ করে চতুর্থ আবাসরূপ চতুর্থ শূন্যে অধিষ্ঠিত হয়েছেন এবং ইন্দ্রিয়সমূহকে দগ্ধ করে নির্বিকল্প অবস্থা লাভ করেছেন। তাই শকুন-শৃগালরূপ বিষয়বিকল্প ক্রন্দন করছে অর্থাৎ কাতর হয়েছে। এই অবস্থায় উপনীত হওয়ার জন্য ভবমত্ত বা ভববিকল্পগ্রস্ত সংবৃতি বৌধিচিত্তকে সদ্‌গুরুর উপদেশরূপ খড়্গের দ্বারা বলি দেওয়ায় অর্থাৎ ধ্বংস করায় শবরপাদ নির্বেদ অবস্থায় উপনীত হয়েছেন এবং তাঁর শবরত্বেরও অবসান হয়েছে অর্থাৎ তাঁর আত্মা-আত্মীয়ভাবরূপ দ্বৈতজ্ঞানেরও অবলুপ্তি ঘটেছে ॥

পরিশিষ্ট

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাগীতির যে পুথি আবিষ্কার করেছিলেন, তাতে কতকগুলি পাতা না থাকায় ২৩ সংখ্যক গানের শেষাংশ এবং ২৪, ২৫ ও ৪৮ সংখ্যক গান তিনটি সেখানে পাওয়া যায় নি। পরে চর্যাগীতির তিব্বতী অনুবাদ অবলম্বনে প্রবোধচন্দ্র বাগচী উক্ত লুপ্ত গীত ও গীতাংশের যে সংস্কৃতানুবাদ পরিকল্পনা করেন বর্তমান ক্ষেত্রে তারই পুনরুদ্ধার করা হল, এবং সেই সঙ্গে তার সম্ভাব্য বঙ্গানুবাদ দেওয়া হল।

২৩

[শেষ চার ছত্রের সংস্কৃতানুবাদ]

কায় আত্মাপাত্রং মাতা পৃথিবী জলম্ অগ্নিশ্চ ভোজনম্।
কালাকালোভয়ম্ আলম্ব্য পবনমার্গে যোগপ্রমাণারিত্রেণ চালয় ॥
জালশৃঙ্খলারজ্জূনামভাবে হরিণো দ্রুতং পলায়িতঃ।
উৎপ্লুত্যোৎপ্লুত্য দ্রবন্ গগনমধ্যেঽস্তমিতঃ ভুসুকুপাদরজনী প্রভাতা ভবতি ॥

বাচ্যার্থ ॥ ৭—৮. কায়ই নিজের আধার [এবং] পৃথিবী (=ক্ষিতি), জল (=অপ্), অগ্নি (=তেজঃ) প্রভৃতি ভোগযোগ্য পঞ্চভূতের মাতা বা উৎসস্বরূপ। [সুতরাং] কালাকাল (চন্দ্রাভাস সূর্যাভাস) উভয়কে একত্র করে পবনমার্গে (=অবধূতীমার্গে) যোগপ্রমাণরূপ দাঁড় দিয়ে চালনা কর। ৯—১০. জাল-শিকল-রজ্জুর অভাবে হরিণ দ্রুত পালিয়ে গেল। লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে গগনমধ্যে হারিয়ে গেল এবং ভুসুকুপাদের [-ও] রজনী প্রভাত হল।

২৪

॥ রাগ ইন্দ্রতাল—কৃষ্ণাচার্যপাদানাম্ ॥

পূর্ণচন্দ্র উদয়তি যদা।
চিত্তরাজো বিমলো ভবতি তদা ॥
মোহমলং ছিন্নং গুরূপদেশেন।
বিষয়েন্দ্রিয়ং গগনমুপেতম্ ॥ ধ্রু ॥

খসমবীজং যৎ খসমং যাতি।
আত্মবৃক্ষস্ ত্রিধাতুষু বিতনোতি চ্ছায়াং ॥
যথা উদিতে সূর্যে রাত্রির্ব্যপয়াতি।
(তথা) ভবসমুদ্রমোহরজো দূরীভবতি ॥
রাজহংসো যথা জলং বিবিনক্তি।
ভবং ভুঙ্ক্ষ্ব [তথা] ইতি কথয়তি কৃষ্ণপাদঃ ॥

সেকোদ্দেশটীকায় এই চর্যার প্রথম দুই ছত্রের মূল রূপ পাওয়া যায় :

পুন্নিমা চন্দা উইঅউ জব্বেঁ।
চিঅরাঅ নিমিলিঅ (নিমলঅ ?) তব্বেঁ ॥

বাচ্যার্থ ॥ ১—২. যখন পূর্ণচন্দ্র উদিত হয় তখন চিত্তরাজ বিমল [নিমিলিঅ = নিমীলিত] হয়। ৩—৪. গুরুর উপদেশে মোহমলিনতা (টীকায় 'মোহাদিকাবরণং' = মোহাদি আবরণ) ছিন্ন হল। বিষয়েন্দ্রিয় গগনে প্রবেশ করল। ৫—৬. শূন্যবীজ শূন্যে যায়। আত্মবৃক্ষ ত্রিধাতুতে ছায়া বিস্তার করে। ৭—৮. যেমন সূর্য উঠলে রাত্রি কেটে যায় [তেমনি] ভবসমুদ্রমোহধূলি দূরীভূত হয়। ৯—১০. রাজহংস যেভাবে জলকে পৃথক করে [শুধু দুধটুকু খায়], কাহ্ন বলে, ভবকে [ঠিক তেমন ভাবেই] ভোগ কর।

২৫
॥ গীতিস্ তন্ত্রীপাদানাম্ ॥

ধর্মোদয়ঃ পাদাধিষ্ঠানং বজ্রপদং নাদঃ।
পঞ্চক্রমং বয়িত্বা তন্ত্রিণঃ পটো বিমলঃ ॥
অহমেব তন্ত্রী স্বয়মেব তানং।
বিতানং [চ] স্বয়মজ্ঞাতলক্ষণং ॥ ধ্রু ॥
সার্ধত্রিহস্তং গৃহে বেমমুক্তং ত্রিবৃতং।
গগনং পূর্ণং স হি তন্ত্রবয়নং।
অনাহতো বেমবরশব্দো হি গুরূপদেশেনাবিরহিতং।
দ্বে স্থিতী ছিত্বা সূত্রাণি ব্যাবৃত্য দৃঢ়ং প্রসারিতানি ॥
মণিং গতঃ শূন্যতয়া লক্ষণশূন্যতাসারং।
বয়ন [জাল] রসন্তন্ত্রী মোহজালমুক্তঃ ॥

বাচ্যার্থ ॥ ১. পাদাধিষ্ঠান বজ্র পদ ধর্মোদয় নাদ। ২. ক্রমান্বয়ে পাঁচবার বয়ন করে তাঁতির [বোনা] পট (=কাপড়) বিমল (=পরিষ্কার) হল। ৩—৪. আমিই তাঁতি, [আমি] নিজেই [তাঁতের] টানা এবং অজ্ঞাতলক্ষণ পোড়েন। ৫—৬. সাড়ে তিন হাত ঘরে তিনগুণ [দীর্ঘ] সেই মাকুমুক্ত তাঁত-বোনায় গগন পূর্ণ হল। ৭—৮. অনাহত সেই বয়নশব্দ

অবিরাম গুরুর উপদেশে দুই স্থিতি ছিন্ন করায় সুতোগুলি দৃঢ়ভাবে প্রসারিত হয়েছে। ৯—১০. বয়ন-পরায়ণ তাঁতি শূন্যতার দ্বারা লক্ষণশূন্যসার মণিতে গিয়ে মোহজালমুক্ত হল।

৪৮

॥ রাগঃ পটহঃ—কুক্কুরীপাদানাম্ ॥

কুলিশাব্জযুদ্ধং প্রবিষ্টাঃ।
সমতাযোগস্য সৈনিকসমূহাঃ ॥
বিষয়েন্দ্রিয়গ্রামানহন্।
শূন্যতারাজো মহাসুখনামা ॥ ধ্রু ॥
তূর্যশব্দঃ শঙ্খধ্বনির্ অপ্রতিহতনাদং নদতি।
মোহভববলানি দূরাতীতানি ॥
সুখপুরং শিখরে সংস্থাপ্য সর্বম্ আকৃষ্টং (সংগৃহীতং বা)।
অঙ্গুলিম্ ঊর্ধ্বং ক্ষিপ্ত্বা কুক্কুরীপাদো বদতি ॥
অয়ং ত্রৈলোক্যে মহাসুখেন জয়তি।
তত্ত্বস্যার্থং শব্দান্তরেণ কুক্কুরীপাদেন কথিতং ॥

বাচ্যার্থ ॥ ১—২. কুলিশ-কমলের যুদ্ধে সমতাযোগের সৈন্যসমূহ প্রবেশ করল। ৩—৪. বিষয়েন্দ্রিয়ের দুর্গসমূহ জয় করে শূন্যতারাজ মহাসুখী হলেন। ৫—৭. তূর্যশব্দ শঙ্খধ্বনি অনাহত গর্জন করল। মোহভববরূপ বল (=সৈন্য) দূরে পলায়ন করল। ৭—৮. সুখপুরশিখরে স্থাপন করে সব কিছু (লুণ্ঠিত দ্রব্য) আহরণ করা হল। ঊর্ধ্বে অঙ্গুলি তুলে কক্কুরীপাদ বলেন। ৯—১০. এই ত্রিলোকে মহাসুখেই জয় হয়। [এই] তত্ত্বের অর্থ কুক্কুরীপাদের দ্বারা শব্দান্তরে (অর্থাৎ সন্ধ্যাভাষায়) কথিত হল।

আকরপঞ্জী

ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার— মানবধর্ম ও বাংলাকাব্যে মধ্যযুগ, কলকাতা ১৯৫২।

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়— বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১ম খণ্ড), ২য় সং, (সম্পাঃ) নবচর্যাপদ (ক.বি.) ১৯৮৯ কলকাতা ১৯৬৩।

ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়— চর্যাগীতি, বিশ্বভারতী ১৩৭২।

নলিনীনাথ দাসগুপ্ত— বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম কলকাতা ১৩৫৫।

ডঃ নীলরতন সেন— চর্যাগীতির ছন্দপরিচয়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৪। চর্যাগীতিকোষ, কলকাতা, ১৯৭৮

ডঃ নীহাররঞ্জন রায়— বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা ১৩৫৯।

ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী— বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য, বিশ্বভারতী ১৩৫৯।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়— রচনাবলী (১ম খণ্ড), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৭০।

মনীন্দ্রমোহন বসু— চর্য্যাপদ, পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা ১৯৫৯।

রাজ্যেশ্বর মিত্র— বাংলায় সঙ্গীত (প্রাচীন যুগ), কলকাতা ১৯৫৩।

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত— বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি, ২য় সং, কলকাতা ১৩৭১।

ডঃ শিবচন্দ্র লাহিড়ী— বাংলা কাব্যে উপমালোক, কলকাতা ১৯৬৫।

শ্যামাপদ চক্রবর্তী— অলঙ্কারচন্দ্রিকা, পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা ১৩৬৯।

ডঃ সুকুমার সেন— বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ) ৪র্থ সং, কলকাতা ১৯৬৩।

চর্যাগীতি পদাবলী, ৩য় সং কলকাতা ১৯৭৩।

ভাষার ইতিবৃত্ত, ১২শ সং, কলকাতা ১৯৭৫।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী— হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩২৩।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়— বঙ্গীয় শব্দকোষ (দুই খণ্ড), সাহিত্য অকাদেমী। নয়া দিল্লী, ১৯৬৭

ডঃ ক্ষুদিরাম দাস— বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতি, কলকাতা।

Beatrice Lane Suzuki- Mahayana Buddhism, George Allen and Unwin Ltd. London. 1959

D. N. Basu-	Functional Analysis of Old Bengal Structures. Calcutta, 1976.
Herbert V. Guenther-	Tibetan Buddhism without Mystification, Leiden 1966.
Per. Kvaerne	An Anthology of Buddhist Tantric Songs A study of the Caryāgīti, OSLO, Norway, 1977
Dr. Prabodhchandra Bagchi	Caryāgiti-Kosa of Buddhist
Santi Bhiksu Sastri-	Siddhas, Viswabharati, 1956.
R. D. Banerji	The origin of the Bengali Script. (Reprint) Calcutta 1973
Dr. Sashibhusan Dasgupta-	Obscure Religious Cults. 2nd ed. Calcutta 1962. An introduction to Tantric Buddhism, C.U. 1950.
Dr. Sunitikumar Chatterji–	The Origin and Development of theBengali Language, Calcutta 1926.
Dr. Surendranath Dasgupta–	A History of Indian Philosophy, vol I, Cambridge 1922.
Dr. Tarapada Mukhopadhyay–	The old Bengali Language and Text, Calcutta University, 1963
Indian Linguistics, Vol IX part 2-4, 1946-48	Index verborum of the old Bengali Caryā songs and Fragments–Dr. Sukumar Sen.
Indian Lingnistics, vol. x. Calcutta 1948.	Old Bengali Texts or Caryagitikosa.
Journal oftheDepartment of Letters. Vol xxx, C.U., 1938	Materials of a Critical Edition of the old Bengali Caryapadas : Dr. Prabodh. Chandra Bagchi
Monier Monier Williams–	A Sanskrit English Ditionary, Delhi-6
Dr. Muhammad Sahidullah	Buddhist Mystic songs. Renaissance Printers, Dacca, June 1974.

পদপঞ্জী

[পদের পার্শ্ববর্তী সংখ্যাযুগলের প্রথমটি চর্যাসূচক, দ্বিতীয়টি চর্যার "পদ"সূচক]

অ

অইস ৪১ ।৫ ঃ অইসন ২ ।৫ ; অকট ৩১ ।২, ৪১ ।২ ; অকাশফুলিআ ৫০ ।৪ ; অকিলেসেঁ ৯ ।৫ ; অগে ১৫ ।৩ ; অঙ্কবালী ৪ ।১ ; অছ ৩৭ ।৩ ; অচ্ছন্তেঁ ৩৯ ।৪ ; অচ্ছসি ৪১ ।৫ ; অচ্ছহু ৬ ।১ ; অচ্ছিলেঁসু ৩৫ ।১ ; অজরামর ৩ ।১, ২২ ।৫ ; অব ১৫ ।৪ ; অঠকমারী ১৩ ।১ অণহা ১৭ ।১, ২৫ ।১ ; অণুঅণা ৪১ ।১ ; অদঅ ৪৯ ।১, অদঅভুঅ ৩৯ ।৩, অদশ ৪৬ ।১ ; অধরাতি ২৭ ।১, অধরাতী ২ ।২ ; অন ৩৮ ।২ ; অনাবাটা ১৫ ।১ ; অণুঅনা ৪৩ ।৩ ; অনুদিনং ৪২ ।২ ; অনুভব ৩৭ ।২ ; অন্তউড়ি ২০ ।২, অন্তরালে ৪৬ ।১ ; অন্তরে ১০ ।৫, ১০ ।৬ ; অন্তে ১৮ ।২ ; অন্ধারী ২১ ।১ ; ৫০ ।৪ ; অপইঠান ৩৪ ।৩ ; অপণা ৬ ।২, ২৬ ।৩, ৩৯ ।৩ ; অপণে ৩ ।৩, ২২ ।১, ৩২ ।৩, ৩৭ ।১ ; অপা ৩১ ।১, ৩২ ।৩ ; ৩৯ ।৪ ; অপেঁ ৪১ ।৩ ; অপ্যণা ৩৯ ।৩ । অভাগে ৩৫ ।৫ ; অভাব ২৯ ।১, অভিনচারেঁ ৩৪ ।১ ; অম্হে ৪ ।৫, অমিঅ ২১ ।১, অমিআ ৩৯ ।৪ ; অন্তে ২২ ।২ ; অলকখ ১৫ ।১, অলো ১৭ ।২ ; অলক্ষ ৩৪ ।২ অবণাগবণ ৭ ।৪, অবণাগবণা ২১ ।২ অবণাগমণ ৩৬ ।৪, অবণাগমণা ৪৬ ।২, অবধূই ২৭ ।২ ; অবধূতী ১৭ ।১ ; অবর ১০ ।৫, ৩৪ ।৫ ; অবশ ১২ ।৪, অবস ৩২ ।৪ ; অহর্ণিসি ৯ ।৪ ; অহার ৩৫ ।৫, অহারিউ ১৯ ।৩, ২৬ ।৩ ; অহারিল ৩৫ ।৪ ; অহেরি ২৩ ।১ ।

আ

আই ৪৩ ।৩, আইএ ৪১ ।১ ; আইল ৩ ।৩ ; আইলা ৭ ।৪ ; আইলেঁসি ৪৪ ।৪ ; আইস ২৯ ।১, ৪১ ।২, ৪২ ।৫ ; আকাশে ৪১ ।৪ ; আখি ১৫ ।৫ ; আগম ২৯ ।৩ ; ৪০ ।১, আগি ৪৭ ।২ ; আঙ্গণ ২ ।২ ; আজদেব ৩১ ।২ । আজি ৪৯ ।২ ; আণ ৪৪ ।৩ ; আণুতু ১৯ ।৩ ; আণেঁ ৩৮ ।৩ আদঅ ৫ ।৩ ; আনন্দে ৩০ ।৪ ; আভরণে ১১ ।৩ ; আম্হে ১২ ।৫ ; আলাজালা ৪০ ।১ ; আলি ১১ ।৩, ১৭ ।৩ ; আলিএঁ ৭ ।১ ; আলে ৪০ ।৩ ; আলো ১০ ।২ ; আবই ৪২ ।৫, আবয়ি ৪৩ ।৪ ; আবেশী ৩৩ ।১ ; আস ১ ।৪, আসবমাতা ৯ ।২ ; আসা ৪৫ ।১ ; আহারা ২১ ।১ ; আঁসু ২৬ ।১ ।

ই

ইন্দি ৪৫ ।১ ; ইন্দিঅ ৩১ ।১ ; ইন্দিআল ৩০ ।৩ ; ইন্দীজানী ৩৪ ।৪ ; ইন্দিবিস আ ৪৯ ।৩ ।

উ

উআস ৭ ।২ ; উইআ ৪৪ ।১ ; উইজঅ ৪৫ ।২ ; উইত্তা ৩০ ।২ ; উএখী ১৬ ।৪ ; উএসেঁ ১২ ।২ ; উএসই ৪০ ।৩, উগ্গা ২৮ ।১ ; উছলিআঁ ১৯ ।২ ; উছারা ১৪ ।২ ; উজাঅ ৩৮ ।৫ ; উজু ৩২ ।২ ; উজুবাট ১৫ ।২, ১৫ ।৪ ; উজোলি ৩০ ।৪ ; উণ্ডল পাণ্ডল ২১ ।৫ ; উঠি ২১ ।৫ ; ৪৭ ।৫ ; উদক ২৯ ।৪ উন্মত্তো ১৯ ।৫ ; উপাড়ী ৮ ।৩, ৫০ ।১ ; উপায়ে ৩৮ ।২ ; উভিল ৪ ।৫ ; উমত ২৮ ।২ ; উলাস ৩০ ।৩ ; উলোলেঁ ৩৮ ।৪, উবেসেঁ ৮ ।২, উহ ১৫ ।৪, ২১ ।৪, ২৯ ।২, ২৯ ।৫ : উহ্লসিউ ২৭ ।১ ।

এ

এ ৬ ।৪, ২০ ।৫, ২৮ ।৩, ৩০ ।৫, ৩৩ ।৩, ৩৯ ।৩ ; ৪১ ।১, এউ ১ ।৪ এক ৩ ।১, ৩ ।৫, ১০৩ ; একারেঁ ১১ ।২ ; একু ২ ।৫, ১৫ ।২, ২৩ ।২, ৩৪ ।৩ ; একে ২৮ ।৬ ; একেলী ২৮ ।৩, একেঁলে ৩৯ ।৫ ; এড়ি ১ ।৪ ; এত ৩০ ।৫, ৩৫ ।১ ; এথু ১৬ ।৫, ২০ ।২, ২০ ।৫, ২৭ ।৪ ; এবংকার ৯ ।১ ; এবেঁ ৩৫ ।১, ৩৫ ।২ ; এযা ১৫ ।৪ ; এযু ৩৭ ।৫ ; এসে ৫০ ।৩ ; এসু ৪২ ।৫ ; এহ ৪৩ ।৪, এহু ২৬ ।৫

ও

ওড়িআণে ৪ ।৩

ক

কইসণ ২২ ।২, কইসণি ১৮ ।২, কইসা ৪০ ।৫, কইসে ৪২ ।২ ; কইসেঁ ৮ ।২, ২৮ ।৭, ৩৯ ।১, ৪০ ।২ ; কএলা ৩৫ ।৫, ৫০ ।৬ ; কঙ্কণ ৪৪ ।৫ ; কংখা ২২ ।৪, ৩৭ ।১ ; কঙ্গুচিনা ৫০ ।৫, কট ৪১ ।৪, ৪৩ ।৪ ; কণ্ঠ ১৮ ।৪ ; কণ্ঠে ২৮ ।৫, ৫০ ।১ ; কণ্ডহার ১৩ ।৫ ; কন্ঢারা ১৫ ।২ ; কপালী ১০ ।৬, ১১ ।২, কপাসু ৫০ ।৩, কমল ৪ ।১, ৪ ।২, ২৭ ।১, ২৭ ।৩, ৪৭ ।১ ; কমলিনি ২৭ ।৩ । কর ২৮ ।২, ৪১ ।২ ; করঅ ২১ ।১, করই ৪১ ।৪, করউ ২২ ।৪, করণক ১ ।৪, করণ্ডকশালা ১৯ ।১, করহকলে ১৭ ।৪, করহা ১৭ ।৪ করহু ৪ ।১, করি ৯ ।৫, করিঅ ১ ।২, করিঅই ১ ।৩,করিআ ১২ ।৪, ৩৪ ।৪, করিণা ৯ ।৩, করিণিরেঁ ৯ ।৩ ; করিব ৭ ।২, ১০ ।২, ৩৬ ।৫ ; করিহ ২১ ।৫ করুণরি ৩৪ ।১, করুণমেহ ৩০ ।১ ; করুণা ৮ ।১ ; ১২ ।১, ৩১ ।১, ১৩ ।২ ; করেই ১৪ ।১ ; কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী ২৮ ।৩, কলএল ৪৪ ।৫, কলিআ ২১ ।৩, কবড়ী ১৪ ।৫, কবালী ১১ ।৫, কসণ ১৬ ।১ ; কহেই ২৭ ।২, কহিঁ ৭ ।২, ৩১ ।১, ৪৯ ।৩ কা ২ ।৩, ৩৯ ।৪ ; কাঅঁ ১৩ ।৩, ৩৮ ।১, ৪০ ।২, ৪৬ ।৪, কাঅবাক্ চিঅ ৩3 ।১, ৪০ ।২, কাঅর ৪২ ।৩, কাআ ১ ।১, কাউই ২ ।৪, কাঙ্কাণ ৩২ ।৩ : কাচ্ছী ৮ ।৩, ১৪ ।৩, কাজ ১৮ ।৩, ১৮ ।৩, ২৬ ।৫, কানেট ২ ।২, ২ ।৩. কান্দ ৫০ ।৬, কান্ধ ৪২ ।১, কান্ধে ৩ ।২ কাপালি ১০ ।২, কাপুর ২৮ ।৫, কাম ২২ ।৬, কামচণ্ডালী ১৮ ।৫, কামরু ২ ।৩, কামলি ৮ ।২, ৮ ।৩ : কাল ১ ।১, ৩৫ ।১. ৪০ ।৪ কালা ২১ ।৪ কালি

১১ ।৩, ১৭ ।৩ কালেঁ ৪০ ।৫, কাবালী ১৮ ।২ কাহরি ১০ ।৪, কাহি ১ ।৩, ৪৩ ।৩, কাহেরি ৩৭ ।১, কাহেরে ৬ ।১, ২৯ ।৪, কাহ্ন ৭ ।১-৫, ১০ ।২, ১১ ।২, ১১ ।৫, ১২ ।২, ১২ ।৫, ১৩ ।৫, ১৯ ।২, ৪০ ।৫, ৪৫ ।২ ; কাহ্নিল ৪২ ।৫, কাহ্নিলা ৩৬ ।২, কাহ্নু ৪২ ।২, কি ৮ ।৪, ২২ ।৬,৩৩ ।২, ৩৯ ।৫, ৪২ ।৩ : কিঅ ১৩ ।১, ১৩ ।৩, ১৯ ।৩ : কিউ ১১ ।৩, কিণ ২৬ ।২ কিন্তো ৩৪ ।৩, কিম্‌পি ১৬ ।৫, ২২ ।৫, ৪৯ ।৪, ৫০ ।৫ কিস ২৯ ।৪-৫ কিং ৪১ ।১ : কীস ৬ ।১, ৪০ ।৩, কুঠার ৪৫ ।৫, কুঠারে ৪৫ ।২, কুড়িআ ১০ ।১, কুণ্ডুবাঁ ৩৯ ।৪ : কুণ্ডল ১১ ।৩, ২৮ ।৩ : কুন্দুরে ৪ ।৫, কুম্ভীরে ২ ।১, কুরাহী ৫০ ।১, কুরুণ্ড ৩৭ ।৪, কুলিণ ১৮ ।২, কুলিশ ৪ ।১, ৪৭ ।১, কুলেঁ ১৪ ।৫, ১৫ ।২ ; কেডুআল ৮ ।৪, ১৩ ।৩, ১৪ ।৩, ৩৮ ।১, কেলি ৪১ ।৪, কেহো ১৮ ।৪, কেঁ ৮ ।৪ কো ১৬ ।৪, ২৯ ।১ কোই ৪২ ।৫, কোএ ৪৩ ।১, কোঞ্চা ৪ ।৪, কোঠা১২ ।৫, কোড়ি ২ ।৫, ৪৯ ।৫ কোহিঅ ৫ ।৩ ।

খ

খ ২০ ।১, ৪৩ ।১ ; খট্টে ১১ ।১, খড় ১৫ ।৫, খনঅ ২১ ।৩, খণহ ১৯ ।৫, ৬ ।২, খনহিঁ ৪ ।২ ; খমণ ২০ ।১ খম্ভাঠাণা ১৬ ।৩, খর ১৬ ।৫, ৩৮ ।৫, ৪৭ ।৩, খলি ২০ ।৪ খসম ৪৩ ।১ খসমে ৫০ ।৩, খাঅ ২ ।১, ১০ ।৭, খাই ২৮ ।৫, ৪১ ।১ খাইব ৩৯ ।৪, খাট ২৮ ।৪, খাণ্টা ৩৮ ।৪, খাণ্টি ৩৮ ।১, খালবিখলা ৩২ ।৫, খুণ্টি ৮ ।৩, খুর ৬ ।৫, খেড়া ৪১ ।৪ খেপহুঁ ৪ ।৩, খেলই ৪১ ।৪, খেলহুঁ ১২ ।১ ।

গ

গঅণ ৮ ।২, ১৪ ।৩, ১৬ ।৩, ৩০ ।২, ৩৫ ।২, ৪৩ ।২, ৪৭ ।৩ ; গঅণত ২৮ ।৩, ৩৪ ।১, ৩৪ ।২, ৩৫ ।৪, ৫০ ।১, গঅণন্ত ১৬ ।২, গঅণাঙ্গণ ১৬ ।৫, গঅণে ২১ ।৪, গঅনেঁ ৩৮ ।৫, গঅবর ১৭ ।৩, গই ২ ।৩, ৭ ।২, ১৬ ।৫, ৩১ ।১, ৪৯ ।৩, গউ ২৭ ।৩, গঅন্দা ১৬ ।২ গজিই ৩২ ।৪, গঢ়ই ৫ ।২, গন্ধ ১৩ ।৪, গন্ধবনইরী ৪১ ।৩, গবিআ ৩৩ ।৩, গম্ভীর ৫ ।১ গরাহক ৩ ।৩ । গরাহকা ৩ ।৪, গরুআ ২৮ ।৭ ; গলপাস ৩৭ ।৫ ; গলেঁ ৩৭ ।৫ ; গহণ ৫ ।১, গাইউ, ২ ।৫, গাইতু ১৮ ।৫, গাজই ১৬ ।১, গাতী ২১ ।৩, গিবত ২৮ ।১, গীত ৩৩ ।৫, গুঞ্জরী ২৮ ।১, গুণিআ ১২ ।৫, ১৭ ।৩, গুমা ১৫ ।৫, গুরু ১ ।২, ২৮ ।৬, ৩৯ ।১ ৪০ ।৩, ৪৫ ।৩, গুলী ২৮ ।২, গুহাড়া ২৮ ।২, গেল ২ ।৩, ৪৭ ।৫, গেলা ৭ ।৪, ১৫ ।১, ৩৬ ।৩, গেলি ৩৭ ।১, গেলী ৮ ।২ গো ২০ ।২গোঅর ৪০ ।১, গোহালী ৩৯ ।৫ ।

ঘ

ঘড়িএ ৩ ।৪, ঘড়ুলী ৩ ।৫, ঘণ ১৬ ।১, ঘণ্টা ১১ ।৩, ঘর ২ ।২, ৩৩ ।১, ঘরিণী ২৮ ।২, ৪৯ ।২ ঘরে ৩ ।১, ১১ ।৫ ঘলিলি ১০ ।৬ ঘাট ১৫ ।৫, ঘাণ্টে ৪ ।১,ঘারেঁ পারেঁ ৩৯ ।৪ ঘালি ৪ ।৪, ঘালিউ ১২ ।৩, ঘিণি ৬ ।১, ঘুণ্ড ৩৯ ।১, ঘুমই ৩৬ ।২ ঘোরিঅ ৩৬ ।৪, ঘোলই ১৬ ।২ ।

চ

চউকোড়ি ৪৯ ।৫, চউখণ ৪৪ ।২ চউদিস ৮ ।৪, চউশঠি ৩ ।৪, চউষঠ্টি ১২ ।৫, চকা ১৪ ।৪, চঙ্গেড়া ১০ ।৫ চঞ্চল ১ ।১, ২১ ।৩ চঞ্চালী ৫০ ।৬ চটারিউ ২৬ ।৩, চড়হিলে ৮ ।৪, চড়ি ১০ ।৩, চড়িলা ১৪ ।৫ : চড়িলী, ১৪ ।১ চণ্ডালী ৪৭ ।১, ৪৯ ।২ : চন্দ ১৪ ।৪, চমকিই ৪১ ।১, চমণ ১ ।৫, চরঅ ২১ ।৪, চর্যা ২ ।৫, চলিআ ১৯ ।২, চলিল ১৩ ।৫, চাটিল ৫ ।২,৫, চান্দ ৪ ।৪, ২৯ ।৪, চান্দকান্তি ৩১ ।৩,চান্দরে ৩১ ।৩, চাপী ৪ ।১, ৮ ।৫, চার ২১ ।৬, চারা ২১ ।১ : চারিবাসে ৫০ ।৬, চালিঅ ২৭ ।২, ২৭ ।৩, চাহঅ ৮ ।৪, চাহন্তে ৩১ ।৪, ৪৪ ।৩ চাহাম ২০ ।২ চাহি ২০ ।২ চিঅ ১৩ ।৫, ৩১ ।১, চিঅরাঅ ৩২ ।১, ৩৫ ।২, ৩৫ ।৫, চিখিল৫ ।১, চিত্তা ১৬ ।৩, ৩৪ ।২ চীঅণ ৩ ।১, চীএ ১ ।২ ; চীরা ৪ ।৫ চুম্বী ৪ ।২, চেঅণ ৩৬ ।৩ চেবই ১৪ ।৪, ৩৪ ।৪, ৩৬ ।২, ৫০ ।৫, চৌকোড়্হি ৩৭ ।২ চৌদীস ৬ ।১, চৌর ৩৩ ।৪ চৌরি ২ ।২ চৌষট্ঠি ১০ ।৩ ।

ছ

ছই ১০ ।১ ছড়গই ৯ ।৪, ছন্তেঁ ৪২ ।৪, ছন্দা ১৪ ।৪, ছাড়ী ৬ ।৪, ১৫ ।৫ ; ছিছজই ৪৬ ।৩. ছিণালী ১৮ ।৫, ছুপই ৬ ।৩, ছাঅ ৪৬ ।৪, ছাইলী ২৮ ।৪, ছাড় ৫০ ।২, ছাড়ু ৫০ ।২, ছাড়অ ৬ ।২, ১৯ ।৫, ছাড়ি ১০ ।৫, ছান্দক ১ ।৪, ছার ১১ ।৪, ছিজঅ ৪৫ ।২, ছুধ ৯ ।৪, ছেব ৪৫ ।৪, ছেবই ৪৫ ।৩, ছেবহ ৪৫ ।৫ ছোই ১০ ।১ ।

জ

জ ২৬ ।৫, জঅ ১৯ ।২ জই ৫ ।৫, ২৩ ।১. ৪১ ।২, ৪৬ ।২ জইসনে ৩৭ ।৩, জইসা ৪০ ।৫, ৪১ ।৩ জইসো ২২ ।৩, ৩৭ ।২, জউতুকে ১৯ ।৩, জউনা ১৪ ।১, জগ ৩৯ ।৩, ৩৯ ।৫, ৪১ ।১ ৪১ ।২, জথাঁ ৪৪ ।৪, জলিঅ ৪৭ ।১, জবেঁ ২১ ।৬, ৪৪ ।১, জসু ৪০ ।২, জা ২০ ।১, ২২ ।৪, ২৯ ।৫. জাঅ ৪ ।৩, ১৯ ।৪, ৩৩ ।২ ৪৩ ।২, জাঅন্তে ১৫ ।৪, জাই ২৯ ।১, জাইউ ১৫ ।৫, জাইব ১৪ ।২, জাউ ৩৮ ।৩, জাগঅ ২ ।৩, জাগন্তে ৫০ ।১, জাণ ১ ।২, ২০ ।৪, ৪৪ ।৪ জাণই ৪৫ ।৪ জাণমি ৩১ ।১, ৪৯ জান্তে ১৫ ।৪, জাম ৮ ।২, ১৯ ।৩, ২২ ।২, ৪৩ ।৩, জামে ২২ ।৬, জায়া ৩৯ ।২, জালন্ধরি ৩৬ ।৫ জালা ৪৭ ।৩, জাসি, ১০ ।৪ জাহী ৫ ।৪ জাহের ২৯ ।৩ : জিণউর ৭ ।৫, ১২ ।২ জিনউরা ১৪ ।২, জিতেল ১২ ।১, জিম ৯ ।৩, ১৩ ।২, ২৯ ।৪, ৩০ ।৪, ৩১ ।৩ জীবন্তে ২২ ।৩, ২৩ ।২ জীবমি ৪ ।২, জুঅতি ২৬ ।৫, জুঝঅ ৩৩ ।৫, জে ৭ ।৪, ১৫ ।১, ২২ ।৫, জেন ২১ ।২, জো ৪৯ ।৩, জোই ১০ ।২, ১৯ ।৫, ২২ ।২, জোইআ ১৪ ।১, ২১ ।২, জোইণি ৪ ।১, ৪ ।৩, ১৯ ।৪, ২৭ ।১, জোএঁ ৪৭ ।১ জোড়িঅ ৫ ।৩ জোহা ৫০ ।৪, জৌবণ ২০ ।৪ ।

ঝ

ঝাণ ৩৪ ।৩, ঝাণে ১ ।৫

ট

টণ্টামালা ৪০ ।১ টলি ৩১ ।৩, টলিআ ৩৫ ।২, ৪৩ ।২ টাকলি ১৬ ।৩, টাঙ্গী ৫ ।৩, টাণঅ ৩৮ ।৩, টাল ৪০ ।৪, টালত ৩৩ ।১, টালিউ ১৮ ।৩ টুটি ৩৭ ।১ টেণ্টণপা ৩৩ ।৫

ঠ

ঠাকুর ১২ ।২, ঠাকুরক ১২ ।৪ ঠাণা ২৯ ।২, ঠাবী ৮ ।১

ড

ডমরু ১১ ।১, ডমরুলি ৩১ ।২ ডহি ৪৯ ।৩, ডাল ১ ।১, ৪৫ ।৫ ডালী°২৮ ।৩, ডাহ ৪৭ ।২, ৫০ ।৬, ডোম্বি ১০ ।১, ১০ ।৪, ১৪ ।৭, ১৮ ।৫, ডোম্বী ১০ ।২, ১০ ।৩, ১০ ।৬, ১৮ ।৩, ১৯ ।২, ১৯ ।৩, ১৯ ।৫ ডোম্বী এর ১৯ ।৫ ।

ণ

ণ ১৪ ।৫, ১৫ ।২, ২০ ।৪, ৪২ ।৪, ৪৩ ।১, ৪, ৪৪ ।৩, ণইরামণি ২৮ ।৪, ণচ্ছন্তে ৪২ ।৪ ণঠা৩১ ।১, ৩৫ ।৩, ণবগুণ ৪৭ ।৪, ণাণা ২৮ ।৩, ণাদ ৪৪ ।৩, ণাব ৪৯ ।১, ণাবড়ি ৩৮ ।১, ণাবী ১৩ ।১ ণিঅ ২৮ ।২, ৩০ ।৩, ৪৯ ।২, ণিঅড় ১২ ।২, ণিঅড়ি ৭ ।৫, ণিরবর ২৬ ।১, ণিরালে ৩১ ।২, ণিরেবণ ৫০ ।৭, ণিবাণে ২৭ ।৩, ২৮ ।৬ ণিবারিউ ৩১ ।৫ ।

ত

তই ৩৯ ।২, তইলা ৫০ ।১, তইসন ৩৭ ।৩, তইসো ১৩ ।৪, ২২ ।৩, ৩৭ ।৩, তউযে ২৬ ।২ তড়ি ১৫ ।৫ তথতা ৯ ।৩, ৩৬ ।১, ৪৪ ।৫, ৪৬ ।৫ তথাগত ১৩ ।৩, তন্তে ৩৪ ।৩ তরই ৫ ।২, তরঙ্গ ১৩ ।২, ৪২ ।৩, তরিত্তা ১৩ ।২, তরু ১ ।১, ৪৫ ।১, তবেঁ ২১ ।৬, ৪৬ ।১, তসু ২৭ ।১, ৪৫ ।১, তহি ১০ ।৩, ১৪ ।১, ২৮ ।১, ৩১ ।৩, ৪৩ ।৫ ৫০ ।৬, তং ৪১ ।১, তঁই ৪ ।২, ১৮ ।৩, তা ৭ ।১, ১৬ ।১, ৩৭ ।১, ৩৭ ।৫, ৪৫ ।৪, তাএলা ৫০ ।৪ তাস্তি ১০ ।৫, ১৭ ।২, ১৭ ।৫, তাঁভলা ৫০ ।৬ তাহের ২৯ ।৫, তাঁবোলা ২৮ ।৫, তিঅড্ডা ৪ ।১, তিঅধাউ ২৮ ।৪, তিঅস ২২ ।৫, তিণ ৬ ।৩, তিনা ৩৩ ।৩, তিনি ৭ ।৩, ১৮ ।১, তিম ৯ ।৩, ৪৩ ।২, তিমই ৪৬ ।৩, তিল ১৫ ।২ তিশরণ ১৩ ।১, তিহুঅন ১৬ ।৪, তু ১০ ।৬, ১৪ ।২, ১৪ ।৪, ৩২ ।৩, তুটঅ ২১ ।২, তুটহ ১৪ ।২, ৩০ ।৩, ৪৬ ।২, তমহে ৫ ।৫, ২৩ ।১, তুলা ২৬ ।১, ২৬ ।৩, তুসে ১৬ ।২, তেঁ ।৩, ৭ ।৪, তেন্তলি ২ ।১, তেলোএ ৪১ ।১, তৈলোএ ৩০ ।৫, ৪২ ।২, তো ৪ ।২, ৬ ।৪, ১০ ।৪, ৪১ ।৫, তোএ ১০ ।২, তোড়িআ ১২ ।৩, তোড়িউ ৯ ।১, তোরা ৪১ ।২, তোরেঁ ১৮ ।৪, তোলি ৫০ ।৬, তোলিআ ১২ ।৩, তোহোর ১০ ।৫, ১০ ।৬, ১৯ ।২, তোহোরি ১০ ।১, ১৮ ।২, ১৮ ।২, তোহোরে ১৮ ।৪, তোহোরেঁ ৩৯ ।১ ।

থ

থাকিউ ৪৯ ।৪ থাকিব ৩৯ ।১, থাকী ৪৪ ।৪, থাতী ২১ ।৩, থাহা ১৫ ।৩, থাহী ৫ ।১, থির ৩ ।২, ৩ ।৫, ৩৮ ।২, ২০ ।৫, থোই ৮ ।১।

দ

দঙ্গালে ৪৯ ।১, দমকুঁ ৯ ।৫, দলিআ ৩০ ।৩, দশদিসেঁ ৯ ।৫, দশমি ৩ ।৩, দশবল ৯ ।৫, দহদিহ ৩৫ ।৩, দাঢ়ই ৪৬ ।৩, দাণ্ডী ১৭ ।১, দান ১২ ।৫, দাপণ ৩২ ।৩, ৪১ ।৬, দারী ২৮ ।৪, দাহিণ ৫ ।৪, ৮ ।৫, ১৪ ।৪, দিঠা ১ ।৫, ১৬ ।৫, দিঢ় ১ ।২, ৩ ।২, ৫ ।৩, ১১ ।১, দিধলি ৫০ ।৭, দিল ৩৫ ।৪, দিবসই ২ ।৪, দিবি ২৯ ।৪, দিসঅ ২৬ ।৪, দিসই ৩৯ ।৩, ৪৭ ।৩, দীসঅ ৬ ।৫, দীসই ১৫ ।৩, ১৫ ।৪, দুআ ১২ ।২, দুআন্তে ৫ ।১, দুই ৩ ।১, ১৪ ।৪, ২৬ ।৪, দুখোলেঁ ১৪ ।৩, দুঠা ৩৯ ।৫, দুন্দোলী ৫০ ।২, দুধ ৪২ ।৪ দুধু ৩৩ ।২ দুংদুহি ১৯ ।২, দুলক্ খ ২৯ ।২, ৩ভ ।৩, দুলি ২ ।১, দুহি ২ ।১, দুহিএ ৩৩ ।৩, দুহিল ৩৩ ।২, ৫ ।৫, ৩১ ।৪, দে ৪ ।৪, ৩০ ।৩, দেখই ৪২ ।৪, দেখি ৭ ।১, ১৬ ।৪, ৪১ ।১, ৪২ ।৩, দেখিআ ৩ ।৩, দেখিল ৩৫৬ ।৪, দেঢ় ৩ ।৪, দেবী ১৭ ।৫, দেশ ১১ ।৪, দেহ ১১ ।২ ১৩ ।১, দেহুঁ ১২ ।৫, দো ১৫ ।৫, দোসে ৩৯ ।১, দ্বন্দ্বল ৩০ ।১, দ্বাদশ ৩৪ ।৫।

ধ

ধনি ১৭ ।২, ধমণ ১ ।৫, ধর ৩৮ ।১, ধরণ ২ ।১, ধরহুঁ ৩৮ ।২, ধাম ১৯ ।৩, ২২ ।৬, ৪৭ ।৫, ধামার্থে ৫ ।১, ধীরা ৪ ।৫ ধুনি ২৬ ।১, ২৬ ।৩, ধূম ৪৭ ।৩।

ন

ন ২৬ ।৪, ৫, ২৯ ।১-৪, ৩২ ।১, ৩৪ ।৪, ৩৫ ।৩, ৪৫ ।২, ৪৬ ।৩, ৫০ ।৫৪ নঅবল ১২ ।১, নঅরী ১১ ।২, নইরী ৪১ ।৩, নউ ৪৬ ।৩, ৪৭ ।৩, নগর ৪০ ।১, নড়এড়া ১০ ।৫, ননন্দ ১১ ।৫, নলিনীবন ৯ ।২, ২৩ ।১, নাই ১৪ ।১, ৩৮ ।২, নাচঅ ১০ ।৩, নাচন্তি ১৭ ।৫, নাটক ১৭ ।৫, নাঠ ৪২ ।৩, নাড়ি ১১ ।১, ২০ ।৩, নাড়িআ ১০ ।১, নাদ ৩২ ।১, ৪৪ ।৩, নামে ২৮ ।২, নায়করে ১৬ ।৪, নারী ৪ ।৫, নাল ৩ ।৫, নালে ৪৭ ।৫, নাব ১৫ ।৩, নাবী ৮ ।১, নাশঅ ২১ ।৩, নাসিঅ ৩৯ ।৫, নাহা১৫ ।৩, নাহিল ৩ ।৪, ৮ ।৪, ১৮ ।৫, ৩৩ ।১, নাহিক ৮ ।১, নিঅ ১৩ ।১, ৪৯ ।৪, নিঅড়ি ৫ ।৪, ৭ ।৫, নিঅমণ ২৮ ।৫, ৩২ ।৩, ৩৯ ।১, নিঅহি ৩২ ।২, নিঘিণ ১০ ।২, নিচিত ১ ।৩, নিচ্চল ২১ ।৫, নিতি ৩৩ ।১, ৩৩ ।৫, নিদ ২ ।৩, ৩৬ ।২, নিদালু ৩৬ ।২, নিরন্তর ১৬ ।২, ৩০ ।১, নিরবর ২৬ ।১, নিরাশী ২০ ।১, নিরেবণ ৫০ ।৭, নিরোহ ৪৪ ।২, নিল ২ ।২, ২ ।৩, নিলঅ ৬ ।৩, নিলেসি ৩৯ ।২ : নিবাণে ৫ ।৩, ৩৪ ।৩, নিবাস ৭ ।২, নিবিতা ৯ ।২, নিবুধি ৩৩ ।৪, নিসারা ৩ ।৪, নিসি ২১ ।১, নিহুরে ৩০ ।৩, নিংদ ১৩ ।৪, নেউর ১৩ ।৩ নৈরামণি ৫০ ।১, নৌ ৪৬ ।৩, নৌকা ৩৮ ।৩, নৌবাহী ৩৮ ।৩

প

পইঠ ১১ ।২, পইঠা ১ ।১, ১৬ ।৩, ১৬ ।৫, পইঠেল ৩ ।৪, পইস ২৩ ।২, পইঠো ১ ।১, পইসঅ ২৬ ।৪, পইসই ৬ ।৫, ৭ ।৫, ১৪ ।৩,৩১ ।৩ পইসন্তে ২৩ ।১, ২৮ ।৭, পইসি ৯ ।২, পউআ ৪৯ ।১, পঞ্চ ১ ।১, ১৩ ।৩, পঞ্চজনা ২৩ ।১, পঞ্চপাটন ৪৯ ।৩, পড়অ ৬ ।১, পড়ন্তেঁ ১৪ ।৩, পড়হ ১৯ ।১, পড়া ৪৭ ।৪, পড়িবিম্বু ৪১ ।৩, পড়বেষী ৩৩ ।১, পড়িভাসঅ ৩১ ।৩, পড়িহাই ৪১ ।১, পণ্ডিআচাএ ৩৬ ।৫, পতবাল ৩৮ ।১, পতিআই ২৯ ।১, পদুমা ১০ ।৩, পদ্মবন ২৩ ।২, পমাই ৪২ ।২, পরম ১১ ।৪, ২৮ ।৬, ৩৪ ।৩, পরহিণ ২৮ ।১, পরামণ ১০ ।৭, পরাপর ৩৫ ।৪, পরিচ্ছিন্না ৭ ।৩, পরীনিবিত্তা ১২ ।৪, পরিমাণ ১ ।২, পরিমাণী ৪৫ ।৩, পরিবারে ৪৯ ।৪, পরেলা ৪৩ ।৩, পবণ ৯ ।১, ৩১ ।১, পবণা ২১ ।২, পসঙ্গে ১৯ ।৪, পসরিউ ২৩ ।৩, পসারা ৩ ।৪, পসিআ ৩৫ ।৪, পহারী ৩৬ ।১, পহিল২০ ।৩, পহিলে ১২ ।৩, পাখ ১ ।৪, পাখুড়ী ১৭ ।৩, পাখেঁ ৪৬ ।৪, পাগল ২৮ ।২ পাণ্ড ১২ ।৩, ১৪ ।৩, ৪৫ ।১, পাটী ৫ ।৩, পাটের ১ ।৪, পড়িলা ২৮ ।৪, পাড়ী ৪৯ ।১, পাণিআ ৪৩ ।২, পানী ৬ ।৩, ১৪ ।৩, ৪৫ ।৩, ৪৭ ।২, ৪৭ ।৫, পাত ৪৫ ।১ পাথর ৪ ।৩, পান্তর ১৫৪ ।৪, পাপ ১৬ ।৩, পার ১৪ ।১, ১৪ ।৫, ৩৮ ।২, পারিম ৩৪ ।১, ৩৪ ।২, পাব ৪১ ।৫, পাবত ১৮ ।১, পাবিঅই ২৬ ।২, পাস ১ ।৪, পাসের ৫০ ।৪, পিচিউ ১৭ ।৪ ; পিটা ২ ।১, ৩৩ ।২, পিঠত ১৪ ।৩, পিণ্ডি ১ ।৫, পিথক ৩৭ ।৩, পিরিচ্ছা ২৯ ।৪, পিহাড়ি ১২ ।১ পীচ্ছ ২৮ ।১, পুচ্ছতু ৫ ।৫, ৪১ ।৫, পুচ্ছসি ১৫ ।৩, পুচ্ছি ৮ ।৩, পুচ্ছিঅ ১ ।২, পুছমি ১০ ।৪, পুণ্ডআ ২৮ ।৬, পুণ ২৬ ।৩, ৪৫ ।২, পুনু ১৪ ।২, পুণ্ণ ১৬ ।২, ৩৫ ।৩, পুলিন্দা ১৪ ।৪, পেখ ৩০ ।২, ৪৬ ।৩, পেখই ৪২ ।৪, ৪২ ।৪, পেখমি ৩৫ ।৩, পেক্ষ ২৮ ।৪, পোথা ৪০ ।১, পোহাঅ ১৯ ।৪, পোহাইলী ২৮ ।৪ ।

ফ

ফরই ৪২ ।২, ফরিঅ ৪৩ ।১, ফলবাহা ৪৫ ।১, ফাড়িঅ ৫ ।৩, ফাল ৪ ।৪, ফিটঅ ২১ ।৬, ফিটিল ৫০ ।৭, ফিটেলি ৫০ ।৪, ফীটউ ১২ ।১, ফীট্টা ৪৭ ।৪, ফুটিলা ৫০ ।৩ ফুড় ৪৬ ।৫, ৪৭ ।৫, ফুলিআ ৪১ ।৪, ফেটলিউ ২০ ।২ ।

ব

বঅণ ৩৯ ।১, বঅণে ৩৮ ।১, ৪৫ ।২, বইঠা ১ ।৫, বখানী ২৯ ।৩, ৩৭ ।৪, বখানে ৩৪ ।৩, বঙ্ক ৩২ ।২, বঙ্গালী ৪৯ ।২, বঙ্গালে ৪৯ ।১, বঙ্গে ৩৯ ।২, বজ্রধারী ২৮ ।৩, বট ২৬ ।৫, ২৯ ।২, বট্টই ৭ ।৫, বড়হিল ৩৩ ।২, বড়িআ ১২ ।৩, বতিস ১৭ ।৪, ২৭ ।১, বধেলি ২৩ ।৩, বন ৬ ।৪, ২৮ ।৭, বন্ধাব ২২ ।১, বর ৩৯ ।৫, ৪৫ ।২, বলআ ৩৮ ।৪, বলদ ৩৩ ।৩, বলন্দে ৩৯ ।৫, বলি ৪৬ ।৩, বলী ৫০ ।৭, বসই ২৮ ।১, বহই ১৪ ।১, ২৭ ।৩, বহল ২৬ ।৪, ৪ ।১, বহিআ ৩ ।৩, ৪ ।৩, বহুড়ী ২ ।৩, ২ ।৪, বাক্ পথাতীত ৩৭ ।৪, ৪০ ।৩, বাকলঅ ৩ ।১ ৩ ।১, বাকি ১৭ ।১ বাখোড়

৯ ।১, বাঙ্ক ১৫ ।২ বাজঅ ৩১ ।২, বাজই ১৭ ।২, বাজএ ১১ ।১, বাজিল ১৭ ।৫, বাজুল ৩৫ ।৪, বাঝই ৪৬ ।৩, বাঁঝে ৩৩ ।৩, বাট ৭ ।১, ১৫ ।২, ১৫ ।৪, ৩২ ।৫, বাটত ৮ ।৫, ১৪ ।২, ৩৮ ।৪, বাটা ১৫ ।৫, বাড়ী ৫০ ।১, ৫০ ।৩-৪, বাঢ়ই ৪৫ ।৩, বাণ ১ ।৪, ২৯ ।৩, বাণে ২৮ ।৬, বাণ্ড ৩৭ ।৪, বাতাবর্তে ৪১ ।৩, বাধা ৩৪ ।৫, বান্ধ ১ ।৪, বান্ধঅ ৩ ।১, বান্ধন ৯ ।১, ২১ ।৬, বান্ধি ১৪ ।৩, বাপ ২০ ।৪, বাপা ৩২ ।৫, বাপুড়া ২০ ।৩, বাপুড়ী ২০ ।৩, বাম ৫ ।৪, ৮ ।৫, ১৪ ।৪, ১৫ ।৫, বারুণী ৩ ।১-২, বাল ১৫ ।২, বালাগ ২৬ ।৪, বালি (বালী) ২৮ ।১, ৫০ ।১, বালুআ ৪১ ।৪, বাষনা ৪১ ।২, বাস ৩৭ ।৩, বাসনপুড়া ২০ ।৩, বাসসি ১৫ ।৪, বাহ ৩৬ ।১, বাহঅ ১৩ ।৩, বাহতু ৮ ।২-৩, ১৪ ।২, ১৪ ।৪, বাহবকে ৮ ।৪, বাহবা ১৪ ।৫, বাহিঅ ১৮ ।১, বাহিউ ৪৯ ।১, বাহিরি ১০ ।১, বাহী ৫ ।১, বাহ্ম ১০ ।১, ৪৭ ।৪, বিআএল ৩৩ ।৩, বিআণ ২০ ।৩, বিআতী ২ ।২ বিআপক ৯ ।১, বিআর ৩১ ।৪, বিআরম্ভে ২০ ।৩, বিআরেঁ ১৫ ।১, বিআলী ৪ ।১, বিকণঅ ১০ ।৫, বিকসই ৪০ ।৫ বিকসউ ২৭ ।১, বিগোআ ২০ ।১, বিচুরিল ৪৫ ।৫, বিণানা ২৯ ।২, ৩৯ ।২, ৪৬ ।৪ বিদারম ৩৯ ।১, বিদুজন ১৮ ।৪, ৪৫ ।৩, বিনু ৪ ।২, বিন্দারঅ ২১ ।৩, বিন্দু ৩২ ।২, ৪৪ ।৩, বিন্ধহ ২৮ ।৬, বিপথ ১৬ ।৪, বিমনা ৭ ।১, ৭ ।৪, বিমুকা ৩৭ ।২, বিমুক্কা ৪৬ ।২, বিয়োএ ৪২ ।১, বিরমানন্দ ২৭ ।৪, বিরলে ৩৩ ।৫, বিরুআ ৩ ।৫, ১৮ ।৪, বিলক্ষণ ২৭ ।৪, বিলসঅ ৯ ।২, বিলসই ১৭ ।২, ২৯ ।২, ৩৪ ।১-২, ৪২ ।৫, বিলসন্তি, ৫০ ।২, বিবাহিআ ১৯ ।৩, বিবাহে ১০ ।২, বিবিহ ৯ ।১, বিশেষ ৪৯ ।৫, বিষম ৫০ ।২, বিষয় ১৬ ।৪, বিস ৩৯ ।৪, বিসঅ ৩০ ।৪, বিসঙ্কা ২২ ।৪, বিসণ্না ৪২ ।১, বিসমা ১৭ ।৫, বিহণি ২৩ ।২, বিহরই ১১ ।২, বিহরহুঁ ৩৯ ।৫, বিহরিউ ৩১ ।৫, বিহাণ ৪৪ ।৪, বিহারেঁ ৩৯ ।১, বিহুণ ৩৬ ।৪, বিহুনে ১৩ ।৪, বিহুণ্ণে ৩৫ ।৩, বীরনাদে ১১ ।১, বীরা ৪ ।৫, ২০ ।৫, বুজিঅ ১৫ ।৫, বুঝঅ ৩৩ ।৫, বুঝই২০ ।৫, ২৭ ।৪, ৩৭ ।৫, বুঝতু ৩২ ।৩, বুঝষি ৪১ ।২, বুঝসি ১৫ ।৩, বুঝি ২৩ ।৩, বুঝিঅ ২৭ ।৫, বুঝিল ৩৫ ।১ বুজ্‌ঝিঅ ৩০ ।৪, বুড়ন্তে ১৬ ।১০, বুড়িলী ১৪ ।১, বুদ্ধ ১৭ ।৫, বুলই ১৪ ।৩, বুলথেউ ১৫ ।৫ বেঅন ৩৬ ।৩, বেএঁ ২৯ ।৩, বেগেঁ ৫ ।১, বেঙ্গ ৩৩ ।২, বৈরী ৬ ।৩ বোড়ী ১৪ ।৫, বোড়ে ৪৬ ।১, বোব ৪০ ।৪-৫, বোল ৪০ ।২, বোলঅ ৬ ।৪, বোলই ১৮ ।৪, বোলবা ৪০ ।২, বোলিআ ৩৮ ।৫, বোলী ৪০ ।৪, বোহি ৫ ।৪, ৩২ ।২, বোহী ৪৪ ।২, বোহে ২১ ।৫, বোহেঁ ১২ ।১ ২৩ ।৩, ৩৫ ।১, ব্যাপিউ ১৭ ।৪ ।

ভ

ভঅ ৩৮ ।৪, ভইঅ ৪৭ ।১, ভইআ ৪১ ।৩, ভইল১৪ ।২, ১৪ ।৫, ভইলা ৭ ।১, ৭ ।৪ ১৫ ।১, ৫০ ।৭, ভইলী ৪৯ ।২, ভইলে ২ ।৪, ভইলেসি ২০ ।৪, ভখঅ ২১ ।১ ভড়ারা ৪৭ ।৪, ভণ ৪০ ।২, ৪২ ।২, ভণঅ ২১ ।৬, ভণই ১ ।২, ৪ ।৫, ৭ ।৩, ভণতি ২২ ।৬, ভণথি ২০ ।৫, ভণন্তি ৩ ।৫, ১৬ ।৫, ৩৯ ।৫, ভণি ২৯ ।৪, ভণিআ ৩৫ ।৪, ভণ্ডার ৩৬ ।২, ৪৯ ।৫ ভমন্তি, ২২ ।৪, ভয় ৩১৪-৫, ভয়ঙ্কর ১৬ ।৫ ভর

২৭ ।১, ৩৬ ।৩, ভরিতী ৮ ।১, ভব ৫ ।১, ৭ ।৩, ১৩ ।২, ৩৯ ।৩, ৫০ ।৭, ভাঅ ২ ।৪, ভাইলা ৩২ ।৫, ভাইব ২৯ ।৫, ভাংতিএ ৪১ ।১, ভাগ ৪২ ।৩, ভাগেল ৩৯ ।২, ভাজই ১৬ ।১, ভাঞ্জিঅ ১ ।৭, ভাত ৩৩ ।১, ভান্তি ১৫ ।৪, ৩৭ ।৩, ভান্তী ৪১ ।৩, ভান্তো ৬ ।৪, ভাব ২৯ ।১, ভাবাভাব ৯ ।৪, ৩০ ।১ ৪এ ।৪, ভাবিঅই ২৬ ।২, ভাবে ৪২ ।৫, ভাভরিআলী ১৮ ।২, ভাল ১২ ।৫, ভিণ ১৫ ।২, ভিতি ১ ।৪, ভিয়া ৭ ।৩, ভুঅণ ১৮ ।১, ভুঅণে ৩৪ ।৫, ভুজঙ্গ ২৮ ।৪, ভুঞ্জই ৩৪ ।৪, ভুলহ ১৫ ।২, ভেড় ৪এ ।৩, ভেলা ১৫ ।৩, ২৩ ।২, ভেবউ ৪৫ ।৪, ভো ২ ।২, ভোল ৩৭ ।২, ভোলা ৫০ ।৫ ।

ম

ম ১০ ।১, ১৩ ।২, ২০ ।৪ মঅগল ৯ ত, মঅলেঁ ২২ ।৩, মই ১৬ ।৫, ১৮ ।১, ২৭ ।৫, ২৯ ।৪, ৩০ ।৪, ৩৬ ।৪, মইলেঁ ৪৯ ।৫, মএল ২৩ ।২, মকুঁ ৩৫ ।২, মঝ ১৩ ।২, মণ ১৯ ।১, ২০ ।১, মণা ৪৬ ।২, মণিকুলে ৪ ।৩, মণ্ডল ১৬ ।১, মতিএঁ ১২ ।৪, মন্তেঁ ৩৫ ।৩, মরণ ২২ ।২, ৪৩ ।৩, মরি ৩২ ।৪, মরিঅই ১ ।৩, মরুমরীচি ৪১ ।৩, মহাতরু ৪৩ ।২, মহানেহে ৪৯ ।৪, মহামুদেরী ৩৭ ।১, মহারসপানে ১৬ ।৪, মহাসিদ্ধি ১৫ ।৪, মহাসুখে ২৮ ।৪, মহাসুহ ১ ।২, ৮ ।৫, মহাসুহলীলে ৩৪ ।৩, মহাসুহে ৫০ ।২, মহাসুহেঁ ৩৪ ।২, ৫০ ।৫, মহিন্তা ১৬ ।৫, মা ৫ ।৪, ১৫ ।৪, ১৫ ।২, মাঅ ১৩ ।২, মাআ ৪৬ ।৪, ৫০ ।২, মাআজাল ১৩ ।৩, ২৩ ।৩, মাআমোহা ১৫ ।৩, মাআহরিণী ২৩ ।৫, মাএ ২০ ।২, মাংসে ৬ ।২, ২৩ ।২, মাগ ১৪ ।৪, মাগঅ ২ ।৩, মাগে ২৭ ।২, মাঙ্গত ৮ ।৪, মাঙ্গা ৮ ।৫, মাঙ্গে ১৩ ।৫, ১৪ ।৩, মাঝ ৪৪ ।২, ৪৪ ।৪, মাঝেঁ ২ ।৫, ৫ ।১, মানই ৪৫ ।৪, মাণী ৩৪ ।৪, মাতঙ্গী ৪ ।১, মাতেল ১৬ ।২, ১৬ ।৪, মাতেলা ৫০ ।৫, মাদলা ১৯ ।১, মাদেসি ১২ ।২, মার ১৬ ।১ ২১ ।২, ২৬ ।৪, মারমি ১০ ।৭, মারিঅ ১৫ ।৫, মারিআ ১১ ।৫ মারিউ ১২ ।৩, মারিল ৫০ ।৭, মারিহসি ২৩ ।১ মারী ১৩ ।১, মালী ১০ ।৬, ২৮ ।১, মিঅলী ৪৭ ।১, মিচ্ছা ২৯ ।৪, মিছে ২২ ।১, মিলিআ ৪৪ ।১, মিলিমিলি ৮ ।৫, মূকল ৩২ ।১, মুক্তাহার ১১ ।৪, মুণিআ ১৭ ।৩, মুষাএর ২১ ।৬, মুসা ২১ ।১-৩, মূহ ৪ ।২, মূঢ় ৬ ।৫, মূঢ়া ১৫ ।২, ৪১ ।৫, ৪২ ।৩-৪, মূল ২০ ।৪, ৪৫ ।৫, মেরি ৫০ ।৩, মেরুশিখর ৪৭ ।৩, মেল ৩৮ ।৩, মেলই ১০ ।৪, মেলি ৬ ।১, ৩৮ ।৩, মেলিলি ৮ ।৩, মেলে ২৭ ।৫, মেহ ৩০ ।১, মেহেলী ১৩ ।১, ৫০ ।২ ; মো ৭ ।৫, ৩৫ ।৪, ৩৯ ।৫, মোএ ১০ ।৬, মোখ ১১ ।৪, মোড়িঅ ১৬ ।৩, মোড়িউ ৯ ।১, মোর ২০ ।৩-৪, ৩৩ ।১, ৪৯ ।৩-৫, মোরঙ্গি ২৮ ।১, মোরি ৩৬ ।৫, মোলাখ ১০ ।৭, মোর ১১ ।৪, ৪৬ ।১-২, মোহা ৫০ ।২, মোহে ৩৪ ।৫, ৪৬ ।৩, মোহোর ২০ ।১ মৌলিল ২৮ ।৩ ।

য

যোইণি ৪ ।২, যোগী ১১ ।২

র

রঅণ ৯ ।৫, ৪০ ।৫, রঅণহুঁ ২৭ ।২, রঅণি ১৯ ।৪, ২৩ ।২, রচি ২২ ।১, রত্তো ১৯ ।৫, রথে ১৪ ।৫, রবি ১১ ।৩, ১৬ ।৫, ৩২ ।১, রস ২২ ।৪, রসানেরে ২২ ।৪, রাঅ ৩৪ ।৫, রাআ ১৪ ।৫, রাউতু ৪১ ।৫, ৪৩ ।৪, রাগ ১১ ।৪, রাজই ৩১ ।২, রাজপথ ১৫ ।২, রাজসাপ ৪১ ।১, রাতি ২ ।৪, ২৭ ।১, ২৮ ।৪-৫, রাহুঅ ৩৬ ।৫, রিসঅ ৯ ।৩, রুঅ ৪৯ ।৪, রুখের ২ ।১,রুণা ১৭ ।২, রুন্ধেলা ৭ ।১, রুব ২৯ ।৩, রূপা ৮ ।১, রেবই ১৪ ।৪, রোষে ২৮ ।৭ ।

ল

লই২৯ ।৫, ৩৮ ।৫, ৪৭ ।২-৩, লইআ ১১ ।৪, ২৮ ।৫, ৩৫ ।৫, ৪৯ ।৫, ৫০ ।২, লইআঁ ২৬ ।৩, লক্খণ ১৫ ।১, ৩৪ ।২, লড় ৪২ ।৪, লধা ৩৪ ।৫, লবএ ১১ ।৪, লাউ ১৭ ।১, লাংগ ১০ ।২, লাগি ১৬ ।৩, লাগে২৯ ।২, লাগেলি ১৬ ।১, ১৭ ।১, ৪৭ ।২, লাগেলী ২৮ ।৩ লাঙ্ক ৩২ ।২, লাঙ্গা ৩৬ ।২, লীড়েঁ ১৮ ।১, ৩৪ ।৩, লীলে ১৪ ।১, ২৭ ।৫, লুড়িউ ৪৯ ।১, লেই ১৪ ।৫, লেউ ৩২ ।৩, লেপ ৪ ।৩, লেমি ১০ ।৭, লেলী ৪৯ ।২, লেহু ৩২ ।১, ৪৭ ।৫, লেহুঁ ১২ ।৫, লো ১০ ।৬, ১৪ ।২, লোঅ ৫ ।২, লোঅ ৫ ।২, ৫ ।৫, ১৮ ।৪, ২২ ।১, ৪২ ।৪, লোআচার৩১ ।৫, লোড়িব ২৮ ।৭, লোহা ৪১ ।২ ।

শ

শক্তি ১১ ।১, শঙ্কা ৩৭ ।১, শবর ৫০ ।৫, শবরো ৫০ ।২, ৫০ ।৬, শশিমণ্ডল ৩২ ।১, শশী ৩৬ ।৫, শান্তি ২৬ ।৪, শালী ১১ ।৫, শাসন ৪৭ ।৪, শাসু ৪৭ ।৫, শিআলী ৫০ ।৬, শিখর ৪৭ ।৩, শুঙিনি ৩ ।১, শূন ১৩ ।১, ৩৫ ।৩, ৪২ ।১ ।

ষ

ষম ৩ ।৫, ষরবালী ৫০ ।৭, ষযহর ২৭ ।২-৩ ষহজে ২৭ ।২, ষামাঅ ৩৩ ।২, যারা ৩০ ।৫, যারে ৪১ ।১, ষিআলা ৩৩ ।৫, ষিহে ৩৩ ।৫, ষুকড় ৫০ ।৩, ষে ৫০ ।৩ ।

স

সঅ ১৫ ।১, ১৬ ।১, ২৬ ।৫, সঅল ১ ।৩, ৯ ।৪, ১৬ ।১, ১৭ ।৪, ১৮ ।৩, সঅলা ৩৬ ।১, সংকেলিউ ১৫ ।৫, সংঘারা ২০ ।৪, সংপুন্না ৪২ ।২, সংবোহিঅ ৪০ ।৫, সংবোহী ৪৪ ।২ সংবোহেঁ ২৯ ।১, সংসার ৩৩ ।২, সংসারা ১৫ ।২, সংহার ১৪ ।৪, সঁবেঅন ২৬ ।৫, সগুন ৫০ ।৬, সঙ্গে ১৯ ।৫, ৩২ ।৪, সচরাচর ২২ ।৫, সড়ি ৪৫ ।৪, সদগুরু ৮ ।৩, ১২ ।২, ১৪ ।২, সদ্ভাবে ১০ ।৪, সন্তাপেঁ ১৬ ।৫, সন্তারে ৩৭ ।৪, সন্ধি ২৮ ।৬, সপরবিভাগা ৩৬ ।২, সভাবেঁ ৪১ ।২, সম ১০ ।২, সমতা ৪৭ ।১, সমতুলা ৫০ ।৩, সমরসে ৪৩ ।২, সমাঅ ৪ ।৩, ৩৮ ।৫, ৪০ ।২, ৩৪ ।২, সমাণা

৪৬ ।৪, সমাহিঅ ১ ।৩, সমুদারে ১৫ ।৩, সমুদে ৩৫ ।২, সম্বেঅন ১৬ ।১, সরবর ১০ ।৭, সরুঅ ১৫ ।১, সরুআ ৩০ ।২, সরুই ৩ ।৫, সব ৩৮ ।৪, সবরী ২৮ ।১, ২৮ ।৩, সব্ব ৩৫ ।১, ৪৫ ।৪, সসর ১৮ ।১, ৪৭ ।২, সসি ১৭ ।১, সহজ ২৮ ।১, ১০ ।২, ১৭ ।১, সহজানন্দ ২৭ ।৫, সহজে ১ ।২, ৪২ ।১, সহাব ৪১ ।৫, ৪১ ।৪, সহাবে ৯ ।৪, ১২ ।১, সহি ১৭ ।২, সাঅর ৪২ ।১, সাঙ্কম ৫ ।২, সাঙ্কমত ৫ ।৪, সাঙ্গ ১০ ।২, সাঙ্গা ৮ ।৫, সাঙ্গে ১১ ।৫, সাচ ২৯ ।৪, সাদ ১৯ ।২, সাদেঁ ৪৪ ।৫, সাধী ১১ ।৪, সান্তি ১৫ ।৫, ২৬ ।২, ২৬ ।৫, সান্ধ ১ ।২, সান্ধঅ ১ ।১, সান্ধি ১৪ ।১, ১৭ ।১, সামী ৫ ।৫, সারি ১৭ ।১, সাসু ৪ ।৪, সাহা৪৫ ।১, সাঁঝে ১১ ।১, সিংগে ৪১ ।৪, সিকল ১৬ ।১, সিঝই ১৫ ।৪, সিণ্ডহু ১৪ ।১, ৪৭ ।২, সিঠি ১৪ ।৪ সিহর ২৮ ।৭, সীস ৪০ ।১, সীসা ৪০ ।৪, সুঅণে ৪৬ ।১, সুআ ৪১ ।৪, সুইনা ১১ ।২, ১১ ।৪, ১৯ ।১, সুচ্ছড়ে ১৪ ।৫, সুজ ৪ ।৪, ১৭ ।১, সুণ ৬ ।৪, ১১ ।৪, সুণে ২৬ ।১, সুতেলা ৩৬ ।৩ সুতেলি ১৮ ।১, সুধ ২৭ ।৪, সুনন্তে ৩০ ।৩, সুনুপাখ ১ ।৪, সুন্দারী ২৮ ।২, সুফল ২৬ ।৩, সুভাসুভ ৪৫ ।৩, সুরঅ ১৯ ।৪, সে ৩ ।১, ৭ ।৫, ৫৪০ ।৭, সেজি ২৮ ।৪, সেব ২০ ।৩, সেস ৪৯ ।৫, সেসু ২৬ ।১, সো ৭ ।২, ১০ ।১, সোই ৩২ ।৪, ৪৬ ।৪, সোণ ৪৯ ।৪, সোনে ৮ ।১, সোন্তে ৩৮ ।৫, সোষই ৪২ ।৩, স্ব ৩৪ ।৪ স্বপনে ৩৬ ।৪ স্বভাবে ৪৬ ।৫, স্বমোহেঁ ৩৫ ।১ ।

হ

হই ৪৭ ।৪, হথ ৩৯ ।১, হথা ৪১ ।২, হর ৪৭ ।৪, হরি ৪৭ ।৪, হরিঅ ৯ ।৫ ; হরিণা ৬ ।২, হরিণী ৬ ।৪ হাক ৬ ।১, হাড়েরি ১০ ।৬, হাণ ২৩ ।২, হাথেরে ৩২ ।৩, হালো ১০ ।৪, ১৮ ।২, হাঁউ ১০ ।৬, ২০ ।১, হাঁড়ীত ৩৩ ।১, হিঅ ২৮ ।৫, হিঅহি ৬ ।৫, হিএঁ ৫০ ।১, হিণি ২৩ ।২, হিণ্ডই২৮ ।৩, হুঁ ৩৯ ।২, হে ৫ ।৫, হেণ্ঠে ৫০ ।১, হেড্ডই ৩০ ।৫, হের ৫০ ।৭, হেরি ৬ ।২, ৭ ।৫, ৫০ ।২, হেরুঅ ১৭ ।২, ২৬ ।২, হেলেঁ ১৮ ।১, হো ৭ ।৩, ৩১ ।১, হোই ৩ ।২, ১৫ ।২, ১৭ ।৫, হোইব ৫ ।৫, হোন্তি ২২ ।৫, হোহিসি ২৩ ।১, হোহী ৫ ।৪, হোহু ৬ ।৪ ।

নির্ঘণ্ট

অথর্ববেদ ৪৪
অদ্বয়বজ্র১০
অনঙ্গবজ্র ১৪
অভিসময়বিভঙ্গ ১৬, ১৮, ২২
অসঙ্গ ৫৮
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪, ১০৪
আচার্যপাদ ১০
আজদেব ২১, ২৪, ৯০
আর্নল্ড বাকে ১০৪
ঋগ্‌বেদ ৪৪
কঙ্কণ ২১, ২২, ২৪
কবীর ৪৬
কামলি ২১, ২৪, ৯৩
কালিদাস ৭৯, ৮৮
কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল ২৮
কাহ্নপাদ ১৬, ১৭, ২০, ২৩-২৬, ৩২, ৫০, ৫৫, ৭৩
কুক্কুরীপাদ ২০, ২১, ২৩, ৭৬
কৃষ্ণাচার্য ১০, ১৭
গাথা সপ্তশতী ১২৪
গুণ্ডরীপাদ ২০, ২৪, ৭৪
গোপীচন্দ্রের গান ৯, ১০৫
গোরক্ষনাথ ১৭
চতুরাভরণ ১৮
চতুঃশূন্য ৬৪
চা চা গান ১০৪
চাটিল ২০, ২৪, ৫৩
চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৬
ছোম্বা ৪৪
জঅনন্দি ২১, ৬০
জয়কান্ত মিশ্র ২৯
জালন্ধরিপা ২৬
জেতারি ১৪
টেণ্টন পাদ ২১, ২২, ৪৫, ৯০
ডোম্বীপা ২১, ২৪, ৯৩
তত্ত্বস্বভাবদোহাকোষ ২২
তন্ত্রীপাদ ২১
তাড়ক ২১, ২২, ৯০
দণ্ডী ৮৮
দারিক২১, ২৩, ৪৯, ৯০
দীনেশচন্দ্র সেন ৯
দীপঙ্কর ১৬, ১৮
ধর্মাধর্মবিনিশ্চয় ১৪
ধাম ২১, ২৪, ৫৬
নবচর্যাপদ ১০৪, ১০৫
নাগার্জুন ৫৮, ৬৪
নিবৃত্তিনাথ ১৭
পঞ্চক্রম ৬৪
পাদাকুলক ৮৪, ৮৫, ৮৬
পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৩, ৪৪
প্রবোধচন্দ্র বাগচী ১০, ১৩, ১৫, ৪৪, ৫৯, ২২৭
প্রবোধচন্দ্র সেন ৮৪
'বঙ্গ ভাষার উৎপত্তি' ৯
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ১০
বসুবন্ধু ৫৮
বামন ৮৮
বিজয়চন্দ্র মজুমদার ২৭, ২৮

বিজ্ঞানবাদ ৫৮, ৫৯
বিদ্যাপতি ৯
বিধুশেখর শাস্ত্রী ১৩, ৪৫
বিবিধার্থ সংগ্রহ ৯
বিরুআ ২০, ২৩, ২৫
বিরূপপদচতুরশীতি ২৩
বীণাপাদ ২১, ৫৪, ৯৩
ভবভূতি ৮৮
ভাদে ২১, ২৪, ৯০
ভুসুকু ১৮, ২০, ২৪, ৫১, ৫৭, ৬০, ৬১, ৭১, ৯০, ৯৩
মরহট্টা ৮৪
মহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১৬, ১৭৪, ১৭৫
মহিণ্ডা ২১, ২৪
মহীপাদ ২৪
মাধ্যমিক বাদ ৫৮, ৫৯
মানসোল্লাস ২০, ৭৮
মীননাথ ২২
মুনিদত্ত ১১, ১২, ১৫, ৩১, ৪৪
মেখলা ১০
মৈত্রেয় ৫৮
রবীন্দ্রনাথ ৭০, ১০৮, ১০৯
রাজ্যেশ্বর মিত্র ১৯, ৭৭
রাহুল সাংকৃত্যায়ন ১৬, ২৮, ১০৩, ১০৪
লালনগীতিকা ১০৮
লুইপাদ ১৩, ১৬, ১৮, ২০, ২২, ৪৯, ৫০, ৬২
শবরপাদ ২১, ৫৭, ৬৫, ৭৫, ১০০
শশিভূষণ দাশগুপ্ত ৬৬, ১০৪
শাক্যমুনি ৪৭
শান্তিপাদ ২১, ৮০
শার্ঙ্গদেব ১৯
শূন্যবাদ ৫৮, ৫৯, ৬৩
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ১৭
শ্রীভগবদভিসময় ২২
সঙ্গীতরত্নাকর ১৯, ৭৮
সরহ ১৬, ২১, ২৪, ৫৩, ৫৪, ৬০
সহজযান ৪৮, ৪৯
সুকুমার সেন ১২, ১৮, ২০, ২৩, ২৪, ৬৯, ৭৯, ১০৩
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৫, ১৬, ১৭, ১৮
সুন্দরদাস ৪৬
সৌত্রান্তিক ৫৮
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ৯, ১০, ১২-১৫, ২০, ২৭, ৪৩, ৪৭, ৭৭, ১০৩, ২২৭
হারামণি ১০৮
হেবজ্রপঞ্জিকা ১৭, ৩২
হেবজ্রতন্ত্র ৪৪, ৫০